‘মাতৃভাষা’-র দশ বছরের অর্জন

সংকলন: ২

ভারত-ভুটান ভূখণ্ডে ভাষা-জাতিসত্তার বৈচিত্র্য ও টানাপোড়েন

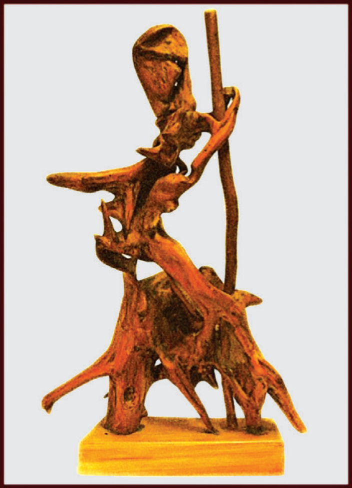

সম্পাদনা:
সজল রায়চৌধুরী, বিপ্লব নায়ক

ভাষা-জাতিসত্তার বৈচিত্র্য ও টানাপোড়েন

সংকলন: ২

সম্পাদনা:
সজল রায়চৌধুরী
বিপ্লব নায়ক

চুড়ো-করে-বাঁধা কেন্দ্রীভূত জাতি-রাষ্ট্রের আগ্রাসী সমসত্ত্বতা-আরোপকারী প্রবল টানের বিরুদ্ধে নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই লড়তে হচ্ছে বিভিন্ন জনজাতির মানুষকে। সবগুলোই এক একটা অসম লড়াই। তবু এ লড়াই ও প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাগুলোর ভিতরে নানা সীমাবদ্ধতা-পিছুটানের মধ্যেও গঠনমূলক নানা সম্ভাবনা উঠে আসছে। তারই কিছু পরিচয় এই সংকলনের মধ্যে ধরা হয়েছে। এই সংকলনে বিশ্বের কিছু অগ্রণী সমাজভাষাবিদদের লেখা বা লেখার তর্জমা রয়েছে, কিন্তু বেশি অংশ জুড়েই রয়েছে ‘মাতৃভাষা’ পত্রিকার ভাষাকর্মীদের ক্ষেত্রসমীক্ষাগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা আর বিভিন্ন জনজাতিদের নিজেদের ভালোবাসার মানুষদের লেখা। সাধারণভাবে ভাষিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও জনজাতিদের স্বাধিকারের পক্ষে হলেও তাই লেখাগুলোর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির নানা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে যা বিষয়টির বহুমাত্রিকতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। পাঠক এই বইটিকে অনুরাগ-ভালোবাসার পটে আঁকা বিলীয়মান ভাষিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মায়াবিবরণ হিসেবেও পড়তে পারেন।

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

‘মাতৃভাষা’-র দশ বছরের অর্জন সংকলন: ২

ভারত-ভুটান ভূখণ্ডে

ভাষা-জাতিসত্তার বৈচিত্র্য ও টানাপোড়েন

‘মাতৃভাষা’-র দশ বছরের অর্জন সংকলন: ২

ভারত-ভুটান ভূখণ্ডে

ভাষা-জাতিসত্তার বৈচিত্র্য ও টানাপোড়েন

সম্পাদনা

সজল রায়চৌধুরী

বিপ্লব নায়ক

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪৩২ / জুন ২০২৫

সম্পাদনা
সজল রায়চৌধুরী
বিপ্লব নায়ক

প্রকাশক
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড
কলকাতা ৭০০০৪৭

প্রচ্ছদ
বিপ্লব নায়ক (ব্যবহৃত দারুভাস্কর্যটি বিমলেন্দু মজুমদারের সৃষ্টি)

পুস্তানি
ইন্দ্রনাথ মজুমদার

অক্ষর ও পৃষ্ঠাবিন্যাস
সত্যজিৎ দাস

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি.
১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর
কলকাতা ৭০০১৩২

মূল্য : ৪০০ টাকা

সম্পাদকীয়

'তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।' বলা বাহুল্য যে কবিতার লাইনটা রবীন্দ্রনাথের। অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন, ভাষা বা জনজাতি প্রসঙ্গে নয়। 'মাতৃভাষা' পত্রিকার দশ বছরের অর্জন মন্থন করে প্রথম সংকলনটি আগেই বেরিয়েছে। সমাজভাষার তাত্ত্বিক প্রসঙ্গই সেখানে সংকলিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় সংকলনটিতে ভারত ও ভুটান ভূখণ্ডের ভাষা ও জাতিসত্তা পরিচয়ের বৈচিত্র্য ও টানাপোড়েন সংক্রান্ত যে মহাবিষয়, তারই অন্তর্গত কিছু অণুবিষয় অন্যতর পাঠ ও চর্চার উদ্যোগে দুই মলাটের মধ্যে সংকলিত হলো।

এবার অন্তর্ধানের কথাটা বলি। আমরা এক অদ্ভুত আগ্রাসী বৈচিত্র্যবিনাশী বিশ্বের ঘূর্ণিপাকে পড়ে গেছি। বিচিত্রের লীলা ও নানা সংস্কৃতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্যতা প্রতিনিয়তই বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হয়ে পড়ছে। বিশেষত, সংখ্যার বিচারে ছোটো জনজাতিগুলোর ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বাধিকার দ্রুত বিলুপ্তির পথে চলেছে। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকরা হিসাব করে বলছেন যে পৃথিবীর ভাষাভাণ্ডার থেকে প্রতি মাসে গড়ে দুটি করে ভাষা বিদায় নিচ্ছে, অর্থাৎ, তাদের শেষ কথকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাচ্ছে। এই পরিণতির প্রধান শিকার হচ্ছে সংখ্যাল্প জনজাতিদের ভাষা-সংস্কৃতি ও স্বশাসনের চিরায়ত প্রবাহ। (যদিও তামিল, বাংলা, কন্নড় ইত্যাদি সংখ্যার বিচারে বড়ো জাতিগুলোর ভাষা-সংস্কৃতিও এই আগ্রাসী সমসত্ত্বতা আরোপের ধ্বংসোন্মাদনা থেকে রেহাই পাচ্ছে না।) এর প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত নানা প্রয়াসও অঙ্কুরিত হচ্ছে। লিপিহীন ভাষার বাচকরা নিজেদের উদ্যোগে লিপি তৈরি করছেন, আধিপত্যকারী ভাষায় সরণ ঘটে যাওয়া ঠেকাতে বা সরণ ঘটে যাওয়ার পরও আবার নিজ মাতৃভাষায় ফিরিয়ে আনতে শিশু-তরুণদের জন্য নিজ মাতৃভাষা শেখানোর আখড়া পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন, নিজেদের ভাষার

সরকারি স্বীকৃতি আদায়ের জন্যও নানা উদ্যোগ নিচ্ছেন। চেষ্টা করছেন তাদের পরম্পরাগত আচার-অনুষ্ঠান-সমাজরীতি বজায় রাখতে। ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফশিলে স্থান পাওয়া ভাষাগুলোও পায়ের তলার মাটি সরে যেতে থাকার বোধ থেকে নানা ধরনের জাতিসত্তার লড়াই গড়ে তুলছে। চুড়ো-করে-বাঁধা কেন্দ্রীভূত জাতি-রাষ্ট্রের আগ্রাসী সমসত্ত্বতা-আরোপকারী প্রবল টানের বিরুদ্ধে এই সবগুলোই এক একটা অসম লড়াই। তবুও এ লড়াই ও প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাগুলোর ভিতরে নানা সীমাবদ্ধতা-পিছুটানের মধ্যেও গঠনমূলক নানা সম্ভাবনা উঠে আসছে। তারই কিছু পরিচয় এই সংকলনের মধ্যে ধরা আছে।

এই সংকলনে বিশ্বের কিছু অগ্রণী সমাজভাষাবিদদের লেখা বা লেখার তর্জমা রয়েছে, কিন্তু বেশি অংশ জুড়েই রয়েছে 'মাতৃভাষা' পত্রিকার ভাষাকর্মীদের ক্ষেত্রসমীক্ষাগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা আর বিভিন্ন জনজাতিদের নিজেদের ভালোবাসার মানুষদের লেখা। সাধারণভাবে ভাষিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও জনজাতিদের স্বাধিকারের পক্ষে হলেও তাই লেখাগুলোর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির নানা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে যা বিষয়টির বহুমাত্রিকতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। পাঠক এই বইটিকে অনুরাগ-ভালোবাসার পটে আঁকা বিলীয়মান ভাষিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মায়াবিবরণ হিসেবেও পড়তে পারেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সজল রায়চৌধুরী
বিপ্লব নায়ক

সূচি

সাধারণ প্রসঙ্গ
জনজাতিদের ভাষা ৯ গণেশ নারায়ণদাস দেবী
ভারত, জনজাতিদের শিক্ষা এবং
মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে অংশগ্রহণ ২১ টোভ স্কুটনাব কাঙ্গাস
ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে
হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ২৮ বিনয় চৌধুরী
জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ভাষার নিকটবর্তী
অন্যান্য ভাষা ও ভাষাসমস্যা ৭৭ বিমলেন্দু মজুমদার

টোটো জনজাতি প্রসঙ্গে
টোটোপাড়া ফিরে দেখা ১০২ বিমলেন্দু মজুমদার
টোটোপাড়ায় টোটোদের জীবনধারা ১০৭ সত্যজিৎ টোটো
টোটোপাড়ায়, টোটোদের মধ্যে:
জনজাতির জীবন ও 'আধুনিকতা'-র অভিঘাত
সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক পর্যবেক্ষ ১১৯ বিপ্লব নায়ক

তামাঙ জনজাতি প্রসঙ্গে
তামাঙ জনজাতির কথা ১৫২ বিপ্লব নায়ক

ডয়া জনজাতি প্রসঙ্গে
তাপা গ্রামের ডয়াদের কথা ১৯৯ বিপ্লব নায়ক

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি প্রসঙ্গে
অরুণাচলের অন্তরাগ:
জনজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি ২১৫ বিপ্লব নায়ক

মণিপুরের পাবর্ত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতি মানুষদের অভিজ্ঞতার আলোকে স্বশাসন, বিকাশ ও ভাষা প্রশ্ন	২৯০	বিপ্লব নায়ক
ওরাওঁ জনজাতি ও বুরুখ ভাষা প্রসঙ্গে		
কুড়ুখ্ ভাষা ও তোলোং সিকি লিপি	৩০৯	নিমাই কুমার সরদার
এক ডাক্তার ও যাজকের কথা যাঁরা আদিবাসী লিপিতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন	৩৩৬	নলিনা মিঞ্জ
ভূমিজ জনজাতি প্রসঙ্গে		
ভূমিজ পুনরুত্থান কথা	৩৫০	বিপ্লব নায়ক
ভারতের নানা কোণে		
তামিলনাডুর হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন	৩৮০	বিপ্লব নায়ক
আসামের বরাক উপত্যাকার বাংলা ভাষা আন্দোলন	৩৯৪	বিপ্লব নায়ক
উনিশে মে-র ভাবনা: ভাষাবিদ্বেষ নয়, মৈত্রী	৪০৭	সজল রায়চৌধুরী
ওড়িয়া ভাষার স্বাধিকারের সংগ্রাম	৪১৩	ড. প্রবাল সেনগুপ্ত

জনজাতিদের ভাষা

গণেশ নারায়ণদাস দেবী

[**লেখক পরিচিতি:** গণেশ নারায়ণ দেবী ১৯৫০ সালের ১ আগস্ট এক গুজরাটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি পরিবারের সঙ্গে মহারাষ্ট্রে (বর্তমান) আসেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাই কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখেই তিনি একটি খনির অফিসে ফাইফরমাশ খাটার চাকরি নেন। কাজের পর তিনি একটি স্থানীয় গ্রন্থাগারে বই পড়তে যেতেন। এভাবে পড়তে পড়তে তিনি একদিন আবিষ্কার করেন যে গুজরাটি ও মারাঠি ছাড়াও তিনি ইংরেজি বই দিব্যি পড়ে বুঝতে পারছেন। যে বইটি ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে এই আত্মবোধ জাগায় সেটি পার্ল এস. বাকের ‘দ্য গুড আর্থ’।

তিনি আবার কলেজে ভর্তি হন। কোলহাপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও লীডসে তিনি ইংরেজি নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন। এই পর্বেই সহাধ্যায়িনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

১০ বছর তিনি সয়াজিবাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। গল্প, উপন্যাস ও নন্দনতত্ত্বের ওপর তাঁর লেখা নজর কাড়ে। ‘আফটার অ্যামনেসিয়া’ উপন্যাস লিখে তিনি সাহিত্য এ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের হাতে স্বাধীন চিন্তা বিপন্ন হতে দেখে, বিশেষত কলবুর্গির হত্যার পর, তিনি ওই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে তিনি দক্ষিণায়ন আন্দোলন শুরু করেন।

তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষিক অধিকার আন্দোলনের একজন পুরোধা। ‘তালিকা বহির্ভূত আদিবাসী’দের ভাষিক ও মানবিক অধিকারের জন্য তিনি

লক্ষ্মণ গায়কোয়াড় ও মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে মিলিতভাবে Denotified and Nomadic Tribes Rights Action Group (DNT-RAG) গঠন করেন। তিনি ৯০টি গ্রন্থের লেখক। তাঁর বিস্ময়কর কীর্তি তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তায় ৫০ খণ্ডে Peoples Linguistic Survey of India প্রকাশ। বহু পুরস্কার তিনি তাঁর কাজের জন্য পান। এখনও তিনি নিপীড়িত ভাষার স্বার্থে নিরলস কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই নিবন্ধটি তাঁর ইউনেসকোয় প্রদত্ত বক্তৃতার স্বকৃত পরিমার্জিত রূপ।—সম্পাদক]

এই জনগোষ্ঠীগুলি অস্ট্রেলিয়ায় 'অ্যাবরিজিন' নামে পরিচিত। নিউজিল্যান্ডে এদের বলা হয় 'মাওরি', কানাডায় তারা 'ফার্স্ট নেশনস', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের 'ইন্ডিজেনাস' হিসেবে অভিহিত করা হয়। ভারতে এরা 'জনজাতি' নামে চিহ্নিত। নৃতত্ত্বে এরা 'উপজাতি' (Tribe), অনেক দেশে প্রশাসনিক পরিভাষায় এরা 'নোটিফায়েড গোষ্ঠী'। মানবাধিকার চর্চায় এরা 'জনজাতীয় মানুষ' (Indigenous people)। এশিয়ার সমাজকর্মীদের পরিভাষায় এরা 'আদিবাসী'। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী এত বিপুল সংখ্যক এবং এত বিভিন্ন নামে চিহ্নিত যে এদের একটা কোনো নামের ভেতর বেঁধে ফেলা অসম্ভব।

এদের কীভাবে দেখা হবে? ধরা যাক, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আধুনিকতা অথবা ভুবনায়নের মতো যুগবৈশিষ্ট্যের পরিসরে বিভিন্ন উৎপীড়িত গোষ্ঠী হিসেবে যদি তাদের দেখি, সেটাও হবে অতিসরলীকরণ। নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে এরা এত বিভিন্ন যে এই গোষ্ঠীগুলিকে মানবসমাজের একটা নির্দিষ্ট বিভাগের মধ্যে ফেলার কথা বলাই যায় না। এমন একটি কোনো নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না যা দিয়ে এদের চিহ্নিত করলে বলা যায় যে এটাই যথার্থ হয়েছে। এমনকী, ধরা যাক, কোনো একটা পারিভাষিক শব্দ আমাদের বেছে নিতেই হল, তাহলেও সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ একদিকে পারিভাষিক শব্দটির রীতিসম্মত কাঠামো, অন্যদিকে আলাদা আলাদা গোষ্ঠীর ইতিহাসের চমকপ্রদ বিভিন্নতা—এ দুয়ের অসংখ্য বিরোধ দেখা দেবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এ ধরনের বর্ণনামূলক সমাজতাত্ত্বিক পারিভাষিক শব্দ ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রহিসেবে কিছুদূর পর্যন্ত কার্যকরী হয়।

কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই সমস্যাটি চোখে পড়ে। ওই পারিভাষিক শব্দটির কাছে আমরা চিহ্নিতকরণের যে বিস্তার আশা করি তা অধরা থেকে যায়। তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বেশির ভাগ নানাস্পর্শী ধারণা নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক অবশ্যম্ভাবীভাবে চলতে থাকে।

এসব সমস্যার কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৮২ সালে একটা কার্যকরী গোষ্ঠী তৈরি করে। এ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল কোন ধরনের জনগোষ্ঠীকে জনজাতি বলে গণ্য করা যায় তা নির্ধারণ করা। রাষ্ট্রসংঘের এই কমিটি চারটি মাপকাঠি স্থির করে: (ক) 'আগে থেকেই যারা ছিল', এমন লোকেরা; (খ) 'প্রান্তিক হয়ে যাওয়া এবং দলিত' জনগণ; (গ) 'সংখ্যালঘু ও সাংস্কৃতিকভাবে আলাদা' জনগোষ্ঠী; (ঘ) সেইসব মানুষ যারা জনজাতি বলে নিজেদের দাবি করেন।

এই চারটি মানদণ্ডের প্রত্যেকটির মধ্যেই বিতর্কের পরিসর আছে। তাই যখন 'জনজাতিদের অধিকারের ঘোষণা' (সেপ্টেম্বর ২০০৭) রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত হয়, তখনও তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়নি। কয়েকটি রাষ্ট্র এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। তাদের মধ্যে ছিল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।

এসব শব্দার্থগত সমস্যার কথা মেনে নিয়েও, বাইরের লোক হোক বা নিজেরাই নিজেদের 'প্রান্তিক, সংখ্যালঘু, জনজাতি' যে নামেই পরিচয় দিক না কেন, বাস্তব দুর্দশার নিরিখে সব মহাদেশেই এদের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত থেকে জনজাতিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, উচ্ছেদের মুখোমুখি ফেলে দেওয়া হচ্ছে, গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। সমাজতাত্ত্বিক শিব বিশ্বনাথনের ভাষায় 'আধুনিকতার উন্নয়ন প্রকল্পের সামনে তারা একটা সমস্যা' হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

উপজাতি হিসেবে **অপর**, এই সমস্যাকণ্টকটিকে চারটি অবস্থান থেকে বা চারটি অনুধ্যান হিসেবে দেখা হয়, যেগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ও সুগভীর। সাদামাটা হিসেবে আমরা তাদের চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি : রুশোপন্থী ভাবনা, নিজস্ব তির্যকতা সহ রোমান্টিক প্রতিক্রিয়া, নৈতিক বাস্তববাদী দর্শন এবং উন্নয়নবাদী অবস্থান। শেষের অবস্থানটা নৃতত্ত্বকে পরিত্যাগ করার নামান্তর। এদের মতে জনজাতি শুধু **অপর** হিসেবেই টিঁকে থাকতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে

বিষয়টাকে উলটো করে দেখা হয়। এতে শুধু পার্থক্যকেই ধ্বংস করা হয় না, তা হয় সোজাসুজি গণঘাতী।'[১]

গত কয়েক শতাব্দীজুড়ে 'অপর জনগোষ্ঠী'র ইতিহাস ধারাবাহিক নিপীড়নের কাহিনিতে ভরা। জোর করে বিতাড়ন, জমি থেকে উচ্ছেদ, ক্রমবর্ধমান প্রান্তিকীকরণ, হিংসা ও প্রতিহিংসার ঘটনা জাতিরাষ্ট্রই তাদের বিরুদ্ধে ঘটিয়ে চলেছে। উন্নয়নের যে কোনো মাত্রায় এই গোষ্ঠীগুলি সবসময় সবার পিছে থেকে যায়। পশুপালক ও যাযাবর গোষ্ঠীগুলির পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। যে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির মুখে এসব গোষ্ঠীকে টিঁকে থাকতে হয়েছে, সেকথা ভাবলে, যেভাবে এরা তাদের ভাষা বাঁচিয়ে রেখেছে ও বিশ্বের বিস্ময়কর ভাষাবৈচিত্র্যের ভাণ্ডারে অবদান রেখে চলেছে তা প্রায় অলৌকিক বলে মনে হয়। তবে পরিস্থিতি যদি একই রকম প্রতিকূল থাকে তবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির ভাষাভাণ্ডার বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। বাক্‌রোধ ব্যাধির মতো ভাষা হারানো মনে হয় তাদের নিয়তি।

কোন কোন ভাষা বিলুপ্তির প্রান্তে এসে ঠেকেছে, কোনগুলো সুনিশ্চিতভাবেই সেদিকে যাচ্ছে এবং কোনগুলো ভাষিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, সেটা নির্ণয় করা একটা দুঃসাধ্য কাজ। আমাদের হাতে যতটুকু ভাষাতাত্ত্বিক উপাত্ত আছে, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তা অপ্রতুল বললেই ঠিক হয়।

উনিশ শতকের শেষ দশক জুড়ে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয় তার ভিত্তিতে প্রকাশ পায় স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সনের লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (১৯০৩-১৯২৩)। এই সমীক্ষা ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষাকে চিহ্নিত করে। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে ১৮৮টি ভাষা ও ৪৯টি উপভাষার অস্তিত্ব দেখানো হয়। ১৯৬১-র আদমশুমারির হিসেবে ১৬৫২টি 'মাতৃভাষা'র উল্লেখ করা হয়। এদের মধ্যে ১৮৪টি 'মাতৃভাষা'র প্রতিটিতে ১০ হাজারের বেশি বাচক পাওয়া যায়। ৪০০টি 'মাতৃভাষা'র উল্লেখ গ্রিয়ার্সনের সমীক্ষায় ছিল না। এছাড়াও ১০৩টি

---

১ শিব বিশ্বনাথন, 'লিসেনিং টু টেরোড্যাকটাইল/জি. এন. দেবী, জেফ্রি ভি. ডেভিস এবং কে কে চক্রবর্তী সম্পাদিত Indigeniety Representation and Interpretation (Orient Blackswan, 2009) গ্রন্থে।

'মাতৃভাষা' 'বিদেশি' হিসেবে এবং ৫২৭টিকে 'অ-বর্গীকৃত' বলে দেখানো হয়। ১৯৫১-র গণনায় 'বিদেশি' বলে চিহ্নিত ভাষার সংখ্যা ছিল ৬৩। এভাবে এক দশকের মধ্যেই ৫০টি নতুন 'বিদেশি' ভাষা 'আবিষ্কৃত' হয়।

১৯৭১-এর আদমশুমারিতে ভাষাতথ্য অন্যভাবে সাজানো হয়। দুটো শ্রেণি করা হয়। একশ্রেণিতে থাকে অষ্টম তফসিলভুক্ত ভাষাগুলো ও দশ হাজারের বেশি বাচকসম্পন্ন ভাষাসমূহ। দ্বিতীয় শ্রেণিতে দশ হাজারের কম বাচক সবকটা ভাষাকে একসঙ্গে গোছা পাকিয়ে শিরোনামা দেওয়া হয় 'অন্যান্য'। এই পদ্ধতি পরবর্তী প্রতিটি জনগণনায় অনুসরণ করা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী উদয় নারায়ণ সিংহের ভাষায়ঃ

> ভারতীয় ভাষাগুলোর নামাঙ্কন নিয়ে অনেক সমস্যা আছে। ১৯৬১-র আদমশুমারিতে 'মাতৃভাষা' বলে বহু ভাষার নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল। বিশেষ করে বর্তমানে যেগুলো 'অবর্গীকৃত' বলে চিহ্নিত তাদের মধ্যে কটা ভাষা টিঁকে আছে তা নির্ণয় করাই একটা বিশাল কাজ। যেসব ভাষার বাচক সংখ্যা এক হাজারের বেশি, পরবর্তী দশকগুলোয় তাদের টিঁকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। তার মধ্যে এই নীচের ১০টি 'অ-বর্গীকৃত' ভাষার নাম করা যায়ঃ আদিভাষা (৪৮০৭), বাকেরওয়ালি (৫৯৪১), বেলদারি (২৭০২), জাতাপু (১৯৪৬৭), কাঞ্জরি (১৮১০), রাজা (১৩৪২), সরোদি (১৩৫৪), সোহালি (১৫৭৬), সুব্বা (১২৫৭), তিরগুলি (১০০০)। আর কয়েকটি ভাষাও কিছুটা ভালো অবস্থায় আছে। যেমন, বারে (৯০৯), কোলহাটি (৯৫২), খসল (৭৭৮), ইনকারি (৭৩২) এবং উচাই (৭৬৮)। কিন্তু আর ৪৭টা ভাষা এমন অবস্থায় নেই। এই ভাষাগুলোর নাম প্রকাশ্যে আনার আগে আদমশুমারির কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই কিছুটা প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তবুও যে ২৬৩টি ভাষার আশা আমাদের ছেড়ে দিতেই হবে যাদের বাচকসংখ্যা ৫ জনের কম। কারণটা খুব পরিষ্কার। এদের যথার্থতা বা সমস্যা যাচাই করতে গেলে এত বেশি ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে যেটা অসাধ্য কাজ।[২]

২. উদয় নারায়ণ সিংহ 'Minor and Minority Languages in India' জি. এন. দেবী উপগোষ্ঠীর প্রতিবেদন, 'Protecting Non-Scheduled Languages, একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তাব/মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (২০০৬)-এর অন্তর্গত।

যদি ভেবে দেখি যে-দেশে পরিযায়ী জনসংখ্যা বিপুল ও সাক্ষরতার হার কম, সে দেশে আদমশুমারি কী জটিল ব্যাপার, তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা মোটেই আশ্চর্য নয় যে সংগৃহীত তথ্যগুলো অনেকটা অনিশ্চিত। কিন্তু ২৬৩টা ৫০-এর কম বাচক, ৪৭টা হাজারের কম বাচক সম্পন্ন ভাষা সহ ৩১০টা ভাষা এই অবস্থায় কী করে পৌঁছল সেটাই বিস্ময়কর। এই ৩১০টা বিপন্ন ভাষা পূর্বোক্ত ১৬৫২টি 'মাতৃভাষা'র মধ্যে আছে। ১৯৬১-র আদমশুমারির পদ্ধতি যতই বিতর্কিত হোক না কেন এটা মানতেই হবে।

অন্য ভাবে বলা যায়, ভারতের ভাষিক ঐতিহ্যের এক-পঞ্চমাংশ গত অর্ধশতাব্দীতে বিলুপ্তির স্তরে পৌঁছেছে। ভাষাসমীক্ষার পদ্ধতির কথা ভাবলে বলতে হয় গত তিনটে আদমশুমারিতে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ভাষাসংখ্যার আরও ক্ষয় চোখ এড়িয়ে যেতেই পারে। এটা কোনো একটা মাত্র দেশের পরিস্থিতি নয়, গোটা পৃথিবীতেই এই দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কারণ প্রতিবেশগত যে উপাদানগুলি কোনো দেশের ভাষাক্ষয়ের জন্য দায়ী, পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরাষ্ট্রেও সেই উপাদানগুলো আধুনিকতার প্রতিবেশ গড়ে তুলেছে।

ভারতে শুধু 'অপ্রধান' ভাষা ও 'অ-বর্গীকৃত উপভাষাগুলোই' যে ক্ষয় পাচ্ছে তা নয়, যেসব 'প্রধান ভাষা'র দীর্ঘ সাহিত্যিক পরম্পরা আছে এবং কল্পনামূলক ও দার্শনিক লেখাপত্রের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে সেগুলোও ক্ষয় পাচ্ছে। ধরা যাক, মারাঠি, গুজরাটি, কন্নড় ও ওড়িয়া ভাষার কথা। এরা প্রধান কয়েকটি সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে পড়ে। এদের বাচকদের 'মাতৃভাষা'ও এগুলি। এদের তরুণ প্রজন্ম 'মাতৃভাষায়' 'কথা বলতে পারে' ঠিকই, কিন্তু ওইসব ভাষার লিখিত ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই বললেই চলে। ভুবনায়িত উন্নয়নের পরিণামে সারা পৃথিবীর মানুষকেই ভাষার ঐতিহ্যে গুরুতর ক্ষতি ভোগ করতে হচ্ছে—এই সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক মনে হয় না। এই পরিস্থিতিকে বলা যায় 'খণ্ডিত ভাষাদক্ষতা' অর্জন। এতে পূর্ণ সাক্ষর একটি মানুষ মোটামুটি ভালো মানের শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে যে-ভাষায় লিখতে, পড়তে, কথা বলতে পারে সেটি তার মাতৃভাষা নয়। যাকে সে মাতৃভাষা বলে দাবি করে তাতে সে হয়তো কথা বলতে পারে কিন্তু লিখতে পারে না।

স্বাধীনতার পর ভারতের রাজ্যগুলো ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়। যে-সব ভাষার লিপি আছে তাদের হিসেবের মধ্যে আনা হয়। যাদের লিপি নেই

বলে মুদ্রিত সাহিত্যও নেই তাদের জন্য নিজস্ব রাজ্যও বরাদ্দ হয়নি। সরকারি ভাষাগুলোয় পড়াশোনার জন্যই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদের লিপি নেই তাদের ভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ প্রজ্ঞা থাকলেও মৌখিক পরম্পরায় তা চলতে থাকে, তাদের ভাগ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জোটে না। তবে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার একটা নিশ্চয়তাত্মক প্রতিশ্রুতি তারা পায়। ভারতের সংবিধানের ৩৪৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

> এ বিষয়ে কোনো দাবি উত্থাপিত হলে রাষ্ট্রপতি যদি সন্তুষ্ট হন যে ওই রাজ্যের পর্যাপ্ত পরিমাণ মানুষ চান তাদের মুখের ভাষাটির ব্যবহার রাজ্য কর্তৃক স্বীকৃতি পাক, তবে তিনি রাজ্যের সর্বত্র বা কোনো অংশে, যেমনটা তার অভীষ্ট, সেভাবে ভাষাটির সরকারি স্বীকৃতি দিতে পারেন।

দেখা যাচ্ছে, ভাষালোপ, ভাষাসরণ এবং ভাষিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়ের জন্য শুধুমাত্র কাঠামোগত উপাদানকে দায়ী করলে চলবে না। আর একটা আরও অভিভূতকারী উপাদান (এই ক্ষয়লীলার পেছনে) কাজ করে চলেছে। সেটি, দ্রুত ভুবনায়নী বিশ্বে উন্নয়ন কথা। ভারত ও এশিয়া-আফ্রিকার অন্য দেশগুলোতে আজকাল বাবা-মায়েদের মধ্যে সন্তানদের ইংরেজি, ফরাসি বা স্প্যানিশ মাধ্যমে পড়ানোর প্রবল কূলছাপানো ইচ্ছে দেখা দিয়েছে। উৎপাদনশীল শ্রমের আন্তর্জাতিক বাজারে এসব ভাষাই বড়ো হলে তাদের দিশা দেখাবে—এই আশাতেই এমন প্রবল তাগিদ। এই তাগিদ জোরালো ধাক্কা দিয়েছে। কোনো একটা আন্তর্জাতিক ভাষামাধ্যমের অনুকূলে স্কুলশিক্ষার মাধ্যমকে হেলিয়ে দিয়েছে। এর আগের কোনো যুগে এমনটা দেখা যায়নি।

সুস্থ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য শিশুকে অন্তত প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত স্কুলশিক্ষা দেওয়া দরকার। এই যুক্তি সত্যিই অখণ্ডনীয়। কিন্তু এর বিপরীত একটা যুক্তি আছে, সেটি হল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা না দিলে তার পূর্ণাঙ্গ বৌদ্ধিক বিকাশ হয় না। এই যুক্তিটা পুনর্বিবেচনা করার দাবি রাখে। ধরা যাক সাহিত্যের কথা। ভাষার সবচেয়ে জটিল প্রয়োগ সাহিত্যেই হয়ে থাকে। তাহলে যে শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা পায়নি তারা ওই ভাষায় সাহিত্য রচনা করা দূরে থাক, সাহিত্যের রসগ্রহণও পুরোপুরি করতে পারবে না। ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ কিন্তু দেখিয়ে দেয় যে এমন সিদ্ধান্ত করার পক্ষে শক্ত কোনো ভিত নেই।

পৃথিবীর মহত্তম লেখকদের কয়েকজনের কথা বলা যায়, যে ভাষায় তারা সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করেছেন, সে ভাষায় তাদের স্কুলশিক্ষা হয়নি। শেক্সপিয়র ও মিলটন লাতিনে তাদের শিক্ষালাভ করেছিলেন। দান্তে ইতালিয়ান ভাষায় শিক্ষালাভ করেননি। বাল্মীকি ও কালিদাসের ইতিহাস কিছুটা অস্পষ্ট হলেও তাঁরা সংস্কৃতে শিক্ষালাভ করেননি। আমাদের স্পষ্টভাবে জানা নেই, জঁ জেনে ফরাসি স্কুলে পড়েছিলেন কিনা; অথবা উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস গ্যালিক স্কুলে পড়েছিলেন কিনা। চসারের প্রজন্মের ইংরেজ শিশুরা ইংরেজিতে নয় ফরাসিতেই লেখাপড়া করত। বস্তুত, চার্টিস্ট আন্দোলনের সময় ইংরেজ শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার দাবিটা ওঠে। তার আগে পর্যন্ত ইংল্যান্ডের স্কুলে ইংরেজি কোনো বিষয় হিসেবে চালু হয়নি।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে ভারতের সমাজসংস্কার আন্দোলনের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল শিক্ষার মাধ্যম। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা চাইছিলেন ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা। বিপরীতে ইংরেজ আধিকারিক মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের মতে ভারতীয় ভাষাগুলোয় শিক্ষা দেওয়াই কাম্য। তর্কবিতর্কের অবসান ঘটাল ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাব। তিনি সুপারিশ করলেন, ভারতের সব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এক প্রক্রিয়া এই সময় থেকেই ভারতের সাহিত্যে শুরু হল। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সৃজনশীলতার উন্মেষ হতে দেখা গেল। ভাবার কোনো কারণ এই যে এসব যুক্তি মাতৃভাষায় শিক্ষার ঔচিত্যকে বিন্দুমাত্র খাটো করার জন্য দেওয়া হচ্ছে। তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাই সর্বোত্তম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যে মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগের অভাবটা এমন পর্যাপ্ত সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি নয় যাতে মানুষের সৃজনশীলতা ধ্বংস হয়ে যায়। আরও গুরুতর পরিস্থিতি হল জনগোষ্ঠীর টিঁকে থাকার ভরসা লুপ্ত হওয়া।

যখন কোনো ভাষাসম্প্রদায় এই বিশ্বাসে পৌঁছোয় যে তাদের টিঁকে থাকার একমাত্র পথ অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ, ওই সম্প্রদায় নতুন ভাষা পরিস্থিতিতে নিজেদের মানিয়ে নেবে বলে মনস্থির করে। তাহলে তো একটা বিষয় ভেবে দেখতেই হয়—আজকের পৃথিবীতে উন্নয়নচিন্তার আধিপত্যকারী ধারার ভেতর কী এমন কিছু নিহিত আছে যা পৃথিবীর ভাষা ঐতিহ্যের ক্ষয় বা

একধরনের ভাষানিধন দাবি করে? যদি তা-ই হয় তবে তো সেটা রাজনৈতিক কল্পনা ও অর্থনীতির বিশ্লেষকদের কাজ। মানুষের ভাষাগুলোর ভবিষ্যৎ তাহলে ভীতিদায়ক। যেসব সম্প্রদায় ইতিমধ্যে তাদের স্থানীয় বা জাতীয় পরিসরে প্রান্তিক হয়ে গেছে, যারা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিসরে ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু, যারা তাদের উদ্বেগ জানানোর সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তারাই ভাষানিধনের বলি হওয়ার জন্য সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতে সর্বজনীন শিক্ষা দেওয়ার কর্তব্য অভিভাবকদের এবং অধিকার শিশুদের। রাষ্ট্রের আয়োজিত স্কুলশিক্ষা প্রায় বিনামূল্যেই পাওয়া যায়, সবচেয়ে বঞ্চিতদের পক্ষেও নাগালের মধ্যে। শিশুদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা আছে, যাতে খাদ্য নিরাপত্তার অভাবে শিশুরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে না থেকে যায়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো স্কুলশিক্ষাকে তাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করে। সরকারিভাবে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। অনেক রাজ্যে মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষাও অবৈতনিক। তফশিলী জাতি, তফশিলী উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সন্তানদের জন্য শিক্ষায় সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আছে।

ভারতে রাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রায় পঞ্চাশটি ভারতীয় ভাষা এবং কয়েকটা 'বিদেশি' ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চলে। বয়স্ক সাক্ষরতা ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকে ধারাবাহিকভাবে উৎসাহিত করা হয়। সবকটা তালিকাভুক্ত ভাষায় শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়নে উৎসাহিত করার জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ভাষাসমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (সিজেজেএল)-এর ওপর প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু ভাষায় শিক্ষাদানের উপকরণ রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এসব বিধান সত্ত্বেও অনেক প্রান্তিক ভাষা এমনকী কিছু 'প্রধান' ভাষার ক্ষেত্রেও তাদের রক্ষণাবেক্ষণে এক দুর্জ্ঞেয় উদাসীনতা দেখা যায়। অকল্পনীয় বিপুল সংখ্যক শিশু মাত্রাছাড়া বেতন দিয়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, এইসব স্কুলশিক্ষার লক্ষ্য উচ্চশিক্ষার ৪৫ হাজার প্রতিষ্ঠানে শিশুদের ভর্তির যোগ্য করে গড়ে তোলা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ৬০ শতাংশই তথ্যপ্রযুক্তি শেখায়। যেসব স্কুলে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে কেউ ভর্তি হলে এই কাজটাকে সামাজিক ভাবে অসুবিধাজনক বলে দেখা হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে ভাষাগুলো বাঁচিয়ে রাখা (বিশেষ করে

যে ভাষাগুলো সংরক্ষণ করতে বিশেষ উদ্যোগ দরকার) একটা ভয়াবহ কঠিন কাজ। শুধুমাত্র কাঠামো সংস্কার করেই এ কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়।

ভারতে নাগরিক সমাজের থেকে কিছু কর্মী বেরিয়ে এসেছেন। তাদের তৈরি অধিকার-ভিত্তিক সংগঠনের উদ্যোগে সম্প্রতি জনজাতিদের ভাষায় লিখনের কাজ শুরু হয়েছে। অনেক উপজাতীয় ভাষায় নিজস্ব লিপি তৈরি হয়েছে অথবা তারা রাজ্যের প্রচলিত লিপিতেই নিজেদের ভাষায় লিখছেন। প্রায় চার দশক আগে দলিত সাহিত্য দেশের নজর কাড়তে শুরু করে। কিন্তু দলিত আন্দোলনের অংশ হিসেবে উপজাতির লেখক উঠে আসবেন তেমনটা সাধারণত ভাবা হত না। যেমন মারাঠি ভাষায় আত্মারাম রাঠোর, লক্ষণ মানে ও লক্ষণ গায়কোয়াড়রা যাযাবর উপজাতির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দলিত লেখক হিসেবেই অভিনন্দিত হয়েছেন।

সেসময় বাকি ভারতবর্ষের কাছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল একটা গুজবের চেহারায় বিরাজ করছিল। সম্ভবত অল্প কিছু মানুষ ভেরিয়ার এলুইনের বিপুল সংগ্রহের কথা জানতেন, কিন্তু উপজাতীয় সৃজনশীলতার কোনো আভাসও তখন পাওয়া যায়নি।

সবে বছর কুড়ি হল বিভিন্ন জনজাতির কণ্ঠস্বর ও রচনার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। এভাবেই কেরালা থেকে বেরিয়েছে ‘কোচেরেটি’। উত্তর থেকে ‘আলমা কাবুত্রি’। পাঠকরা বিস্মিত হয়ে গেছেন। প্রায় একই সময়ে মিজো সাহিত্যের সংকলন প্রকাশ করেছেন এল. খয়াংতে, খাসি সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেছেন ডেসমন্ড খারমাপলাঙ। বেরিয়েছে গোবিন্দ চটকের প্রয়াস গাড়োয়ালি সাহিত্য সংকলন। প্রথমটি ইংরেজি ও পরেরটি হিন্দি অনুবাদে। এর ফলে ইংরেজি অনুবাদে জনজাতীয় সাহিত্য সংকলন ‘দ্য পেইন্টেড ওয়ার্ডস’ (পেঙ্গুইন, ২০০২) প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

গত দুই দশকে দেখা গেছে জনজাতীয় সাহিত্য লোকগীতি ও লোককাহিনির চেয়ে আয়তনে বড়ো। বর্তমানে এর সীমায় চলে এসেছে উপন্যাস ও নাটক জাতীয় অন্যান্য জটিলতর শ্রেণির রচনা। আহমেদাবাদে দক্ষিণ বজরঙ্গির বুধন থিয়েটার একের পর এক চমকপ্রদ তরতাজা নাটক পরিবেশন করে চলেছে। এগুলোর আঙ্গিক আধুনিক, বিষয়বস্তু সমকালীন। ‘ছত্তিশগড়ি লোকাক্ষর’ ও ‘ঢোল’-এর মতো ছোটো পত্রিকা বেরোতে শুরু করেছে। এতে আদিবাসী

কবি ও লেখকদের জন্যও পরিসর রাখা আছে। রমণিকা গুপ্তার 'আম আদমি' এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি ও গুজরাটের ডাণ্ডিতে মাঝে মাঝেই সাহিত্য সম্মেলন হয়। এগুলিতে আদিবাসী লেখকরা অংশগ্রহণের সুযোগ পান।

সারা দেশজুড়েই আদিবাসী সমাজকর্মীরা আরও বেশি করে বুঝতে শুরু করেছেন যে তাদের ভাষা ও সাহিত্যকে সামনে না আনতে পারলে আদিবাসী আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। প্রতিটি মহাদেশের বুকে বহু গল্প, অনেক কথামালা জমে আছে। উপনিবেশের অভিজ্ঞতা, আদিবাসীদের প্রান্তিকীকরণ, তাদের সংগ্রাম এবং দেশে দেশে জাতীয় সাহিত্যে তাঁদের কণ্ঠস্বরের উদয়, এসব দিয়েই বৃত্তান্ত।

স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি সংরক্ষণের সঙ্গে ভাষালালন বা সংরক্ষণের গুরুতর পার্থক্য আছে। ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রই জানে যে ভাষা সমাজব্যবস্থারই অংশ। অন্যসব প্রাসঙ্গিক সামাজিক বিকাশের প্রভাব ভাষার ওপর পড়ে। বলা হয়, সমাজে নিহিত একটা তন্ত্র হিসেবে ভাষার বস্তুগত অস্তিত্ব আছে। কোন অর্থে বস্তুগত অস্তিত্বের কথা বলা সম্ভব? যেমন, কোনো ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা সম্ভব। ভাষার অনুলিপি করা সম্ভব। লিখিত রূপ দেওয়া সম্ভব। যান্ত্রিকভাবে মুদ্রিত করা সম্ভব। ফিতেবন্দি করে দলিলের আকার দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সম্পূর্ণ মানবচৈতন্য নিরপেক্ষ ভাবে ভাষার কোনো অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট ভাষা তার বাচক সম্প্রদায় থেকে বিযুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না। তাই যুক্তিযুক্তভাবে বলতে গেলে, কোনো ভাষা সংরক্ষণের জন্য তার বাচকসম্প্রদায়ের সংরক্ষণ প্রয়োজন।

কোনো সম্প্রদায়ের যৌথ চেতনা এবং যে-ভাষার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে, উভয়ের মধ্যে বিরাজ করছে ওই সম্প্রদায়ের 'বিশ্ববীক্ষা'। তাই কোনো ভাষা সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ওই ভাষাসম্প্রদায়ের বিশ্ববীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া। ধরা যাক, কোনো ভাষাসম্প্রদায়ের বিশ্বাস বসুন্ধরার অনুগত থাকাই তাদের নিয়তি। তাই আমরাই বসুন্ধরার মালিক, এমন ভেবে তাকে অপমান বা আঘাত করার কথা তারা ভাবতেই পারে না। এমন কোনো সম্প্রদায়ের ভাষা রক্ষা করতে গিয়ে আমরা যদি তাদের এমন কোনো রাজনৈতিক কল্পনার অংশীদার করে নিতে চাই যাতে উন্নয়নের নামে বসুন্ধরার সম্পদ লুঠ

করে নেওয়াটা বৈধতা পায়, তাহলে তাদের ভাষা সংরক্ষণ অসম্ভব। এরকম পরিস্থিতিতে ওই সম্প্রদায়ের সামনে দুটো বিকল্প উঠে আসে : হয় তারা সেই কল্পস্বর্গকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যার মূল কথা হল প্রাকৃতিক সম্পদকে লুঠ করে তাকে পুরোপুরি বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার অধিকার। অথবা তাদের বিশ্ববীক্ষা বাতিল করে যে ভাষাব্যবস্থা তাদের ওই বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে যুক্ত করেছে তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

বস্তুত, পৃথিবীর ভাষাগুলোর অবস্থা ভালো নয়। বিশেষত, আদিবাসীদের ভাষা, প্রান্তিক ও সংখ্যালঘুদের ভাষা এবং সেইসব সংস্কৃতির ভাষা, যারা বিজাতীয় সংস্কৃতির আধিপত্যের নীচে ছিল অথবা এখনো আধিপত্যের অভিজ্ঞতা ভোগ করে চলেছে, তাদের ভাষার অবস্থা বিপজ্জনক। এখনই বিপদঘণ্টা বাজানোর সময় এসে গেছে। তবুও শুধুমাত্র রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব ফেলে দিয়ে বিপদমুক্তির বিন্দুমাত্র সুরাহা হবে না। লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য জাতিরাষ্ট্রগুলোর সাহায্য তো নিতেই হবে, কিন্তু তার বাইরের নানা স্বাধীন সংগঠনকেও কাঁধ লাগাতে হবে। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক নাগরিক সমাজের সংগঠন ও ব্যক্তিদের চাই। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য ও ভাষা আকাদেমি, শুভেচ্ছা সমিতি, অসরকারি সংগঠন, বিদ্বৎজন, গবেষক ও সমাজকর্মীদের দরকার।

ক্ষয়িষ্ণু ভাষায় পাঠ্যপুস্তক, অভিধান, শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ রচনা কাজে আসবে। তথ্যায়ন, জাদুঘর ও মহাফেজখানা গড়ে তোলারও কিছুটা দরকার। কিন্তু ভাষাগুলোকে টিঁকিয়ে রাখতে গেলে ভাষা সম্প্রদায়কে তাঁদের যোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসনে বসাতে হবে নৃতাত্ত্বিক অপর হিসেবে না দেখে, আমাদের আত্মসত্তার সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা অনুন্নত অংশের রেশ হিসেবে দেখা। তাঁরা যেমন, সেই নিজস্বতার অধিকারেই তাঁরা মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

একটা সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠে। মানবসমাজ যেসব ভাষা গড়ে তুলেছে সেগুলো আমাদের যৌথ ঐতিহ্য। সুতরাং সম্প্রতি ভাষানিধন যে-ভাবে লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে যৌথ দায়িত্বেই সেই আক্রমণ রোখা সুনিশ্চিত করতে হবে।

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ: সজল রায়চৌধুরী

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

ভারত, জনজাতিদের শিক্ষা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে অংশগ্রহণ

টোভ স্কুটনাব কাঙ্গাস

ভরতে জনজাতি শিশুদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মাতৃভাষা নয় এমন কোনো ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধা সৃষ্টি হয়। একে গণহত্যা বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায়। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে অংশ গ্রহণ না করতে চাইলে ভারতের কী করা উচিত?

মানবাধিকার আইনজীবী রবার্ট ডানবার এবং আমি, জনজাতির সহকর্মীদের সহযোগিতায়, জনজাতিদের বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী আলোচনা মঞ্চ UNPFII-এর জন্য একটা বিশেষজ্ঞ গবেষণা পত্র তৈরি করি (দ্রঃ মাগ্না ও অন্যান্য, ২০০৫) এই গবেষণায় সমাজ তাত্ত্বিক, শিক্ষালাভ ও আইনি দিক থেকে ভূমিজ জনজাতীয় ও সংখ্যা লঘুদের সন্তানদের শিক্ষার মাধ্যমে বিষয়টা আলোচনা করা হয়েছিল। অভিবাসী সংখ্যালঘুদের সন্তানদের শিক্ষার বিষয়টাও চর্চার আওতায় আসে। আমরা কী দেখতে পাই? দেখা যায়, কোনো অধিপতি ভাষার মাধ্যমে নিমজ্জন পদ্ধতিতে হোক বা অস্থায়ী উৎক্রমণকালীন পদ্ধতিতে হোক ভূমিজ জনজাতি বা সংখ্যালঘুদের (ভূজস—ভূমিজ, জনজাতি, সংখ্যালঘু) শিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করলে সেটা শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বাধাসৃষ্টি করে। তিনটে কারণে এই বাধা ভাষাগত, শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক। ফলে এতে শিক্ষার অধিকার নামক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।

এই অধিকারটার কথা অনেকগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে অলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্র সংঘের শিশু অধিকার সনদের ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদেও এটি ঘোষিত হয়েছে। সনদটি রাষ্ট্রসংঘের সবকটি সদস্যদেশ অনুমোদন করেছে। দুটি দেশ ব্যতিক্রমী—সোমালিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

নিমজ্জন শিক্ষায় ভূজস শিশুরা অধিপতি ভাষার কিছুটা বিয়োজন পদ্ধতিতে শেখে। অর্থাৎ নিজভাষার কিছুটা হারিয়ে তার বদল অন্যভাষার খানিকটা আয়ত্তে আনে।

প্রায়ই দেখা যায় অধিপতি ভাষা শিশুর নিজের ভাষাকে উচ্ছেদ করেছে। নিমজ্জন শিক্ষা প্রায়ই শিশুদের দক্ষতার বিকাশকে খর্ব করে এবং দারিদ্র্যকে আবহমান করে তোলে। (নোবেলপুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের লেখা দেখুন)। গবেষণালব্ধ দৃঢ় প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে জানা গেছে কীভাবে উঁচুমানের দ্বিভাষিকতা বা বহুভাষিকতা অর্জন করা যায়। কীভাবে এই শিশুরা বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (বভাশি) কর্মসূচিতে অন্তত শিক্ষার প্রথম ছ-বছর পর্যন্ত, পারলে আরও বেশিদিন, শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্য ভাষা/ভাষাগুলো বিষয় হিসেবে শিশুর মাতৃভাষা জানা শিক্ষকদের দ্বারা পড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

আমাদের সাম্প্রতিক বিশেষজ্ঞ গবেষণাপত্র (ডানবার ও স্কুটনাব কঙ্গাস, ২০০৮) থেকে ভূজস শিশুদের ওপর অধিপতি ভাষার মাধ্যমে বিয়োজনী শিক্ষার ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া গেছে। দেখা যাচ্ছে এ ধরনের শিক্ষা শিশুদের পক্ষে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে ক্ষতিকর। গুরুতর মানসিক ক্ষতি এর ফলে ঘটে যায়ঃ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মনস্তাত্ত্বিক, বোধগত, ভাষিক ও শিক্ষাগত ক্ষতি। অনেকটা এসব ক্ষতির ফলে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা প্রান্তিক বর্গে পরিণত হয়। মাঝে মাঝে প্রান্তিকীকরণের ফলে শারীরিক ক্ষতিও ঘটতে দেখা যায়। আবাসিক বিদ্যালয়ে এগুলো ঘটে। দীর্ঘ প্রান্তিকীকরণের ফলে নেশাসক্তি, হিংসা ও আত্মহত্যার ঘটনাও বিরল নয়।

যখন ভারতসহ রাষ্ট্রগুলো এসব বিপর্যয়কর ফলাফল পুরোপুরি জেনে বুঝেও বিয়োজনী নীতিগুলো কার্যকর করে চলে তখন সেই শিক্ষাপরিকল্পনাকে

গণহত্যা বলা যায়। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘে গণহত্যা সনদ (গণহত্যা অপরাধের প্রতিরোধ ও শাস্তিবিধান সনদ, ১৯৪৮) পাশ হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে ওই সনদের দুটি অনুচ্ছেদের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বলি:

> অনুচ্ছেদ II (e): কোনো গোষ্ঠীর শিশুদের বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তরিত করা।
>
> অনুচ্ছেদ II (b): কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর শারীরিক ও **মানসিক** হানি ঘটানো (নজরটান লেখিকার)

আইনের চোখে এরকম শিক্ষাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে চিহ্নিত করা যায়। বিয়োজনী শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত হল, এই শিক্ষা:

> মানবাধিকার ও এক সারি মূল্যমানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং আমাদের মতে মৌলিক অধিকারগুলোর ধারাবাহিক বিরোধিতার সমান। সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য যে সব মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে, এই শিক্ষা তার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। আমরা মনে করি 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ'-এর ধারণাটা (গণহত্যার চেয়ে) কম সংকীর্ণ। এই ধারণাটাকে এধরণের শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়।...
>
> আমাদের দৃষ্টিতে জনজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতির পক্ষে শুধু নয় জনজাতি গোষ্ঠীদের জীবনের পক্ষেও বিয়োজনী শিক্ষার ধবংসাত্মক ফল মারাত্মক। 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের' ধারণা একটা বিবর্তনের শক্ত ভিত তৈরি করতে পারে। এই ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই শেষ পরিণতিতে আসবে বিয়োজনী শিক্ষার নীতি ও কাজকর্ম নিন্দনীয় বলে গণ্য হওয়া এবং এ বিষয়ে আইন প্রণীত হওয়া।

অধিপতিভাষার মাধ্যমে বিয়োজনী শিক্ষা চলতে থাকলে প্রায়ই একটা ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়। জনজাতি ও সংখ্যলঘু শিশুরা একটা বা দুটো প্রজন্মের মধ্যেই অধিপতি গোষ্ঠীর মধ্যে মিশে যেতে থাকে। এর পরিণামে জনজাতি বা সংখ্যালঘুদের ভাষা বিলুপ্ত হতে পারে। ফলে পৃথিবীর ভাষাবৈচিত্র্যের অবক্ষয় ঘটতে থাকে।

জীববৈচিত্র্যের ধারণা ও তার সংরক্ষণের জ্ঞান ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। এটা ভাষাবৈচিত্র্য বিনাশের আংশিক পরিণাম। শেষ পর্যন্ত এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে

মানুষের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাক-উপকরণগুলোও হ্রাস পেতে থাকে। ভাষাবৈচিত্র্য ও জীববৈচিত্র্য পরস্পরের সঙ্গে আন্ত:সম্পর্কে ও কার্যকরণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। পৃথিবীর অধিকাংশ মহাজীববৈচিত্র্যের এলাকাগুলো ভূমিজ/ জনজাতিদের অভিভাবকত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণে আছে। জীববৈচিত্র্য রক্ষার খুঁটিনাটি কলাকৌশলের অনেকটাই জনজাতিদের ভাষাগুলোর ভেতরে বীজাকারে সুপ্ত হয়ে আছে। ওই ভাষাগুলোকে মেরে ফেললে আমরা জীববৈচিত্র্য বাঁচানোর প্রাক-উপকরণগুলোকেই মেরে ফেলব। আমরা যদি এখনকার চালে চলতেই থাকি তবে ২১০০ খ্রিস্টাব্দে অধিকাংশ জনজাতির ভাষা লুপ্ত হয়ে যাবে।

জনজাতিদের ভাষিক মানবাধিকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নির্ণায়ক নিঃশর্ত অধিকার হল নিজভাষায় সরকারি বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষা পাওয়া। ভারতসহ যে রাষ্ট্রগুলো এই অধিকার থেকে জনজাতিদের বঞ্চিত করছে, তারা শুধু ওই শিশুদের ক্ষতি করছে তা নয়, সমগ্র সমাজ তথা আমাদের এই গ্রহেরও ক্ষতি করছে।

মানবতার বিরুদ্ধে আপরাধে অংশগ্রহণ না করে ভারত ও অন্যান্য রাষ্ট্র কী করতে পারে?

ভূমিজ, জনজাতির ও সংখ্যালঘুদের শিক্ষাকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে উচ্চমানের বহুভাষিকতার ব্যবস্থা থাকে। স্কুলের লেখাপড়া, অধিপতি ভাষাশিক্ষা ও আত্মপরিচয় সংক্রান্ত চেতনা—এই তিনটে দিকেই এরফলে সুফল পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে যোগ করা যায় শিক্ষার জন্য খরচের বিষয়টা। শুরু করার সময় স্বল্পমেয়াদি খরচ সামান্য কয়েক শতাংশ বাড়লেও, দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে প্রধানত মাতৃভাষামাধ্যমে শিক্ষায় খরচে সাশ্রয় হবে। এছাড়া লক্ষ লক্ষ শিশুর 'নিরক্ষরতা' ও আজকের শিক্ষার অপচয় দূর হবে।

বহু দেশ ও বহুজনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভূমিজ ও জনজাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ইতিবাচক ফল দেখা গেছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সদ্য। সেখানে বেশিদূর এগোনো এখনো সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত, নেপাল (দ্র: হাউ ও অন্যান্য ২০০৯), ওড়িশা (মোহান্তি ও পাণ্ডা ২০০৭, ২০০৯, মোহান্তি এবং অন্যান্য ২০০৯) ও পেরুর (পেরেজ ২০০৯, পেরেজ ও ট্র্যাপনেল, যন্ত্রস্থ) প্রয়াসগুলি লক্ষ করা যেতে পারে। নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডের সামি অঞ্চলে

(দ্র: পুওস্কারি/২০০৯, আইকিও পুওস্কারি ও সুকটনাব কাঙ্গাস ২০০৭) সামি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত চলতে পারে। ইথিওপিয়ায় দেশব্যাপী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ফলাফলটা দেখুন। যে সব শিশুরা ৮ বা ১০ বছর ধরে মাতৃভাষার মাধ্যমে, আমহারিক ও ইংরেজিকে ভাষা হিসেবে নিয়ে পড়েছে তাদের পরীক্ষার ফল যারা অল্পদিন মাতৃভাষা মাধ্যমে পড়েছে বা শুরু থেকেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়েছে তাদের থেকে সব বিষয়ে ভালো হয়েছে। এমনকি ইংরেজি ভাষাতেও (দ্র: হিউ ২০০৯, হিউ ও অন্যান্য ২০০৭)। বধিরদের জন্য সাংকেতিক ভাষামাধ্যমও বলিভিয়া, বাংলাদেশ প্রভৃতি নানা দেশে সুফল ফলিয়েছে। একই রকম ভাবে দেখা গেছে জাতীয় ও অভিবাসী সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া কার্যকরী হয়েছে। (দ্র: মোহান্তি এবং অন্যান্য ২০০৯, গার্থিয়া এবং অন্যান্য ২০০৬ স্কুটনাব কাঙ্গাস ২০০০ সারাংশগুলো পাওয়া যাবে) অথচ, আজও ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্যামৃত শোনা যায়, কাজের বেলায় ছিঁটে ফোঁটা।

ওড়িশার নজির থেকে বোঝা যায় ভারতেও এটা কার্যকরী করা সম্ভব। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে ওড়িশায় একটা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। ২০০ স্কুলে ১০টা জনজাতির শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষা প্রথম শ্রেণি থেকে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। উপকরণ জোগাড় করা হয় শিশুর অভিভাবক ও শিক্ষকদের কাছ থেকে। প্রকল্পের সমন্বয়কারক ছিলেন ড: মহেন্দ্রকুমার মিশ্র। ২০০৮ সালে আরো ১৬টি ভাষা যুক্ত হওয়ার কথা। গবেষণা প্রকল্পটির নাম ছিল ‘মাতৃভাষা থেকে অন্যভাষায়: ভারতের জনজাতিদের সন্তানদের বহুভাষিক শিক্ষায় উৎক্রমণে সহায়তা।’ এই গবেষণার অধিকর্তা ছিলেন অজিত কুমার মোহান্তি ও মিনতি পণ্ডা (জাকির হোসেন সেন্টার ফর এডুকেশনাল স্টাডিজ, জে এন ইউ)। এরা কিছু শিশুর শিক্ষাপ্রগতির দিকে ধারাবাহিক ভাবে নজর রেখেছিলেন। দেখেছেন শিক্ষাতত্ত্বের ও প্রয়োগের বিপুল সমস্যা যেমন আছে, তেমন তার সমাধানও আছে। শিক্ষার মাধ্যমে বদল করা ছাড়াও শিক্ষকপ্রশিক্ষণ, পদ্ধতি, উপকরণ ও আরও অনেক বিষয়ে নজর দিতে হবে। শিক্ষার মধ্যে স্থানীয় প্রসঙ্গ পরিবেশ যোগ করতে হবে। অন্ধ্র ও আরও কয়েকটি প্রদেশে ছোটো মাপে একই ধরণের প্রকল্প চালু হতে চলেছে।

নেপালের প্রকল্পের নাম 'নেপালের প্রাথমিক স্কুলগুলির অ-নেপালি ভাষাভাষী পড়ুয়াদের জন্য বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচি' (ড: লাভাদেও অবস্তি, শিক্ষা মন্ত্রক)। এই মহাপ্রকল্পের অধীনে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের জন্য ৬টা অগ্রণী প্রকল্প চালু হয়েছে। তাদের প্রধানত মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে। উপকরণ ও পাঠ্যসূচি তলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরাই এগুলো জুগিয়েছেন। নেপালে অ-নেপালি ভাষার সংখ্যা প্রায় ১০০, সবকটি ভাষার ক্ষেত্রেই এই প্রকল্পটি বিস্তৃত হবে।

ওড়িশা ও নেপালি প্রকল্পের মধ্যে ভালো সহযোগিতার সম্পর্ক আছে। এক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করেছেন তারা একে অপরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন, উপকরণ ও ভাবনার আদান প্রদান করেছেন। এধরনের দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

ইথিওপিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতি উদ্ভাবনী ও প্রগতিশীল। সেখানে ৮ বছর ধরে মাতৃভাষামাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অঞ্চলগুলোর হাতে নিজের নিজের এলাকার জন্য বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা করার অধিকার আছে। কোনো কোনো অঞ্চলে ৪ থেকে ৬ বছর শিক্ষার পরই ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা এর আগে চালু হয়েছিল। একটা তুলনামূলক বিচারের সুযোগ এসে গেল ইথিওপিয়ার শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে। গোটা দেশজুড়ে একটা শিক্ষা পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হল। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চারমাস জুড়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হল প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমগুলির তুলনামূলক ফলাফলকে। ২২ জানুয়ারি ২০০৭ চূড়ান্ত প্রতিবেদন বেরোল। (দ্র: হিউ, ক্যাথলিন, বেনসেন, ক্যারল, বেরহীনু বোগালে ইত্যাদি ২০০৭) এই প্রতিবেদনটি সুদক্ষ পদ্ধতিভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে বিপুল তথ্য ভাণ্ডারের আধার। পড়ুয়াদের আর্জিত দক্ষতা সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা এর মধ্যে পাওয়া যায়। দেখা গেছে যারা ৮ বছর মাতৃভাষা মাধ্যমে এবং ইংরেজিকে একটা ভাষাবিষয় হিসেবে পড়েছে তাদের দক্ষতা ইংরেজিসহ সববিষয়েই বেশি। কাদের তুলনায়? যারা ৪বা ৬ বছরের মাতৃভাষা মাধ্যম শিক্ষা পেয়েছে তাদের তুলনায়।

আমি যখন কুর্দিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী আবদুল আজিজ তৈয়বের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, 'বিশ্বের প্রতিটি শিশুর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে।' সাক্ষাতের দিনটা ছিল ১৫ মার্চ ২০০৬।

এই অধিকার পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেসব দেশের একটা ভারতবর্ষ। দুটো সবচেয়ে ক্ষতিকারক কল্পবিশ্বাস এক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমটা হল, ভূমিজ, জনজাতি ও সংখ্যালঘু শিশুদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আঞ্চলিক প্রধান ভাষা বা ইংরেজির মাধ্যমে পড়ানো শুরু করানো যায় এবং যত বেশি সম্ভব ওই ভাষার পরিবেশ তার চারপাশে তৈরি করা যায় তত বেশি তার ওই ভাষায় দক্ষতা বাড়বে। ভুল, ভুল, ভুল! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুলক্ষ শিশুর ওপর পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষা শিক্ষার গবেষণাটি হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে মাতৃভাষাকে যত বেশি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হবে তত বেশি ইংরেজি সহ অন্যান্য শিক্ষায় শিশুর সক্ষমতা আসবে। (দ্র : টমাস অ্যান্ড কোলিয়ার ২০০২)

অন্য কল্পবিশ্বাসটি হল, ভালো একটা চাকরি পাওয়ার জন্য ইংরেজি জানাই যথেষ্ট। ইউরোপে একটা গবেষণা হয়েছিল—'শ্রমের বাজারে বহুভাষিক দক্ষতা' এই শিরোনামে। ১৯৯৮-২০০০ সালে বাছাই নমুনা সংগ্রহে ২০ থেকে ৬৪ বছর বয়স পর্যন্ত ৮৩২ জন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই গবেষণার উপসংহারে দেখানো হয়েছিল:

'ইংরেজির ওপর দখলের জন্য চাকরির সুবিধার ব্যাপারটা ক্রমশ কমে আসবে যখন এধরনের দক্ষ মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে।' (দ্র: ২০০৭:২৭৮) ইংরেজি কিছু দরজা খুলবে? হ্যাঁ। কিন্তু নিরাপদ পন্থা হল মাতৃভাষা মাধ্যমে লেখাপড়া শুরু করে আঞ্চলিক প্রধান ভাষা বা ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন।

(যে তথ্যসূত্রগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে তা স্কুটনাব কাঙ্গাসের ৩০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থতালিকায় www.tove-skutnabb-kangas.org থেকে পাওয়া যাবে। বর্তমান লেখাটি http://www.tove-skutnabb-kangas.org থেকে নামানো হয়েছে।—অনুবাদক)

অনুবাদ: সজল রায়চৌধুরী

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ ২০২০

ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বিনয় চৌধুরী

[আজ থেকে ২৬ বছর আগে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৪০১ মাঘ ও ১৪০২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল। পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক আবদুর রউফের অনুমতি নিয়ে আমরা লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করলাম। এর দ্বিতীয় অংশটির খোঁজ পাওয়া গেছে বন্ধু সন্দীপ দত্তের সৌজন্যে।]

হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্কের যে দিক নিয়ে আমাদের এ আলোচনা তা হল, ঔপনিবেশিক আমলে আদিবাসী সমাজের উপর হিন্দু-প্রভাবের চরিত্র। এ প্রসঙ্গে নানা ধারণা গড়ে উঠেছে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা তাদের কয়েকটার বিচার করার চেষ্টা করব।

১

আমাদের নিবন্ধের বিষয়বস্তুর এই প্রাথমিক উপস্থাপনা থেকে ধারণা হতে পারে আদিবাসী ও হিন্দু-সংস্কৃতির উপাদান সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। আমরা পরে দেখব, এ ধারণা ভ্রান্ত। কিন্তু তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তো ছিলই। বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আমরা তাই এ ভিন্নতাকে স্বীকার করে নেব।

আসলে হিন্দু ও আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সম্পর্কে একটি ধারণা বহুদিন টিকে ছিল এমন কি পেশাদার নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যেও। সুরজিৎ

সিংহের স্বীকারোক্তিকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়। উনিশশো পঞ্চাশের দশকের নানা সময়ে তিনি সিংভূমের (পরবর্তী পুরুলিয়ার) ভূমিজদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন। অনুসন্ধানের কাজ শুরু হবার আগে তাঁর ধারণা ছিল, ভূমিজ-সংস্কৃতির ধারা বৃহত্তর হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মূলধারা থেকে আলাদা; ভূমিজ সমাজ যেন প্রাক্-'সভ্যতা' পর্বের অংশ[১]। গবেষণার কাজ কিছু এগুলে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর প্রাথমিক ধারণা কত ভ্রান্ত। তাঁর নতুন ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে যে, এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ বহুদিনের; এর এলাকাও বিস্তীর্ণ। যেখানে ব্যবধান স্পষ্টভাবে দেখা গেছে, তার কারণ এ নয় যে এ সংযোগ আদৌ ছিল না; এর কারণ, এককালের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে বা শিথিল হয়েছে। এটা এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও সংঘাতের পরিণাম। এই সংঘর্ষে ভূমিজদের হার হয়েছে। এর একটা প্রধান কারণ, কৃষি-উৎপাদনের কলা-কৌশলে হিন্দুরা অনেক বেশি নিপুণ। পরাজিত ভূমিজরা তাই হিন্দু-প্রভাব বহির্ভূত কোনো দূর এলাকায় সরে গেল। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় উৎপাদন-শক্তির উপর যতটুকু নিয়ন্ত্রণ তারা আয়ত্ত করতে পেরেছিল, তার অনেকটা বিফলে গেল। আবার নতুনভাবে তাদের অর্থনীতি ও সমাজ গড়ে তুলতে হল[২]।

সুরজিৎ সিং-এর মূল সিদ্ধান্ত—আদিবাসী জগৎ, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে, বহুদিন ধরে 'হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য' সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

২

কিন্তু সংযোগ থাকলেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে বা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এর রূপ পরিবর্তিত হতে পারে। হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষ কোনো কোনো দিক গ্রহণ (বা বর্জন) করার মানসিকতাও পাল্টাতে পারে। আদিবাসী সংস্কৃতির উপর 'হিন্দু' প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কিত কোনো কোনো ধারণার বিচার প্রসঙ্গে আমরা এ প্রেক্ষাপটের কথা বিশেষভাবে মনে রাখব।

'সংস্কৃতি' শব্দটাকে এর ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছি—যেমন সামাজিক জীবন-চর্যা, ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণা, মনন। কৃষি এবং নানা উৎপাদনের কলা-কৌশল, এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজ-সংগঠন অবশ্যই এর অংশ। তবে এ দিকটার উপর আমরা বিশেষ নজর দিইনি। কারণ, আমাদের সময়কালের মধ্যে হিন্দু-আদিবাসী সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ দিক থেকে বিশেষ কোনো পরিবর্তন

আসেনি। কিন্তু যেখানে আদিবাসী গ্রামে বাইরের নানা গোষ্ঠীর (যাদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দু) ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ওখানকার অর্থনীতিতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে, আমরা তার তাৎপর্য বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

গোটা পূর্ব ভারতকে আমরা আলোচনায় আনিনি, বাংলা ও বিহারেই তা সীমাবদ্ধ। এর একটা কারণ, এ দুই প্রদেশে, আদিবাসী জগতের উপর একটা প্রধান প্রভাব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-সৃষ্ট নতুন ভূমিব্যবস্থা। এ অঞ্চলেরও কয়েকটা মাত্র গোষ্ঠীকে আমরা বেছে নিয়েছি—যেমন, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, ওরাঁও এবং হো। রঙমহলের পাহাড়িয়া, উড়িষ্যার জুয়াঙ এবং আরও কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কথা এসেছে—কিন্তু তুলনা হিসেবে। আদিবাসী সংস্কৃতিতে হিন্দু প্রভাবের যে জটিল প্রক্রিয়া আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়, তা বোঝানোর জন্য আমরা এসব গোষ্ঠীর পরিবর্তমান মানসিকতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়েছি। এ প্রসঙ্গে আবারও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। যেসব এলাকায় আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের সমাজ সংগঠন ভেঙে গেছে, গ্রামজীবনের সঙ্গে তাদের সংযোগ বিনষ্ট বা শিথিল হয়েছে, এবং ফলে আদিবাসী হিসেবে তাদের সংহতিবোধ দুর্বল হয়েছে, সেখানে হিন্দু প্রভাব বিস্তারের রকমটাই আলাদা। আমাদের নির্বাচিত আদিবাসীদের গ্রামীণ সমাজ-সংগঠনের উপরও নানা আঘাত এসেছে; কিন্তু তাদের সংহতিবোধ বিলুপ্ত হয়নি। এ বোধের একটা প্রধান উৎস, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, এবং ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা। বহিরাগত শত্রুকুলের বিরুদ্ধে চিরন্তন প্রতিরোধ এ বোধকে সমৃদ্ধ করেছে।

৩

হিন্দু আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রধানত হিন্দু প্রভাবের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। বস্তুত, সঙ্গত কারণেই। এই দুই সংস্কৃতির বিনিময়ে এ প্রবণতাটাই বিশিষ্ট ছিল। কোনো কোনো গবেষক এ বিনিময়ের অন্য একটা দিকের কথাও বলেছেন; অর্থাৎ কীভাবে আদিবাসী ধর্ম-বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান হিন্দু জীবন-চর্যার নানা দিককে প্রভাবিত করেছে।

দুই সংস্কৃতির সংযোগের ফলে এ ধরনের বিনিময় ঘটতেই পারে। কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে একটা ধারণা বিচার-সাপেক্ষ।

বলা হয়েছে, গুরুত্বের দিক থেকে হিন্দুপ্রভাব আর আদিবাসী প্রভাবে বিশেষ কোনো তারতম্য নেই। কুমার সুরেশ সিং হিন্দু প্রভাবের তুলনায় এ দ্বিতীয় প্রভাবকে 'Counterveiling process' বলেছেন।[৩]

এ প্রসঙ্গে আমরা নীহাররঞ্জন রায়[৪] এবং কুমার সুরেশ সিং[৫]-এর গবেষণা উল্লেখ করতে পারি। অবশ্য দুজনেই অনেক আগেকার ঘটনার কথা বলেছেন। রায়ের বিষয়বস্তু 'আদিপর্বের' বাঙালির ইতিহাস। তাঁর মতে : 'আজ আমরা যাকে হিন্দু ধর্মকর্ম সাধনা বলিয়া দেখি, বা যাহাকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনা বলিয়া জানি তাহা একদিকে আর্য ও অন্যদিকে প্রাক-আর্য বা অনার্য ধর্মকর্মসাধনার সমন্বিত রূপ।' এ সমন্বয়ের সূচনা হয়েছে বেশ কয়েক শতাব্দী আগে। 'বাংলাদেশে মোটামুটি খ্রিস্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্যধর্মের প্রবাহ প্রবলতর হওয়ার সময় হইতেই সদ্যোক্ত সমন্বয় নিয়া চলিতে আরম্ভ করে; মধ্যযুগে এ সমন্বয় সাধন সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং আজও তা চলিতেছে লোকচক্ষুর অগোচরে।'[৬]

আগেকার ঘটনা হলেও হিন্দু আচার ও ধ্যান-ধারণায় আদিবাসী সংস্কৃতির কোনো কোনো উপাদানের সংমিশ্রণের কথা উল্লেখ করছি, প্রধানত একটা কারণে। আমরা বলার চেষ্টা করছি, হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক বিনিময়ের তাৎপর্য এ দুই সমাজের পক্ষে সমান নয়; বিনিময়ের এলাকাও সমান ব্যাপক নয়।

আসলে কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাবের বিস্তীর্ণতা ও গভীরতার কথা অধ্যাপক রায়ই বিশেষভাবে বলেছেন।[৭] তিনি প্রধানত লোক-সংস্কৃতির (Folk culture, popular culture) ক্ষেত্রেই এ প্রভাবের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, তথাকথিত 'হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য' সংস্কৃতি আর এ সুবিশাল লৌকিক বিশ্বাসের জগৎ বহুক্ষেত্রে আলাদা।[৮] তিনি হিন্দু-জনসাধারণের অনেক বিশ্বাস ও আচারের কথা বলেছেন, যাদের উৎস কোনো ব্রাহ্মণ্য বিধান বা অনুশাসন নয়। তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তগুলির কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করছি। যেমন 'গ্রাম-দেবতা'র পূজা। এ পূজা কখনও 'গ্রামের ভিতরে বা লোকালয়ে' অনুষ্ঠিত হত না; তার জন্য 'সর্বত্রই গ্রামের বাহিরে, জনপদসীমার বাহিরে ''থান'' বা ''স্থান'' বলিয়া একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে।' অধ্যাপক রায় নিঃসংশয় যে, যে নামেই গ্রাম-দেবতার পরিচয় হোক না কেন, 'সর্বত্রই তিনি প্রাক-আর্য আদিম গ্রাম-

গোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা।... ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ; মনু তো বারবার এসব দেবতার পূজারীদের পতিতই বলিয়াছেন।' গ্রামীণ কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা যৌথ আচার অনুষ্ঠানও ছিল, যেখানে 'সাধারণ কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের' ভূমিকা ছিল না। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও রায় আদিবাসীদের কাছে হিন্দু সমাজের ঋণের কথা বলেছেন। 'বস্তুত, বাঙ্গালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে, রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কৌমের, এক কথায় বাঙ্গলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস... এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়ায় আমরা অনেক কিছুই সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি।

অধ্যাপক রায়ের আলোচনা থেকে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক বিনিময়ে দুটি প্রবণতার আভাস মেলে: কোথাও কোথাও হিন্দু-সমাজের উপর আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট; অনাদিকে এ দুটি সংস্কৃতির সমান্তরাল অবস্থান, যার প্রধান কারণ, আদিবাসী এলাকায় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য বিধান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কুমার সুরেশ সিং-এর আলোচনা একটু ভিন্ন ধরনের। প্রথমত, তিনি বলছেন, বহিরাগত সব হিন্দুগোষ্ঠীর উপর আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। উচ্চবর্ণ বা উচ্চবর্গের ক্ষেত্রে এ প্রভাব মোটেই ছিল না; থাকলেও নগণ্য। কিন্তু নিম্নবর্ণ বা নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর এ প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক। এ প্রসঙ্গে তিনি দুটি গোষ্ঠীর কথা বলেছেন: জমির সন্ধানে আসা চাষি, আর কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী ইত্যাদি নানা বৃত্তিজীবী। সিং মনে করেন, আদিবাসী এলাকায় আসার আগেও এদের ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক ধারণা ও আচার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব খুবই সীমিত ছিল। এদের কেউ কেউ গাছ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশুপাখী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করত (Animistic belief)। আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। আদিবাসী জীবন-চর্যার নানা দিক গ্রহণ করা তাই তাদের

পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক ছিল। তা ছাড়া আদিবাসী সমাজের সঙ্গে তারা এত নিবিড়ভাবে মিলে গিয়েছিল বলে এ গ্রহণে কোনো বিঘ্নই ঘটেনি।

আদিবাসী প্রভাবের অন্য কয়েকটা দৃষ্টান্তও একটু বিশেষ ধরনের। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলাদের নানা প্রতিবেদনে এদের উল্লেখ আছে।[৯] যেমন, হিন্দুদের উৎপীড়নে আদিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেও, গ্রামের পূজারী-পুরোহিত (পাহান) এবং আদিবাসী রীতি-অনুসারী কুশলী চিকিৎসক ('medicinemen') বহু ক্ষেত্রে থেকে গিয়েছিল। হিন্দুরাও চায়নি যে, তারা গ্রাম ছেড়ে যাক। হিন্দুরা তাদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়। অন্যান্য আদিবাসীরা চলে গেলেও গ্রামদেবতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা বহুদিন বন্ধ হয়নি। তা চলতে থাকে পুরানো রীতিতে। আর আদিবাসী পাহানদের ভূমিকা এখানে অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া মুণ্ডা-রাষ্ট্রের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান মুণ্ডাগ্রামের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছাড়া সিদ্ধ বলে গণ্য হত না। হিন্দুধর্মান্তরিত মুণ্ডারাজপরিবার এভাবে মুণ্ডাসমাজের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ও ঐতিহ্যকে মেনে নেয়।

আদিবাসীপ্রভাবের এসব নানা দৃষ্টান্ত থেকে, এ সিদ্ধান্ত কি যথার্থ হবে যে, এদের ফল 'ট্রাইব্যালাইজেশন' (Tribalization)? সুরেশ সিং-এর এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, কোনো কোনো হিন্দুগোষ্ঠীর (যেমন ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের লোক) উপর এ প্রভাব প্রায় পড়েইনি। গ্রামের ধর্মানুষ্ঠানে পাহানদের ভূমিকা সম্ভবত সেখানেই টিকে ছিল, যেখানে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন নানা কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারেনি, বা এ অনুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ঠিকমতো গড়ে উঠতে পারেনি। মুণ্ডারাষ্ট্রের কোনো কোনো মঙ্গলানুষ্ঠানে, বিশেষ কোনো কোনো মুণ্ডার যোগদান অনেক প্রাচীন প্রথা। এ প্রথা যে উনবিংশ বিংশ শতাব্দীতেও কোনো কোনো জায়গায় মানা হত, তার এক ধরনের প্রতীকী তাৎপর্য হয়ত ছিল। কিন্তু মুণ্ডারাজতন্ত্রের পক্ষে এর বিশেষ মূল্য ছিল। এ যোগদান যেন মুণ্ডাগ্রামের পক্ষ থেকে মুণ্ডারাজের বৈধতার স্বীকৃতি।

বস্তুত, আদিবাসী জীবনে যে হিন্দুপ্রভাবের কথা আমরা পরে বলব, তার তুলনায় এসব দৃষ্টান্ত থেকে অনুমেয় আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব অনেক সীমিত। এর প্রধান কারণ, বর্ণাশ্রমের কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা হিন্দুসমাজের উচ্চবর্গ

গোষ্ঠী সচেতনভাবে কৌম-জনগোষ্ঠী থেকে বহুক্ষেত্রে নিজেদের দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। এর অনিবার্য ফল, কোথাও কোথাও কৌমেরা হিন্দুসমাজের অংশ বলে গণ্য হলেও তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল সমাজের একেবারে নীচু তলায়। প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণেতর বর্ণবিভাগের যে আলোচনা নীহাররঞ্জন রায় করেছেন, তা থেকে আমরা জানতে পারি, এরা আসলে ছিল বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত; 'অন্ত্যজ', 'ম্লেচ্ছ', অস্পৃশ্য।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও আদিবাসী সম্পর্কে উচ্চবর্ণের হিন্দুগোষ্ঠীর মনোভাবে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ওই শতাব্দীর প্রথম দশকে ভাগলপুরে গ্রাম-পরিক্রমার সময় বুকানন হ্যামিলটন এ মনোভাবের কথা জানতে পারেন। সেখানকার এ আদিবাসীরা ছিল সাম্প্রতিককালে অন্য জায়গা থেকে চলে আসা সাঁওতাল। গ্রামের যে-অংশে বর্ণহিন্দুদের বাস, সেখানে সাঁওতালদের বাড়িঘর বানানোর কোনো অধিকার ছিল না। তারা থাকত গ্রামের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে। হিন্দুদের গরুর দুধ দোয়া এদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ; মনে করা হত, তাদের 'অশুচিতায়' গরু বা দুধের পবিত্রতা নষ্ট হবে। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটলে সারা গ্রাম এ 'অনাচারের' প্রতিবাদ জানাত।[১১]

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও তথাকথিত ট্রাইব্যালাইজেশনের ভিত্তি ছিল অগভীর। যেমন উত্তরপ্রদেশে এবং মধ্যপ্রদেশে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের শাস্ত্রীয় বিধানসম্মত জীবন-যাত্রার রীতি বর্জন করেছে, এবং আদিবাসীদের আচার ও রীতি গ্রহণ করেছে। এটা ঘটেছে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে। তারা আদিবাসী অঞ্চলে দীর্ঘদিন বাস করেনি; অতি স্বল্প সময়ের জন্য সেখানে তারা ছিল। তাদের আদি সমাজের অনুশাসন থেকে সাময়িক বিচ্যুতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দ্যোতক নয়।[১২]

৪

হিন্দু-প্রভাবের প্রসার (Hinduization) হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঔপনিবেশিক যুগে তো বটেই। সমসাময়িক বর্ণনায় এবং বিশ্লেষণে 'হিন্দু-প্রভাবে'র সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। নানা অর্থে এ শব্দ-সমষ্টিকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব ঐতিহাসিক

ঘটনা হিন্দু-প্রভাবের প্রমাণ এবং লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়েছে, তার আলোচনায় আবার আমরা এ প্রসঙ্গে ফিরে আসব। এখানে এটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলা এবং নৃতত্ত্ববিদদের বর্ণনায় দুটো প্রবণতা দেখা যায়। গোড়ার দিকে একটা ধারণা ছিল, আদিবাসীরা শুধুমাত্র হিন্দুদের কোনো কোনো ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করছে। তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই আরও দুটি দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এ গ্রহণ শুধুমাত্র বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পরিবারের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল নয়, এটা যৌথ প্রয়াস। দ্বিতীয়ত, এ প্রয়াসের প্রেক্ষাপট হিসেবে আদিবাসীদের নতুন এক 'রাজনৈতিক' চেতনার কথা বলা হয়েছে। তবে হিন্দু-প্রভাব এবং এ দুটি দিকের কার্য-কারণগত যোগ কোথায়, তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি।

'হিন্দু প্রভাব' বলতে পরে আরও বাপক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। যেমন নানাভাবে আদিবাসীরা বর্ণাশ্রম ও জাতিপ্রথার কাঠামোয় গড়ে ওঠা হিন্দুসমাজের অঙ্গে পরিণত হচ্ছে। তবে এ পরিণতির চরিত্র সম্পর্কে নানা মত ছিল।

এ দুটি প্রবণতার কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করব। সীমিত অর্থে হিন্দু-প্রভাবের দ্রুত বিস্তার সম্পর্কে প্রথম বিস্তারিত উল্লেখ পাই আমলাদের সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলনের (১৮৭৪-১৮৮২) বিবরণে। এর থেকে বোঝা যায়, এ প্রভাব বিস্তারের ঘটনা সাম্প্রতিক। এ ঘটনার নানা ব্যাখ্যা থেকে আরও বোঝা যায়, এখানে নানা উপকরণের জটিল সংমিশ্রণ ঘটেছে।

হিন্দু-প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে আমলাদের ধারণার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাদের বিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশের সংক্ষিপ্তসার আমরা দেব। বিবরণগুলি কালানুক্রমে সাজানো; তাই তাতে কোনো কোনো বিষয়ে পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাবে।

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার (৭ অক্টোবর, ১৮৭৪)[১৫]

সাঁওতাল নেতা ভগীরথের নির্দেশে দক্ষিণ ভাগলপুরের বাউসী নামক জায়গায় এক 'হিন্দু মন্দিরে' বারোশ সাঁওতালের এক জমায়েত হয় (২৪ জুলাই ১৮৭৪)। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরই উদ্যোগে তারদিহা নামক জায়গায় আর একটা নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে পূজার সব অনুষ্ঠান পুরোপুরি হিন্দু রীতিতে

'(Hindoo Principles)'। তার পুরোহিত (পাণ্ডা) কিন্তু একজন সাঁওতাল। ভগীরথ-অনুগামীদের উপর নির্দেশ ছিল, তারা যেন তাদের সব মোরগ আর শুয়ার মেরে ফেলে। কারণ, এর ফলে তারা 'শুচি' হবে। দলে দলে সাঁওতাল এ মন্দিরে আসতে থাকে। এ নির্দেশ সব সাঁওতাল মানেনি বটে; তবে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেরই কেউ কেউ এ শুচিতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে এক অনিশ্চিত আশঙ্কাবোধ ('panic') এবং অস্থির উত্তেজনা (excitement)। তারদিহা মন্দিরের পাণ্ডা এবং এর সঙ্গে যুক্ত সবাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিশনার (১ অক্টোবর, ১৮৭৪)[১৪]

গোটা উত্তর সাঁওতাল পরগণা জুড়ে মোরগ, এবং শুয়োর মারার নতুন অভিযান চলছে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেও তা ছড়িয়ে পড়ছে। সাঁওতালদের বিশ্বাস, এটা একান্তই 'ধর্ম' সম্মত কাজ (religious act)। গোড়ায় তারা এ কাজ প্রকাশ্যে করেছে, সম্পূর্ণ নির্দ্বিধায়। এ বিষয়ে সরকারের (হাকিম) মনোভাব মোটেই অনুকূল নয় জেনে এ কাজের সমর্থনে নানা ধরনের অজুহাত দেখাতে থাকে। যেমন, খিদের জ্বালায় তারা এসব করছে। সরকারি জেরায়, তারা স্বীকার করে, এ অজুহাত সত্য নয়। তারা এখন বলল, অন্যসব পাড়াপড়শিরা এ কাজ করছে, তাই তারাও করছে।

ভগীরথ মাঝির ব্যাপক প্রভাব সন্দেহাতীত। তারদিহার মন্দিরে সাঁওতালরা বিপুল সংখ্যায় আসছে। ভগীরথকে ঘিরে নানা ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান (ceremonies) হয়েছে। মাতাদিন নামক এক হিন্দু তার কপালে লাল রঙের টীকা (red mark) পরিয়েছে। ভগীরথের পরিকল্পনা ছিল, সাঁওতালদের মধ্যে সে নতুন এক ধর্ম-আন্দোলন (religious movement) সৃষ্টি করবে; তার নেতৃত্ব সবাই মেনে নিয়েছে। 'আমার বিশ্বাস, এ মন্দিরে অজস্র লোকের আনাগোনা এবং এ 'শুদ্ধি' (purification) আন্দোলন, সাঁওতালদের চিন্তা-ভাবনায় এক নতুন প্রবণতার দ্যোতক; তারা চারপাশের হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে (amalgamate with the Hindoos who surround them)।'

ভাগলপুর-বিভাগের কমিশনারের ১৮৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন[১৫]

গোটা ব্যাপারটা ঘটেছে ভগীরথ এবং মাতাদিন নামক এক হিন্দুর মধ্যে যোগসাজসে; মাতাদিন ভগীরথের পুরানো সাকরেদ; বিদ্রোহী সিপাহী (ex-Mutineer of a cavalry regiment') হিসেবে তার সাজাও হয়েছিল। বাউসীর মন্দিরে ধর্মানুষ্ঠান চলে দু-তিনদিন ধরে; একেবারে অর্থহীন ক্রিয়াকলাপও (a good deal of absurd nonsense) হয়েছে তালদিয়ার নতুন মন্দিরে মহাদেবের পুজোর জন্য। 'অশুচি' জীবজন্তু মারার জন্য ভগীরথের হুকুমনামা এখান থেকে জারি করা হয়। 'সাঁওতালরা এমনিতেই উত্তেজনাপ্রবণ জাত; স্থানীয় প্রশাসনের মতে, আধা-হিন্দু নানা ধারণা গ্রহণ করার জন্য তারা মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত' (ripe for the acceptance of semi-Hindu ideas)। 'দাবাগ্নির মতো' এ নতুন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে; শুয়োর ইত্যাদি নিধন-পর্বের পর বিশাল জন-প্রবাহের গতি তালদিয়ার মন্দিরাভিমুখী। ভগীরথের অন্তরঙ্গ অনুগামীদের মধ্যে ধোনা মাঝি ও জ্ঞান মাঝি—এ দুজনের শুদ্ধি আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। জ্ঞান মাঝি এমনও বলেছে, ভগীরথের নির্দেশ অনুযায়ী 'শুদ্ধাচারী' না হলে তাদের এক বড় বিপদ আসন্ন : খ্রিস্টান এক পাদ্রী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাঁর হতে তারা জাত খোয়াবে। (a certain padree was coming round who would take their caste)। ভগীরথের নতুন ধর্মে দীক্ষিতদের চেনার একটা সহজ উপায় ছিল; বেলপাতার রস থেকে তৈরি একধরনের প্রলেপ দিয়ে তারা কপালে টীকা পরত (Bel-tika)।

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫)[১৬] **:**

সাম্প্রতিককালে অনেকেই বলেছে, কীভাবে হিন্দুধর্ম সাঁওতালদের চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে (the stronghold which Hinduism is taking of the santhal mind at the present moment)। এ আন্দোলনে আমরা ব্যাঘাত সৃষ্টি করব না : সাঁওতালদের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার প্রকাশে আমরা বাধা দেব না; আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এর সঙ্গে 'সন্দেহজনক সব রাজনৈতিক সম্পর্ক'কে (all the political connection of a doubtful kind) বন্ধ করা যায়।

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার (৯ মার্চ, ১৮৭৫)[১৭]

ভগীরথ মাঝি একেবারে ভুঁইফোড় নেতা নয়; জমিদার ও রাজ-বিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকা অনেক আগেই প্রশাসনের নজরে এসেছে। ১৮৬৬ সালে তার কারাদণ্ড হয়। ১৮৭৩/৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় দুঃস্থ সাঁওতালদের মধ্যে সরকারি অনুদান (বিশেষ করে খাদ্যশস্য) বণ্টনে চরম বিশৃঙ্খলার প্রতিবাদ করে সে আবার জনপ্রিয় হয়। সাম্প্রতিক ধর্ম-আন্দোলনের হিন্দুমুখিতা তার উদ্যোগেরই ফল। এটা তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির কৌশলমাত্র। শুয়োর ইত্যাদির প্রতিপালন সাঁওতাল অর্থনীতির একটা বিশিষ্ট দিক; অথচ ভগীরথের আদেশে বিনা দ্বিধায় সাঁওতালরা বিপুল সংখ্যায় 'অশুচি' জীবজন্তু মেরে ফেলেছে; এটা যেন নতুন ধর্ম সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা (test of sincerity)। সরকারি খাস মহল 'দামিন-ই-কো'তেই এ নতুন ধর্ম আন্দোলন সব চাইতে বেশি ছড়ায়। এ সময়েই সাঁওতালরা তাদের 'জাতির আদি নাম' (an old tribal name) 'খেরওয়ার' কথাটা আবার ব্যবহার করতে শুরু করে। নতুন ধর্মে দীক্ষিত সাঁওতালরা এ নামেই নিজের পরিচয় দিচ্ছে। মহেশপুর অঞ্চলে ভগীরথের এক অনুগামী জ্ঞান মাঝি এক নতুন ধরনের প্রচার শুরু করে। সে বলছে, 'শুদ্ধ' না হলে এক 'পাদ্রী সাহেব' তাদের জাত মারবে; অবশ্য জ্ঞান মাঝির 'পরওয়ানা' থাকলে এটা সম্ভব হবে না। এ ধর্ম-আন্দোলন এত ব্যাপক হয়েছে যে সরকারি হস্তক্ষেপে একে বন্ধ করার চেষ্টা বৃথা। অথচ সাঁওতালদের মতো উত্তেজনা-প্রবণ 'জাতি'র মধ্যে নতুন ধর্মের প্রবর্তন (change of religion) ব্যাপক অস্থিরতা (movement) সৃষ্টি করবে।

লেফটেন্যান্ট রিচার্ড টেম্পলের মন্তব্য (৯ মার্চ, ১৮৭৫)[১৮]

সাঁওতালরা তাদের আদি ধর্ম (aboriginal religion) ক্রমেই পরিত্যাগ করছে; এবং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করছে।

সাঁওতাল পরগণার সহ-কমিশনার (১৬ মার্চ, ১৮৮১)[১৯]

সবাই ধরে নিয়েছিল খেরওয়ার আন্দোলন ফুরিয়ে গেছে। এমনকি ১৮৭৯ সালেও, অর্থাৎ এর পুনরুজ্জীবনের আগের বছর। নুতনভাবে এর শুরু ১৮৮০

সালের মাঝামাঝি সময়ে (জুন)। সূচনা সাঁওতাল জগতে অতিপরিচিত এক ধর্মীয় উন্মাদনার ঘটনা দিয়ে। পাঁচজন সাঁওতাল অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় দুমকার মহকুমা শাসকের দপ্তরে আসে। হাতে কয়েকটা কাগজের টুকরো। দুর্বোধ্য লিপিতে লেখা। তারা বলে, এসব আকাশ থেকে পড়েছে; দৈববাণী বলেছে, এগুলো তারা যেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যায়। ওই বছরের শেষে বোঝা গেল, এটা তাদের অর্থহীন বাগাড়ম্বর নয়। খেরওয়ার আন্দোলনের পুরানো মেজাজ আবার ফিরে এসেছে। দেওঘর এবং জামতারা মহকুমায় দেখা গেল, অজস্র বেনামী চিঠি লোকের হাতে হাতে ঘুরছে। তাতে একই কথা লেখা : সব শুয়োর মেরে ফেলতে হবে। উদ্দেশ্য, সম্ভবত এটা জানানো যে, তারা 'শুদ্ধ' বা হিন্দু হয়ে গেছে; (to signalize their having become pure or Hindus), পালগঞ্জের দুবিয়া গোঁসাই-এর নাম এ সময় থেকে শোনা যায়। বহু সাঁওতাল তার সাক্ষাতের জন্য পালগঞ্জ আসে। জিজ্ঞেস করলে, তারা আসল কথাটা কবুল করে না। হাণ্ডোয়া অঞ্চল থেকে আসা একটা বড় দল বলে, তারা গরু ইত্যাদি 'সওদা'র জন্য পালগঞ্জ যাচ্ছে। বেনামি চিঠির সংখ্যাও বাড়তে থাকে। তাদের ভাষায় হেরফের আছে; তবে তাদের জবান একই রকমের : আসন্ন এক 'বিপর্যয়' (Calamity) এড়াতে সাঁওতালরা রোজ ভগবানের নাম জপ করবে; পালগঞ্জে গিয়ে গোঁসাই-এর সঙ্গে দেখা করবে; সব মোরগ, শুয়োর মেরে ফেলতে হবে; রবিবার কোনো কাজ করবে না। কোনো কোনো জায়গায় চিঠিতে নির্দেশ ছিল, সাদা রঙের ছাগলকে মেরে ফেলতে হবে। চতুর্দিকে অজানিত এক আশঙ্কাবোধ; সাঁওতালদের চোখে-মুখে একান্ত স্বাভাবিক খুশির চিহ্ন নেই; বহু জায়গায় ওরা ওদের অতি প্রিয় দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানও করেনি। আদমসুমারির (১৮৮১) প্রস্তুতি চলছে সর্বত্র; সাঁওতালরা এ কাজে সংঘবদ্ধ হয়ে বাধা দিচ্ছে। পাকুড়ের সহ-কমিশনার ক্যাম্পবেলকে মুখের উপর বলে দিল, তারা খেরওয়ার; আদমসুমারির দায়-দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত; এটা তাদের এক নেতা ভাগরাই মাঝির নির্দেশ ; করণিক (scribe) লাখান পরওয়ানা মারফৎ তা সবাইকে জানাচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় তারা বলছে, তাদের নাম 'বাবা ভগীরথে'র (father Bhagirath), খাতায় উঠেছে; নতুন করে আদমশুমারিতে তারা নাম লেখাবে না। কেউ কেউ বলছে, যদি লেখাতেই হয়, তাহলে 'হিন্দু'

হিসেবে লেখাবে; সাঁওতাল হিসেবে নয়। অবশ্য এ যুক্তি 'আদি' খেরওয়ারদের (old Kherwars); সাঁওতাল পরগণার উত্তরে এবং পূর্বে তাদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু পশ্চিমে নতুন দীক্ষিত খেরওয়াররা একথা বলছে না।

দুমকার মহকুমা শাসক ডাবলিউ এম স্মিথ ১৮৮১[২০]

দুমকা মহকুমায় ১৮৮১'র আদমশুমারিতে নথিভুক্ত খেরওয়ারের সংখ্যা ৫৯০৬; আর আদি সাঁওতালদের (old-style Santhals) সংখ্যা ১, ২৬, ৫৬২। দামিন-ই-কো'র যে অংশ দুমকা মহকুমায় পড়েছে সেখানে খেরওয়ারদের সংখ্যা অনুপাতে কম। কিন্তু আদি সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ তারা রাখে না। বস্তুত তারা স্বীকারই করে না যে আদতে তারা সাঁওতাল। তাদের সাঁওতাল, বা 'মাঝি' বলা, ডাকা পছন্দ নয়। তারা বলে, 'আমরা খেরওয়ার', 'রামহিন্দু খেরওয়ার'।

রাজমহলের সহকারি কমিশনার এস এস জোনস (১৮৮১)[২১]

খেরওয়ার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য, সাঁওতালরা যাতে ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে; এর উপায় হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হওয়া (to mix in the social and religious scale by admission into Hinduism)। তারা কালীমা'র পুজো করে; বৈদ্যনাথ এবং মধুসূদন তাদের তীর্থস্থান; মোরগ, শুয়োর ইত্যাদি তারা মেরে ফেলে; এদের বদলে 'হিন্দু' খেরওয়াররা পোষে পায়রা, ছাগল আর ভেড়া। উত্তেজক সুরা জাতীয় (intoxicating liquors) পানীয় তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

ডাব্লিউ এইচ রাট্রে (Rattruy); দুমকার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর (১৮৮১)[২২]

খেরওয়ারেরা হিন্দুধর্মানুগামী (follow the footsteps of the Hindu religion)। মোরগ বা শুয়োরের মাংস খাবে না; বস্তুত, হিন্দুরা যা খাবে না, তারাও তা যাবে না। পুরাতনপন্থী সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক নেই; তাদের পূজানুষ্ঠানের রীতি হিন্দুদের মতোই।

ডাব্লিউ এম স্মিথ, দুমকার মহকুমা শাসক (১৮৮১)[২৩]

খেরওয়ারেরা নিজেদের বিশিষ্ট সম্প্রদায় (peculiar people) বলে ভাবে। আমার সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে, তাদের অনেকেই বাউসীর গোঁসাই মঙ্গলদাসের দেওয়া কাগজপত্তর সঙ্গে রাখে। মঙ্গলদাসের 'চেলা' বলেই এ কাগজে তাদের পরিচয় লেখা আছে।

ক্যাপ্টেন কারনাক (Curnuc), সহকারী কমিশনার (১৮৮১)[২৪]

খেরওয়ারেরা নিজেদের সম্পূর্ণ আলাদা (exclusive) ভাবে; নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তাই হয়েছে। পুরানো ধর্মের প্রতি তাদের প্রবল বিতৃষ্ণা (intense hatred)। বিশেষ করে, আদি সাঁওতালদের সঙ্গে তারা সম্পর্ক রাখতে চায় না। হিন্দুদের সহ্য হয়ত করে; কিন্তু সাঁওতালদের সম্পর্কে তারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু। 'আমি একজন খেরওয়ারের কথা জানি, যে আচমকা রাগের বশে এক 'অশুদ্ধ' সাঁওতাল পরিবারের তিন চারটি মোরগ মেরে ফেলে। তাদের বলে, নতুন ধর্ম গ্রহণ না করলে তাদের পক্ষে ফল খারাপ হবে।' আচার আচরণে কিন্তু খেরওয়ারেরা অন্য সাঁওতালদের চেয়ে অনেক উন্নত। ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে তারা অনেক মনোযোগী এবং নিয়মনিষ্ঠ; কোনো রকম মাংস বা উত্তেজক পানীয় তারা খায় না; বিশেষ করে সাঁওতালদের 'সর্বনাশের মূল' (bane of the Santals) হাঁড়িয়া তারা ছোঁয় না। সাধারণভাবে তারা বেশি বুদ্ধিমান। তাদের বেশ কয়েকজন গুরু এবং গোঁসাই আছে; বেশির ভাগ হিন্দু। তাদের অতি শ্রদ্ধাভাজন এক গোঁসাই হল বাউসীর মঙ্গল দাস। অন্যান্য গুরুদের মধ্যে আছে ঠাকুর গোঁসাই, চন্দ্র সাধু এবং সালকোন সাধু; সবাই অতান্ত নীচু জাতের হিন্দু (miserable low caste Hindus)। বাউসীর বিখ্যাত মেলায় তারা যায়; সেখানে মঙ্গল দাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে; উদ্দেশ্য হিন্দু-ধর্মের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগের কথা বোঝানো (simply to declare their affinity with Hinduism)।

খেরওয়ার আন্দোলনের যুগে সাঁওতাল গোষ্ঠীর উপর হিন্দু-প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে সরকারি আমলাদের দেওয়া তথ্যের সারাংশ আমরা উপরে দিয়েছি।

বহুক্ষেত্রে এ তথ্য স্থানীয় বেসরকারি নানা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের থেকে পাওয়া। ভাগলপুর ডিভিশনের কমিশনার এ সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাদের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন পাঠায়।[২৫] বেশ কয়েকটা সরকারি প্রতিবেদন উত্তরের উপর ভিত্তি করে লেখা বলে মনে হয়। নিচে দেওয়া এরকম কয়েকটা উত্তরের সারাংশ থেকে তা বোঝা যাবে। উত্তরগুলি সব ১৮৮১ সালে লেখা, যখন খেরওয়ার আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল সবচাইতে বেশি।

মহেশপুরের জমিদার মহারাজা গোপালচন্দ্র সিং[২৬]

'খেরওয়ার' সাঁওতালদের পূর্বপুরুষদের নাম। খেরওয়ারদের আচরণ অনেকটা হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতো। মুরগী, শুয়োর ইত্যাদি পোষা তারা ছেড়ে দিয়েছে।

পাকুরের জমিদার তরাসনাথ পাণ্ডে[২৭]

সমাজ এবং ধর্মের সংস্কারের জন্যই এ আন্দোলন; উদ্দেশ্য হিন্দুদের মতো বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ। এ জন্যই তারা কোনো কোনো 'হিন্দু বাবাজী'র সাহায্য চায়; এসব বাবাজীরা মাঝে মধ্যে সাঁওতাল অঞ্চল পরিক্রমা করে; এদের থেকেই সাঁওতালরা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু শেখে; অন্যদেরও তা বোঝাতে চায়। এভাবেই সংস্কার আন্দোলনের সূচনা (proclaimed a reformation)। তারা বলে, তারা হিন্দু; তারা 'পবিত্র পৈতে' পরে; গলায় পরে রুদ্রাক্ষের মালা (wearing sacred beads about their necks)। সব ধরনের মাংস আগে তারা খেত; এখন সব বাদ দিয়েছে; বলে এসব 'অপবিত্র জিনিষ' (unclean things)। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগেকার মতো খাটো লেঙ্গটি তারা আর পরে না; তার বদলে পরে হিন্দুদের মতো ধুতি। মদের নেশায় মাতলামি এখন বন্ধ; নৈতিক জীবন অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। সূর্য, দুর্গা, কালী এবং অন্যান্য আরও হিন্দু দেবদেবীর পুজোর প্রচলন হয়েছে। তাদের গুরুকে তারা হিন্দুদের ভাষা নকল করে 'বাবাজী' বলে। সর্বত্র তার সম্মান। খেরওয়ারদের মধ্যে ধর্মের বাঁধন দৃঢ়, সব সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানে তারা অন্য সাঁওতালদের এড়িয়ে চলে।

জমিদার রামকানাই কারফোরমাণ[২৮]

বৈষ্ণবগুরু মঙ্গলদাসের থেকে মন্ত্রদীক্ষার জন্য সাঁওতালরা বাউসীতে জমায়েত হয়; এভাবে অনেকেই হিন্দু হয়ে যায় (turned Hindus)। বৈষ্ণবদের মতো তারা রাম ও কৃষ্ণের পুজো করে।

এফ এফ কোল, রাজমহলের খ্রিস্টান মিশনারী[২৯]

খেরওয়ার আন্দোলনের মূল সুর রাজনৈতিক; ধর্ম একটা ছদ্মবেশ মাত্র। কোনো কোনো দিকে খেরওয়ারদের বিশিষ্টতা আছে। কারোর ঘরে মোরগ বা শুয়োর নেই। হিন্দুদের মতো মাথায় চুলের গোছা রাখে। কেউ কেউ পৈতা পরে। রোজ স্নানও করে।

কনেলিয়স, জামতারার খ্রিস্টান মিশনারী[৩০]

'ভূতপূজা' (demon worship) এবং পিতৃপুরুষের জন্যে তর্পণাদি অনুষ্ঠানে (ancestor worship) মোরগ-বলি সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের প্রথা। অথচ খেরওয়ারেরা সব মোরগ মেরে ফেলছে। পুজোতে ঘি, দুধ ও চালের ব্যবহার নতুন একটা রীতি। কেউ কেউ পৈতা পরে। হিন্দু যোগীর মত চুল বাঁধে, এবং গাঁজা খায়। হালচাষের জন্য গরু দিয়ে হাল টানে না। মাটির হাঁড়ি-কলসী ভেঙে ফেলে; এজন্যই তো তাদের নাম 'সাফাহোর', অর্থাৎ 'পরিচ্ছন্ন', 'শুদ্ধ' মানুষ।

৪.১

সাঁওতাল আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে (১৮৭৪-১৮৮২) সাঁওতাল সমাজের উপর হিন্দু-প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে সমসাময়িক ধারণার যে কয়েকটি দিক আমরা দেখেছি, এবার তাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

(ক) সাঁওতালদের আদি ধর্ম হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—এ ধারণা কারো কারোর ছিল। সবার নয়। কেউ কেউ সাঁওতাল সংস্কার আন্দোলনে হিন্দুমুখিতার কথা বলেছে, আবার অনেকে সুস্পষ্টভাবে বলেছে। সাঁওতাল 'জাতি'র আদিনাম, 'খেরওয়ারে'র প্রচলন তখন থেকেই। 'সাফাহোর' (অনাবিল মানুষ, বিশুদ্ধ মানুষ) কথাটাও নাকি আদৌ নতুন নয়—তাও কেউ কেউ বলেছে।

(খ) হিন্দু প্রভাব আগে যে ছিল না, তা নয়; তবে এর দ্রুত প্রসার সাম্প্রতিক ঘটনা। এ প্রসার এক জটিল প্রক্রিয়াও। এ জটিলতার একটা বিশিষ্ট দিক এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। অনেকেই বলেছে, সাঁওতালদের নতুন 'রাজনৈতিক' চেতনা থেকে এ প্রক্রিয়াকে আলাদা করা যায় না। (এ বিষয়ে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করব)।

(গ) সাম্প্রতিক হিন্দু-প্রভাবের অভিনবত্ব শুধুমাত্র তার বিস্তারের গতিতে নয়। কোনো কোনো হিন্দু ধারণা, বিশ্বাস, রীতি, এবং আচার সাঁওতালদের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যময় ছিল। কারণ এগুলি সাঁওতাল সমাজের আমূল পুনর্বিন্যাসের জন্য নতুন পরিকল্পনার ভিত্তি। এটাকে নতুন এক সামাজিক দর্শন বলা যায়। অথচ এ দর্শন সমানভাবে গ্রহণ করা সব সাঁওতালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেমন, মোরগ, শুয়োর ইত্যাদি নিঃশেষে মেরে ফেলার নির্দেশ বহু সাঁওতালের পক্ষে একটা অবাস্তব দাবি বলে মনে হয়েছে, কারণ এদের প্রতিপালন সাঁওতাল অর্থনীতির একটা বিশিষ্ট দিক। তাছাড়া, দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস হঠাৎ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া অনেকের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই দীক্ষিত এবং সক্রিয় খেরওয়ারদের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল। বস্তুত, এ কারণে তারা বৃহত্তর সাঁওতাল সমাজ থেকে বিছিন্ন একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল।

(ঘ) এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, হিন্দুসংস্কৃতির কথা মনে রেখেই (reference point) সাঁওতালরা নিজের 'সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রটি, অপূর্ণতার' কথা বলেছে। যেমন শুদ্ধতার (purity) এবং শুদ্ধির (purification) নতুন ধারণা, যার নানা দিক সমসাময়িক বিবরণে বার বার উল্লিখিত হয়েছে, প্রধানত হিন্দু ধারণার আদলে গড়া। ব্রাহ্মণত্বের সূচক উপবীত-ধারণের মানসিকতাও সম্পূর্ণ নতুন। তবে এসব বিবরণে এও বলা হয়েছে যে, কেউ কেউ মাত্র পৈতে পরত। তাছাড়া হিন্দুপ্রভাবের অর্থ মোটেই এ নয় যে সাঁওতালরা তাদের দীর্ঘদিনের সব দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করেছে। মহাদেব, মাকালী, দুর্গা ইত্যাদির পাশাপাশি ঠাকুর জিউ, চান্দো (সূর্য বা চন্দ্র), মারাঙ্গ বুরু'র উপাসনাও বজায় ছিল। (তবে দুর্গাপূজা সাঁওতাল অঞ্চলে মোটেই নতুন নয়)।

(ঙ) সমাজ ও ধর্মসংস্কারের মূল ধারণাগুলির উৎস হিসেবে 'বৈষ্ণবগুরু'দের সঙ্গে সংযোগের কথা বলা হয়েছে। সরকারি আমলার প্রতিবেদনানুযায়ী, এরা সবাই

'অত্যন্ত নীচু জাতের হিন্দু'। এসব অঞ্চলে বৈষ্ণবগুরুদের আনাগোনা মোটেই নতুন ঘটনা নয়। আসলে বৈষ্ণবদের একটা সম্প্রদায় এভাবে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াত; কোনো নির্দিষ্ট গ্রামে বা লোকালয়ে তাদের প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল না। 'গৃহী বৈষ্ণব'দের প্রভাবের ধারা ছিল ভিন্ন।[৩১] সংস্কারের মূল প্রেরণা সাঁওতাল সমাজের মধ্য থেকেই এসেছে; বৈষ্ণবগুরুরা এ নতুন ধারণাগুলির মাধ্যম মাত্র।

(চ) এ জন্যই সাঁওতাল সমাজ বৈষ্ণব প্রচারকদের 'গুরু' বলে ডাকত; কিন্তু বৃহত্তর খেরওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় কখনও তাদের দেখি না। ভগীরথ যে অর্থে নেতা, দুবিয়া গোঁসাই সে অর্থে নয়। নেতারা স্বেচ্ছায় আন্দোলনের সঙ্গে বৈষ্ণবগুরুদের সংযুক্ত করতে চেয়েছিল। যেমন বাউসীর হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের 'অভিষেকে' এক বৈষ্ণবগুরুর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল।

৪.২

আমরা আগে উল্লেখ করেছি 'হিন্দু'-প্রভাব বলতে আরও ব্যাপক পরিবর্তনের কথাও বলা হয়েছে। যেমন, নানাভাবে আদিবাসীরা বর্ণাশ্রম ও জাতিপ্রথার কাঠামোয় গড়ে উঠা হিন্দুসমাজে অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। বিশিষ্ট এক সরকারি আমলা রিজলী তাঁর The Tribes and Castes of Bengal (১৮৯১) গ্রন্থে হিন্দুপ্রভাবের সেসব দৃষ্টান্তই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[৩২] ১৯১৫ সালে প্রকাশিত একটা লেখায় তিনি আরও স্পষ্টভাষায় এ কথা বলেছেন : 'বর্তমান সময়ে গোটা ভারতবর্ষে আদিবাসীরা আস্তে আস্তে এবং তাদের অজ্ঞাতসারে 'জাতি'তে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।[৩৩] নৃতত্ত্ববিদরা এ পরিবর্তনের প্রবণতা স্বীকার করেছেন। তবে পরিবর্তনের ব্যাপকতা এবং অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে ভিন্ন মত আছে। যেমন, Ghuriye আদিবাসীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে 'তথা-কথিত' আদিবাসীরা আসলে হিন্দু 'উপজাতি' (Sub-castes), 'অনগ্রসর হিন্দু' (backward Hindus)। অর্থাৎ, তার ধারণায় আদিবাসীরা নিশ্চিতভাবে হিন্দু-জাতিপ্রথার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে।[৩৫] নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকেই এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানেন না। তাদের মতে, হিন্দুমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকলেও হিন্দুপ্রভাবের ফলে আদিবাসী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নির্মলকুমার বসু মনে করেন এর কারণ, হিন্দুসমাজ এক বিশিষ্ট পদ্ধতিতে

আদিবাসীদের স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে; তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জোর করে আদিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয়নি।[৩৫] মার্টিন ওরান্স, সুরজিৎ সিংহ এবং আরও কেউ কেউ বলেছেন, 'দীর্ঘদিনের সংযোগের ফলে আদিবাসীরা হিন্দু সংস্কৃতির অনেক কিছু গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও তারা নানাভাবে প্রয়াসী হয়েছে।[৩৬]

৫

আদিবাসী সমাজের উপর হিন্দুপ্রভাব সম্পর্কিত আলোচনায় দুটি বিশেষ প্রবণতার কথা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এ প্রবণতাগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হিন্দুপ্রভাবের চরিত্র এবং তাৎপর্য সম্পর্কে কয়েকটা ধারণা গড়ে উঠেছে। এ নিবন্ধের পরবর্তী অংশগুলিতে আমরা এ রকম কয়েকটা ধারণার সারবত্তা বিচার করব।

এ ধারণাগুলির তথাগত ভিত্তি বিশ্লেষণের আগে আমরা সংক্ষেপে আমাদের বিচারের পদ্ধতি নির্দেশ করব।

দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকার ফলে আদিবাসী সমাজে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়, এ ঘটনা যেন স্বয়ংক্রিয়, স্বতঃসিদ্ধ এবং অনিবার্য। এ ঘটনার বিশ্লেষণে একটা কথা প্রায়ই অনুল্লিখিত থাকে। তা হল, হিন্দু সংস্কৃতির কোনো কোনো উপাদান গ্রহণে আদিবাসীদের এক সচেতন মানসিকতা (subjectivity, will) সক্রিয় ছিল। তাই আমরা দেখি, হিন্দু সংস্কৃতির সব দিক গ্রহণ করা হয়নি; আদিবাসী জগতের সব গোষ্ঠী একইভাবে এ গ্রহণে আগ্রহীও ছিল না[৩৭]; বিশেষ কোনো কোনো ঐতিহাসিক এবং পরিবর্তিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ প্রবণতা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়ে গেছে। একই কারণে হিন্দু-প্রভাবের তাৎপর্য এটা ছিল না যে, এর ফলে সবক্ষেত্রে আদিবাসীরা অনিবার্যভাবে হিন্দু জাতি ও বর্ণপ্রথায় অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এমনও হয়েছে, এ প্রভাব সত্ত্বেও আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি চেতনা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।

৬

আমরা প্রশাসনিক আমলা ও পেশাদার নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা ও সিদ্ধান্ত আলাদাভাবে আলোচনা করব।

ধরতে গেলে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত (এবং তার পরেও) আদিবাসী সমাজে হিন্দু-প্রভাবের রূপ-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যের একটা প্রধান উৎস সরকারি আমলাদের বিবরণ। সব বিবরণীর উপলক্ষ এক নয়, যদিও সবগুলি প্রশাসনিক প্রয়োজনে লেখা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ প্রয়োজন আশু এবং প্রত্যক্ষ। যেমন আদিবাসী জগতে নানা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনকে বোঝার চেষ্টা হিসেবে ওখানকার সমাজ ও সংস্কৃতি আমলাদের নজরে আসে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এ প্রয়োজন এরকম প্রত্যক্ষ নয়। সংগঠিত আন্দোলন না থাকলেও নানা কারণে আদিবাসী সমাজের নানা দিক বোঝা প্রশাসনের পক্ষে জরুরি ছিল।

কালানুক্রমে সাজালে আমলাদের বিবরণী থেকে ঔপনিবেশিক আমলে আদিবাসী সমাজে হিন্দুপ্রভাব বিস্তারের চরিত্র সম্পর্কে কয়েকটা সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করা যায়।

(ক) ভূমিজ আন্দোলন (১৮৩২-৩৩)[৩৮] সংক্রান্ত সরকারি দলিল থেকে ভূমিজ সমাজে হিন্দুপ্রভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে স্থানীয় আমলাদের একটা ধারণা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তা হল, এ প্রভাব এত ব্যাপক এবং গভীর যে আদিবাসী হিসেবে ভূমিজদের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রায় লোপ পেয়েছিল। এ প্রভাবের ইতিহাস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি; তবে মনে হয়, আমলাদের ধারণা ছিল এর প্রক্রিয়া বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ভূমিজ সংস্কৃতি সম্পর্কিত পরবর্তী সব সরকারি রিপোর্টে হিন্দু প্রভাবের ব্যাপকতার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

(খ) তুলনায় মুণ্ডা সমাজে হিন্দু-প্রভাবকে সরকারি আমলারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি; অন্তত মুণ্ডা ('কোল') বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত (১৮৩১–৩২)। তাদের মতে, এ প্রভাব প্রধানত নাগবংশী মুণ্ডারাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। (সরকারি মহলে, একটা প্রচলিত ধারণা ছিল, নাগবংশী পরিবার আসলে মুণ্ডাজগতের এক প্রভাবশালী 'মানকি'-পদাধিকারী পরিবার)।[৩৯]

(গ) প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-৫৬) সরকারি বিবরণে সাঁওতাল সমাজে হিন্দু-প্রভাবের কোনো কোনো নিদর্শনের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ প্রভাবের

চরিত্র বা তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য নেই। বস্তুত, আমলাদের নানা ধরনের লেখা থেকে মনে হয়, ১৮৬০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল অঞ্চলে হিন্দু-প্রভাবের প্রসার সম্পর্কে তারা মোটেই ওয়াকিবহাল ছিল না।

(ঘ) পরবর্তী সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসী আন্দোলন (১৮৭০-১৯৩২)[৪০] সম্পর্কিত আমলাদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা প্রথম বুঝতে পারি, এ অঞ্চলে, সমাজের নানা স্তরে, হিন্দু-প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক হয়ে গেছে।

(ঙ) আমরা আগেই বলেছি, আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে আমলাদের অনুসন্ধিৎসার কারণ শুধুমাত্র ওখানকার সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনকে বোঝার প্রয়াস নয়; প্রশাসনিক প্রয়োজনের অন্যান্য দিকও ছিল। তাছাড়া একান্ত প্রত্যক্ষ এ প্রয়োজনের চৌহদ্দির মধ্যেই এ অনুসন্ধান সীমিত ছিল না। ১৮৭০-এর দশক থেকে আমলাদের নানা রচনায় এর প্রমাণ মেলে। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িক নৃতত্ত্ববিদ্যার তাত্ত্বিক এবং পদ্ধতিগত দিকের সঙ্গে তাদের কেউ কেউ সম্যক পরিচিত ছিল। তাই হিন্দু আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে তারা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পেরেছে। অবশ্য তাদের অনুসন্ধানের পদ্ধতি পরবর্তী পেশাদার নৃতত্ত্ববিদদের মতো নয়। কোনো নির্দিষ্ট আদিবাসী এলাকায় গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তারা সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ করেনি। তাদের অধস্তন রাজপুরুষদের কাছে নানা বিষয় নিয়ে জানতে চেয়ে তারা প্রশ্নাবলী পাঠিয়েছিল। এ সম্পর্কিত উত্তরই ছিল তাদের আলোচনার প্রধান উপকরণ।

৭

ভূমিজ সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রথম সরকারি বিবরণ মেলে ১৮৩৩ সালে। এটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ভূমিজ বিদ্রোহের (১৮৩২-৩৩) উপর স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিবেদনের অংশ।[৪১] বিদ্রোহের গতি প্রকৃতির সঙ্গে ভূমিজ সংস্কৃতির কোনো প্রত্যক্ষ যোগের কথা এতে বলা হয়নি। বিদ্রোহের মূলকারণগুলি অনুসন্ধানের ব্যাপারে প্রশাসন অনেক বেশি যত্নশীল ছিল। ভূমিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে উল্লেখ সংক্ষিপ্ত।

সরকারি বিবরণ থেকে মনে হয়, ভূমিজ-সমাজে হিন্দুপ্রভাব সর্বত্র একরকম ছিল না। কয়েকটা অঞ্চলে তার ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয় যেমন—বড়ভূম, ধলভূম

এবং বড়ভূমের পূর্বপ্রান্তস্থিত মানভূমে। হিন্দুপ্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে ১৮৩৩ সালের বিবরণীতে কী বলা হয়েছিল তা পরিষ্কার বোঝা দরকার। কারণ, ভূমিজদের সম্পর্কে পরবর্তী কয়েকটা সরকারি রিপোর্টে এর উল্লেখ আছে। হিন্দু প্রভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ভিত্তি বিচারযোগ্য।

আমরা তাই সরকারি বিবরণীর প্রাসঙ্গিক অংশ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি। 'বড়ভূমের অধিবাসীরা প্রধানত ভূমিজ। কুর্মি, সাঁওতাল এবং অন্যান্য নীচু জাতের লোকেরাও আছে, তবে সংখ্যায় কম! তাছাড়া আছে স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বানিয়া (Bania Traders) এবং মুসলমান . . . শারীরিক গঠনের দিক থেকে কোলদের সঙ্গে তাদের মিল আছে; কোলদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও আছে। এর থেকে মনে হয়, তাদের আদিপুরুষ এক। ভূমিজ ধর্ম সম্পর্কে সঠিক বলার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান আমার নেই। তারা বলে, তারা হিন্দু। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের কোনো ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতের কাজ করে না। ধর্মকর্মের জন্য তাদের মন্দির জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। তাদের পুজোর জায়গা গ্রামের কাছাকাছি বড় কোনো গাছ বা ঝোপের তলা। সেখানে আছে বিশাল পাথরের এক চাঁই। লাল রঙ-মাখানো এ পাথরকে তারা বলে বুরু-কা-থান। [বুরু = সর্বশক্তিমান ভগবান, মারাং বুরু; থান = স্থান। 'বুরু-কা-থানে'র অর্থ তাই ভগবানের উপাসনার জায়গা।] তাদের নানা পালে-পার্বণে পুরোহিতের কাজ করে নায়া (Nya)। [সাঁওতাল অঞ্চলে এ পূজারী পুরোহিতের নাম নায়েক: Naik, Naike] বছরে তিনটি প্রধান পার্বণ। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল সুরুলপূজা। সময় বৈশাখ মাস, চাষবাসের কাজ শুরু হবার আগে। এ উপলক্ষে ঢালাও খাওয়া-দাওয়া আর নাচের আয়োজন করা হয়। পুরুষ নারী একসঙ্গে এতে যোগ দেয়। সাধারণত গরুর মাংস খাওয়া তারা ছেড়ে দিয়েছে। কোলদের সঙ্গে তাদের এ বিষয়ে পার্থক্য। কিন্তু মোরগ-মুরগী আর ভেড়ার মাংস তারা বাদ দেয়নি। তারা মড়া পোড়ায়, কিন্তু শ্মশান থেকে হাড় কুড়িয়ে এনে আবার মাটিতে পোঁতে; একটা পাথর দিয়ে এ জায়গায় নিশানা চিহ্নিত করে। তাদের ভাষা বাঙ্গালা; আমি কিন্তু বড়ভূমে এমন কোনো ভূমিজ দেখিনি, যে বাঙ্গালা পড়তে ও লিখতে পারে। পশ্চিম দিকে সিংভূমের কাছাকাছি অঞ্চলে তাদের ভাষা হল 'তার' (Tur), যা আসলে কোলদের ভাষা।'[৪২]

সংক্ষিপ্ত হলেও আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। বড়ভূম এবং কাছাকাছি অঞ্চলে হিন্দু-প্রভাবের ব্যাপকতা অনস্বীকার্য; কিন্তু এ প্রভাবের সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্যণীয়।

তারা হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অংশ—ভূমিজদের এ ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ। তারা নির্দ্বিধায় নিজেদের হিন্দু বলেছে; অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায়, আদিবাসী হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রায় মুছে গেছে। যদিও তারা বাঙ্গালা পড়তে ও লিখতে পারে না, তারা এ ভাষায় কথা বলে। তাদের আদিভাষার প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপ অন্য সংস্কৃতির গভীর প্রভাবের নিশ্চিত প্রমাণ।

কিন্তু নিজেদের হিন্দু বললেও এবং অন্য ভাষা গ্রহণ করলেও নানা মৌলিক বিশ্বাসে ও আচারে বর্ণাশ্রমশাসিত হিন্দু-সমাজ থেকে তাদের ব্যবধান এবং দূরত্ব লক্ষ্যণীয়। যেমন, কোনো 'সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার' তাদের ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদিতে পুরোহিতের কাজ করবে না। কোনো কোনো নিম্নবর্ণ হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এটা দেখা গেছে। তাই পৌরোহিত্যের জন্য তারা বিশেষ কাউকে নিযুক্ত করত, যাদের পরিচয় সর্বত্র 'ব্রাহ্মণ' বলে। এটা আসলে ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের স্বীকৃতি। ভূমিজদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। 'সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ'কে তারা পুরোহিত হিসেবে পায়নি বলে, ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে অন্য কাউকেও তারা এ কাজের জন্য ডাকেনি। তাদের ধর্মানুষ্ঠানের জন্য 'পূজারী পুরোহিত' তাদের আদি গ্রামসমাজ-সংগঠনের অংশ—যেমন 'নায়া'। অনেক ক্ষেত্রে এরা ভূমিজ গ্রামপ্রধানও। এ সমাজ-সংগঠন দুর্বল হলেও 'নায়া'র বিশিষ্ট ভূমিকা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এটা লক্ষ্যণীয় যে এ 'পূজারী'—যেমন মুণ্ডা পাহান, বা সাঁওতাল নায়েক—আদিবাসীদের স্বীকৃত অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছুতে পৌরোহিত্য করত না। যেখানে আদিবাসী গ্রাম-সংগঠন অটুট ছিল, সেখানে এটাই ছিল প্রচলিত প্রথা। ভূমিজ গ্রামসংগঠন অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে গেলেও 'পূজারী'র জন্য বাইরের কাউকেও নিয়োগ করার কথা ভাবা হয়নি।

হিন্দু মন্দিরের মতো ভূমিজদের কোনো উপাসনাগার ছিল না। কিন্তু নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করলেও মন্দিরের মতো কোনো ইমারত বানায়নি। তাদের উপাসনার রীতি সম্পূর্ণ আদি ঐতিহ্যসম্মত। বড় কোনো 'পবিত্র' গাছের তলায় বিশাল পাথর বসিয়ে লাল রঙের প্রলেপ লাগিয়ে 'বুরু-কা-থান'

বানিয়েছে। তাদের সর্বশক্তিমান ভাগবানও তাদের দীর্ঘকালের 'বুরু'। তাছাড়া, মৃত্যু যেখানেই ঘটুক না কেন, পরিবারের মৃতজনের অস্থি নিজ গ্রামে এনে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে রাখা আদিবাসী জগতের নানা অঞ্চলে বহুল প্রচলিত একটা প্রথা। পোঁতার জায়গাকে পাথর রেখে দিয়ে চিহ্নিত করা, এবং এ পাথরের টুকরোকে অতি পবিত্র জ্ঞান করাও এক বিশিষ্ট আদিবাসী রীতি [৪২]।

ভূমিজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে আমলাদের পরবর্তী গবেষণাধর্মী রচনায়—যেমন ডাল্টন ও রিজলীর লেখায়—[৪৩] ১৮৩৩-এর বিবরণীর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। তাছাড়া ভূমিজ সমাজে হিন্দু প্রভাবের সীমাবদ্ধতার অন্য কয়েকটা দিকের কথাও আমরা তা থেকে জানতে পারি। বিশেষ করে রিজলীর লেখা থেকে। ডাল্টনও মনে করেন, আদিতে ভূমিজ এবং মুণ্ডা স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী ছিল না। স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে পরে, বিশেষ করে যখন একই গোষ্ঠীর দল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। 'ছোটনাগপুরের সীমানাবর্তী অঞ্চলে কোলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; তারা মুণ্ডা বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। আরও পূর্বদিকে যারা গিয়ে থেকেছে, তাদের নাম ভূমিজ... ছোটনাগপুরের কাছাকাছি জায়গায় যাদের বাস, তারা মুণ্ডাদের সঙ্গে কোনো পার্থক্যের কথা বলে না। তাদের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ; অন্যান্য নানা ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে যোগ এত নিবিড় যে, মনে হয় তারা আসলে এক জাতির লোক। আরও পূর্বাঞ্চলে হিন্দু-প্রভাব এত বেশি যে ভূমিজরা এ ধরনের সম্পর্ক অস্বীকার করে। ধলভূমের ভূমিজরা মনে করে তারা এখানকারই আদি লোক; মুণ্ডা, হো বা সাঁওতালদের সঙ্গে কোনোরকম সংযোগের অস্তিত্ব তারা মানে না। এটা নিশ্চিত বলা যায়, এ এলাকার নানা মহলের জমিদার ও ভূমিজরা একই জাতির লোক। ধলভূমের ভূমিজরা হিন্দুদের বেশ কয়েকটা উৎসব, পার্বণ গ্রহণ করেছে; কিন্তু তাদের ধর্মানুষ্ঠানের জায়গা এখনো আগেকার মতো, 'পবিত্র কুঞ্জ' [গাছের ঝোপ]; সেখানেই দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়' ডাল্টনের মতো রিজলীরও বিশ্বাস, 'ভূমিজরা আসলে মুণ্ডাদেরই একটা শাখা'। কিন্তু পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে সেখানকার হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ ঘটে, তাই আদিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগসূত্র হারিয়ে যায়। 'ভূমিজরা যত পূবদিকে এগিয়েছে, হিন্দুপ্রভাবও ক্রমেই বেড়েছে।' অযোধ্যা পাহাড় পর্যন্ত সুবর্ণরেখা নদীর উভয়তীরস্থ এলাকায় পশ্চিম মানভূমে

যে সব ভূমিজদের বাস, তারা 'নিঃসন্দেহে খাঁটি মুণ্ডা'। এ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে বিশেষ ধরনের অসংখ্য কবর, যাদের অস্তিত্ব মুণ্ডাদের বৈশিষ্ট্য। এর থেকে বোঝা যায়, মুণ্ডাদের আদিমতম বাসস্থানগুলির মধ্যে একটা ছিল এ অঞ্চল। 'অযোধ্যা পাহাড়ের পূর্বদিকে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।' বিস্তৃত পাহাড় থাকায় আনাগোনা স্বভাবতই কম ছিল। সে সব জায়গায় মুণ্ডাভাষা, এমনকি মুণ্ডানামও প্রায় হারিয়ে গেছে। 'এখানকার আদিবাসীরা নিজেদের ভূমিজ বা সর্দার বলে; বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে।'

রিজলীর একটা সিদ্ধান্ত আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা হল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভেদে ভূমিজ জগতে হিন্দুপ্রভাব বিস্তারের প্রকৃতিতে তারতম্য ঘটেছে। সামাজিক পদমর্যাদা বা ভূসম্পত্তির অধিকার যাদের বেশি, হিন্দুপ্রভাবও তাদের মধ্যে বেশি ব্যাপক।[৪৪] জমিদার এবং তাদের অধস্তন বিভিন্ন স্তরের স্বচ্ছল ভূস্বত্বাধিকারী[৪৫] নিজেদের পরিবারের ধর্মানুষ্ঠানে পুরোহিত হিসেবে ব্রাহ্মণদের ডাকে। তারা কালী এবং মহামায়ার উদ্দেশ্যে বলি দেয়। কিন্তু সাধারণ অবস্থার ভূমিজরা আগের মতোই নানা নামে সূর্যের উপাসনা করে—যেমন সিং বোঙ্গা বা ধর্মঠাকুর। কারণ সূর্যদেবতাই তো তাদের ফসল নিশ্চিত করে, আর নিয়ন্ত্রণ করে ঋতু পরিবর্তন, যার সঙ্গে সফল কৃষিকাজও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নানা ধরনের আঞ্চলিক দেবদেবীর পুজোও তারা করে। 'উচ্চবর্গের লোকেরা নিজেদের কাজের জন্য নিজেরাই ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে'; আঞ্চলিক লৌকিক দেবদেবীকে স্বীকার করে না। অন্যান্য ভূমিজ পরিবারের ধর্মানুষ্ঠানের রীতি আলাদা। ব্রাহ্মণ এখানে পুরোহিতের কাজ করত না। তাদের পুরোহিত ('লায়া', Laiya) আসলে 'অরণ্যের দেবদেবী'র পুজোর পূজারী। সাধারণ ভূমিজ পরিবারের ধর্মকর্ম এদের নির্দেশমতো হতো। মাঝে মাঝে তারাও ব্রাহ্মণদের ডাকত—যদি অবশ্য কোনো প্রচলিত হিন্দু দেবদেবীর পুজো হয়। কিন্তু স্থানীয় ব্রাহ্মণ মহলে এই দুই জাতের ব্রাহ্মণদের মর্যাদা সমান ছিল না। জমিদার বা অন্যান্য ভূস্বামী পরিবারের কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের পদমর্যাদা ছিল অনেক বেশি। তারা নিজেদের 'রাঢ়ী কুলিন' বলে পরিচয় দিত; আর এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণকুলের সবাই তাদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন বলে স্বীকার করত। কিন্তু সাধারণ ভূমিজ

পরিবারের কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের 'পতিত ব্রাহ্মণ' বলে গণ্য করা হত; 'তারা ছিল কুর্মি বা ধোপাদের ব্রাহ্মণ'।

সামাজিক শ্রেণিভেদে হিন্দু প্রভাবের এ রকমফের রিজলী কিন্তু তার বইয়ের দীর্ঘ ভূমিকায়[৪৬] স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। এখানে বরং নানা হিন্দু প্রভাবকে তিনি ভূমিজদের 'হিন্দুজাতিতে' অনিবার্য রূপান্তরের অপরিহার্য নানা ক্রম বলে ধরে নিয়েছেন। রিজলীর এ বিশ্লেষণ উদ্ধৃতিযোগ্য : 'এখানকার এক খাঁটি দ্রাবিড় গোষ্ঠী তাদের আদিভাষা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে; এখন তারা শুধু বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলে। নিজেদের দেবদেবী ছাড়া তারা হিন্দু দেবদেবীর পুজোও করে। একটা লক্ষ্যণীয় প্রবণতা হল এই যে, আদিবাসী দেবদেবীর পুজোর ভার নারীদের উপর ন্যস্ত। সাঁওতাল ও মুণ্ডাসমাজের মতো এখানেও 'টোটেম'-বিশ্বাস-নিয়ন্ত্রিত গোত্র বিভাগের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু, এসব নানা টোটেমের নাম ভূমিজরা ভুলতে বসেছে। সম্ভবত টোটেমের এ নামগুলি হারিয়ে যাবে, আর তাদের বদলে এখানকার অভিজাত গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নতুন নামের প্রচলন হবে। ফলে অতি প্রাচীন আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রকৃত অর্থে 'জাতি'তে রূপান্তরিত হবে। আর তাদের উৎপত্তি ও আদি ইতিহাসের পরিচায়ক নানা রীতি আচার তারা সম্পূর্ণ বর্জন করবে।'

৭.১

ভূমিজ সমাজের তুলনায় মুণ্ডাসমাজে হিন্দুপ্রভাব আরও বেশি সীমাবদ্ধ, অন্তত ভূমিজ-বিদ্রোহের সমসাময়িক ঘটনা 'কোল' বিদ্রোহ পর্যন্ত (১৮৩১-৩২)। এ বিদ্রোহের কারণ সংক্রান্ত সরকারি বিশ্লেষণে হিন্দু-প্রভাবের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। বিদ্রোহীদের কোনো কোনো কার্যকলাপের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ উল্লেখ। যেমন মুণ্ডা নাগবংশী রাজপরিবারের কারো কারোর[৪৮] বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের আক্রোশ সুপরিকল্পিত হিংসা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। এ ব্যাখ্যায় মুণ্ডা রাজপরিবারের হিন্দু ধর্মের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঝোঁকের কথা বলা হয়েছে। এর একটা ফল, মুণ্ডারাষ্ট্রের শাসনকার্যের নানা স্তরে মুণ্ডা সমাজ বহির্ভূত লোকের প্রাধান্য বাড়তে থাকে; মুণ্ডাদের চাষের জমি ও অন্যান্য গ্রামীণ সম্পদের একাংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কিন্তু কোল বিদ্রোহের

সময় পর্যন্ত হিন্দু প্রভাব প্রধানত রাজপরিবার এবং তাদের অনুগ্রহভাজনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুণ্ডা অঞ্চলের কোথাও কোথাও (যেমন পাঁচ পরগণায়) বৈষ্ণব প্রভাবের প্রমাণ অন্য সূত্র থেকে পাই।[৪৯] তবে সামগ্রিক আদিবাসী সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে এ প্রভাব নিতান্তই নগণ্য মনে হয়।

আসলে হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও রাজপরিবার এর প্রচারের জন্য বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেয়নি। কারণ এ আকর্ষণের উৎস কোনো বিশেষ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নয়; হিন্দু-মুখিতা খানিকটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি-প্রণোদিত। নাগবংশী পরিবার চেয়েছিল তারা যে আদিতে মুণ্ডা ছিল এ সত্যটা চাপা পড়ুক; তারা হিন্দু ক্ষাত্র ঐতিহ্যের ধারক—এ কল্পিত ধারণার ভিত্তিতে তারা নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এ ধারণার সৃষ্টি ও প্রচারে আসল সহায় ছিল ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী। তারা বানাল মিথ্যা কুলপঞ্জী, যাতে কল্পিত কোনো রাজপুত রাজবংশের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। (আসলে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও রাজনৈতিক ক্ষমতা সুনিশ্চিত করার কৌশল হিসেবে এ ধরনের কুলপঞ্জী তৈরি করার নজির আছে। নৃতত্ত্ববিদরা একে বলেন Mythical calendar)। রাজপরিবার ও তার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল আমলা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুণ্ডাসমাজের ক্রমবর্ধমান বিরূপতা এ মিথ্যার আশ্রয় নেবার প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

৭.২

আমাদের নির্বাচিত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির—সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও এবং হো—উপর হিন্দু-প্রভাবের প্রকৃতি সম্পর্কিত আমলাদের পরবর্তী আলোচনার মূল বৈশিষ্ট্য একটু পরেই নির্দেশ করব। আর একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য তার আগে উল্লেখ করতে চাই। ১৮৭০-এর দশক থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে হিন্দু প্রভাবের দ্রুত প্রসার সম্পর্কে সচেতনতা এবং কৌতূহল বাড়তে থাকে। এ ঘটনার নানা আখ্যা তাদের রচনাতে পাই! কেউ কেউ বলেছে, আদিবাসীরা 'হিন্দু' হয়ে যাচ্ছে (Hinduized)। কেউ কেউ 'হিন্দু' এবং 'ব্রাহ্মণ' শব্দ দুটিকে সমার্থক মনে করে এ ঘটনাকে 'ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বিস্তার' (Brahmanization) বলে বর্ণনা করেছে। এখানে হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির গড়নে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব-

বহির্ভুত লৌকিক ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির নানা বিশিষ্ট উপাদানের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

ডাল্টনের বিখ্যাত বই-এর (Descriptive Ethnology of Bengal) প্রকাশকাল ১৮৭২ সাল। তিনি অবশ্য হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কোনো পরিবর্তনের কথা বলছেন না। তবে আদিবাসীদের শ্রেণি বিভাজন বিষয়ে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিতে তাদের সম্পর্কে সরকারি মহলে নতুন অনুসন্ধিৎসা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়।[৫০] তাঁর মতে, আদিবাসীদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট ভাগ লক্ষ্যণীয়—খাঁটি আদিবাসী আর হিন্দু-আদিবাসী (Hinduized aborigines) 'হিন্দু-আদিবাসীদের' তিনি 'ভেঙ্গে-যাওয়া' (broken) আদিবাসী গোষ্ঠী বলেও বলেছেন। দুটি নিয়মের ভিত্তিতে ডাল্টন আদিবাসীদের ভাগ করেছেন : ভাষা এবং হিন্দু-প্রভাবের ব্যাপকতা। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, এ দুটি নিয়ম সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র নয়। অন্তত আদিবাসী-হিন্দু সম্পর্কের ক্ষেত্রে। তাঁর মতে : 'এটা লক্ষ্যণীয় যে, ভাষায় পরিবর্তন ধর্মীয় প্রভাবের ফলেই ঘটেছে। যে সব আদিবাসী ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু হয়ে গেছে, তারা তাদের আদিভাষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে; ভাঙ্গা আঞ্চলিক কোনো হিন্দি বুলিতে তারা এখন কথা বলে' (speak a rude dialect of Hindi)। হিন্দু আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তিনি এভাবে নির্দেশ করেছেন : তাদের কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা গোড়ায় সহজ মনে হয়না; 'তারা তাদের আদিভাষা ভুলে গেছে, তাদের গোড়ার ইতিহাস অবিকৃত রাখেনি (mystified their early history); আচার এবং ধর্মের বিষয়ে তারা বেশ হিন্দুভাবাপন্ন। নিজ ঐতিহ্য থেকে তাদের প্রধানতম বিচ্যুতি ঘটেছে ভাষার ক্ষেত্রে।

প্রশাসনিক মহলে অনেকেই হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বিস্তার বলতে আসলে সমসাময়িক ঘটনাকেই বুঝিয়েছে। সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলন (১৮৭৪–৮২) সম্পর্কে আমলাদের বিবরণীতে 'হিন্দু প্রভাবে'র কথা বার বার বলা হয়েছে। আগেই আমরা এর উল্লেখ করেছি। এখানে হিন্দু প্রভাবের অর্থ—কীভাবে সাঁওতালরা নিজেদের 'শুদ্ধি'র উপায় হিসেবে নানা হিন্দু-বিশ্বাস ও আচার সাগ্রহে গ্রহণ করছে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত একটি রচনায় আলফ্রেড লায়াল (Alfred Lyall) হিন্দু প্রভাবের তাৎপর্য বোঝাতে বলেছেন কীভাবে

নানা 'আদিম জনগোষ্ঠী, অনার্য জাতি এবং বর্ণজাতিহীন ('Casteless') আদিবাসীরা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের আওতায় চলে আসছে।'[৫১] ১৮৮৪ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসন ভারত সরকারের কাছে লেখা একটা চিঠিতে এ প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে। '১৮৮১-র আদমশুমারি থেকে বোঝা যায় কী দ্রুত গতিতে আদিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং কী ভাবে আদিমজাতিকুল বিপুল হিন্দু-ব্যবস্থার ('great system of Hinduism') অঙ্গীভূত হয়ে পড়ছে।'[৫২]

এ পরিবর্তনের নিপুণতম বিশ্লেষণ প্রথম আমরা পাই রিজলীর লেখায়,[৫৫] এর জটিলতা এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবত তিনিই প্রথম আলোচনা করেন। তার দেওয়া দৃষ্টান্তগুলি এক বিশেষ ধরনের। এখানে আদিবাসীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে 'হিন্দু' হয়ে গেছে। তিনি চারটি 'প্রক্রিয়া'র কথা বলেছেন।

প্রথম প্রক্রিয়াটি একটু আলাদা ধরনের। এখানে হিন্দু-সংস্কৃতির কোনো কোনো দিক অনুকরণে প্রধান উদ্যোগ ছিল ক্ষমতাবান ভূস্বামীদের ('independent landed proprietors')। আদিতে এরা সবাই ছিল অদিবাসী। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বা গ্রামের যৌথ সমাজ-সংগঠনে তাদের ভূমিকা আস্তে আস্তে পাল্টে যায়। ওই পরির্তনের একটা প্রধান কারণ অদিবাসী জগতে 'রাষ্ট্রশক্তি'র আবির্ভাব এবং বিকাশ। গ্রামের উপর এ নতুন 'রাষ্ট্রের' কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য নানা ব্যবস্থার সঙ্গে তারা যুক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের নিজ গ্রাম বা কাছাকাছি গ্রামসমষ্টির উপর তাদের নিজস্ব ক্ষমতাও বাড়ে; পুরানো গ্রাম-সংগঠন থেকে তারা ক্রমেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে। গ্রামের জমি বা অন্যান্য নানা সম্পদের একাংশও তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এভাবে আস্তে আস্তে তারা ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু-সংস্কৃতিতে আগ্রহ আসলে তাদের এ ক্ষমতা বজায় রাখার কৌশল মাত্র। এ কৌশল হল, আদিবাসী গ্রামের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এ নেপথ্য ইতিহাস যাতে গ্রামের লোকেরা ভুলে যায়। এটা অংশত সম্ভব হয়, যদি তারা দেখাতে পারে, এ ক্ষমতালাভের ইতিহাস আলাদা। যেমন, যদি তারা প্রমাণ করতে পারে তারা আদৌ আদিবাসী গ্রামের লোক ছিল না; বাইরের লোক, এবং প্রতাপশালী লোক; এর জোরেই তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এ ছলনা বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের নানা ফন্দি বাতলাতে হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান

একটা হল, মিথ্যা ইতিহাস বানিয়ে ক্ষমতাবান কোনো হিন্দু রাজপরিবারের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী রক্তের সম্পর্কের অকাট্য প্রমাণ সৃষ্টি করা।

রিজলী এ সুপরিকল্পিত প্রবঞ্চনার বিভিন্ন ধাপ নির্দেশ করেছেন: গোড়ায় তারা নিজেদের রাজপুত বলে জাহির করে। এর জন্য প্রথম দরকার কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে কাজে লাগানো। সে তাদের পরিবারের কোনো কল্পিত আদিপুরুষের নাম বানায়; এ পরিবারকে ঘিরে অলৌকিক নানা কল্পিত ঘটনার গল্প ফাঁদে; বলে, যে আদিবাসী গ্রামে এ পরিবারের দীর্ঘদিন বাস, সেখানেই এ সব ঘটনা ঘটেছে; সে আরও বলে বেড়ায়, এ পরিবার আসলে প্রখ্যাত রাজপুতকুলের সঙ্গে সম্পর্কিত; এজন্য এমন কোনো রাজপুত গোত্রের কথা বলে, যার নামই কেউ কখনও শোনেনি। এ পরিবারের আরোপিত মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরও নতুন ফন্দি বাৎলানো হল। যেমন, বিশেষ ধরনের বৈবাহিক সম্বন্ধ; অবশ্যই আদিবাসী সমাজের বাইরে। খাঁটি কোনো রাজপুত পরিবারের সঙ্গে এ সম্পর্ক স্থাপন নিঃসন্দেহে শ্রেয়তম; না হলে দ্বিতীয় বিকল্প এমন কোনো পরিবার যারা নিজেরাই নানা কপট কৌশলে রাজপুত বলে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। হয়ত এ স্বীকৃতির ঘটনা এতকাল আগে ঘটেছে যে, লোকে এসব ছলাকলার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। খাঁটি রাজপুত পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নাই বা হল; অন্তত এসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী আদিবাসী-ভূস্বামীদের আদিবাসী হিসেবে পরিচয় তো ঘুচল। 'বিশুদ্ধ রক্তের' হিন্দুদের থেকে তাদের তফাত করার বা তাদের অনার্য আখ্যা দেবার উপায় থাকল না। ফলে তারা সম্পূর্ণ অর্থে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেল এবং স্থানীয় সমাজও তাদের উচ্চবর্ণের হিন্দু বলে মেনে নিল। রিজলীর ধারণা, ছোটনাগপুরের প্রধান প্রধান অনেক পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করলে এ রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের নিদর্শন মিলবে। অদিবাসীদের হিন্দু বনে যাওয়ার অন্য তিনটি 'প্রক্রিয়া' স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে বিত্তবান, প্রতাপশালী ভূস্বামীদের মতো সংখ্যায় নগণ্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যোগ ছিল না।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, এখানে উদ্যোগী আদিবাসীরা সাধারণ অবস্থার লোক। যে কোন কারণেই হোক তাদের একটা অংশ কোনো না কোনো হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ে (sect) যোগ দেয় যেমন বৈষ্ণব, রামায়েত

(Ramayat) ইত্যাদি। এদের নতুন ধর্মবিশ্বাস এ বিশিষ্ট সম্প্রদায়-প্রচারিত বিশ্বাস; প্রচলিত হিন্দু বিশ্বাস বা আচারের বিশৃঙ্খল সমাহার নয়, এখানে বিশ্বাস ও আচরণবিধি অনেক সুবিন্যস্ত। এ নতুন সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীরা তাদের পুরানো সমাজ থেকে আস্তে আস্তে অনেক দূরে সরে আসে। সম্প্রদায়ের রূপ যাই হোক তারা ক্রমে হিন্দু সমাজে মিশে যায়।

তৃতীয় প্রক্রিয়া নানা দিক থেকে এর থেকে আলাদা। এখানে হিন্দু মর্যাদা পাবার জন্য আগ্রহী আদিবাসীর সংখ্যা সচরাচর অনেক বেশি। একটি গোটা আদিবাসী গোষ্ঠী বা এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এক সঙ্গে হিন্দু হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দুদের প্রচলিত নানা জাতির কোনোটাকেই তারা গ্রহণ করেনি। তারা নতুন 'জাতি' (Caste) হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিল। যেমন রংপুরের (এবং পাশাপাশি এলাকার) কোচরা হিন্দু হল বটে; কিন্তু নতুন জাতি হিসেবে 'রাজবংশী' বা 'ভঙ্গ ক্ষত্রিয়' এ নতুন নাম বেছে নিল। এ নতুন জাতিত্বের দাবির সমর্থনে তারা বলল, তারা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলবাসী ক্ষত্রিয় সমাজের অংশ; ক্ষত্রিয়কুলবিনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরশুরামের আক্রোশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা বাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পালিয়ে এসেছিল। স্বতন্ত্র জাতিত্বের কথা বললেও ধর্মকর্ম বা বিবাহাদি অনুষ্ঠানে তারা প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য রীতিকেই অনুসরণ করেছে। ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণরাই পুরোহিতের কাজ করে। বিবাহের নানা মঙ্গলাচার প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্য-আচার। গোত্র ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণদের অনুরূপ।

চতুর্থ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তস্বরূপ রিজলী পশ্চিবঙ্গের ভূমিজদের হিন্দুতে রূপান্তরের কথা বলেছেন। এর আলোচনা আমরা আগেই করেছি। তৃতীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর একটা পার্থক্য বিশিষ্ট। কোচদের মতো ভূমিজরা আলাদা নতুন কোনো জাতি বানায়নি। পুরানো আদিবাসী আখ্যা 'ভূমিজ'ও বর্জন করেনি।

৭.৩

এই চারটি 'প্রক্রিয়া'র্ নানা দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় কীভাবে আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন স্তরে হিন্দুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু রিজলীর বিশ্লেষণ থেকে এ সিদ্ধান্ত কি যথার্থ হবে যে, এ প্রভাবের ফলে সবক্ষেত্রে আদিবাসী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য মুছে যাচ্ছিল?

অন্তত প্রথম এবং চতুর্থ, এ দুটি প্রক্রিয়ার বিশিষ্ট ধরনের উদ্ভব এই প্রভাবের সীমাবদ্ধতা সূচিত করে। এখানে আদিবাসী সমাজের একান্তই ক্ষুদ্র কোনো কোনো গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার কৌশল হিসেবে নানা রাজপুত রাজবংশের সঙ্গে তাদের জন্মগত যোগের অলীক কাহিনী প্রচার করে, যে কাহিনীর বয়ান বানিয়েছিল তাদের অনুগ্রহপ্রার্থী একান্ত বশম্বদ ব্রাহ্মণকুল। কোনো বিশেষ হিন্দু ধর্মীয় এবং নৈতিক বিশ্বাস তাদের সামগ্রিক জীবন-চর্চাকে প্রভাবিত করেনি; স্বভাবতই আদিবাসী জনগণের মধ্যে এসব বিশ্বাসের প্রচারে তাদের কোনো উদ্যোগ ছিল না। সম্ভবত তাদের ধারণা ছিল, বৃহত্তর আদিবাসী সমাজের সঙ্গে তাদের দুস্তর সাংস্কৃতিক ব্যবধানের মিথ্যা কুহক বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলে তাদের কর্তৃত্বের ভিত্তি দৃঢ় হবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার সামাজিক ভিত্তি অনেক বেশি ব্যাপক। এবং কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আচরণবিধি অনুসরণে উদ্যোগী আদিবাসীদের আন্তরিকতা এক্ষেত্রে সন্দেহাতীত। তবে রিজলী স্পষ্ট করে বলেননি, আমাদের নির্বাচিত অঞ্চলের কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে কিনা। আমরা আগে সাঁওতালদের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব প্রসারের কথা বলেছি। কিন্তু এর ফলে সাঁওতালরা তাদের আদি ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ বর্জন করে কোনো ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হতে চায়নি। আমরা পরে দেখব, এ বর্জনের ব্যাপকতা সব চাইতে বেশি ছিল ওরাঁওদের মধ্যে। কিন্তু কোথাও তারা ওরাঁও হিসেবে তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হয়নি। কোথাও বা যদি দলবদ্ধ হয়ে আদিবাসীরা কোনো হিন্দু 'সেক্টে' (sect) যোগ দিয়ে থাকে, তা সম্ভবত ক্ষুদ্র কোনো এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। তুলনায় রাজবংশী আন্দোলন যাকে রিজলী তৃতীয় প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এক বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে হিন্দুবর্ণপ্রথার চৌহদ্দির মধ্যে নতুন জাতিত্বের মর্যাদা লাভের প্রয়াসও অনেকটা সফল হয়েছিল। অন্তত এখানকার আদিবাসীদের একটা বড় অংশই[৫৫] নিজেদের আদিপরিচয় ক্রমেই অস্বীকার করে। এবং এর বদলে 'রাজবংশী' অভিধার প্রকাশ্য ঘোষণায় অনুভব করে এক বিশেষ গর্ব। তাদের মানসিকতায় এ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে দেখা গেল দীর্ঘকাল কোচ নামে

অভিহিত আদিবাসীরা লোকগণকদের কাছে ওই পরিচয়ই দিল না, এমনকি কোচ প্রধান অঞ্চল কুচবিহারেও।[৫৬] অবশ্য এর মধ্যে আত্ম-প্রবঞ্চনার উপাদান বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাদের দাবি ছিল ক্ষত্রিয়ত্বের। বর্ণাশ্রম-শাসিত হিন্দু সমাজ তাদের হিন্দু বলে গ্রহণ করলেও তাদের অভিপ্রেত মর্যাদা স্বীকার করেনি। এ সমাজে তাদের স্থান ছিল নীচুতে।[৫৭] উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের হাত থেকে রান্না খাবার নিত না, আর একই হুঁকোয় তামাক খেত না। দার্জিলিং তরাইয়ে, যেখানে বিপুলসংখ্যক রাজবংশীর বাস, বর্ণহিন্দুরা তাদের হাতের ছোঁয়া জল খেত বটে; কিন্তু রিজলীর মতে তা একটা ব্যতিক্রম মাত্র; স্থানীয় অবস্থাভেদে।

অধিকাংশ রাজবংশী যে জাতে উঠতে পারেনি তার একটা সম্ভাব্য কারণ তাদের চরম আর্থিক দৈন্য। প্রধানত কৃষিজীবী হলেও জমিতে স্থায়ী দখলীস্বত্ব খুব কম জনেরই ছিল। এদের মধ্যে দরিদ্রতম গোষ্ঠীরা হল বিভিন্ন ধরনের ভাগচাষী (যেমন আধিয়ার) বা একেবারে নিঃস্ব ভূমিহীন দিনমজুর। বিত্তবান রাজবংশী 'জমিদার'ও ছিল; কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, 'এসব আদি রাজবংশী পরিবার বেশ কিছুকাল আগে 'রাজপুত' পদমর্যাদা-অধিকারী গোষ্ঠীতে উন্নীত হয়ে গেছে।'[৫৮]

রিজলী এবং আরও অনেকের মতে 'রাজবংশী আন্দোলন' মূলত তথাকথিত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ সিদ্ধান্ত কি যথার্থ? আদিবাসী জগতে হিন্দুপ্রভাবের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এ প্রশ্নের আলোচনা জরুরি। এটা অনস্বীকার্য যে এ দাবির প্রতিষ্ঠা রাজবংশী আন্দোলনের একটা প্রেরণা, কোনো কোনো সময়ে প্রধানও বটে। তবে রিজলী-প্রমুখ পণ্ডিতেরা যে ভাবে এর চরিত্র-নির্দেশ করতে চেয়েছেন, তাতে এর বৈচিত্র্য এবং জটিলতা সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না।

আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য যে প্রশ্ন বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তা হল, সামগ্রিক হিন্দু-প্রভাব এবং ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতি লাভের প্রয়াস কি সমার্থক? প্রশ্নটি আসলে রাজবংশী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কিত। কোন সামাজিক গোষ্ঠী এ স্বীকৃতির জন্য সবচাইতে বেশি উদ্যোগ নিয়েছিল? তার কারণই বা কী? প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পণ্ডিতেরা একটা বিষয়ে একমত।

তা হল, ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পর্কে আন্দোলনের নেতা বা প্রবক্তাদের যে যুক্তি তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আকস্মিক কোনো ঘটনাচক্রে এই ক্ষত্রিয়গোষ্ঠী তাদের আদিবাস ছেড়ে উওরবঙ্গ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে এসে জমায়েত হয়েছিল— এ ধারণার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। এ গোষ্ঠী তাদের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বর্গ সম্পূর্ণ বিস্মৃতই বা হল কেন? পণ্ডিতদের তাই স্থির সিদ্ধান্ত, রাজবংশী নেতাদের ধারণা সম্পূর্ণ বানানো।[৫৯]

অবশ্য রাজবংশী আন্দোলনের বিশেষ করে প্রাক-ঔপনেশিক যুগের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। তবে উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর বা আশির দশক থেকে বিশিষ্ট 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনে'র বিবর্তন এবং বিকাশ সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণা[৬০] থেকে আমরা কয়েকটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

ক) এ আন্দোলন শুধু রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়নি। বৃহত্তর আদিবাসী জগৎ থেকে তাদের দূরত্ব ক্রমেই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে গেছে। রাজবংশীরা চাইল, হিন্দু সমাজ এই বর্ণগত ব্যবধানকে স্বীকৃতি দিক। রাজবংশী আন্দোলনে এটা সম্পূর্ণ নতুন কোনো প্রবণতা নয়। নতুন আন্দোলনে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খ) এ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিশেষ এক ঐতিহাসিক পরিবেশ। নানা ঘটনার ফলে তাদের আশংকা বাড়ছিল যে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ তাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নির্দ্বিধায় মেনে নেবে না।

গ) এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল প্রধানত কয়েকটি বৈষয়িক দিক থেকে সফল এবং বিত্তশালী রাজবংশী পরিবার। বস্তুত এ বৈষয়িক সাফল্যের জন্যই তারা হিন্দুসমাজে তাদের যথোপযুক্ত স্থান এবং মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল।

ঘ) আন্দোলনের সাফল্যের জন্য সাধারণ অবস্থার রাজবংশীদের সমর্থন এবং সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। আন্দোলনের কোনো কোনো কর্মসূচি এর পক্ষে অনুকূল ছিল বটে; কিন্তু রাজবংশী সমাজে ক্রমবর্ধমান শ্রেণিবৈষম্য এক বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে ওঠার পথে একটা প্রধান অন্তরায় ছিল।

ঙ) এ আন্দোলন আসলে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের (organized politics) দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। আন্দোলনের ভাবাদর্শ ও কর্মসূচির প্রচার, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নানা সংগঠন সৃষ্টি অপরিহার্য ছিল।

ক্ষত্রিয় আন্দোলন হিসেবে রাজবংশী আন্দোলন মোটেই সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা নয়। রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি অনেক দিনের। আগেও তারা এর ভিত্তি হিসেবে শাস্ত্রীয় অনুমোদনের কথা বলেছে। বিশিষ্ট রাজবংশী পরিবার নিজেদের হিন্দু বলে মনে করত। অবশ্য উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ একে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়নি। হিন্দু বলে মানলেও রাজবংশীদের মনে করত নীচু জাতের লোক। এ মনোভাবের দৃষ্টান্ত আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

নতুন ক্ষত্রিয় আন্দোলন এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে গড়ে উঠেছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তখন আবার নতুন করে সুসংবদ্ধভাবে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি অস্বীকার করতে শুরু করে। এ বিষয়ে তাদের মনোভাব ক্রমেই অনমনীয় হয়ে ওঠে। উপলক্ষ ছিল, সরকারি আদমশুমারিতে রাজবংশীদের কীভাবে শ্রেণিভুক্ত করা হবে তা নিয়ে বিতর্ক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, উচ্চবর্গীয় হিন্দু-সমাজের রাজবংশী-বিরোধী মনোভাবের জন্যই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় বলে মানলই না।[৬১] আদমশুমারির নতুন বিধানে বলা হল তারা কোচই। রাজবংশী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এই স্বেচ্ছাচারী বিধানকে প্রতিহত করা। রাজবংশীদের আশংকা ছিল, একবার সরকারি নথিতে তাদের সামাজিক বর্ণ নির্দিষ্ট হয়ে গেলে পরে তার পরিবর্তন কঠিন হবে। তাছাড়া হিন্দুদের থেকে এই নিরন্তর উপেক্ষা আর অবমাননা তারা আর মানতে চাইল না, বিশেষ করে বৈষয়িক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নানা রাজবংশী পরিবার। তাদের বিত্ত আছে; ভূস্বামী হিসেবে তাদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ; নানা পেশায় তাদের দক্ষতা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত; তবুও হিন্দুসমাজ তাদের যথাযথ সামাজিক মর্যাদা দিচ্ছে না। নানাদিকে অগ্রসর কোচরা হিন্দুদের অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু অনেক রাজবংশী পরিবার কোচদের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

স্বভাবতই, এই আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল নানা পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত, বিত্তবান—এসব আত্মবিশ্বাসী পরিবার—যেমন জমিদার,

জোতদার, স্বচ্ছল বড়ো জোত-জমার মালিক কৃষক, আইন-ব্যবসায়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, তেজারতি, মহাজনীতে যুক্ত নানা পরিবার।[৬২] বিত্তের সঙ্গে তারা চাইল সামাজিক মর্যাদা; বর্ণাশ্রম নিয়ন্ত্রিত-হিন্দুসমাজে এ মর্যাদার প্রধানতম প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি বর্ণপ্রথায় উঁচু স্থান। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাদের তীব্র বিরূপতা কিন্তু বর্ণপ্রথা বর্জনের প্রয়াস মূঢ়তা মাত্র, কারণ শুধুমাত্র তাদের প্রতিরোধে সুদৃঢ় বর্ণপ্রথার উৎসাদন সম্ভব নয়। তাই তারা চেয়েছিল সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে উচ্চবর্গের সমান হতে। রাজবংশী নেতৃত্ব মাঝে মাঝে নিজেদের সমাজের সংস্কারের কথা বলেছে, কিন্তু তার মুখ্য আদল উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের আচরণ বিধি। যেমন উপবীত ধারণ। তারা ভেবেছিল, এসব আচার আচরণ গ্রহণের (appropriation) মধ্য দিয়ে হিন্দুদের সামাজিক প্রাধান্য খর্ব হবে।

অথচ সকল আন্দোলনের জন্য বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। আন্দোলনের ব্যাপকতা থেকে অনুমান করা যায়, এ সম্পর্ক নেতৃত্বের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ বিফল হয়নি। এর একটা কারণ, বর্ণহিন্দুদের কাছে 'নীচু জাতের লোক' বলে গণ্য রাজবংশীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা সংহতিবোধ ছিল। এ অবজ্ঞা তাদের সমাজের সর্বস্তরের লোককে সমানভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। ক্ষত্রিয় হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বর্ণবিরোধী নতুন আন্দোলন তাই রাজবংশী সমাজকে এক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আন্দোলন সম্পর্কে জনসাধারণের অনুকূল মনোভাবের আর একটা কারণ নেতাদের কোনো কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচি।[৬৩] কিন্তু এ সহযোগিতা আদৌ সর্বব্যাপী ছিল না। এর প্রধান কারণ, তখনকার রাজবংশী সমাজের গড়ন—তার শ্রেণিবিন্যাস, প্রকট শ্রেণিবৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব। নতুন আবাদের এলাকায় এ দ্বন্দ্বের প্রধান উৎস জোতদার ও প্রান্তিক চাষি এবং ভাগচাষিদের (আধিয়ার) সম্পর্ক। সব জোতদার অবশ্যই রাজবংশী নয়; কিন্তু জমিতে ভাগচাষীদের অধিকার বিষয়ে রাজবংশী নেতাদের মনোভাব প্রধানত প্রতিকূল ছিল।[৬৪] এ দ্বন্দ্ব কদাচিৎ মাত্র সংগঠিত জোতদার বিরোধী প্রতিরোধের রূপ নিয়েছে। কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন বৈরিতা বহু ক্ষেত্রে আধিয়ারদের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ক্ষত্রিয় আন্দোলনে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ের ডাক তাদের এই অনীহাকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গতে পারেনি।

আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি যাই হোক না কেন, এর সংগঠন অত্যন্ত নিপুণভাবে গড়ে তুলতে হয়েছে। এখানে রাজবংশী নেতৃত্বের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সংগঠনের একটা দিক ভাবাদর্শগত; যেমন বর্ণহিন্দুসমাজ-প্রচারিত ভাবাদর্শের একটা বিকল্প তৈরি করা (counter ideology)। রাজবংশীরা আদিতে কোচ বৈ অন্য কিছু ছিল না, তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই—এ প্রচার খণ্ডন না করা গেলে ক্ষত্রিয় আন্দোলন টেকে না। এ খণ্ডনের একটা উপায় ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির স্বপক্ষে শাস্ত্র, পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত নানা কাহিনি, গাথা, গান ইত্যাদির ব্যাপক প্রচারেরও ব্যবস্থা হল। এ সংগঠনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা। এর জন্য দরকার ছিল ‘আধুনিক’ ধরনের এক সংগঠনের যাতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নানা নিয়মের মাধ্যমে এর শাখা, উপশাখার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যেতে পারে। এখানে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা বা পছন্দ থাকতে পারে, কিন্তু তা বজায় রাখার জন্য সংগঠনের লিখিত বিধান, রীতি এবং পদ্ধতির লঙ্ঘন অবাঞ্ছিত। বিধান ইত্যাদি সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সংগঠনের একটা বিশিষ্ট রাজনৈতিক দিকও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তা হল, বর্ণহিন্দুসমাজ-বিরোধী আন্দোলনের একটা হাতিয়ার হিসেবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা। এর ভিত্তি এই প্রত্যাশা যে, হিন্দুসমাজ তাদের দাবি অস্বীকার করুক; কিন্তু রাষ্ট্রের অনুমোদনে হিন্দুদের এই বিরুদ্ধতা অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই রাজবংশী আন্দোলন মূল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলন থেকে সচেতনভাবে দূরে থেকে গিয়েছিল।

প্রাক্ ব্রিটিশযুগের ‘রাজবংশী আন্দোলন’ একটু স্বতন্ত্র ধরনের। (এখানে ‘আন্দোলন’ শব্দের ব্যবহার যথার্থ নয়)। আমরা আগেই বলেছি, এই সময়কার আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। তবুও এর কয়েকটা প্রবণতা মোটামুটি বোঝা যায়।[৬৫]

ক) রাজবংশী নামে পরিচিত হবার জন্য উদ্যোগ কোচ বা অন্য কোনো আদিবাসী সমাজের ভিতর থেকে আসেনি। এই উদ্যোগ প্রধানত স্থানীয় কয়েকটা ক্ষমতাবান, উচ্চাভিলাষী পরিবারের। বিশাল কামরূপরাজের

দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা স্বতন্ত্র, স্বাধীন 'রাজ্য' গড়তে চেয়েছিল। সফল যারা হয়েছিল, তারা নিজেদের রাজা আখ্যা দিল। আসলে, সত্যিকার কোনো রাজবংশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না আদৌ। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পেরেছিল বলেই তারা 'রাজা' নাম নিল। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় এ রকম এক সফল ব্যক্তির নাম বিশু। প্রচলিত ধারণা, সম্ভবত বিশুই প্রথম নিজের পরিবারকে রাজবংশী বলে। তার দাবি, কোচ গোষ্ঠী কোনো ক্ষত্রিয় রাজবংশ-সম্ভূত। বিশু তার নতুন পাওয়া রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সাধারণের চোখে এ ভাবে বৈধ করে নিতে চাইল।

খ) অনিবার্যভাবে এখানে গড়ে উঠল ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্ম প্রচারের নানা ব্যবস্থা করা হল; আদিবাসী গ্রামের 'পুরোহিত' কলিতাদের সরিয়ে নানা জায়গা থেকে এনে ব্রাহ্মণদের বসানো হল। শুধু তাই নয় সম্পূর্ণ নতুনভাবে সমাজকে ঢেলে সাজানোর জন্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করা হল। সম্ভবত রাজাদের উদ্দেশ্য ছিল, এর ফলে নতুন এক অনুগত সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হবে।

গ) কিন্তু শুধুমাত্র রাজপরিবারের খামখেয়ালিপনায় দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ-সংগঠন পাল্টানো সম্ভব ছিল না। এই সমাজ-সংগঠনে যুক্ত নানা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, যেমন কলিতা, এই স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নেয়নি। বহু আদিবাসীর সমর্থনও তাদের প্রত্যাশিত ছিল। ফলে ব্যাপক অসন্তোষ। এ ব্যাপকতার একটা প্রমাণ, ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজা নরনারায়ণ একটা আপসে আসতে বাধ্য হয়। রাজতরফ থেকে কথা দেওয়া হল, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের কোচ, মেচ ইত্যাদি আদিবাসীদের ধর্মকর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। আপসের প্রধান প্রশ্ন ছিল—পৌরোহিত্যের অধিকার কার, কলিতার না ব্রাহ্মণের। এর থেকে মনে হয়, আদিবাসীদের বিরোধিতা কলিতাদের নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল।

ঘ) কোচদের (বা অন্যান্য আদিবাসীদের) মধ্যে রাজবংশী নামের আকর্ষণ কেমন ছিল সঠিক বলা যায় না। বুকাননের বিবরণ থেকে জানতে পারি, প্রধানত

> হিন্দু সংস্কৃতি-প্রভাবিত কোচরাই রাজবংশী বলে নিজেদের পরিচয় দিত। আসামের গোয়ালপাড়া এ ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম বলা যায়। হিন্দুপ্রভাবের রূপ যাই হোক, 'বিজনী'রাজাদের এলাকায়, কোচদের প্রচলিত নামই ছিল 'রাজবংশী'। বুকাননের লেখা থেকে জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেও অনেক কোচ হিন্দুপ্রভাবের আওতায় আসেনি। মোটামুটি ভাবে বলা যায় এ প্রভাব সব চাইতে বেশি ছিল রঙপুরে। কিন্তু সেখানেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সর্বব্যাপী ছিল না। ধর্মানুষ্ঠানে কলিতাদের পৌরোহিত্য তখনও কোথাও কোথাও অব্যাহত ছিল। 'পতিত' শ্রেণির ব্রাহ্মণদেরও মাঝে মাঝে এ কাজে ডাকা হত।[৬৬] কোচদের আরও দুই সম্প্রদায়ের কথা বুকানন বলেছেন, যাদের মধ্যে হিন্দু প্রভাব ছিল নগণ্য। যেমন কেউ কেউ বাংলা ভাষা গ্রহণ করলেও কোচদের পুরানো নানা নাম বাতিল করেনি। অন্যান্যরা বাংলাই বলত না। 'ঝুম' পদ্ধতিতে তারা চাষ করত। হিন্দুপ্রভাব সেখানে একেবারে পৌঁছয়নি।

উপরের আলোচনায় আমরা রাজবংশী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে ধারণার বিচার করতে চেয়েছি। স্পষ্টত এই ধারণা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। রিজলীর মতে, এই আন্দোলনের ফলে এক বিশেষ আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রায় সবাই অথবা এর বৃহত্তম অংশ পুরোপুরি হিন্দু হয়ে গেছে, এবং হিন্দুবর্ণপ্রথার মধ্যে একটা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা যায় এই আন্দোলন ছিল ভিন্ন চরিত্রের। আন্দোলনের মূল উদ্যোগ আদিবাসী জনসাধারণ থেকে আসেনি। ব্রিটিশ আমলের আগে রাজবংশী নাম ব্যবহারে প্রধান উৎসাহ ছিল রাজ-মর্যাদাকাঙ্ক্ষী উচ্চাভিলাষী কোনো কোনো ব্যক্তির। উদ্দেশ্য ছিল অবৈধ উপায়ে পাওয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধকরণ। ব্রিটিশ যুগের 'রাজবংশী আন্দোলনে' মুখ্য ভূমিকা ছিল হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় সামাজিক প্রতিপত্তিকামী কোনো কোনো পরিবার, যারা প্রায় সবাই বৈষয়িক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তথাকথিত হিন্দুপ্রভাব তাই আদিবাসী গোষ্ঠীর একটা অংশে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণগুলির[৬৭] একটি আগেই উল্লেখ করেছি। তা হল, রাজবংশী সমাজ মূলত শ্রেণিবিভক্ত সমাজ; বহু ক্ষেত্রে কৃষিউৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি আধিয়ারি প্রথা; সম্পন্ন, জোতদার রাজবংশী পরিবারের সঙ্গে

প্রধানত ভুমিহীন, নির্বিত্ত আধিয়ার রাজবংশীদের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক অনিবার্য ছিল, যদিও কোনো কোনো বিশেষ অবস্থা ছাড়া এই বৈরিতা প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হয়নি। তাই উচ্চবিত্ত রাজবংশী পরিবার পরিচালিত ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে গরিব রাজবংশী সমাজের সহজ সহমর্মিতাবোধ গড়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয় কারণও প্রধানত অর্থনৈতিক। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে পরিকল্পিত, ব্যাপক সমাজসংস্কার কর্মসূচিও এই জন্যই স্বল্পবিত্ত রাজবংশীদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারেনি। এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, রাজবংশী সমাজের অনেক প্রথা, আচার, রীতিনীতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে গর্হিত মনে হত; ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদা পেতে হলে তাই এসব সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। যেমন—রাজবংশী নারীরা ঘরের বাইরে চাষবাস এবং অন্যান্য কায়িক শ্রমসাধ্য কাজে নির্বিচারে অংশ নিত; একটু বেশি বয়সে মেয়েদের বিয়ে হত; বিধবা বিবাহ এখানে প্রচলিত প্রথা; নরনারীর যৌনসম্পর্ক ছিল অপেক্ষাকৃত অবাধ; এবং মদ্য জাতীয় পানীয় বা শুয়োরের মাংস খাওয়া সম্পর্কে কোনো বাধানিষেধ ছিল না। এসব ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নেতাদের মনোভাব ছিল অনমনীয়। তারা নানাভাবে এসব বন্ধ করতে চেষ্টা করেছে। তাদের নিষেধ অমান্য করার জন্য 'অপরাধী'দের সম্পর্কে গুরু শাস্তির বিধান ছিল, যেমন জরিমানা, জাতিচ্যুতি ইত্যাদি।

কিন্তু আধিয়ার, প্রান্তিক চাষি বা শ্রমজীবী রাজবংশী পরিবারের পক্ষে সমাজ-সংস্কারের এসব কর্মসূচি মেনে নেওয়ার অর্থ সমূহ আর্থিক ক্ষতিস্বীকার। কারণ, তাদের আয়ের একটা বড় অংশ আসত, নারীদের নানা ধরনের কায়িক শ্রম থেকে। তাছাড়া যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ রীতি-সম্মত ছিল না, বা মদ্যপান বা শুয়োরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্যের সঙ্গে তা মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

কোনো কোনো সংস্কারের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের উচ্চবিত্ত নেতারাই চায়নি যে রাজবংশী সমাজের সবাই এ সম্পর্কে সমান আগ্রহী হোক; তারা নানাভাবে চেষ্টা করেছে, এই সংস্কার একটা ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠীতেই সীমাবদ্ধ থাকুক। যেমন 'উপনয়ন', অর্থাৎ উপবীত ধারণ। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটা কর্মসূচি ছিল, রাজবংশী সমাজ উপবীত ধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে,

কারণ এর ফলে 'ব্রাত্য' গোষ্ঠী হিসেবে তাদের দীর্ঘদিনের অবমাননা এবং হীনমন্যতাবোধ ঘুচবে। এই উপনয়ন অনুষ্ঠানের একটা অপরিহার্য অংশ ছিল এই যে তারা সম্মিলিতভাবে একটা বিশেষ জায়গায় ('মিলনক্ষেত্র') ব্রাহ্মণ্য মর্যাদার একটা বিশেষ প্রতীক উপবীত ধারণ করবে। প্রথম থেকেই অনেক গরিব রাজবংশী এ সম্পর্কে কোনো উৎসাহ দেখায়নি। কারণ উপনয়ন অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ, 'শুদ্ধি', ছিল ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু যেখানে তারা এ খরচ যোগাতে সমর্থ এবং সম্মত সেখানেও ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নেতারা তাদের নিরুপায় করতে চেষ্টা করেছে; গরিব রাজবংশীদের থেকে নিজেদের সামাজিক দূরত্ব তারা এভাবে বজায় রাখতে চেয়েছে। ফলে এমনও ঘটেছে, উপনয়ন অনুষ্ঠানের পরেও অনেকেই উপবীত বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে।

বস্তুত উপবীত ধারণের অধিকার নিয়ে বিতর্ক এবং বিরোধের ফলে রাজবংশী সমাজে বিভেদ ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনটে আলাদা গোষ্ঠীতে রাজবংশী সমাজ ভাগ হয়ে যায়ঃ উপবীতি, পতিত এবং অনুপবীতি। উপবীতিরা প্রধানত উচ্চবিত্ত রাজবংশী পরিবার; যারা উপবীত গ্রহণ করে কখনও বর্জন করেনি। 'পতিত' ছিল তারা যারা উপবীত গ্রহণ করেও নানা কারণে তা ছাড়তে বাধ্য হয়। অনুপবীতিদের উপবীত ধারণ করার কোনো অধিকার উচ্চবিত্ত রজিবংশী পরিবার স্বীকার করেনি। এ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ক্রমেই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে পড়ে; তা হিন্দুসমাজের 'উঁচু' এবং 'নীচু' জাতের মধ্যে ব্যবধানের মতোই। যেমন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পঙক্তি ভোজন বা বৈবাহিক সম্পর্ক অসিদ্ধ। এই ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই রাজবংশীসমাজের শ্রেণিবিভাগও ক্রমেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। প্রধান শ্রেণি ছিল তিনটি : 'ভদ্রলোক' বা বাবু; কোনো এলাকায় দীর্ঘদিন বসবাসকারী 'জোতদার' এবং আধিয়ার ও ভূমিহীন চাষি। সামাজিক প্রতিপত্তির দিক থেকে ভদ্রলোকেরাই ছিল সবার উপরে। জোতদারদের গ্রামসমাজের নেতা বলা যেতে পারে। তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ভূসম্পত্তি; ক্ষুদ্রচাষি, আধিয়ার এবং ভূমিহীন দিনমজুরদের উপর তাদের প্রভুত্ব কায়েম করা সম্ভব ছিল প্রধানত এই সম্পত্তির জোরেই।

রাজবংশী সমাজে হিন্দু প্রভাব তাই প্রতিপত্তিশালী কয়েকটা মাত্র পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে; বৃহৎ সমাজের সঙ্গে এর যোগসূত্র

ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। এটা আমরা বিশেষভাবে মনে রাখব, কারণ অন্যান্য প্রধান প্রধান আদিবাসী সমাজে হিন্দুপ্রভাব বিস্তারের পটভূমিকা এবং চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০২১
'মাতৃভাষা' পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

টীকা

১. সুরজিৎ সিংহের মন্তব্যঃ 'I initially conceptualized the category 'tribe' ideally, us un archaic pre-civilizational.' Tribes and Indian Civilization (বারাণসী, ১৯৮১); 'Foreword'। 'সভ্যতা' (civilization) কথাটাকে বোঝাতে অধ্যাপক সিংহ Robert Redfield-এর (Human Nature and the Study of Society, Chicago, 1962) সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। এতে প্রধানত 'সংস্কৃতি' (culture) এবং 'অবয়ব', 'বিন্যাস' (structure)-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতির দিক থেকে সভ্যতার ধারণা, 'assumes the existence of critically systematized thought formulated by specialists (literati) above the level of the unsystematized local oral tradition'। 'অবয়ব'-এর দিক থেকে সভ্যতার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হলঃ 'The existence of hierarchies of urban centres for the cultivation of material and ideational excellence'। নাগরিক এ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে গ্রামীণ এবং অন্যান্য অঞ্চলের ব্যাপক যোগসূত্র রয়েছে—সুরজিং সিংহ; পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩।

২. এ নতুনভাবে গড়ে ওঠা সমাজ ও অর্থনীতিকে সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন 'Secondary Formation'.

3. Kumar Suresh Singh, Tribal Society in India (Manohar, New Delhi, 1985), পঞ্চম অধ্যায়; 'Tribalization'.

৪). নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫); দ্বাদশ অধ্যায় : Kumar Suresh Singh, পূর্বোল্লিখিত।

৫. বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ৬০৬।

৬. সম্ভবত এ ব্যাপকতার কথা মনে রেখেই সুরেশ সিং এই প্রক্রিয়াকে 'Tribalization বলেছেন। তাঁর মতে এর একটা আদি রূপ লক্ষণ (traditional aspect) হলঃ 'acceptance of tribal mores, rituals und beliefs by in-coming communities'. Tribal Society in India, পৃ. ৮৭।

৭. বিস্তারিত আলোচনার জন্য, বাঙ্গালীর ইতিহাস; দ্বাদশ অধ্যায়।

৮. তাঁর অনবদ্য ভাষা আমরা উদ্ধৃত করছি: 'আজিকার দিনে কিংবা আদি ও মধ্যযুগে ভদ্র, উচ্চস্তরের বাঙ্গালী জীবনে যে ধর্মকর্মানুষ্ঠানের প্রচলন আমরা দেখি ও যাহাকে আমরা বাঙ্গালীর কর্মজীবনের বিশিষ্টতম ও প্রধানতম রূপ বলিয়া জানি, অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দেবী, গণেশ, অসংখ্য বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও তান্ত্রিক বিচিত্র দেবদেবী লইয়া আমাদের যে ধর্মকর্মের জীবন তাহা একান্তই আর্য-ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের চন্দনানুলেপ মাত্র এবং তাহা সংস্কৃতির গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক হইতে একান্তই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ধর্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন বাঙ্গালীর জীবনের গভীরে বিস্তৃত... সেই ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্য-মনের, আর্য-ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ- জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে।' পৃ: ৬০৮-৬০১

৯. E Lister, Hazaribagh District Gazetteer, (1917), পৃ.৭৬-৭৭

১০. বাঙ্গালীর ইতিহাস, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ ৩১৬-৩২১

১১. Buchanan Hamilton, Bhagalpur Jourual, 1810-11, (Putna, 1930) ১৮০৭-১৮১৪, এ সময়কালের মধ্যে বুকানন হ্যামিলটন বাংলা ও বিহারের কয়েকটা জেলায় ঘুরে ঘুরে নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করেন।

১২. এম এন শ্রীনিবাস এ প্রসঙ্গে এস এল কলিয়ার (S L Kalia) গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন। 'Kalia's examples illustrate the radical changes which may come about in the style of life and values of people when they move away from their reference groups. The cure with which the high-caste Hindus look over the new culture was perhaps due to the temporary nature of their stay, and some of them were at least aware of this. Thus Uttar Pradesh Brahmins who ate meat, drunk liquor; and consorted with hill women in the Jaunsar-Bawar area [of Uttar Pradesh] told Kalia : 'We have to do it because of the climate. There is nothing available here except meat. We will purify ourselves the day we cross the Jumna and return to our homes in Dehradun', (M N Srinivas, Social change in Modern India (Allied Publishers, New Delhi, 1966), অধ্যায় 'Sanskritization', পৃ. ১৯।

১৩. Bengal Judicial Proceedings, November, 1874; Nos 1-3; G N Barlow, Officiating Commissioner of Bhagalpur to Govt. of Bengal, Political Department, dt. 7 Oct, 1874.

১৪. প্রাগুক্ত; John Boxwell, Officiating Deputy Commissioner of the Santhal Pergunnahs to the Commissioner of the Santhal Pergunnahs, 1st Oct, 1874.

১৫. Bengal General Miscellaneous Proceedings, September, 1875; File No 133-1/4: Annual General Report, Bhagalpur Division, 1874-75.

১৬. Bengal Judicial Proceedings, March 1875: G N Barlow, Officiating Commissioner of Bhagalpur Division, to the Deputy Comissioner of the Santhal Pergunnahs, 25 Feb. 1875.

১৭. প্রাগুক্ত; File No 40-88; 'Note' by G N Burlow, Bhagalpur Commissioner, 'upon the course of events occurring in the Santhal Pergunnahs subsequent to 1872, which have led to the state of affairs existing at the present time', dated 9 March 1875.

১৮. প্রাগুক্ত; File No 40-89; 'Note' By Richard Temple, the Lieutenants Governor of Bengal, 9 March 1875.

১৯. Bengal Judicial Proceedings; August 1881, Nos 39-40. Appendix 'A' of Bhagalpur Commissioner's letter of 5 June 1881 to the Govt. of Bengal, Judicial Department. 'Note' by W Oldham, Deputy Commissioner of the Santal Pergunnuhs, (dated 16 March, 1881) on 'the state of Affairs in the Santhal Pergunnahs'.

২০. প্রাগুক্ত; Appendix 'C. Reply to Bhagalpur Commissionner's Questionnaire.

২১. প্রাগুক্ত; Appendix 'ঘ'

২২. প্রাগুক্ত; Appendix 'C'.

২৩. একই।

২৪. একই; 'Reports received subsequent to the preparation of previous papers'.

২৫. প্রাগুক্ত; Appendix 'B'; খেরওয়ার আন্দোলন সম্পর্কিত বারোটা প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল।

২৬. প্রাগুক্ত; Appendix 'C'; Reply to Questions No. 7; What is the true origin to the Kherwar Movement?

২৭. একই।

২৮. একই।

২৯. একই।

৩০. একই।

৩১. উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীহট্টের বৈষ্ণব সমাজের এ দুই সম্প্রদায়ের এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর, 'Memoirs of My Life and Times', (Calcutta, 1932), Chapter 6-এ। 'There are two kinds of Vaishnavas, the householder and the mendicant.... The mendicant

Vaishnavas take the vow to celibacy and poverty like the other religious mendicants and take up the stuff and the bowl and affect the loin clouh or Kaupin of the general body of our Sannyasins.... these Vaishnava mendicants, unlike those of the other orthodox Hindu Sannyasins, generally come from the lower castes of Bengalee Society...'. আদিবাসী এলাকায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বৈষ্ণব গোঁসাইদের আন্তরিক প্রয়াসের কথা আচার্য যদুনাথ সরকার খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। 'The Vaishanva Gosains set themselves to converting the aboriginal tribes...' (The History of Bengal, Vol. II, University of Dacca, 1972 impression; Ch. XII), বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের বিখ্যাত ইতিহাসকার রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতে ঐ এলাকায় বৈষ্ণব আদর্শপ্রচারে অগ্রণী গোঁসাইরা মূল বৈষ্ণব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তারা ছিলেন 'deviant order's-এর অনুগামী। Vaisnavism in Bengal, 1486-1900, (Calcutta, 1985), পৃ: ৩২৭-২৮।

৩২. H H Risley, The Tribes and Castes of Bengal (1891, Calcutta); 'Introductory Essay'। রিজলীর সিদ্ধান্তের বিচার প্রসঙ্গে আমরা এ বিলোপের চরিত্র আলোচনা করব।

৩৩. H H Risley, The People of India (London 1915, পৃ. 'All over India at the present moment tribes are gradually and insensibly being transformed into castes'.

৩৪. G S Ghurye, The Aborigines 'So-Called and their Future (Poona, 1943)

৩৫. আদিবাসী সমাজের পক্ষে হিন্দুপ্রভাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে নির্মলকুমার বসুর বক্তব্য আমরা পরে বিচার করব। এই 'পদ্ধতি'কে বসু 'The Hindu Method of Tribal Absorption' বলেছেন।

৩৬. এই দুটো দিককে তারা নাম দিয়েছেন Emulation এবং Solidarity. Martin Orans, The Santal : A Tribe in search of a Great Tradition (Detroit, 1965)। পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে এ বিষয়েও আমরা বিশদ আলোচনা করব।

৩৭. যেমন, মুণ্ডাজগতে এ আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল নাগবংশী রাজপরিবারে। পরে (Section 7.1) আমরা দেখব, একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছোটনাগপুরের অনেক বিত্তশালী ভূস্বামী পরিবার নিজেদের কোনো না কোনো রাজপুত রাজপরিবারভুক্ত বলে দাবি করে।

৩৮. ভূমিজ বিদ্রোহের শুরু দুটি জঙ্গলমহল এলাকায়—বরাভূম ও ধলভূম। কিন্তু জঙ্গলমহলের প্রায় সব 'জমিদারী'তে তা বিস্তৃত হয়। (১৮০৫ সালের ১৮ নম্বর Regulation-এ 'জঙ্গলমহল'কে এক আলাদা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীন নতুন জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়)।

৩৯. একটা গ্রামের ‘প্রধান’কে বলা হত মুণ্ডা। ‘মানকি’ ছিল গ্রামসমষ্টির প্রধান। গ্রাম-‘প্রধান’ হিসেবে ‘মুণ্ডা’র দায়িত্ব ছিল খুবই ব্যাপক; আদিবাসী অঞ্চলের বাইরে গ্রাম-প্রধান ‘মণ্ডল’-এর দায়িত্বের সঙ্গে তা মোটেই তুলনীয় নয়। গ্রামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মানকিদের সচরাচর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

৪০. যেমন মুণ্ডা, ওরাঁও এবং হো’দের আন্দোলন।

৪১. Bengal Judicial Criminal Proceedings, 31 March 1834; No 51; Joint Commissioners of Jungle Mahals to the Secretary to the Government, Judicial Department, dated 4 September 1833.

৪২. Ibid: paras 3-5 of the ‘Report’ (4 Sept. 1833)

(৪২.ক) এ প্রস্তরখণ্ডকে মুণ্ডারী ভাষায় বলা হত Sasan-di-ri, Sasan হল মুণ্ডাদের আদিগ্রাম পত্তনকারী পরিবারের (খুঁৎকাটিদার) বংশধরদের ব্যবহৃত শাশান। Sasan-diri-র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: ‘a stone slab brought to the sasan’। নির্মলকুমার বসু’র ‘হিন্দু সমাজের গড়ন’ (কলিকাতা ১৩৫৬)-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য: John Hoffmann: Encyclopedia Mundariea (পৃ. ৩৮৩৮-৩৮৭৩)

৪৩. E T Dalton, Descriptive Ethnology of Bengal (1st Edn. 1872, Calcutta): (Reprint, Calcutta 1980); পৃ: (‘Reprint’) ১৭১- ৭৫।

(৪৩.ক) H H Risley--The Tribes and Castes of Bengal (Calcutta 1891), vol 1. The People of India (London 1915)

৪৪. রিজলীর মন্তব্য: ‘The religion of the Bhumij varies, within certain limits, according to the social position and territorial status of the individuals concerned’. Tribes and Castes..., পৃ: ১২৪-২৫

৪৫. ‘Well-to-do tenure-holders’.

৪৬. Tribes and Castes..., ‘Introductory Essay’, পৃ: xvii-xviii.

৪৭. ibid.

৪৮. বিশেষ করে গোবিন্দপুরের ইরনাথ শাহী।

৪৯. শরৎচন্দ্র রায় (The Mundas & their Country, 1st Edn. Calcutta 1912)-এর নানা নিদর্শনের মধ্যে মুণ্ডারী গানে বৈষ্ণব প্রভাবের কথা বলেছেন।

৫০. ডাল্টন, পূর্বোল্লিখিত; (Calcutta Reprint) পৃ. ১২০, ‘Group Five: Hinduized Aborigines and Broken Tribes.

৫১. Asiatic Researchcs (London, 1882), পৃ. ১০২।

৫২. Risley, Castes & Tribes... ‘Introductory Essay’-তে উদ্ধৃত, পৃ. (iii)।

৫৩. Risley, পূর্বোল্লিখিত; ‘Introductory Essay’ পৃ. (xv-viii)।

৫৪. বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের রঙপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, তরাই, কুচবিহার এবং 'নিম্ন' আসামের গোয়ালপাড়া।

৫৫. প্রচলিত মত অনুযায়ী রাজবংশীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বৃহত্তর বোড়ো (Bodo) গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোচ, মেচ, পালিয়া, গারো, রাভা, লালঙ, মোরা, ধীমাল ইত্যাদি এ 'বোড়ো পরিবার'-এর অংশ। (চারুচন্দ্র সান্ন্যাল, The Rajbansis of North Bengal (The Asiatic Society, Calcutta, 1965) প্রথম অধ্যায়ের অংশ 'Historical and Ethnological Data'.)

৫৬. 'At the present day the name Kochh, without doubt the original designation of the Tribe, is so carefully tabooed in the districts where they are most numerous, and where there is every reason to believe them to represent the earliest permanent settlers, that in Kuch Behar itself at the census of 1881 not a single Kochh was to be found'. H. H. Risley, The Castes and Tribes... (Vol.1, P.491).

৫৭. 'In spite of their pretensions to be Kshatriyas, the social status of the Rajbansi is still extremely low, and no well known caste will take cooked food from their hands or smoke in their hookahs. In the Darjeeling Terai, where the caste is numerous, Hindus take water from them, but this is one of the concessions to circumstances of which caste custom offers many examples', H. Risley, ibid, P. 499.

৫৮. রিজলীর মন্তব্য: 'There are said to be no zamindars among them, the fact probably being that all the zamindars who were originally Rajbansis have long ago got themselves transformed into Rajputs.' Ibid, P. 499. জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং অঞ্চলে অবশ্য এদের অনেকেই ছিল বড়ো জোতের (জোতদারির) মালিক।

৫৯. 'The transformation of the Kochh into the Rajbansi... is a singular illustration of the influence exercised by fiction in the making of a caste.... Although there is no historical foundation for the claim of the Rajbansi to be a provincial variety of the Kshatriyas, the title Rajbansi serves much the same purpose for the lower strata of the Hindu population of Northern Bengal as the title Rajput does for the landholding classes of dubious origin all over India. The one term, like the other, serves as the sonorous designation of a large and heterogencous group bound together by the common desire of social distinction.' Ibid, p. 491.

৬০. রাজবংশী আন্দোলনের চরিত্রবিশ্লেষণে এক মূল্যবান সংযোজন Ranajit Das Gupta, Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri

1869-1947 (Oxford University Press, Delhi, 1992) Chapter 1 এবং পৃ-৮৭-৯২, ১২৬-১২৮। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের আন্দোলনের জন্য: S. Taniguchi, 'The Rajbansi Community and the changing structure of landtenure in the Koch Bihar princely state', in S. Taniguchi et al (c d s) Economic changes and Social Transformation in Modern and Contemporary South Asia (Tokyo, 1994).

৬১. ১৮৯১ এবং ১৯০১—এ দু'বারের আদমশুমারিতেই রাজবংশীদের কোচ বলে উল্লেখ করা হয়। ১৮৯১-এর লোকগণনা শুরুর আগে রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংগঠন রঙপুর ধর্মসভার মত জানতে চান। পণ্ডিতরা অবশ্য বলেন, রাজবংশী এবং কোচ আলাদা 'জাতি'। এবং রাজবংশীদের 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ১৯০১-এর লোকগণনায়ও তাদের কোচদের থেকে আলাদা করে দেখানো হয়নি। রণজিৎ দাশগুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য : 'It seems that opposition from sections of high caste Hindus was an important factor behind the rejection of the demand.' R. Das Gupta, op. cit, পৃ: ৮৮

৬২. Ibid, পৃ. ৮৯--৯২।

৬৩. যেমন, রাজবংশী কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়; সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হয়; হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত যৌতুক প্রথা সম্পূর্ণ বর্জন করার জন্য তাদের মধ্যে প্রচার করা হয়।

৬৪. জোতদার-স্বার্থের পরিপন্থী কোনো প্রস্তাব রাজবংশী নেতৃত্ব সাধারণত অনুমোদন করেনি। ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে (১৮৮৫) একটা সংশোধনের প্রস্তাব নিয়ে বঙ্গীয় আইন পরিষদে বির্তক হয়। ১৮৮৫ সালের আইনে জমিতে ভাগচাষিদের কোনো অধিকারের কথা বলা হয়নি। সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাগচাষীর অধিকার দেওয়া হোক। আইন পরিষদে রাজবংশী সদস্য এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। অথচ জোতদারের স্বার্থে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করার প্রশ্নে রাজবংশী নেতারা ছিল পরম উৎসাহী। R. Das Gupta, op. cit, পৃ. ১২৮।

৬৫. S. Taniguchi, পূর্বোল্লিখিত; পৃ. ৫৭--৭২।

৬৬. বুকাননের মতে এদের স্থানীয় নাম ছিল 'বর্ণ-ব্রাহ্মণ'। বুকাননের আসামের উপর বিবরণেও এদের উল্লেখ আছে। তাঁর আলোচনা থেকে মনে হয়, এরা কেউ স্থানীয় নয়। বাইরের কোনো জায়গা থেকে তাদের আনা হয়েছিল। এদের নাম ছিল 'বৈদিক ব্রাহ্মণ'। এদের একটা অংশ পরে 'পতিত' বলে গণ্য হয়। বুকাননের এই সম্পর্কিত আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি: 'Many

Kamrupi Vaidika Brahmins are now settled in Assam and it is said that among them there are many persons learned in Hindu science... some of the Vaidiks in this Country have degraded themselves, have become Varna, and instruct the impure tribes, a meanness to which none of those in Bengal have submitted.' Francis (Buchanan) Hamilton, An Account of Assam (compiled in 1807--1814), (Department of Historical and Antiquarian Studies, Assam, Gauhati, 1963), পৃ. ৫২।

৬৭. এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক একটা প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Sibsankar Mukherjee, 'The Social Role of a Caste Association', The Indian Economic and Social History Review, Jan-March 1994.

জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ভাষার নিকটবর্তী অন্যান্য ভাষা ও ভাষাসমস্যা

বিমলেন্দু মজুমদার

হিমালয়ের আঁচল ছুঁয়ে গড়ে ওঠা জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক অবস্থান এই জেলাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত করেছে। একদিকে ভৌগোলিক অঞ্চল অনুসারী অনু-উচ্চতাগত অসাধারণ জৈব বৈচিত্র্য, অন্যদিকে ভুটান হিমালয় থেকে প্রবাহিত ১৮৮টি নদী-নালা-স্রোতস্বিনী এই জেলার প্রাকৃতিক গঠনকে প্রতি বছরই ভিন্নতর রূপ দান করছে। এইভাবে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় এই জেলার জনসংস্থান চিত্রে। ভারতের প্রায় সবকটি ধর্মসম্প্রদায় এবং প্রায় সবকটি নৃগোষ্ঠীয় জাতি, জনজাতির বাস এ জেলায়। এসব জনগোষ্ঠী ব্যবহার করেন প্রায় দেড়শোটি ভাষা ও উপভাষা। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য জলপাইগুড়ি জেলাকে ভারতের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। এত জাতি, এত ভাষা ও এত ধর্মীয়-সংস্কৃতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এই জেলার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

জেলা সৃষ্টি ও জনবিন্যাস প্রক্রিয়া

বর্তমান ডুয়ার্স-সহ জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ এলাকা একসময় কোচবিহারের হাত থেকে ভুটানের দখলে চলে যায়। তারপর এই এলাকায় প্রায় ৯১ বছর ভুটিয়া শাসন বলবৎ ছিল। পরবর্তীকালে ১৮৬৪-১৮৬৫ সালে ভারত-ভুটান যুদ্ধে ভুটানের পরাজয়ের পর এই এলাকায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন

সম্প্রসারিত হয়। এর চার বছর পর ১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি রংপুর জেলার কয়েকটি থানাকে পশ্চিম ডুয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত করে গঠিত হয় জলপাইগুড়ি জেলা। তারপর দীর্ঘ ১৩৪ বছরে জেলার আকার-আয়তনের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনই পরিবর্তন ঘটেছে জেলার জনসংস্থান চিত্রে। আর এই জেলা গঠনের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোর মধ্যে 'জলপাইগুড়ি জেলা' নামে একটি নতুন উপনিবেশ। আসলে এই জেলাকে তৎকালীন বাংলা প্রদেশের একটি জেলা বলা হলেও এই জেলায় প্রশাসনিক পরিকাঠামো, আর্থ-সামাজিক কর্মতৎপরতা ও অভিবাসন প্রক্রিয়া সবই ছিল একধরনের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের ধাঁচে বাঁধা। মূলত হিমালয়-সংলগ্ন দুটি জেলার (জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং) উদ্ভব ও বিবর্তনের সঙ্গে মরিশাস বা গিয়ানার মতো উপনিবেশের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। এখানকার অহল্যা মাটিতে চায়ের চাষ, এখানকার কৃষিবলয়ে উন্নত মানের তামাক উৎপাদন (পরবর্তীতে পাটের চাষ) এবং বনভূমিতে মূল্যবান কাঠের প্রাচুর্যই এই অঞ্চলে ইংরেজ বণিকদের আকর্ষণের কারণ। এইসব অর্থকরী উৎপাদনের প্রক্রিয়াই এই পাণ্ডববর্জিত ভূ-ভাগকে ঔপনিবেশিক জেলাতে পরিণত করে। দার্জিলিং জেলা সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যেতে পারে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ডুয়ার্স সহ বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল ভুটানের অধীন। ফলে এই অঞ্চলকে ভুটান বলা হত। এমনকি ব্রিটিশ শাসন সম্প্রসারিত হওয়ার পরও এই অঞ্চলকে বলা হত 'ভুটান-ডুয়ার্স' (ভুটানে প্রবেশের দুয়ার এলাকা)। সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে স্থায়ী জনবসতি গড়ে ওঠেনি। বরং দক্ষিণ অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। সে সময় ডুয়ার্সের অধিকাংশ এলাকা ছিল তৃণভূমি প্রধান বনভূমিতে ঢাকা। পশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের মোট আয়তন ছিল ৩৮০ বর্গমাইল। এর মধ্যে ১৫৮ বর্গমাইল এলাকা ছিল তৃণভূমি প্রধান, শাল ও মিশ্র জঙ্গলে ঢাকা। (M. Martin, *Eastern India*, Vol-3, p.440) হান্টারের প্রতিবেদনেও আমরা একই ধরনের তথ্য দেখতে পাই।

ডুয়ার্সের দক্ষিণ প্রান্তে ধূপগুড়ি, ফালাকাটা ইত্যাদি (এলাকার দক্ষিণে) পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা দক্ষিণে সীমান্তরেখায় বিভিন্ন জোতদারের অধীনে বিচ্ছিন্ন

বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করতেন রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার প্রভৃতি জেলা থেকে আগত কৃষিজীবী মানুষের দল। এঁরা ছাড়াও তাঁদের সঙ্গে বসবাস করতেন কামার, কুমোর, নাপিত প্রভৃতি বৃত্তিজীবী মানুষ। ছিলেন খ্যান, যুগী, নাথ বোয়াদার (নান্দনিক বেলদার) কৈবর্তদাস প্রভৃতি পঞ্চাশটির বেশি সম্প্রদায়। আবার কোনো কোনো এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল মেচ, রাভা, গারো, টোটো জনজাতির গ্রাম। এঁদের সকলেরই জীবিকার উৎস ছিল তৃণভূমি, বনভূমি ও তৃণভূমির কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমি। প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন এবং বননির্ভর বিভিন্ন কর্মতৎপরতা। তখন এ অঞ্চলে জমির কোনো অভাব ছিল না। জঙ্গল হাসিল করলেই পাওয়া যেত জমি; কিন্তু জমি চাষের জন্য জনের অভাব ছিল খুব বেশি। তখন জোতদার এবং আধিয়ারের মধ্যে এ জেলায় খুব একটা পার্থক্য ছিল না। জোতদার এবং প্রজা উভয়েই চাষের কাজ করতেন।

তুলনামূলকভাবে পশুপালন ছিল লাভজনক এবং সামান্য কর্মী দিয়েই চারণের কাজ চালানো সম্ভব ছিল। ফলে কৃষিকাজের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ভাওয়া (চারণক্ষেত্র), বাথান (গরু, মোষ রাখার জায়গা) এবং হিলাও (আপদকালীন আশ্রয়স্থল)। কয়েকজন রাখালের সাহায্যেই বাথানদার বা গিরি (ধনী) তাঁর বাথান পরিচালনা করতেন। এসব চারণক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল দেশীয় পদ্ধতির দোহ শিল্প। এই অঞ্চলে দুধ বিপণনের জন্য উপযুক্ত জনবসতি ছিল না, ছিল না পরিকাঠামো। ফলে বাথানে উৎপন্ন দই, মাখন, ঘি বিপণনের জন্য পাঠানো হতো বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে এবং নিকটবর্তী হাটে বাজারে। আর তাঁদের দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত করা পনিরের প্রধান ক্রেতা ছিল ভুটানের মহাজনরা। এ ধরনের গোচারণকেন্দ্রিক ভাওয়া বাথানকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ায় উদ্ভব ঘটেছিল উত্তর বাংলার প্রাণভ্রমরা ভাওয়াইয়া সংগীতের। পরে পার্শ্ববর্তী রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকায় উৎপত্তিস্থল থেকে স্থানিক প্রসারণ (spatial diffusion) ঘটে এবং পরবর্তীকালে এই সংগীতধারা উৎবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎকর্ষ লাভ করে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বর্তমান ডুয়ার্সের যেসব এলাকায় চা-বাগান পত্তন করা হচ্ছে, সেসব এলাকা ছিল বৃক্ষবিরল তৃণভূমি বা বনভূমিতে ঢাকা। এসব এলাকায় ভুটান শাসনকালে বসবাস করতেন ক্ষেত্রান্তরী চাষে অভ্যস্ত স্থানান্তরী (Migratory) জনজাতি।

তাঁরা এক-একজন দলপতির নেতৃত্বে এসব এলাকায় বসতি গড়ে তুলতেন। ওই সময় এই অঞ্চলে জমির পত্তনি দেওয়া হতো, বিশেষ বিশেষ জনজাতির দলপতির নামে। কিন্তু তা সেই জনজাতির প্রতিটি পরিবারের যৌথ সম্পত্তি (community property) হিসেবে পরিগণিত হতো। ফলে এই বিশেষ গ্রামের জমির ওপর সেই জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের সমান অধিকার রক্ষিত হতো। কিন্তু জমির কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি পেত না। এজন্য প্রতিটি প্রাথমিক পরিবারকে (Nuclear family) মাথাপিছু 'দাও -খাজনা' (Capitaion Tax) দিতে হত। ঝুম চাষ এসব জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা হলেও এঁদের প্রান্তিক অর্থনীতিতে (Subsistence economy) শিকার ও বনজ সংগ্রহের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য (লংকা, কার্পাস তুলো ইত্যাদি) এবং বনজ সংগ্রহ ছিল তাঁদের বিনিময় বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ।

ভুটান শাসনকালে হিমালয়-সংলগ্ন বাংলার এই প্রান্তে দু-একটি মাল্লি (রংধামাল্লি, ঘোঘোমাল্লি, ভাঙামাল্লি প্রভৃতি ভোট শব্দ) বা সড়ক থাকলেও ডুয়ার্সের গভীর অরণ্য ও পার্বত্য এলাকার বেশিরভাগ অঞ্চলেই পায়ে চলার মতো পথও ছিল না। ফলে শীতের মরশুমে যখন পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসা অধিকাংশ নদীর জল কমে যেত, তখন সেসব নদীগর্ভ অনুসরণ করেই রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা এবং ব্যবসাবাণিজ্য চালানো হত। এ ধরনের বাণিজ্যিক পথে মানুষ ও পণ্যদ্রব্য বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হতো ঘোড়া, খচ্চর, মোষ ও বলদ। এ ছাড়া পণ্যদ্রব্য দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হতো 'ভারবাহী' (porter)। বর্তমান টোটোপাড়ার টোটো সম্প্রদায় ছিলেন এ ধরনের সরকারি (ভুটান সরকারের) ভারবাহী। এভাবে পাহাড় এবং সমতলের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক পরিক্রমার প্রচলন ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাণিজ্য চালানো হতো বিনিময় প্রথার মাধ্যমে। এ ধরনের সওদাগরদের 'বলদিয়া' বলা হতো। 'বলদিয়া'-রা বলদের পিঠে সমতলের পণ্যসম্ভার চাপিয়ে বনাঞ্চলের জনজাতির গ্রামগুলিতে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে ভুটানের মূল ভূখণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হতেন। আর সেই পণ্যসম্ভার বিনিময় করে তাঁরা নিয়ে আসতেন ভুটানের পণ্যদ্রব্য এবং বনাঞ্চলের জনজাতিদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও বনজ সংগ্রহ। এই বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের পাশাপাশি জনজাতির মানুষেরা পিঠের ঝুড়িতে পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে প্রয়োজনে গিয়ে উপস্থিত হতেন দক্ষিণ অঞ্চলের

জনজাতি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর গ্রামে। তাঁদের চলার পথে বিভিন্ন গ্রামে পাতানো 'ধর্মভাই' বা 'ধর্মমিতা'-র (Ritual friend) বাড়িতে আশ্রয় পেতেন খুব আদরের সঙ্গে। একইভাবে সমতলের জাতি, জনজাতির মানুষ ওসব জনজাতি গ্রামে (ভুটিয়াদের গ্রামসহ) গেলে পেতেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। তাঁদের এই বন্ধুত্বের পথে বিভিন্ন জাতি, জনজাতি গ্রহণবর্জনের প্রক্রিয়ায় যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁদের পরস্পরের সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে তুলতেন।

এসব জনজাতির ধর্মাচরণ ও জাতিদ্যোতক পোশাক (Ethnic costume) যেমন পৃথক ছিল, তেমনই তাঁদের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাও পৃথক। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রয়োজনে তাঁরা সকলেই আন্তর্গোষ্ঠী যোগাযোগের (inter community communication) ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সমকালে প্রচলিত আঞ্চলিক বাংলা ভাষা (কামরূপী/রাজবংশী ভাষা)। বস্তুতপক্ষে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভুটান সিকিম-সহ সমগ্র উত্তর বাংলার যোগাযোগের ভাষা (lingua franca) ছিল বাংলা। সেসময় লেখা বেশ কিছু সরকারি চুক্তিপত্র এবং চিঠি লেখা হয়েছিল বাংলা ভাষায়; ঐতিহাসিক তথ্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোনো একটি অঞ্চলের ভাষা-সংস্কৃতিগত পরিস্থিতি নির্ভর করে সেই অঞ্চলের জনসংস্থান পরিস্থিতির ওপর। কোনো একটি ভাষা সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় এলাকায় (central region) যেমন সেই এলাকায় প্রচলিত একটি মাত্র ভাষিক গোষ্ঠীর (Mono-lingual situation) প্রভাব দেখা যায়, তেমনই যেসব এলাকায় আর্থিক বা ভৌগোলিক কারণে একাধিক জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটে, সেসব এলাকায় একটি বা দুটি প্রভাবশালী (Dominant language) ভাষা যোগাযোগের ভাষা হিসেবে গৃহীত হলেও এক-একটি গোষ্ঠী অন্তত একটা বিশেষ কালসীমা পর্যন্ত নিজ নিজ মাতৃভাষার প্রচলন বজায় রাখার প্রয়াস চালিয়ে যায়। হিমালয়সংলগ্ন দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তবর্তী অবস্থানের জন্য একদিকে যেমন বহু জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ মাতৃভাষা প্রচলিত রাখার প্রয়াসও দেখা যায়। সীমান্তবর্তী অবস্থানের জন্য এই দুটি জেলায় এই ধরনের ভাষিক প্রবণতা প্রাক্-ব্রিটিশকাল থেকেই ক্রিয়াশীল।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চল ছাড়া আমবাড়ি-ফালাকাটা-সহ বিস্তৃত অঞ্চলে ভুটিয়া শাসন বলবৎ ছিল। ফলে প্রশাসনের ভাষা হিসেবে উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যে জোংখা বা পশ্চিম অঞ্চলের ভুটিয়া ভাষার প্রচলন থাকলেও সার্বিকভাবে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে 'বাংলা ভাষা'ই প্রভাবশালী ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। অথচ এই অঞ্চলে অসমের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মতো 'নাগামিজ' জাতীয় কোনো যোগাযোগের ভাষা সৃষ্টি হয়নি। বাংলা কথ্য ভাষাই সাধারণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ভোটশব্দ গ্রহণের (Borrowed words) মাধ্যমে প্রচলিত ছিল।

ভুটান শাসনকালে এই অঞ্চলে 'দোভাষিয়া' নামে একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকলেও আসলে তাঁরা 'দোভাষী'র কাজ করতেন না। ভুটান বাহিনী একসময় ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে (অসম থেকেও) বেশ কিছু যুবক যুবতীকে (প্রায় দশ হাজার) বন্দি করে নিয়ে গিয়ে 'দাসপ্রজায়' (slave) পরিণত করেছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধির শর্ত হিসেবে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এঁরা তাঁদের নিজ নিজ পরিবার বা জনগোষ্ঠীতে স্থান পাননি। পরবর্তীকালে তাঁরা ভুটিয়াদের ভারবাহী এবং আজ্ঞাবহ রূপে জীবিকা নির্বাহের জন্য ডুয়ার্সে ভুটিয়াদের যাতায়াতের পথে বসতি স্থাপন করেন। এঁরা একদিকে বাংলা ও অন্যদিকে ভুটিয়া ভাষা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন বলে তাঁদের 'দোভাষিয়া' বলা হত।

ভুটান শাসনকালে বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক অঞ্চলে দুটি ভাষাগোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি মাতৃভাষার প্রচলন ছিল। সেগুলি সারণি-১-এ দেখানো হল:

সারণি-১

ভুটান শাসনকালে এই অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাবর্গ

- ভারতীয় আর্য ভাষাবর্গ
  - বাংলা (কামরূপী/রাজবংশী-সহ)
- ভোটবর্মি/ভোট-চিনীয় ভাষাবর্গ
  - ভুটিয়া, ডয়য়া, টোটো প্রভৃতি
  - মেচ (বোড়ো), রাভা, গারো, ধীমাল, তণ্ডু প্রভৃতি

ভুটান শাসনকালে বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণাংশে জনবসতির ঘনত্ব কিছুটা বেশি থাকলেও ডুয়ার্স অঞ্চল ছিল প্রায় জনশূন্য। ডুয়ার্সের বনভূমি ও তৃণভূমি অঞ্চলে বসবাস করতেন উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু আদি জনজাতির মানুষ। এ ছাড়া ভুটিয়াদের ভারবাহী ও আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করার জন্য বসবাস স্থাপন করেছিল টোটো ও ডোয়য়াদের মতো কিছু ভারবাহী জনজাতি (Porter tribes)। ভুটিয়াদের সঙ্গে এসব জনজাতির অধিকাংশ সম্প্রদায়েরই শ্রেণিগত (অর্থনৈতিক) পার্থক্য ছিল বিস্তর। এঁদের কোনো কোনো সম্প্রদায় ভুটানে 'জাপু' বা দাসপ্রজা হিসেবে বসবাস করতেন। পরবর্তী ব্রিটিশ-ভুটান যুদ্ধে ভুটানের পরাজয়ের পর ভুটানের সহযোগী এসব জনজাতিও তাঁদের সঙ্গে ভুটানে চলে যান (ব্যতিক্রম শুধু টোটোপাড়ার টোটো সম্প্রদায়)।

এ ধরনের জনবিন্যাস ও ভাষিক পরিস্থিতিতে এসব জনজাতির মানুষরা রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ভুটিয়া শাসকগোষ্ঠী এবং বাঙালিদের সঙ্গে (ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে) যোগাযোগের ভাষা (Language for wider communication) হিসেবে বাংলা ভাষাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। কিন্তু এরা সকলেই নিজ নিজ ঘরের ভাষা (restricted code) বা আন্তঃগোষ্ঠী যোগাযোগের (inter-community communication) ভাষা হিসেবে নিজ নিজ মাতৃভাষাই ব্যবহার করতেন। আসলে এই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আজকের মতোই বহুভাষিক ছিলেন। তখন আজকের মতো হিন্দি, নেপালি বা সাদরির মতো ভাষার অস্তিত্ব ছিল না; বাংলাই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা। অন্যদিকে তখন এ অঞ্চলে যেসব বাঙালি বসবাস করতেন, প্রান্তীয় অঞ্চলে (border region) বসবাসের ফলে তাঁরা একাধিক ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষা ছিল প্রধান যোগাযোগের ভাষা বা 'Lingua franca'।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাল (১৮৬৫—১৯৪৭)

জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের প্রাক্কালে রংপুর জেলা থেকে যে পাঁচটি থানাকে পশ্চিম ডুয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয়, সেই অংশকে (বৈকুণ্ঠ পরগনাসহ) বলা হত 'রেগুলেটেড এরিয়া' (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা permanent

settlement acts 1793 এবং Regulated Acts বা রেগুলেটেড আইন অনুসারে)। আর ভুটান থেকে যেসব এলাকা ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাকে বলা হত নন-রেগুলেটেড এরিয়া। ফলে 'নন-রেগুলেটেড' এলাকায়, বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় ভূমিবণ্টন ও রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল ভিন্নতর।

রেগুলেটেড এলাকার জনবিন্যাস চিত্রের প্রধান শরিক ছিলেন বাঙালি হিন্দু-মুসলমান। ওই এলাকার ভূমি ও ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা এবং কৃষিকেন্দ্রিক সমাজকাঠামো ছিল দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো জমিদারি, জোতদারি, রায়তারি ব্যবস্থার অনুসারী। পার্থক্য ছিল জাতপাতের প্রশ্নে; বাংলার অন্যান্য অংশের মতো জেলার 'রেগুলেটেড' এলাকাতেও জাতপাতের প্রশ্ন প্রবল ছিল না। অবশ্য জাতপাতের প্রশ্নে এই জেলায় কখনও কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ঘটেনি।

জেলার নবলব্ধ ডুয়ার্স এলাকায় ব্রিটিশ শাসন বলবৎ হওয়ায় সূচনা পর্ব থেকেই এই অঞ্চলের জনবিন্যাস চিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। ইতিপূর্বে ভুটান শাসনকালে যেসব জনজাতি ডুয়ার্সে তাঁদের সহযোগী হিসেবে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাদের বেশিরভাগই ভুটিয়াদের সঙ্গে ভুটানে চলে যান। এখনও এই জেলার স্থাননামে (জলদাপাড়া, তণ্ডু, টোটোপাড়া, খোনিয়া) অধুনালুপ্ত এসব জনজাতির স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালে যাঁরা এখানকার মাটিতে থেকে গেলেন, তৎকালীন জেলা প্রশাসন তাঁদের বসবাসের এলাকায় চা-বাগান পত্তনের অনুমতি দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব জনজাতির মানুষদের চিরকালের মতো ভূমিচ্যুত করেন। যাঁদের নামের চিহ্ন বহন করছে সাতালী, মেচপাড়া, গারোপাড়া, তোতাপাড়া, তণ্ডু প্রভৃতি চা-বাগানের নাম পরিচয়ে। তার পরেও মেচ (বোড়ো), গারো, রাভা, ডুকপা, টোটো প্রভৃতি যেসব আদিবাসী থেকে গেলেন, তাঁরাই মূলত এই জেলার আদি জনজাতি।

জেলা গঠনের কিছুকালের মধ্যে নন-রেগুলেটেড এলাকাতে ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বিপুলসংখ্যক অধিবাসীর আগমন ঘটে। সেই সঙ্গে ভূমি ব্যবহারের পদ্ধতি এবং পরিমাণও বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে নবাগত জনগোষ্ঠীর জীবিকা ভঙ্গির ক্ষেত্র পরিবর্তন ঘটে। নন-রেগুলেটেড এলাকায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতিবস্তুর

ওপরই সরকারের অধিকার বলবৎ হয়। এখানে নদী, মাটি, বালি, পাথর, বন ও বনজ সম্পদ, তৃণভূমি সবকিছুর ওপরই রাজস্ব নির্ধারিত হয়। ফলে এই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রকৃতিনির্ভর বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তাঁদের চিরায়ত অধিকার হারান। জেলার ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা (Latitude) বরাবর দক্ষিণের আন্দোলিত উচ্চভূমি ও সমতলপ্রায় ভূমিতে উপস্থিত হল রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাগুলি থেকে হিন্দু-মুসলমান রাজবংশী চাষি, জোতদার ও আধিয়ারের দল। নতুন হাসিল করা জমির বুকে তাঁরা পত্তন করলেন কৃষিভিত্তিক এক সমাজ ও সংস্কৃতি। তবে এর সবটাই শুধুমাত্র জলপাইগুড়ির সুরে বাঁধা নয়; তাঁদের মধ্যে পূর্ববাংলা এবং ভিনরাজ্য থেকে যে অল্পসংখ্যক জোতদার ও চাষি এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের কৃষিকাজের দক্ষতার সঙ্গে এই অঞ্চলের কৃষিপদ্ধতি ও কৃষিসংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটালেন।

এঁদের আগমনে জেলার দক্ষিণাংশে আন্দোলিত সমপ্রায় ভূমির ভূসাংস্কৃতিক দৃশ্যের (Geo-cultural landscape) যেমন পরিবর্তন ঘটল, জনবিন্যাস চিত্রেরও তেমনই পরিবর্তন ঘটল। ভুটান আমলের ভূসাংস্কৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে তার আর কোনো মিলই থাকল না। অন্যদিকে, জেলার উত্তরাঞ্চলে আন্দোলিত উচ্চভূমিতে (ডুয়ার্স অঞ্চলে) জঙ্গলাকীর্ণ স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রেও আঘাত নেমে এল। ওই অঞ্চলে বনভূমি ও তৃণভূমি হাসিল করে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চা-বাগান পত্তনের ফলে এলাকার প্রাচীন ভূ-দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে পালটে গেল এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা জমির অধিকার হারালেন। তাঁদের অনেকেই নতুন জমির সন্ধানে ভুটান বা অসমের দিকে চলে গেলেন। আর যাঁরা নিরুপায় হয়ে থেকেও গেলেন, তাঁদের বাস্তুতন্ত্র এবং জীবিকাভঙ্গির (Occupational pattern) ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এল। একদিকে ডুয়ার্সের মুক্ত বনাঞ্চলের সংরক্ষিত বনভূমিতে (Reserve Forest-1979-এ) পরিণত করা, অন্যদিকে, ব্যাপক এলাকায় চা-বাগান পত্তনের ফলে এসব জনজাতি তাঁদের জীবিকার ক্ষেত্র থেকে উৎখাত হলেন, অথবা ক্ষেত্রান্তরী (Shifting cultivation) চাষ এবং স্থানান্তরী (migratory) বসবাসের অভ্যাস ত্যাগ করে নির্দিষ্ট এলাকায় থিতু (settled) হয়ে

বসবাস করতে শুরু করলেন এবং ওই নির্দিষ্ট এলাকার সাধারণ চাষিদের মতো চাষের পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ার প্রয়াস পেলেন; কিন্তু প্রকৃতির দান অরণ্যের ওপর চিরকালের মতো অধিকার হারালেন, যা তাঁদের মানসিক অভিযোজনের ক্ষেত্রে এবং উপজীবিকার ক্ষেত্রে এক বিপন্নতাবোধের সৃষ্টি করেছিল। সম্ভবত এই ধরনের নিরাপত্তাহীনতার বা বিপন্নতাবোধের মানসিকতাই পরবর্তী ক্ষুদ্র জনজাতি গোষ্ঠীকে তাঁদের নিজ নিজ জাতির অস্তিত্বের সন্ধানে (self identity) প্রবৃত্ত করে। ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় এই বিপন্নতাবোধ বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এক সংক্রামিত সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

জেলার তৎকালীন কৃষিবলয়ে পাট এবং তামাকের মতো অর্থকরী ফসলকে উপেক্ষা না করেও বলা যায় যে, জলপাইগুড়ি জেলার (দার্জিলিং জেলারও) জনবিন্যাসের ইতিহাস এবং এই জেলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠনের প্রক্রিয়া ডুয়ার্স অঞ্চলে চা-বাগান পত্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এ জেলার বনভূমি ও তৃণভূমি হাসিল করে চা-বাগান পত্তনের সূত্রে (১৮৭৪-এ প্রথম 'গজলডোবা' চা-বাগান পত্তনের মধ্যে দিয়ে চা-চাষের সূত্রপাত ঘটে) ছোটোনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, বস্তার ও ওড়িশা প্রভৃতি এলাকা থেকে চা-শ্রমিক হিসেবে বিপুল সংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। এঁরা হলেন ওঁরাও, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহালী, খেড়িয়া প্রভৃতি ৩১টি জনগোষ্ঠী; এক কথায় যাঁদের পরিচয় 'মদেশিয়া' বা সমতলের মানুষ। এদের পাশাপাশি জেলার পাহাড়ি এলাকাগুলিতে এসে উপস্থিত হলেন বেশ কিছু নেপালি শ্রমিক। এঁদের অধিকাংশই নেপালি জনজাতির মানুষ। ফলে দারিদ্র্য, জীবিকা এবং জনজাতিগত অবস্থানের দিক থেকে দুই গোষ্ঠীর (মদেশিয়া এবং নেপালি) একটা শ্রেণিগত মিল অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায়!

চা-বাগান পত্তনের সূত্রে এই অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন চাবাগানের পাট্টাধারী (lease) মালিক, ম্যানেজার ও 'বাবু শ্রেণি'-র মতো বুদ্ধিজীবী মানুষের দল। এসেছিলেন ছোটো ব্যবসায়ী, মুদি মহাজন, ঠিকাদার ও অন্যান্য জীবিকার মানুষ। এভাবে চা-বাগান পত্তনের সূত্রে ব্রিটিশ শাসনকালে এই জেলা এক বৈচিত্র্যময় মানবগোষ্ঠীর মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। আর এভাবেই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জেলার জনসংস্থান চিত্রে যেমন পরিবর্তন ঘটে গেল, তেমনই পরিবর্তন ঘটে গেল জেলার ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। ভাষাগত দিক থেকে

যেখানে আগে শুধুমাত্র আর্য ভাষাগোষ্ঠী ও ভোট-চিনীয় ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, সেখানে চা-বাগান পত্তনের সূত্রে ভারতের প্রধান চারটি ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটল। যেমন, ১) আর্য ভাষাগোষ্ঠী, ২)। ভোট-চিনীয়/ভোট-বর্মি ভাষাগোষ্ঠী, ৩) অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী, ও ৪) দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী। এর ফলে জেলায় বিভিন্ন ভাষা পরিবারের প্রায় ১৫১টি ভাষা, উপভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর (Census-1961, p. 45) আগমন ঘটে এবং সম্পূর্ণ নতুন ভাষিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

এই পরিবর্তিত ভাষা পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসনকালে জলপাইগুড়ি জেলায় (দার্জিলিং তরাই অঞ্চলেও) নতুন করে ভাষাগত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। জেলার উত্তরাঞ্চলে আন্তঃগোষ্ঠী যোগাযোগের ভাষা হিসেবে (Inter-community link language or Lingua franca) বাংলা ভাষার একচেটিয়া আধিপত্য কমতে থাকে। পরিবর্তে প্রতিস্পর্ধী আন্তঃগোষ্ঠী যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ডুয়ার্সের চা-উৎপাদন বলয়ে সাদরি, হিন্দি এবং নেপালি ভাষার প্রাধান্য (dominance) বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে বিভিন্ন বাচকগোষ্ঠী (Speech group) নিজ নিজ মাতৃভাষার অস্তিত্ব বজায় রেখে অথবা বিপন্ন করে এই প্রভাবশালী ভাষাগুলি আত্মীকরণের প্রক্রিয়ার (Process of code switching) সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নেয়। যে প্রক্রিয়া গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে আরও দ্রুতলয়ে প্রসারমান। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডুয়ার্সের ক্রমপরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে।

বর্তমান জেলার চা-বলয়ে বসবাসকারী বিভিন্ন বিচিত্র জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁদের প্রত্যেকের একটা স্বতন্ত্র নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একসময়ে চা-বাগানে বসবাসকারী অভিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর দ্বীপবৎ বিচ্ছিন্নতাকে শাসনের বেড়াজালে আচ্ছন্ন করে রাখার জন্য ব্রিটিশ চা-কররা সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এমনকি চা-বাগানের শ্রমিকরা যাতে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে, সে জন্য প্রতিটি চা-বাগানে এবং কয়েকটি চা-বাগানকে কেন্দ্র করে হাটের ব্যবস্থা করেছিল। অন্যদিকে, বনাঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতির মানুষদের মধ্যে বহির্জগৎ সম্পর্কে যেন এক ধরনের উদ্ভিদধর্মী স্বেচ্ছা-

আরোপিত আড়ষ্টতা কাজ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে এই দুই শ্রেণির জনজাতির মানুষদের সঙ্গে স্থানীয় চাষি এবং প্রান্তিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মিলনের পথ প্রসারিত হতে থাকে। তা হতে থাকে জীবিকার সূত্রে। ব্রিটিশ চা-করদের বেড়াজাল ডিঙিয়ে হাটে-বাজারে তাদের মিলন ঘটতে থাকে। আসলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় চাষিদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল ছিল, তা হচ্ছে কৃষিকেন্দ্রিক মানসিকতা।

স্থানীয় গ্রামে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা মূলত চাষি। আর চাবাগানের মাটিতে যাঁরা এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের মুখ্য জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। বরং বলা চলে চা-বাগানের আদিবাসী শ্রমিকেরা তাঁদের চিরায়ত কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকা থেকে আর এক কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু পেছনে ফেলে আসা চাষি জীবনে যে স্বাধীনতা ছিল, এই বাগিচা ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতা ছিল না। প্রকৃতির কোল থেকে উঠে আসা সেই মানুষগুলি এখানে অসহায় চা গাছের মতো একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতাহীন চা গাছের মতোই কাটাইছাঁটাই হচ্ছিলেন। ফলে চা-শ্রমিকদের প্রথম প্রজন্ম (first generation) হিসেবে, তাঁদের পেছনে ফেলে আসা কৃষিকেন্দ্রিক স্মৃতির অনুষঙ্গেই-তাঁরা তাঁদের আন্তঃগোষ্ঠী আত্মীকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিলেন (পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সাবেক কৃষিকেন্দ্রিক মানসিকতার অবস্থান গবেষণাসাপেক্ষ)। ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্ব ও স্বাধীনতার ঊষালগ্ন ছিল শেকল বাঁধা পাখির শেকল ছেঁড়ার চূড়ান্ত প্রয়াসের কাল। এই প্রয়াসই গ্রামের চাষি ও বাগিচা শ্রমিকদের পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। তাঁদের এই সম্প্রীতিকে দৃঢ়তর করেছিল সমমাত্রিক এক সামাজিক রূপান্তরের পথ, দোমোহনির রেলশ্রমিকরা এই কাজে এক রাজনৈতিক চেতনা অনুঘটকের কাজ করেছিলেন। দোমোহনির অগ্নিরথের শ্রমিকরা তেভাগার অগ্নিপথের সন্ধান দিয়েছিলেন চা-বাগানের শ্রমিক আর জোতদারের বাথানের চাষিকে।

এসব কারণেই ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম পর্বে শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক প্রয়াসের ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির কোনো অভাব ঘটেনি। সেই সময় যখন দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই দুর্দিনেও বাংলার এই প্রত্যন্ত জেলায় নানা জাতি, নানা

ধর্মের, নানা ভাষার মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই অঞ্চলে শান্তিতে বসবাস করেছেন।

স্বাধীনতার পরবর্তীকাল

বাঙালির ভাগ্যে স্বাধীনতার পুরস্কার জুটেছিল দেশবিভাগজনিত আকস্মিক অভিশাপ। তার পরিণতিতে জলপাইগুড়ি জেলার পাঁচটি থানা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) চলে যায়। জেলার ভৌগোলিক আয়তন ৩০৫০ বর্গমাইল থেকে কমে দাঁড়ায় ২৩৭৮ বর্গমাইলে (১৯৪৭ সালের ১৪ জানুয়ারি)। এভাবে জেলায় ভৌগোলিক আয়তন কমে গেলেও বিপুলসংখ্যক বাস্তুহারা মানুষের আগমনে এবং দেশের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও রাষ্ট্রগুলি থেকে ক্রমাগত জনসমাগম (অনুপ্রবেশসহ) জেলার ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার অনুপাত বাড়তে থাকে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সেই প্রক্রিয়া এখনও অনাহতভাবেই ঘটে চলেছে। আর এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে গতিদান করে অন্তত পাঁচটি পর্বে। যেমন, ১) দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ২) ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল চুক্তি (নেপাল অনুপ্রবেশ), ৩) অসমে কয়েক দফায় বঙাল খেদা আন্দোলন, ৪) বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, ৫) দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে জনসমাগম প্রভৃতি।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম ধাপে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা বাস্তুহারা হিসেবে এসে উপস্থিত হন তাঁদের অধিকাংশই জেলার পৌর ও অপৌর শহরগুলিতে বা সংলগ্ন এলাকায় বসতি বিস্তার করেন। এঁদের অনেকে সরকারি কলোনিতে সীমিত জমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, যেখানে জীবিকার ন্যূনতম আয়োজনও ছিল না। অন্যদিকে, ১৯৫০ সালে ভারতনেপাল চুক্তির পর বিপুলসংখ্যক নেপালি জেলায় উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে, চা-বাগানের উদ্বৃত্ত জমিতে, সরকারি খাসজমিতে ও বনবস্তিগুলিতে নিজ স্ব নৃ-গোষ্ঠীগত অভ্যাস (ethnic habit) অনুসারে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে অসম, মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্য এবং ভুটান থেকে বিতাড়িত নেপালি জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। এঁদের বসতি বিস্তারের প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত। জলপাইগুড়ি জেলার ওদলাবাড়িতে

এবং শালুগাড়া অঞ্চলে তিব্বতি বাস্তুহারাদের একটা অংশ বসতি স্থাপন করে বসবাস করছেন।

আবার দেশবিভাগের পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্বে যেসব বাস্তুহারা এ জেলায় এসেছেন এবং অসম থেকে উৎখাত হয়ে যেসব বাঙালি বাস্তুহারা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এঁদের অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা জেলার বিভিন্ন নদীর চর এবং গ্রামাঞ্চলের পতিত ও অনুর্বর জমিতে বসতি বিস্তার করে কৃষি এবং ছোটো ব্যবসা, চাকুরি প্রভৃতিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এঁরা নেপালিদের মতোই পরিশ্রমী এবং কর্মকুশল। ফলে গত ৩-৪ দশকের মধ্যে কোনো প্রকার উল্লেখযোগ্য সরকারি অনুদান ছাড়াই (বাস্তুহারা হিসেবে) নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটিয়েছেন। জেলায় সবজি চাষ ও কৃষির ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে এঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। এঁদের কর্মতৎপরতা জেলার অন্যান্য অধিবাসীদেরও আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করেছে। জেলায় মৎস্যচাষের ক্ষেত্রেও এঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এ জেলার বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ। জেলার ভারত-ভুটান সীমান্তের অপৌর শহর, বনসংলগ্ন দুর্গম এলাকায় এঁরা নানাভাবে বসতি স্থাপন করেছেন। এঁরা প্রধানত কৃষিজীবী শ্রেণির মানুষ হলেও বর্তমানে কৃষির সঙ্গে এঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। এঁরা ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকার কসাইখানা, নির্মাণ শ্রমিক ও অন্যান্য ছোটো বড়ো বৈধ-অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। জেলার বিভিন্ন পৌর এবং অপৌর শহরে রিকশা ও রিকশাভ্যান চালকের কাজকেও এঁরা বিশেষভাবে জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছেন। এঁরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। তার ফলে কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকার পরিবর্তে ভিন্নতর শ্রমনিবিড় জীবিকার সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন করে নিতে পেরেছেন।

এঁরা ছাড়া, জেলার চা-বাগানগুলির জন্মলগ্ন থেকে সেই সুদূর প্রাচীনকালে একদল বাঙালি এসে চা-বাগানে উপস্থিত হয়েছিলেন। চাবাগানের এই কর্মচারীরা সাহেব এবং চা-শ্রমিকদের কাছে 'বাবু' নামে পরিচিত। যেমন, বড়োবাবু, কলবাবু/ফিটারবাবু, বাগানবাবু, গুদামবাবু ইত্যাদি। এঁরা এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে। এঁরা যে ভাষায় এক-একটা চা-বাগানে কথা বলতেন, তাকে বলা যেতে পারে 'বাবু বাংলা'।

এ ধরনের একটি বহুভাষিক জনসংস্থান চিত্র বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার ১৫১টি মাতৃভাষা ব্যবহারকারী (জনগণনা ১৯৬১) জনগোষ্ঠীর বাস। এই ১৫১টি ভাষা ও উপভাষার মধ্যে ৪২টি ভাষার শ্রেণিবিভাগ অনির্ণীত (গ্রিয়ার্সনের সমীক্ষায় এই ভাষাগুলির শ্রেণিনির্ণয় করা হয়নি)। ৮টি ভাষার বাচকগোষ্ঠী মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরের অধিবাসী। বাকি ১০১টি বাচকগোষ্ঠীর শ্রেণিগত বিভাজন নিম্নরূপ :

মোট ১০১টি শ্রেণিনির্ণীত ভাষা (সারণি ২)

আর্য ভাষাগোষ্ঠী	ভোট-চিনীয়/ ভোটবর্মী ভাষাগোষ্ঠী	অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী	দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী
৪৬টি	২৪টি	১৯টি	১২টি
বাংলা, হিন্দি নেপালি, সাদ্‌রি গুজরাটি ইত্যাদি	মেচ (বোড়ো) রাভা, টোটো গারো, ডুকপা লেপচা লিম্বু ইত্যাদি	সাঁওতালী অসুরী বিরহড় মুন্ডারি, কুর্মী লোধা ইত্যাদি	কুরুখ (ওরাওঁ) মালতো নাগোসিয়া ইত্যাদি

জেলার এই ১০১টি শ্রেণিনির্ণীত ভাষা-উপভাষার বাচনিক দুর্বোধ্যতা অনেক ক্ষেত্রেই দুরতিক্রম্য। কিন্তু একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে, জেলার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মানুষই একাধিক ভাষা বা উপভাষা বলতে অভ্যস্ত। যার ফলে আন্তঃগোষ্ঠী যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাঁরা তৃতীয় একটি ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে তৃতীয় একটি যোগাযোগের ভাষায় (lingua franca) অভ্যস্ত থাকায় এই জেলায় বাচনিক দুর্বোধ্যতা অতিক্রম করে বিভিন্ন বাচকগোষ্ঠীর মধ্যে সংহতির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার তাবৎ নির্দিষ্ট ভাষা বা উপভাষার (District language/dialect) বাচকগোষ্ঠী নিজ নিজ মাতৃভাষা বজায় রেখেও মোট ৪টি প্রভাবশালী ভাষায় নিজেদের অভিযোজন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, এঁদের নিজ নিজ মাতৃভাষা চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো রীতিসম্মত সরকারি বা

বেসরকারি উদ্যোগ না থাকায় এই ভাষাগুলির প্রতি তাঁদের আনুগত্য ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে এবং তাঁরা তাঁদের জাতি বা সম্প্রদায়গত আত্মপরিচয় (self identity) প্রতিষ্ঠার পথের সন্ধানে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

জেলার জনগণনার চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, বাংলা ছাড়া জেলার অন্যান্য ভাষা, বিশেষ করে আদিবাসীদের কথ্য ভাষাগুলি, ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনও সুস্থিতি আসেনি। নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বা জনগণনাকারীদের অমনোযোগী মনোভাবের জন্য সাদরি, হিন্দি ও কুরুখ ভাষার বাচকসংখ্যার বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দেখানো হয়েছে। জেলায় সম্প্রদায়গত দিক থেকে বাঙালি জনসংখ্যার পরেই ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর স্থান। এঁদের মাতৃভাষা কুরুখ। কিন্তু জেলার অন্যান্য ৩১টি অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মতো এঁদেরও দ্বিতীয় মাতৃভাষা সাদরি। কুরুখভাষী ওরাওঁ সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরে এবং বাইরে সাদরি ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। সাদরি প্রকৃতপক্ষে জলপাইগুড়ি জেলার অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়েরও (চাবাগানে বসবাসকারী) আন্তঃগোষ্ঠী যোগাযোগের ভাষা রূপে স্থান করে নিয়েছে। বিভিন্ন জনগণনা অনুসারে জেলার প্রধান প্রভাবশালী ভাষাগুলির বাচকসংখ্যা এবং সংখ্যাগত অবস্থান নিম্নরূপ :

সারণি ৩

জনগণনার বছর	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম
১৯৬১	বাংলা ৬,৩৮,০৯০	কুরুখ/ওরাওঁ ১,৬১,৩৩০	নেপালি ১,০৬,৯০৮	হিন্দি ৭৯,৬১৪	সাদ্‌রি ৭৬,৬১০
১৯৭১	বাংলা ১০,৫৪,২৫৫	হিন্দি ২,৬২,১৯৯	কুরুখ/ওরাওঁ ১,৪৪,৭৮০	নেপালি ১,২৮,৭৬৫	
১৯৯১	বাংলা ১৯,০৩,০১২	সাদ্‌রি ৩,২২,৮৭৩	নেপালি ১,৭৯,৮৬৪	কুরুখ/ওরাওঁ ১,০১,২৬৫	হিন্দি ৯২,৭৭৩

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলায় লোকগণনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাচকগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাত কারণে গরমিল থেকে গিয়েছে। ১৯৬১ সালে ও ১৯৯১ সালে হিন্দি ভাষা যেখানে

যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে, সেখানে ১৯৭১ সালে হিন্দিভাষীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাচকগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার প্রথম দুটি জনসংখ্যায় সাদরি ভাষার বাচকগোষ্ঠীর সংখ্যা যেখানে নগণ্য দেখানো হয়েছে, ১৯৯১ সালে সেখানে এই বাচকগোষ্ঠীকে দ্বিতীয় স্থানে দেখানো হয়েছে। বর্তমান লেখকের মতে, বাচকগোষ্ঠীর সংখ্যার দিক থেকে সাদরিকে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাচকগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করাই স্বাভাবিক। কারণ এই জেলায় চা-বাগানে এমনকি চা-বাগানের যে ৩১টি অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক বাস করেন তাঁদের সকলেরই দ্বিতীয় মাতৃভাষা সাদরি। সেদিক থেকে সাদরি বাচক সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে।

অন্যদিকে জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালিদের পরই নেপালি জনগোষ্ঠী জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। এককভাবে ওরাওঁ জনগোষ্ঠী জেলার তৃতীয় জনগোষ্ঠী। এরপর রয়েছে সাঁওতাল (২৮,৯৩৫ জন), মুন্ডা (২১,২৬৯ জন), বোড়ো (১৮,৮২১ জন) এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী।

এ ধরনের ভাষাগত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুদ্র ভাষাগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। জেলায় নেপাল থেকে আগত আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ ১১টি জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যে তাঁদের ভাষা পরিত্যাগ করে নেপালি ভাষাকে তাঁদের মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের শিক্ষা সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে নেপালি ভাষা প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। কোনো কোনো নেপালি আদিবাসীর মধ্যে লোকসংস্কৃতির কিছু কিছু আঙ্গিক (নাচ-গান, মন্ত্র প্রভৃতি) এখনও কোনোভাবে টিকে থাকলেও তাঁদের ভাষা ব্যবহার ক্ষেত্র প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে লিম্বু, তামাং প্রভৃতি বাচকগোষ্ঠী এখনও উত্তরবঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ মাতৃভাষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জেলা গঠনের প্রথম পর্বে চা-বাগান অঞ্চলে মুদি-মহাজনী কারবার ও কাঠের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে জেলার উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন পৌর ও অপৌর শহর বা ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঙালিদের মতো গুজরাটি, রাজস্থানি (মাড়োয়ারি), হরিয়ানি, বিহারি, ওড়িয়া প্রভৃতি বহু ভাষাভাষী মানুষের দল ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে এসে বসতি স্থাপন করেন। এঁদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মাতৃভাষা থাকলেও, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক

(Inter community communication) বজায় রাখার ক্ষেত্রে এঁরা এক ধরনের হিন্দুস্থানি বা হিন্দির ব্যবহার শুরু করেন, যা ব্যাকরণগত দিক থেকে শুদ্ধ হিন্দির তুলনায় অনেকাংশে শিথিল। এ ভাষা ছিল শুধু তাঁদের বাইরের যোগাযোগের ভাষা; গৃহপরিবেশে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ মাতৃভাষাই ব্যবহার করতেন, এখনও করেন। কিন্তু চা-বাগানের আদিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে কর্মসূত্রে বিশেষ করে কেনাবেচার সূত্রে যখন কথা বলতেন, তখন তাঁরা সাদরি ব্যবহার করতেন। যাই হোক, নিজেদের মধ্যে কথা বলার সূত্রে এভাবেই চা-বাগান ও অরণ্য বলয়ে কয়েকটি সীমিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথাকথিত 'হিন্দি ভাষা' চালু হয়। ব্রিটিশ সাহেবরাও এ ধরনের হিন্দিকে আরও কিছুটা শিথিল করে নিজেদের উচ্চারণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন (অবশ্যই খুব প্রয়োজন হলে তবেই)। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ম্যানেজারদের পরিবর্তে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে নানা জাতির মানুষ চা-বাগানের 'সাহেব' (ম্যানেজার) হিসেবে যোগদান করেন। এঁদের আগমনের ফলে একই ভাবে হিন্দি ভাষায় আরও গতি সঞ্চার হয়, যদিও এঁদের সকলের মাতৃভাষা হিন্দি নয়। ইতিমধ্যে জেলার ১৫৩টি সাবেক চা-বাগানের প্রায় প্রত্যেকটিতে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়। জেলা প্রশাসন ও শ্রমিক নেতাদের উদাসীনতা এবং চা-শ্রমিকদের অজ্ঞতার সুযোগে কোনো অজ্ঞাত কারণে চা-বাগানের এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষার কাজ চালু হয়ে যায়। পৃষ্ঠপোষকতা ও চর্চার অভাবে একদিকে ৩১টি অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনজাতির ভাষা বিলুপ্ত হতে থাকে। এমনকি তাঁরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য যে সাদ্‌রি বা 'সাদান' ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই সাদরি ভাষা হিন্দির প্রভাবে প্রভাবিত হতে শুরু করে। ফলে বর্তমানে তাঁদের মধ্যে বাইরের যোগাযোগের ক্ষেত্রে একধরনের অবিশুদ্ধ হিন্দি ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে। অথচ এক্ষেত্রে তাঁদের কাছে শিক্ষার ভাষা বা যোগাযোগের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা শেখার কোনো অবকাশ তৈরি হল না। বরং বাংলা ভাষার সঙ্গে সংহতিপ্রবণ মানসিকতা থেকে তাঁরা আরও দূরে সরে যাচ্ছেন।

আসলে কোনো অজ্ঞাত কারণে জেলার চা-বলয়ে বাংলা ভাষার প্রভাব অনেকটাই শিথিল। বর্তমানে হিন্দি ভাষা-সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক

হচ্ছেন— গুজরাটি, রাজস্থানি (রাজস্থানিও এই ভাষা বর্তমানে হিন্দির প্রতিস্পর্ধী হিসেবে হুমকির সম্মুখীন), বিহারি, হরিয়ানি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি বিত্তবান শ্রেণি। এককভাবে এঁদের কারো মাতৃভাষাই এই অঞ্চলে কোনো প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। ফলে এঁরা নিজ নিজ মাতৃভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষাকে বিদ্যালয় শিক্ষা প্রসারের ভাষা হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। আবার যে-কোনো ভাষা সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে যে আর্থিক আনুকূল্য প্রয়োজন, যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন, সেই সাধ্য এবং স্থিতিশীলতা এঁদের রয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক আনুকূল্য ছাড়াই ডুয়ার্স এলাকায় বেশ কিছু বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে জুটেছে রাজনৈতিক আনুকূল্য।

অন্যদিকে, জেলার চা-বাগান ও বনাঞ্চলে সামরিক ছাউনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে হিন্দি মাধ্যম কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। জেলার নানা স্থানে হিন্দি বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে খ্রিস্টান মিশনারিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যে বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে রাঁচির মিশনগুলির যোগাযোগ খুব বেশি। সামগ্রিকভাবে বলা চলে জেলার প্রধান প্রভাবশালী ভাষা বাংলার সঙ্গে সাদরির মতো সংগতিপ্রবণ বাচকগোষ্ঠীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে প্রায় ৩৬টিরও বেশি বাচকগোষ্ঠী হিন্দি ভাষার সঙ্গে নিজেদের সংহত করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। অথচ একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, সাদরি ভাষাকে তাঁরা একসময় নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যে ভাষা এখনও মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত মানুষ ছাড়া আর সকলে ঘরে-বাইরে ব্যবহার করে থাকেন, সেই ভাষার সঙ্গে (সাদ্‌রির সঙ্গে) হিন্দির চেয়ে বাংলার নৈকট্য অনেক বেশি। ইউনেসকোর জেনিভা ঘোষণাপত্র অনুসারে যদি প্রাথমিক স্তরে সাদরি ও বাংলার মাধ্যমে এবং পরে রাজ্যের বা ওই অঞ্চলের সর্বাধিক প্রভাবশালী ভাষার মাধ্যমে তাঁদের জন্য বিশ্বের দুয়ার খুলে দেওয়া হতো, তাতেই তাঁদের এবং এই অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সংহতিপ্রবণতা আরও সুসংগত রূপ লাভ করত।

কারণ চা-বাগানে বসবাসকারী ৩১টি অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনজাতি যে অঞ্চল থেকে এখানে এসেছিলেন, সে অঞ্চলের ভাষা হিন্দি নয়। অবিভক্ত বিহারের প্রকৃত মাতৃভাষা হিন্দি নয়। সেখানে প্রধানত তিনটি ভাষা—ক) মৈথিলী খ) ভোজপুরি ও গ) মাগধী। কিন্তু এককভাবে কোনো ভাষাই সমগ্র বিহারের ভাষা

হিসেবে স্থান করে নিতে পারেনি। এই অবস্থার অবসানের জন্য তৎকালীন বিহারের শিক্ষা অধিকর্তা ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং দ্বারভাঙ্গার মহারাজার উদ্যোগে বিহারে হিন্দি ভাষা রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে। দ্বিতীয়ত, যে ঝাড়খণ্ড এলাকায় সাদরি ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে, সেখানে এখনও অধিকাংশ মানুষের কথ্য ভাষা ঝাড়খণ্ডি বাংলা। এর ফলেই সাদরি ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে বাংলা ভাষার। এছাড়া ওড়িয়া এবং ভোজপুরি ভাষার প্রভাব অবশ্যই কিছুটা রয়েছে বলা যেতে পারে। সাদরি ভাষার প্রতিষ্ঠিত গবেষক ড. সমীর চক্রবর্তী সাদরি ভাষাকে বাংলার 'ভগিনী' বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে আমাদের বক্তব্য কোনো বিশেষ ভাষার বিরুদ্ধে নয়। আবার একটা জনগোষ্ঠী কোন ভাষাকে নিজের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করবে, তাও নির্ভর করে সেই ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষিত যুবসমাজের চেতনার ওপর। এক্ষেত্রে ডুয়ার্সে বসবাসকারী বিপুলসংখ্যক সাদ্‌রি ভাষার মানুষ বাংলার পরিবর্তে যদি অন্য ভাষা গ্রহণ করেন তবে তা তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের পক্ষে যেমন সহায়ক হবে না, তেমনই যে ভৌগোলিক অঞ্চলে চিরকাল বসবাস করতে হবে সেই এলাকার ভাষা পরিবেশগত ভারসাম্যের পক্ষেও অনুকূল হবে না। লন্ডনে থেকে কোনো ভারতীয় যদি তাঁর মাতৃভাষা বা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষালাভ না করে, চিনা ভাষায় বা আরবি ভাষায় শিক্ষালাভ করেন, তবে তাঁর সাংস্কৃতিক বিকাশক্ষেত্র যেমন সংকুচিত হয়ে পড়বে, এক্ষেত্রেও একই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চা-বাগানের এলাকার বাইরে যেসব অস্ট্রিক দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মানুষ কোনো কৃষিবলয়ে বা শহরে বসবাস করছেন, তাঁদের দিকে তাকালেই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। জেলার কৃষিবলয়ে এসব জনজাতির যেসব পরিবার বসবাস করছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে সমাজ সংহতির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভাষা ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতামূলক (Linguistic or cultural communalism) কোনো চিন্তাধারা তাঁদের মানসিকতায় দানা বাঁধতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে এসব জনজাতি গোষ্ঠীর নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশের ধারাকে সচল রাখার অবকাশ থাকা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ বিভাগ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী লোকসংস্কৃতিকেন্দ্র (Folk and Tribal Folk culture) প্রভৃতি সংস্থা

প্রশংসনীয়ভাবে রাজ্যের সব আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ধারাকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। বরং বলা চলে চা-বাগানের প্রশাসনিক সীমানার বাইরেই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার ধারার সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। আশার কথা, বিগত বছরগুলিতে ওরাওঁ, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাঁদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন শুরু করেছেন। এসব ভাষায় লিখিত হচ্ছে কাহিনি (গল্প), নাটক ও কবিতা। এর পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে সাদরি ভাষায় সাহিত্যচর্চা হয়ে আসছিল, সেই ধারাকেও লোকসংস্কৃতির স্তর থেকে আধুনিক সৃষ্টিশীল ধারায় উন্নীত করবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সাদরি ভাষায় সংবাদ ও সাহিত্যপত্র প্রকাশের পাশাপাশি নাটক ও কবিতা রচনার কাজও এগিয়ে চলেছে। এমনকি সাদরি ভাষায় ইতিমধ্যে বেশ কিছু গানের ক্যাসেট এবং সিনেমাও (পেয়ারকে ডহর, সাঝ বিহান ইত্যাদি) প্রস্তুত হয়েছে।

কিন্তু সাদ্‌রি ভাষা এখন হুমকির সম্মুখীন। প্রথমত, শিক্ষার ভাষা বা নিজস্ব রীতিতে চিরায়ত জ্ঞান বিকাশের ভাষা হিসেবে (সংস্কৃতি বিকাশের বাহন হিসেবে) সাদরির যে গুরুত্ব ছিল, হিন্দির প্রভাবে তা কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ছে। আবার গত দু-তিন দশক থেকে সাদরি ভাষা যেন একধরনের হিন্দিকরণের (Hindiaisation) প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে না হলেও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে, হিন্দি শব্দভাণ্ডারের অনুপ্রবেশ ঘটছে। বাংলা ও সাদরি বেশ কিছু সমার্থক শব্দ (Synonymous) প্রতিনিয়ত স্থানচ্যুত হচ্ছে এবং তার জায়গায় হিন্দি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, সাঁঝ (সাম), বিহান/বেহান (ফজির), বাঢ়ন/বাঢ়হন (ঝাড়/বা/হি), তিত্রি/তেঁতুল (ইমলি) ইত্যাদি। এ ধরনের হিন্দি শব্দ এখনও বয়স্ক মানুষদের মুখের ভাষায় প্রবেশ না করলেও শিক্ষিত যুবসমাজ ক্রমশ হিন্দিকরণের প্রক্রিয়াকে স্বীকার করে নিচ্ছে। অথচ চা-বাগানে যেসব অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করছেন তাঁদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র আজ আর শুধুমাত্র চা-বাগানের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেরও প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতির সীমানা ছাড়িয়ে তাঁদের পক্ষে আর তাঁদের প্রব্রজন-পূর্ব (Pre-migration) পূর্বপুরুষের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব

নয়। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজনেই তাঁদের রাজ্যের সর্বাধিক প্রভাবশালী ভাষার (বাংলার) সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে। রাজ্যের সর্বত্র পঞ্চায়েতের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, এ প্রয়োজন আরও বেশি করে দেখা দিয়েছে। কারণ গ্রামসীমার বাইরে পঞ্চায়েত কার্যালয়, হাটবাজার, হাসপাতাল, জেলার প্রশাসন কেন্দ্র, উচ্চশিক্ষার অঙ্গন, সর্বত্র তাঁদের বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে। জেলায় বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা থেকে এ ধারণা আরও একটু পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

সারণি - ৪

উত্তরবঙ্গের/জলপাইগুড়ির প্রধান জনজাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও ভাষাগ্রহণ প্রবণতা (১৯৯৯)

জনজাতির নাম	মাতৃভাষা	বাংলা	সাদরি	নেপালি	হিন্দি	
(ভোট-চিনীয়)						দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি গোষ্ঠী নেপালি ভাষা ব্যবহার করেন।
ভুটিয়া/ডুকপা	ভুটিয়া	+		++		
লেপচা	লেপচা	—		++		
শেরপা	শেরপা	—		++		
লিম্বু	লিম্বু	—		++		
টোটো	টোটো	+		++		
মেচ (বোড়ো)	বোড়ো	++				সমতলে বসবাসকারী নেপালি জাতি, জনজাতিও প্রধানত নেপালি ভাষা ব্যবহার করেন। এছাড়া আছে বাংলা, হিন্দি, সাদ্রি ভাষা। সমতলের জনজাতির মানুষেরা বাংলা ভাষাকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছেন। এঁদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা।
রাভা	রাভা	++				
গারো	গারো	++				
চাকমা	চাকমা	++				
হাজোং	হাজোং	++				
মগ	মগ	++				

<table>
<tr><td>(অস্ট্রিক)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">জলপাইগুড়ি জেলায় বসবাসকারী জনজাতির মানুষরা প্রায় সকলেই বাংলা বলতে পারেন। শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি। একটা অংশ বর্তমানে বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করছেন।</td></tr>
<tr><td>মুণ্ডা</td><td>মুণ্ডারি</td><td>+</td><td>++</td><td></td><td>+</td></tr>
<tr><td>সাঁওতাল</td><td>সাঁওতালি</td><td>+</td><td>++</td><td></td><td>+</td></tr>
<tr><td>নাগোসিয়া</td><td>সাদ্‌রি</td><td>+</td><td>++</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>মহালি</td><td>মুণ্ডারি</td><td>+</td><td>++</td><td></td><td>+</td></tr>
<tr><td>কোরা/কোড়া</td><td>মুণ্ডারি</td><td>+</td><td>++</td><td></td><td>+</td></tr>
<tr><td colspan="7">(দ্রাবিড়)</td></tr>
<tr><td>ওরাওঁ</td><td>কুরুখ</td><td>+</td><td>++</td><td></td><td rowspan="2">+</td><td rowspan="2">ঐ</td></tr>
<tr><td>মালপাহাড়ি</td><td>মালতো</td><td>++</td><td>+</td><td></td></tr>
</table>

+ শিক্ষার প্রয়োজনে বা আংশিকভাগে গ্রহণ করেছেন।
++ প্রায় মাতৃভাষার মতো দ্বিতীয় ভাষা।

সারণি-৪ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভাষা ব্যবহারের একটা বাস্তবিক পরিবেশ যে-কোনো মানুষকে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। এক্ষেত্রে যে কেউ তাঁর নিজের মাতৃভাষাকে ক্ষুণ্ণ না করে যখন কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্য ভাষা ব্যবহারের পরিবেশের অনুকূল কোনো ভাষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে (ইউনেসকোর ঘোষণাপত্র অনুসারে) তাঁর মাতৃভাষা বা দ্বিতীয় মাতৃভাষার (এক্ষেত্রে সাদরি) মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করে পরবর্তী স্তরে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করলেই, তাঁর পক্ষে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে। অন্যদিকে, তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের (সরকারি-বেসরকারি কার্যালয়, শিক্ষায়তন, হাসপাতাল ইত্যাদি) এলাকাও সম্প্রসারিত হবে। অন্যথায় তাঁর সাংস্কৃতিক বিকাশ ও জীবিকার ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়বে। জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান বনবস্তি এবং বহিরাগত জনগোষ্ঠীর বসবাসের এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যে এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। অসম, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যের মতো এই এলাকার সুস্পষ্ট কোনো ভাষানীতি না থাকায় বিদ্যালয়ছুট, অল্পশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে বৃহত্তর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারও তাঁদের কাছে অধরাই থেকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তাঁদের ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে বিশেষ বিশেষ বাচকগোষ্ঠীকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁরা কোন পথে যাবেন এবং কীভাবে তাঁদের মাতৃভাষা বা দ্বিতীয় মাতৃভাষার ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবেন।

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সংখ্যাগুরু বাচকগোষ্ঠীর অনেক ভাষাই অস্তিত্বের অস্থিরতায় ভুগছে, বাজারি ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ গ্রাস করছে সমগ্র বিশ্বকে, সেখানে কোনো কোনো ক্ষুদ্র বাচকগোষ্ঠীর ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার অসীম প্রাণপ্রাচুর্য ও সাংস্কৃতিক (সাহিত্যিকও) ঐতিহ্য না থাকলে তার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনজাতি এবং নেপাল থেকে আগত জনজাতির গোষ্ঠীর মাতৃভাষা আজ হয় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অথবা বিলুপ্তির পথে। তাঁরা ইতিমধ্যেই নেপালি বা সাদরির মতো একটি দ্বিতীয় ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী কালে নতুনতর সিদ্ধান্ত তাঁরাই গ্রহণ করবেন। আবার চা-বাগান পত্তনের সূত্রে যেসব অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনজাতির মানুষ অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন (উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের মতো) তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষার পরিবর্তে অসমিয়া বা বাংলা ভাষাকে কাজের ভাষা ও শিক্ষার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেসব মাদ্রাজি শ্রমিক কেরালার চা-বাগানগুলিতে বসবাস করছেন তাঁরা প্রাথমিক স্তরে তেলুগু ও মালয়ালমের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করলেও পরবর্তী সকলপ্রকার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মালয়ালম ভাষামাধ্যমকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে এসব এলাকায় জাতিগত সংহতির ক্ষেত্রে অন্তত একটা ভাষাগত সান্নিধ্যের সুযোগ ঘটেছে। ব্যতিক্রম হচ্ছে উত্তরবঙ্গের চাশ্রমিকদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যার ফলে স্থানিক সংহতি প্রক্রিয়া অনেকটা পরিমাণে ব্যাহত হচ্ছে। আবার তাঁদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। জেলার আদি জনজাতিগোষ্ঠী এবং যেসব বহিরাগত জনজাতির মানুষেরা বর্তমানে স্থায়ীভাবে চা-বাগানের এলাকার বাগানে কৃষিবলয়ে বা শহরে বন্দরে বসবাস করছেন, শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যমকে গ্রহণ করায় তাঁরা যেমন বৃহত্তর জনমানুষের কাছাকাছি আসতে পেরেছেন, তেমনই অন্যদের তুলনায়

অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে জেলার ক্ষুদ্র ভাষার বাচকগোষ্ঠীর ভবিষ্যতে কী হবে, সময়ই সে পথের সন্ধান দেবে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০২২

সহায়ক গ্রন্থ :

১. B. Roy, District Handbook, Jalpaiguri, 1961 Census.

২. M. Martin's Eastern India, Vol-3, p. 440, 1838.

৩. W.W Hunter, A Statistical Account of Bengal. Vol-X, 1876.

৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি।

৫. Lilling Stone, Teesta Valley Working Plan, 1895.

৬. পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, সাদরির রূপরেখা।

৭. ড. সমীর চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, মনীষা, কলকাতা।

৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

৯. 'সংবিধান', ভারতীয় ক্ষুদ্রভাষার অধ্যয়ন ও উন্নয়নকেন্দ্র, কলকাতা।

১০. C.C Sanyal, The Limbus—a South-Eastern Himalayan Kiratese People, 1979.

১১. Gopal Man Tandukar, Kirattese at a glance Kathmandu, Nepal, 1984.

১২. ড. হীরাচরণ নারজিনারী—'মেচ সংস্কৃতি ও সভ্যতা', কলকাতা, ১৯৮৬।

১৩. মালিনী ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান স্মারকগ্রন্থ—উত্তরবঙ্গের জনজাতি : আর্থ সামাজিক রূপান্তর—বিমলেন্দু মজুমদার, পৃঃ ২৭৪, ১৯৯৯। লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র।

১৪. ড. নির্মল দাশ, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, সাহিত্যবিহার, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭

টোটোপাড়া ফিরে দেখা

বিমলেন্দু মজুমদার

টোটোপাড়া গ্রামটি একটি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত। এই পাহাড়টির আদি নাম ছিল, তা-ডিং, যার অর্থ, ঘোড়া গ্রাম(তা = ঘোড়া, ডিং = গ্রাম)। প্রাচীন হিমালয়ে যাতায়াতের সুবিধের জন্য মাঝেমাঝেই কতগুলো পান্থনিবাস বা চটি থাকত। এবং সেখানে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য সেই গ্রামে ঘোড়া ও খচ্চর পাওয়া যেত। সম্ভবত টোটোপাড়াতেও একসময় পরিবাহী পশু পরিবর্তনের ব্যবস্থা ছিল। সেকারণেই এই পাহাড়ি স্থানটির আদি নাম ছিল 'তা-ডিং'।

যে কোনো ছোটো জনগোষ্ঠীর জাতি-নাম হয় তারা নিজেরা দেয়, না-হলে তাদের কোনো প্রতিবেশী তাদের নামকরণ করে। টোটোদের নামকরণও করে তাদের নিকটতম প্রতিবেশী শেরপা সম্প্রদায়। তিব্বতি উচ্চারণে শব্দটি TAKTOK-PA, অর্থাৎ, উচ্চ তিব্বতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। কোনো পার্বত্য অঞ্চলের দশ থেকে বারো হাজার ফিটের বেশি উচ্চতায় যারা বাস করে, এখানে তাদেরকেই উচ্চ তিব্বতের অধিবাসী বলে বোঝানো হয়েছে। অন্য দিকে, শেরপারা দাবি করে যে, টোটোরা তাদেরই একটি প্রধান গোত্রের উপগোত্রের মানুষ। সেই প্রধান গোত্রটির নাম মিঞাগ-পা (Minyagpa)। এই গোত্রের অধীনে টোটো নামে আরও পাঁচটি উপগোত্র দেখা যায়। যেমন—টোটো (TAKTOK), টোটো-গার্জা (TAKTOK-GARZA), টোটো-পা (TAKTOK-PA), টোটো-পিনাসা (TAKTOK-PINASA), সারিটোকপা (SHARITOKPA)। কিন্তু

বর্তমানে টোটোপাড়া এবং ভুটান ও অরুণাচলের টোটোরা ছাড়া আর কোনো গোত্রনামের জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় না।

টোটোদের সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায় মাইকেল আরিসের 'ভুটান' গ্রন্থে। তিনিই প্রথম TAKTOK শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি লিখেছেন ভুটানের অভ্যন্তরে দুর্গম প্রান্তে TAKTOK Kha গ্রামে তিনি টোটোদের দেখা পান। বিছুটি গাছের আঁশে বোনা কাপড়ে টোটো পুরুষদের পোশাক পরতে দেখেন। তারপর তিনি টোটোপাড়া ঘুরতেও আসেন, তখন তিনি টোটোদের দেখে সিদ্ধান্তে আসেন যে এরা আসলে TAKTOK জাতির একটা অংশ।

TAKTOK শব্দটির সঠিক উচ্চারণ জানার জন্য তিনি তিব্বতি ভাষাবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুনীতি পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারেন যে শব্দটির উচ্চারণ টোটো। পরে শেরপাদের নিয়ে লিখতে গিয়ে লেখক টোটোদের এই গোত্রগুলির সন্ধান পান।

প্রাচীনকালে প্রান্তীয় উত্তরবাংলায় কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামকে সেই জনগোষ্ঠীর নামের শেষে পাড়া বা বস্তি যুক্ত করে সেই গ্রামের নামকরণ করা হত। ভুটান শাসনকালে টোটোপাড়ার টোটোরা বাস করত ডয়াপাড়া যাওয়ার পথে মু-তি (রক্তাক্ত নদী) নদীর পূর্বতীরে জেন-চু নামক গ্রামে। তখন টোটোপাড়ায় বাস করত রাভা জনগোষ্ঠী। তাদের সেই গ্রামের নাম ছিল সম্ভবত রাভাবস্তি। রাভাদের ধান চাষের জমি ছিল কুয়াপানিতে (মেরেম-তি), যার পরিমাণ ছিল প্রায় চার'শ একর। তারাই ছিল টোটোপাড়ার আদি বাসিন্দা। সেখানকার বর্ষপ্রাচীন কাঁঠাল গাছগুলি ছিল তাদেরই রোপণ করা। পরে পশ্চিম ডুয়ার্সে ভুটান শাসন শুরু হলে সরকারি নির্দেশে টোটোরা টোটোপাড়াতে এসে বসতি স্থাপন করে। সে-সময় রাভারা টোটোপাড়ারই দক্ষিণ-পূর্বাংশে সরে আসে এবং সেখানেই থেকে যায়। এভাবে দীর্ঘকাল টোটো ও রাভারা একই গ্রামে বসবাস করতে থাকে।

এই দীর্ঘ সময় রাভা আর টোটোরা একই সঙ্গে বসবাস করার ফলে টোটোদের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণের ওপরে রাভা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তার মধ্যে অন্যতম হল 'গারাম পূজা' | রাভারা চলে যাওয়ার পরও টোটোরা দীর্ঘকাল ধরে ছাগল বলি দিয়ে রাভাদের মতো

'গারাম পূজা' করত। আর সেই পূজার পৌরোহিত্য করত একজন রাভা পুরোহিত। রাভাদের আরও কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান টোটোরা পালন করত, যেগুলো এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনুমান করা যায় যে, টোটোরা এখনও নানা অনুষ্ঠানে যে ঢোল বাজিয়ে নাচগান করে, সেই ঢোল তৈরি করে রাভারাই, যার সঙ্গে আদি টোটো সংস্কৃতির কোনো মিল নেই। টোটোরা মূলত তিব্বতি বা ভুটিয়া জনগোষ্ঠীর শরিক। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে তিব্বতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরনের ঢোলের কোনো প্রচলন নেই। টোটোরা পুজোর সময় যে দুটো মাটির কলসি ব্যবহার করে, সেই কলসির সঙ্গে রাভাদের 'রৌন্তুক' ও 'বাসেক' দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। তিব্বতি বংশোদ্ভূত কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেবতার প্রতীক হিসেবে এই ধরনের মাটির কলসির ব্যবহার আছে বলে জানা যায় না। ফলে এই দুটো মাটির কলসিকে 'রৌন্তুক' ও 'বাসেক'-এর পরিবর্তিত রূপ বলে অনুমান করা যেতে পারে।

টোটোদের আরেকটি পুজোর নাম 'ওঞ্চু'। এই পুজো টোটোদের নিজস্ব পুজো কিনা সন্দেহ আছে। বক্সাদুয়ারের দ্রুক-পারা সমবেতভাবে গ্রামের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য 'ওম-চু' পুজো করে। পুজোর শেষে সকল গ্রামবাসীরা সমবেত ভোজে অংশগ্রহণ করে। এখানে টোটোদের 'ওঞ্চু' পুজোর সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। টোটোরা দীর্ঘকাল ভুটানের প্রজা থাকার ফলে তাদের ওপর দ্রুক-পাদের 'ওম-চু' পুজোর প্রভাব পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এরপর ১৮৬৪–৬৫ সালে পশ্চিম ডুয়ার্স এলাকা ইংরেজের অধিকারে আসে। তার কিছুকাল পরেই প্রণয়ন করা হয় ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইন। সেসময় সরকারি নির্দেশে রাভারা বন-শ্রমিক হিসেবে টোটোপাড়া ছেড়ে বান্দাপানি বনাঞ্চলে চলে যায় (১৮৯৪ খ্রিঃ)। আর তখন থেকে টোটোরা কুয়াপানি অঞ্চলে অবস্থিত রাভাদের জমি চাষ করতে শুরু করে। তাতে বনবিভাগ কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। বরং এর পরিবর্তে গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তৈরি করা টোটোদের যে পথ ছিল, সেই পথ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব বনবিভাগ থেকে টোটোদেরকেই দেওয়া হয়। তার পর থেকে প্রতি বছর বর্ষার শেষে কয়েকদিন পরিশ্রম করে টোটোরা ওই পথের দু-পাশের বনজঙ্গল কেটে চলাচলের রাস্তা সাফ করত। বনবিভাগ থেকে টোটোদের এই সাফাইকারী

দলটির জন্য সেসময়ে বছরে পাঁচ টাকা বরাদ্দ করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও একইভাবে টোটোরা কুয়াপানির সেই জমিতে চাষের কাজ করতে থাকে। তাতেও কোনো বাধা আসেনি। কিন্তু আনুমানিক ১৯৮৪ সালে বনবিভাগের পক্ষ থেকে একতরফাভাবে ওই জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে বনায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে টোটোরা খুব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এইসময় বনমন্ত্রী ছিলেন মাননীয় পরিমল মিত্র। সেসময় টোটোপাড়াতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে বর্তমান লেখক তাঁকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলেন এবং ঘুরিয়ে দেখান। এরপর লেখক তাঁর কাছে টোটোদের জন্য সমপরিমাণে বিকল্প জমির আবেদন জানান। সমস্ত কিছু শোনার পরে শ্রী মিত্র লেখককে বলেন যে, কাছাকাছি কোনো উপযুক্ত জমি দেখে বিকল্প হিসেবে সেই জমি টোটোদের নামে বরাদ্দ করা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এর কিছুদিন পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরিমল মিত্র মারা যান। পরবর্তীকালে অনেক অনুরোধ করা সত্বেও কোনো বনমন্ত্রীই এই সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টা করেননি। ফলে টোটোদের আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে।

টোটোপাড়া গ্রামেই টোটো মণ্ডল ধনপতি টোটোর নামে প্রায় ২০০০ একর জমি সংরক্ষিত জমি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। সেই জমিতে বহিরাগত কোনো মানুষের বসতি স্থাপনের কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে নানা কৌশলে টোটোদের জমিতে বহিরাগতদের বসতি স্থাপন করা শুরু হয়। অথচ ভারতের আদিবাসী ভূমি সংরক্ষণ আইনে কঠোরভাবে বলা হয়েছে যে, আদিবাসীদের জমি কোনোভাবে দখল করা যাবে না। যদি দখল হয়েও থাকে, সেই জমি বিনা ক্ষতিপূরণে দখলমুক্ত করার দায়িত্ব সরকারের বা জেলা প্রশাসনের। অথচ এক্ষেত্রে তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন বহিরাগতদের হাত থেকে জমি উদ্ধারের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানা নেই। বরং জেলা প্রশাসন সে-বছর চাষ করা হয়েছে এমন সামান্য কিছু জমি ওই টোটো পরিবারগুলির নামে নথিভুক্ত করে এবং অবশিষ্ট জমি সরকারের খাস হিসেবে ঘোষণা করে। এভাবে টোটোদের নিজেদের জমির ওপর তাদের অধিকার সীমিত হয়ে পড়ে। আবার আজকের নির্বাচিত বিধায়ক ও সাংসদদের মতোই প্রথম থেকেই বহিরাগতরা দলবদলের চাল চালতে অভ্যস্ত

হয়ে ওঠে। রাজ্যে যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, তারাও রাতারাতি সেই দলের ভোটারে পরিণত হয়। আর আদর্শহীন রাজনৈতিক নেতারা এই ভোটব্যাংক তাদের দখলে আসার আনন্দে টোটোদের কথা ভাবা তো দূরের কথা, স্বদেশের স্বার্থের কথাও ভাবতে ভুলে যায়। বিশেষ করে, ভোটার সংখ্যা কম হওয়ায় টোটোদের কথা কেউ ভাবেনি। ফলে তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এখন টোটোদের নিজেদের জমিতেই বহু টোটো পরিবার ভূমিহীন হয়ে পড়েছে।

আমাদের কাছে কোনো সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান নেই। সেইজন্য এখানে আদিবাসী ও অন্যান্য গোষ্ঠী উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	দখলীকৃত জনগোষ্ঠী/ জমির মালিকানা	একর হিসেবে
১.	টোটোদের যৌথ সম্পত্তি হিসেবে নথিভুক্ত জমির পরিমান (টোটো মণ্ডল ধনপতি টোটোর নামে নথিভুক্ত)	১৯৯১.৩০
২.	টোটোদের অধিকারে থাকা জমির পরিমাণ	৩১২.১৬
৩.	জমি আছে এমন টোটো পরিবারের সংখ্যা	৮৯টি
৪.	নেপালিদের দ্বারা অধিকৃত জমির পরিমাণ	১১৯৮:০৮
৫.	মোট টোটো পরিবারের সংখ্যা	২০৫টি
৬.	বনভূমি ও পাহাড়ি খাড়াই ঢাল	৪৬৫.১০
৭.	স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি	১৬.০৫

এই পরিসংখ্যান থেকেই টোটোপাড়ার ভূমি ব্যবহার-চিত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। আজও এই সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। এই অবস্থায় মনে হয়, পরিবেশ ও বনভূমির দিকে হাত না বাড়িয়ে টোটোপাড়ার মধ্যেই টোটোদের জীবন-জীবিকার ও হৃত জমি পুনরুদ্ধারের সমাধান সূত্র খুঁজতে হবে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০২২

টোটোপাড়ায় টোটোদের জীবনধারা

সত্যজিৎ টোটো

বিরাট বনজঙ্গল, পাহাড়, নদী-নালা। তার মাঝে একদল মানুষ বাস করত। সেই মানুষদের জানা নেই 'আমরা কোন দেশের বা কোন জাতির।' ওরা আপন মনে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের পশুপ্রাণীদের সাথে লড়াই করে। সেইটি ওদের দৈনন্দিন কাজ। অনেকবার শিকার করতে গিয়ে প্রাণও দিতে হয়েছে।

তাদের জীবনযাপনে সারাদিন শিকার করা আর জঙ্গলের ফল ও কন্দ খোঁড়া। সারাদিনে যা পেত তা সবাই মিলে খেত। এভাবেই তাদের দিন কাটছিল। এই বিরাট জঙ্গলে তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না পশুপ্রাণী ছাড়া। তাদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি ছিল। তাদের মধ্যেই একজন দলপতি থাকত। অসুখ-বিসুখ হলে মন্ত্রপাঠ করা পূজারীও ছিল। তারা গাছপালা, নদীনালা, খালবিল ও পাহাড় পর্বতকে বিশ্বাস করত। এভাবে তাদের দিন হতে বছর কেটে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পূজারীকে বলা হতো পাও। উনি সবকিছু করতেন—বাচ্চার নামকরণ, সূর্য দেবতা ও আরও অনেক প্রাকৃতিক শক্তির কাছে প্রার্থনা করে সবার মঙ্গল কামনা। প্রতি বছর তাদের এক অনুষ্ঠান হতো—সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে গানের মাধ্যমে সারাবছরের ক্লান্তি কষ্ট দুঃখের কথা সেইদিন প্রকাশ করত আর মেয়েরা, বৃদ্ধারা গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করত। সারারাত চলত। নৃত্য, গান কত আনন্দ স্ফূর্তি। তাতে নেই কোনো রাজনীতি, নেই ধর্মভেদ, নেই জাতিভেদ, নেই কোনো ছোটো-বড়ো। এই অনুষ্ঠানে সবাই সমান। সারাবছরের ক্লান্তি কষ্ট সেইদিন শান্ত হতো। এভাবেই তাদের জীবন বয়ে চলত। সব পূজা

শেষ করে একদিন বা দুদিন আরাম করে আবার সেই কাজ—শিকার করা, জঙ্গলে কন্দ খোঁড়া, ফলমূল তোলা। কখনও তাদের মধ্যে ঝগড়া মারপিট হত না। তারা দল বেঁধে শিকার করত, যা পেত সকলে মিলে খেত।

একদিন সারাদিন শিকারের সন্ধানে সারা জঙ্গল ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু কিছুই পেল না। ফেরার পথে সকলেই ক্লান্ত। নদীর ধারে এসে দলপতি বললেন, 'একটু বসি'। সবাই বসল। তাদের মধ্যে একজন সারাদিনের ক্লান্তি এবং কিছু না পাওয়ার দুঃখ প্রকাশ করে নদীর ধারে বসে গান গাইল। যে গানের কথা এইরকম :

য়া টুং টুং কামুলা লাতে
পোওয়া লাগা সেনা হো মেলা গে
দাংতে য়ে দা সুংদা লামা
চাউজে মিতা ওংচো ওয়াইলাগা
মিসে নামু সিং সিং পাগা

এই গানের বাংলা অনুবাদ হবে এইরকম : সারাদিন শিকারের সন্ধানে ক্লান্ত হয়ে গেছি/শিকার কিছু পেলাম না/যখন নদীতে জল খেতে আসি/আমি দেখি জলের ভিতর অনেক মাছ খেলা করছে/আমাদের দেখে সাদা সুন্দর বক উড়ে গেছে। সেই দিন তারা শূণ্য হতে ডেরায় ফিরে আসে। সবাই অপেক্ষায় ছিল যে যারা শিকারে গেছে তারা কিছু না কিছু নিয়ে আসবে, সবাই মিলে খাব। তারা ডেরায় পৌঁছলে সবাই তাকাচ্ছে কে কী নিয়ে এল দেখতে। শূন্য হাত দেখে এবং ঘটনা শুনে সবাই হতাশ হল। দলপতিরও খুব দুঃখ, 'কালকে কথা হবে' বলে উনি নিজের ডেরায় চলে গেলেন। অন্য সবাইও নিজেদের মধ্যে গুন গুন করতে করতে নিজের নিজের ডেরায় চলে গেল। সকালে দলপতি কী বলবেন তাইই সবাই ভাবছিল। রাত হল, সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর হল, সূর্য উপরে উঠে এল। সবাই নিজ নিজ ডেরা থেকে বার হল। সবাই অপেক্ষা করছে দলপতি কখন বেরিয়ে আসে, কী শলাপরামর্শ দেয়। ভালো ঘুম না হওয়ায় অনেকের ক্লান্তি যায়নি, তবু তারাও দাঁড়িয়ে আছে দলপতির অপেক্ষায়। একটু পরেই দলপতি বার হলেন, দেখলেন যে সবাই দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। দলপতি মনে মনে ভাবলেন, এরা সব আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে আর আমি এদের জন্য কিছুই করতে পারছি না! দলপতি সবাইকে বসার অনুমতি দিলেন, নিজেও বসলেন। তারপর আলোচনা

শুরু হল। দলপতি বললেন, 'গতকালের দুঃখজনক ঘটনা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। আমরা সবাই সারাদিন শিকারের সন্ধানে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম, ক্লান্তও হলাম আর শূন্য হাতে বাড়িও ফিরলাম। এভাবে আমরা কতদিন চলব? আমাদের কিছু চিন্তাভাবনা করতে হবে। আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি, নানা চিন্তা করেছি। একটা উপায় আমার মনে হয়েছে, সবাই মন দিয়ে শুনুন। আমরা এতদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি, অনেক পশু বাছুর আমরা ধরেছি, তাদের আমরা মেরে খেয়েছি। এখন থেকে আমাদের মধ্যে কেউ যদি জীবিত গরুর বাছুর বা শুকর বাচ্চা ধরে, তাহলে সেটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে বেঁধে রেখে পালন করবে। এরপর শিকার থেকে যেদিন শূন্য হাতে ফিরতে হবে, সেইদিন ওইসব পালন করা পশু আমাদের কাজে লাগবে, গতকালের মতো দুঃখ পেতে হবে না। আর একটা ব্যাপারও বলি। আপনাদের মনে আছে কিনা জানিনা- কিছুদিন আগে আমরা যখন শিকারে গিয়েছিলাম, তখন লম্বা লম্বা লাল রঙের একটা বীজ খেয়ে দেখেছিলাম। আমার খেতে বেশ সুস্বাদু লেগেছিল। সেই জিনিষ আমরা ভাত রূপে ব্যবহার করতে পারি মাংসর সাথে। আর আমরা এখন জঙ্গলে গেলেই ওই বীজ খুঁজব আর কাছাকাছি লাগাব।' এইভাবেই তাদের মধ্যে পশুপালন শুরু হয় আর প্রথমবার ভাত এর রূপে কাউন (জোয়োঙ)-এর ব্যবহার হয়। তারপর থেকে শিকারে গিয়ে জীবিত গরুর বাছুর বা শুকর বাচ্চা ধরলে তারা ডেরায় নিয়ে এসে রাখত, মেয়েদের কাজ ছিল সেই বাছুর বা শুকর বাচ্চাকে ঘাস এবং ভাত খেতে দেওয়া। কাউনের বীজ জোগাড় করে তা চাষ করতেও কাজ অনেক— প্রথমে জঙ্গল কাটতে হবে, তাকে কিছুদিন শুকোতে দিতে হবে, তারপর তাতে আগুন লাগাতে হবে আর ছাই ঠাণ্ডা হলে ওই জায়গায় বীজ ছড়াতে হবে। এইভাবে তারা পশুপালন এবং জঙ্গল কেটে জমি বানাতে শুরু করে।

দলপতির সঙ্গে সেই আলোচনার পরের দিন ওরা সব জঙ্গলে শিকার করতে গেল। সেইদিন তাদের দুটো কাজ ছিল—শিকার এবং কাউনের বীজ তুলে নিয়ে আসা। সেইদিন তাদের ভাগ্য ভালো ছিল—কাউনের বীজও পেল, অনেক বড়ো শিকারও মারতে সক্ষম হল। সবাই খুব খুশি, দলপতিকে সবাই ধন্যবাদ দিচ্ছে, 'গতকালের কষ্ট ক্লান্তিকে আমরা দূর করলাম, আপনার বুদ্ধিতে দু-দুটো কাজ আমরা করতে পারলাম, আপনাকে আমরা সারাজীবন মনে

রাখব।’ দলপতিও খুব খুশি, সবার খুশির মহল দেখে নিজেকে যেন সামলাতে পারছেন না। তিনি মনে মনে ভাবছেন, আমার বুদ্ধি যদি সঠিক জায়গায় পড়ে আর সবার খাওয়ার যোগান হয়, তাহলে আর দুঃখের মুখ দেখতে হবে না। তিনি সবাইকে বললেন, ‘চলো, এখন আমরা ডেরায় ফিরে যাই এইসব শিকার আর কাউনের বীজ তুলে নিয়ে। খুশিতে মেতে এই জঙ্গলে রাত কাটানো ঠিক হবে না, ডেরায় গিয়ে সবার সাথে আনন্দে রাত কাটাব, আজকের শিকারের বিষয়ে বলব, সবাই খুশি হবে আর সেটাই হবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ। আজ আনন্দে রাত কাটাব।’ সবাই চেঁচিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, চলো ফিরে।’ ওরা সব ডেরার দিকে রওনা দিল। নিজেদের খুশি ডেরায় গিয়ে সকলের সাথে, পরিবারের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য অধীর। দলপতি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছেন, কাল সকালে সবার সঙ্গে বসে আলোচনা করতে হবে যে বীজ আমরা পেয়েছি তা কীভাবে এবং কোন্ সময়ে লাগানো যায়। সবাই ডেরায় পৌঁছল। দলপতি বললেন, ‘এই কাউন-এর বীজ যত্ন করে রাখবে, কাল সকালে আলোচনা হবে। তোমরা আনন্দ ফূর্তি কর। আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি।’ দলপতি তাঁর ডেরায় চলে গেলেন, বাকি সবাই আনন্দে মেতে উঠল। হৈ-হল্লা, গান, বাজনা, নাচ চলল সারারাত। খুশির সীমা ছিল না। কেউ কেউ বলল, ‘কাল দলপতি কী বলবেন দেখা যাবে, আজকের এই খুশি হাতছাড়া করা যাবে না।’

সকাল হল। সবাই অপেক্ষায় বসে আছে দলপতি আলোচনায় কী পরামর্শ দেন। সাররাতের ঘুম বাকি থাকলেও তারা শলা পরামর্শ শুনে তবেই ঘুমোতে যবে। দলপতি এলেন, আলোচনা শুরু হল। দলপতি বললেন, ‘গতকাল আমরা যত কাউনের বীজ নিয়ে এসেছি সব এক জায়গায় নিয়ে এস।’ সবাই নিজ নিজ ডেরায় গিয়ে বীজ নিয়ে আসল আর এক জায়গায় রাখল। তারপর শুরু হল কখন কবে কোথায় এই বীজ লাগান যায় তা নিয়ে আলোচনা। দলপতি বললেন, ‘এই কাউনের বীজ লাগানোর জন্য প্রথমে আমাদের জঙ্গল কাটতে হবে আর কিছুদিন শুকোতে দিতে হবে। শুকোলে তাকে আগুন দিয়ে জ্বালাতে হবে আর দেখতে হবে সব জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়েছে কিনা। যে ডালগুলো সব পুড়ে যায়নি তা সরিয়ে এক জায়গায় ফেলতে হবে আর ছাই যদি ঠান্ডা না হয় তাহলে তাতে বীজ ছড়ানো যাবে না। ঠাণ্ডা হলে তবে বীজ ছড়াব।’ এরপর দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন সবার

কী মত— সেইদিন শিকারে যাওয়া হবে.কি না। সবাই বলল, 'আজ আমরা সবাই বিশ্রাম করতে চাই আপনার অনুমতি থাকলে।' দলপতি বললেন, 'ঠিক আছে, আজ বিশ্রাম হোক, কাল সকালে আবার আলোচনা হবে।' দিন থেকে রাত হল, সেইদিন সবাই বিশ্রাম করল।

সকাল হলে দলপতি সবার ডেরায় গিয়ে সবাইকে জাগিয়ে বলে আসলেন যে আলোচনা হবে, সবাই জমায়েত হও। একে একে সবাই আলোচনার জায়গায় জড়ো হল। সবাই উপস্থিত হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে নিয়ে দলপতি আলোচনা শুরু করল। কাউন চাষ, শিকার আর জঙ্গলে কী সংগ্রহ করা হবে তা নিয়ে আলোচনা হল। কাউন চাষের বিষয়ে আলোচনা হল প্রথমে। ঠিক হল যে দলের মেয়েরা ডেরার কাছাকাছি যে উঁচু জায়গা রয়েছে, তার জঙ্গল কাটবে। কাটা জঙ্গল সরাবে না, সেখানেই শুকোতে দেবে। কিছুদিন পর সব শুকোলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবে, তারপর ঠান্ডা হলে বীজ ছড়াবে। শিকার ও জঙ্গল থেকে সংগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা হল যে তারা যখন জঙ্গলে যাবে তখন সবকিছুকে ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে—সেখানে খাওয়ার মতো ফলমূল অনেককিছু পাওয়া যেতে পারে, চেখে দেখতে হবে কোনটা খাওয়া যায় আর কোনটা যায় না। কেবল শিকারের জন্য পশু শিকার করলে চলবে না, পশুর বাচ্চা জ্যান্ত পেলে তাও ধরে এনে দেখতে হবে পালন করা যায় কিনা। দলপতি বললেন, 'আমাদের দূরের কথা ভাবতে হবে। একদিন খেয়ে মানুষের পেট ভরে না। আমাদের সারা জীবন বাঁচতে হবে, ছেলেমেয়েদের জন্যও সব রেখে যেতে হবে। কেবল শিকারের ভরসায় থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও যাতে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে না হয়, তার জন্য আমাদের কিছু করে যেতে হবে।' আলোচনা এখানেই শেষ করে দলপতি বললেন, 'আমরা আজ শিকার করতে যাব। কে কে যাবে তা সবাই মিলে ঠিক করুন।' তখন সবাই-ই উৎসাহ ভরে বলল যে সবাই-ই জঙ্গলে যাবে, শিকার ও গাছ-ফল-মূল দেখা-চেনা-সংগ্রহ করবে। দলপতি খুশি হয়ে বললেন, 'আমদের এই একতা সারাজীবন থাকুক আমি প্রার্থনা করি। আমাদের পরে যারা আসবেন তারাও আমাদের মতো মিলেমিশে থাকুক এবং কাজ করুক প্রার্থনা করি।' মেয়েদের একদল ঠিক করল তারা জঙ্গল কেটে বীজ বোনার জায়গা করার কাজ শুরু করবে। দলপতি উঠে দাঁড়িয়ে

বললেন 'গারানি' (ধন্যবাদ)। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'গারানি ইয়ঙ কো সংজা' (আমাদের দেবতা সংজা কে ধন্যবাদ)। যে যার ডেরায় গিয়ে নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে জঙ্গলের পথে রওনা হল একসাথে।

এইভাবেই দিন থেকে বছর থেকে যুগ তাদের জীবন শান্তিতে কেটে যাচ্ছিল। জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় কেউ আহত হতো। কখনও কেউ কেউ মারাও যেত। কিন্তু ওনারা পিছু হঠেননি। অনেক বলিদান দিয়েও জঙ্গলের সম্পদকে চেনা ও ব্যবহার করার পথ তৈরি করেছেন, চাষের জমি তৈরি করেছেন, সুন্দর বস্তি গড়ে তুলেছেন এবং একতা রক্ষা করে গেছেন।

তখন থেকেই পশুপালন এবং কাউন চাষ এর যুগ বলা যেতে পারে। অনেক মেয়ে কাউন এর জমি বানাতে গিয়ে কাঁটা লেগে আহত হয়ে সেপটিক হয়ে মারা গেছে। কী কষ্ট করেই না তাঁরা বস্তি গড়ার চেষ্টা করেছেন! তাঁদের বিপুল পরিশ্রমে তৈরি এই বস্তিতে তাঁদের বংশধররা সুখশান্তির জীবন যাপন করতে পারবেন— এইই ছিল তাঁদের আশা। ভবিষ্যতে যে কী ঘটতে চলেছে তা তো তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

একদিন তাদের বস্তিতে হাতিতে চড়ে উপস্থিত হল এক লম্বা প্যান্ট পরা ফর্সা মানুষ। সবাই অবাক। এ আবার কে? তার ভাষাও আলাদা আর অজানা। কেমন করে তার সঙ্গে কথা বলা যাবে, তার কথা বোঝা যাবে? আমাদের এত দুঃখকষ্টে তৈরি জমি কি সে কেড়ে নিতে চায়? গ্রামের সাহসী দুই একজন এগিয়ে গিয়ে তার সাথে ইশারায় কথা বলার চেষ্টা চালাল। সেই প্যান্টবাবু গোটা গ্রাম ঘুরলেন—তিনি যে কী 'সমীক্ষা' করছেন তা কেউ বুঝতে পারল না। সে আবার ফিরে চলে গেল। সবাই অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে যে কোথা থেকে কেন কী করতে সে এসেছিল আর কী-ই বা সে দেখে গেল। দলপতি বললেন, 'আমরা যেমন আছি সুখে শান্তিতে আছি। লম্বা প্যান্টবাবু এসেছিল, আবার চলেও গেছে— তার কথা ভেবে আর লাভ নেই। আমরা আমাদের কাজকর্মে মন দেই।' কিন্তু সেই ফর্সা মানুষের আগমন যে কোন্ অন্ধকার ঘনিয়ে আসার লক্ষণ বয়ে আনছে তা তো তখন জানা ছিল না!

কিছুদিন পর সেই লম্বা প্যান্টবাবুসাহেব আবার তাদের বস্তিতে এলেন, ঘুরে বেরালেন। উনি ভাবলেন যে এই মানুষদের জন্য কিছু করতে হবে। উনি হয়তো

ভালোই চেয়েছিলেন কিন্তু উল্টো হল। টোটোরা কাউন চাষ করলেও তাঁর মনে হল যে তারা আধুনিক কৃষিকাজ জানে না, তাই তিনি টোটোদের তা শেখানোর জন্য নেপালি সম্প্রদায়ের রানা, মঙ্গর-দের এই বস্তিতে আনার বন্দোবস্ত করলেন। কাউন চাষের জন্য যে জমি জঙ্গল কেটে টোটোরা তৈরি করেছিল— তার মধ্য থেকেই জমি দেওয়া হল সেই নেপালিদের এবং সেখানে তারা কৃষিকাজ শুরু করল। এই নতুন আসা জাতিদের সাথে আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে সবার। কিন্তু অচেনা ভাষা, অচেনা ফসল হঠাৎ কেউ বুঝতে পারে না। শিকার, সংগ্রহ, কাউন চাষ সব ছেড়ে হঠাৎ করে এই নতুন ভাবে চাষ টোটোদের পক্ষে উপযোগী ছিল না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। ছয় মাসের বাচ্চাকে যদি একটি গাছের ডালে ঝুলতে বলে, সে কি তা পারবে? সে তো পড়েই যাবে। টোটোদেরও একই অবস্থা হল। অন্যদিকে আস্তে আস্তে টোটোপাড়ায় নেপালিদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। নেপাল, ভুটান, আসাম থেকে টোটোদের বস্তিতে আসা শুরু হয় কাজের নামে। এক বছর, দুই বছর থেকে তারা ফিরে যেত নিজের দেশে। আসব বলে যেত। পরের বছর আসত ঠিকই, কিন্তু একা আসত না। এক মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসে পরিচয় দিত—এ আমার বউ। শান্তিপ্রিয় টোটো জাতি তাদের বসবাসের জমিও দিয়ে দিত। সরকার টোটোদের কৃষিকাজ শেখানোর জন্য রানা মঙ্গরদের নিয়ে এসেছিল। এখন তামাং লামা ছেত্রী রাই সুব্বা সবাই আছে। নেপাল ভুটান আসাম থেকে আসা কয়েকজনের কথা বলি। ধনবাহাদুর ছেত্রী নেপাল থেকে শীতকালে কমলালেবুর কাজ করতে তার বউকে নিয়ে এসেছিল। আগেও আসত আর কাজ শেষে ফিরে যেত। এবার আর ফিরে যায়নি, এখানেই বসবাস শুরু করে। কেন কী কারণে সেই প্রশ্ন কেউ করেনি। দিন থেকে বছর তার এখানেই কাটল, পরিবারও হল। তার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে। তারপর এখানেই মারা যায় তার বউ। কিছুদিন পর সে যায় নেপালে আর সেখান থেকে এক বৃদ্ধা মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি উনি কে, উত্তর দেন—আমার বউ। সবাই আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, তাহলে আগের জন কে ছিল? আর একজনের কথা বলি। তার নাম ভদ্র বাহাদুর গুরুং। নেপাল থেকে কাজের সন্ধানে ভুটানে ঢুকে সেখানে কাজ করত, আবার নেপালে ফিরে যেত। সেইবার ভুটানে না গিয়ে টোটোপাড়ায় আসে আর এখানে কাজ করতে

করতে এক নেপালি মেয়েকে বিয়ে করে এখানের বাসিন্দা হয়ে যায়, এখানেই তাকে জমি দেওয়া হল, চাষবাসও করত, মাঝে মাঝে ও পাচু ভুটানে যেত বলে টোটোরা তাকে পাচুলে বলত। তিন ছেলে, দুই মেয়ে হল তার। সুখে শান্তিতেই তার দিন কাটছিল। একবার তিনি নেপালে গেলেন আর সেখান থেকে নতুন এক যুবককে নিয়ে ফিরলেন। টোটোপাড়ার সবাই জিজ্ঞাসা করল—এ কাকে নিয়ে এসেছেন? তিনি জবাবে বললেন যে এ আমার নেপালের বউয়ের ছেলে—একেও থাকা আর চাষ করার জন্য জমি দিতে হবে। এইরকমভাবে অনেক নেপালিরাই 'এ আমার পিসির ছেলে, এ আমার মামার ছেলে, বলে নানাজনকে এনে টোটোপাড়ার জমির উপর দখল নিয়ে বসেছে। কখনও কখনও নেপাল ভুটান থেকে আগতদের মধ্যে ওঝা, ঝাকরি, ডাইনির শক্তি আছে বলে ভয় দেখাত, জমি না দিলে তারা টোটোদের ক্ষতি করবে বলে শাসানি দিত। টোটোরা বিশ্বাসও করত, ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে যেত না, জমি দিয়ে দিত। সরকারের কর্মচারীরাও টোটোদের জমিতে বাইরে থেকে নেপালিদের নিয়ে এসে বসিয়ে দিতে থাকে। সরকারের কর্মচারীরা এই কাজ কী জন্য করলেন— তাঁদের ভোট করার সুবিধার জন্যই করলেন কি? সরকারের কর্মচারীদের এই অন্যায় ক্ষমা করা যায় না। এখন সেই টোটোপাড়ার বেশির ভাগ জমিই টোটোদের হাতের বাইরে চলে গেছে।

টোটোদের সংস্কৃতি আর ভাষাও ক্ষতির মুখে পড়েছে। টোটোদের মুখের কথায় টোটো শব্দের বদলে অন্য শব্দ (বেশিরভাগ নেপালি শব্দ) জায়গা করে নিচ্ছে। টোটো শব্দগুলো ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। টোটো ভাষা দুর্বল হয়ে পড়ছে। এর কিছু উদাহারণ আমি এখানে দিলাম :

টোটো শব্দ	**বাংলায় তার অর্থ**	**যে শব্দ মুখের ভাষায় তার জায়গা নিয়ে নিচ্ছে**
১. ওয়াইরাধি	হাল বাঁধার দড়ি, আগে গোরুর চামড়ার হত, এখন রশির হয়	হালরোঙরা
২. চুপেয়	লাঙ্গলের ফলা	ফালি
৩. পেটোংরা	ফুলঝাড়ু	কুছু

টোটো শব্দ		বাংলায় তার অর্থ	যে শব্দ মুখের ভাষায় তার জায়গা নিয়ে নিচ্ছে
৪.	মাচেয়	পিঁয়াজ	পিয়াজি
৫.	পেরো	কম্বল	ধুসা
৬.	দিব্‌রি	লম্ফ	বাতি
৭.	টেংটেং	চাদর	চাদারি
৮.	সাইসিং	শালগাছ	শাল
৯.	এনিসিং	শিশুগাছ	শিশু
১০.	জুই	এক ধরনের গাছ	কাকর
১১.	লাঘাকো চোইয়ি	”	গায়ো
১২.	জইসিং	”	গুগুল
১৩.	ইয়াইরুং	”	কালো ছাপ
১৪.	আজাঙসিং	”	লালি
১৫.	জাঙফুঙসিং	”	জমুনা
১৬.	মাঙকাইসিং	”	গাইকুরে
১৭.	ডুরিংসিং	”	লাম্‌পাতে
১৮.	মাইসিং	”	পইলি ছাপ
১৯.	লাঙটুঙ	অধিকার	অধিকার
২০.	গধি	বসার জায়গা	চেয়ার
২১.	নাবেঙ	বিছানার কাপড়	ডনলপ্‌
২২.	পুঙজি	সম্পত্তি	প্রপার্টি
২৩.	ইয়োইইয়োইনা	সোনালি	গোল্ডেন
২৪.	তংকা	রুপো	চাদ্‌নি
২৫.	চিদুঙ	ঝোলা ব্যাগ	ঝোলা ব্যাগ
২৬.	গাইসো	সমান করা	লেভেল
২৭.	টেংরা	শুরু	স্টার্ট
২৮.	ছাঙি	টিন	টিন
২৯.	ছাবরুঙ	শাবল	রাম্বা
৩০.	সুরুই	গাঁইতি	গাঁইতি
৩১.	সোপামসে	লেবু	মৌসম

টোটো শব্দ	বাংলায় তার অর্থ	যে শব্দ মুখের ভাষায় তার জায়গা নিয়ে নিচ্ছে
৩২. বিরসে	জাম	বুগোতে
৩৩. পুম্‌পজিরি	লেবুর মতো ফল	সেতো জামির
৩৪. ওসে	বড়ো কমলার মতো ফল	জামির
৩৫. বাসামতি	পৃথিবী/মাটি	পৃথিবী/মাটি
৩৬. চিদুঙ	ঝোলা ব্যাগ	ঝোলা ব্যাগ
৩৭. গাইসো	সমান করা	লেভেল

বর্তমান টোটো যুবক-যুবতীরা হিন্দি, নেপালি, বাংলা গানে আকর্ষিত হয়ে টোটো ভাষার গান ভুলতে বসেছে। কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে বা পুজোর অনুষ্ঠানে টোটো গান হলে তারা সে সব বন্ধ করে হিন্দি বা নেপালি গান চালাতে বলে। অন্যের নকলবাজি করতে গিয়ে নিজের সাজানো ঘর ধ্বংস করতে চলেছে টোটো যুবক-যুবতীরা। টোটো শিশুদের মুখে টোটো ভাষাকে সুরক্ষিত করতে পারলে তবেই এ সর্বনাশের পথ এড়ানো যাবে।

টোটোরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করত। পাহাড়, নদী, খালবিল, পাথর, গাছ— যা চোখে দেখা যায়, তা নিয়েই তাদের ধর্ম, ধর্মের বিশ্বাস। ১৯৬৫-৬৬ তে এক খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক টোটোদের বস্তিতে এসেছিলেন মিশনের পক্ষ থেকে ধর্মপ্রচার করতে। উনি প্রথম চেষ্টা করেন যাতে টোটো যুবক-যুবতীরা কাপড় বোনা, সুতো বানানোর কাজ শেখে। প্রতি রবিবার ওনার সেবাঘরে গান বাজনা চলত। টোটো যুবক-যুবতীরাও অংশগ্রহণ করত। কিন্তু তখনকার টোটোরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি, নিজের ধর্মকে ছেড়ে যায়নি, নিজেদের ধর্মের প্রতিই তাদের বিশ্বাস ছিল। সেই প্রচারকের নাম ছিল হেরেন্দ্র মানখিন। তিনি কাউকে খ্রিস্টান ধর্ম নিতে জোর করেননি। কিন্তু এরপর নাগা ব্যাপটিস্টরা এল। হেরেন্দ্রবাবুর বাড়িতে থাকল কিছুদিন। প্রতিদিন বিকালে আমাদের তিন-চার জনকে ডাকত, চা খাওয়াত, গিটার বাজানো শেখাত। এরাই প্রথম টোটোদের মধ্য থেকে তিনজনকে খ্রিস্টান করেছিল। সেই তিনজন হল বকুল টোটো, সন্দেশ টোটো ও সাধনা টোটো (সন্দেশ-এর বউ)। তখন সমাজে একটা বড়ো সভা হয় কাইজির বাড়িতে। সবাই ওই তিনজনকে খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে নিজেদের ধর্মেই থাকার জন্য বোঝায়, তবুও

ওনারা তা শুনলেন না। তারপর আস্তে আস্তে এই তিনজন টোটোদের মধ্যে খ্রিস্টান করার জন্য নানা পরিকল্পনা নিতে থাকে ব্যাপটিস্টদের মদতে। এখন প্রায় ষাট-সত্তর জন খ্রিস্টান হয়েছে। নিজেদের পূর্বপুরুষ, নিজ ভূমি, প্রকৃতি—এই সমস্তর প্রতি উদাসীন হয়ে 'নতুন' ধর্মের সুযোগ নিতে যারা পা বাড়াচ্ছে, সংখ্যায় খুব অল্প হলেও, তারা কি একটা ভুল পথ তৈরি করছে না?

প্রকৃতিই জীবন দেয়। প্রকৃতি থেকে টোটোরা অনেক রোগ ব্যাধির ওষুধও পায়। কিছু উদাহরণ দিই। আমেনামে হল একটা ছোট ঝোপের মতো গাছ। গায়ের কোথাও কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে থাকলে এই গাছের পাতা ডলে লাগালে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়। তঙপরসে গাছের নতুন গজানো পাতা খাওয়া হয় ডায়েরিয়া হলে। হাত-পা মচকে গেলে, হাড়ে চোট লাগলে শিমুল এর ছাল আর নায়াপরেওয়া (একধরনের লতা, গাছ থেকে ঝোলে)—এই দুইকে পিষে মিশ্রণটা চোটের জায়গায় লেপে বাঁধলে আরাম হয়। এইরকম আরও অনেক আছে। এছাড়া রোগে বা দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পেতে পাহাড়, গাছ বা পাথরকে পুজো করারও কিছু রীতি আছে। তার কিছু উদাহরণ দিই। মাথাব্যথা হলে পুদুয়া পাহাড়কে পুজো করে। ম্যালেরিয়া হলে মুটি নদীকে পুজো করে। বস্তিতে বিপদ আপদ হলে চইয়ু পুজো করা হয়— এই পুজোয় একটা শুয়োরের গলা কেটে গোটা দেহ নিয়ে রক্ত ছিটোতে ছিটোতে ঘুরতে হয়। মাইসিংপা গাছ আছে—এই গাছ থেকে এক টোটো যুবক পড়ে মারা গিয়েছিল অনেকদিন আগে, এই গাছকে পুজো করা হয় যাতে কাঠসংগ্রহ করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে কারো মৃত্যু না হয়। জিতি নদীর ধারে দুটো মুখোমুখি পাথর আছে, যাদের বলে ন্যাপু পাথর—মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এর পাশ দিয়ে গেলে হাঁটু ব্যথা করে বলে বিশ্বাস, তাই ওখানে বসে বিশ্রাম নিয়ে ওই পাথরকে পুজো করে তারপর আবার যাওয়া হয়।

বাঁশ, কাঠ আর খড় দিয়ে টোটোরা নিজেদের ঘর তৈরির কৌশল গড়ে তুলেছিল। ঘরের মেঝেকে বলে চাপোই। তা বাঁশ/কাঠ দিয়ে তৈরি। এই চাপোই মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে হয়। মাটি থেকে সোরা (বাঁশের খুঁটি) দিয়ে চাপোই এর অবলম্বন তৈরি করা হয়। চুইধি ও কাটি (বাঁশ কেটে কঞ্চির মতো করে তা দিয়ে বাঁধুনি) দিয়ে দেওয়াল হয়, তার উপর চালের জন্য বাঁশের বাঁধুনিকে বলে দিধি। চালের জন্য বাঁশ দিয়ে অবলম্বন করা হয়, তাকে বলে টোংখা।

টোংখার উপর খড় বিছিয়ে তার উপর বাঁশ ফাটিয়ে লম্বা লম্বা করে কেটে দেওয়া হয়— এদের বলে তাচে। ঘরের সামনে কিছুটা মেঝে বেরিয়ে এসে বারান্দা হয়, সেখানে বাঁশের কাপড় শুকোতে দেওয়ার জায়গাকে পাদাং বলে। গাছের গুঁড়ি কেটে তার উপর খাঁজ খাঁজ করে মেঝেতে ওঠার সিঁড়ি হয়, তাকে বলে কাইবু। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় ধরার জন্য বাঁশের রেলিং করা হয়, তাকে বলে ওয়াদোই। লাপুং (দরজা) আটকানোর জন্য একটা লম্বা বাঁশের তিন জায়গায় ফুটো করে জুংরি করা হয়। টোটোপাড়ার বাইরে নানা জায়গায় খাটতে গিয়ে টোটোরা রাস্তা-ঘর বাড়ি তৈরির নানা কাজ করে পাথর-ইট-সিমেন্ট-বালি দিয়ে ঘর তৈরির কৌশলও শিখেছে। ফলে এখন অনেক বাড়ি সেভাবেই হচ্ছে। তবু সেইরকম বাড়িতেও টোটোদের চিরাচরিত প্রথার বাঁশের একটা ঘর, ছোট হলেও, থাকেই।

টোটোপাড়ার বাইরের বিশাল জগৎ—নানা ধরনের মানুষ, নানা ধরনের ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম—এর সঙ্গে টোটোদের পরিচয় গড়ে উঠছে। টোটোদের জানাশোনা বাড়ছে। কিন্তু সব নতুনকে জানা, দেওয়া-নেওয়া তো টোটো ভাষা-সংস্কৃতি- ধর্মের নিজস্ব ভিতের উপর দাঁড়িয়েই হতে পারে। সে ভিত ধসে গেলে পাহাড়ি ধ্বসের তোড়ে হারিয়ে যেতে হবে, নিজেদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০১৬

পরিশিষ্ট: টোটো মানুষদের দুটো দাবি আমি সবার হয়ে তুলে ধরছি—

১. মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক যারা পাশ করছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. টোটোদের জমির উপর তাদের নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, সুনিশ্চিত করতে হবে।

টোটোপাড়ায়, টোটোদের মধ্যে: জনজাতির জীবন ও 'আধুনিকতা'-র অভিঘাত সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

বিপ্লব নায়ক

প্রবেশ কথা

অদ্ভুত সমাপতন। হাসিমারা স্টেশন থেকে বেরিয়ে মাদারিহাট যাওয়ার বাসে উঠতেই দেখা হয়ে গেল ধনীরাম টোটোর সঙ্গে। ধনীরাম টোটোকেই আমরা ফোন করছিলাম বাসে ওঠার আগে। ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যসংগ্রহের কাজে টোটোপাড়া ঘুরে যাওয়া আমাদের এক বন্ধু কলকাতাতেই ধনীরাম টোটোর ফোন নাম্বার আমাদের দিয়ে বলেছিল যে ইনিই টোটোপাড়ায় আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

ভারতে সবচেয়ে ক্ষুদ্র জনজাতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল টোটোরা। তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে তারা গোটা ভারতের মধ্যে কেবল এই জলপাইগুড়ি জেলার ভুটান সীমান্তের টোটোপাড়াতেই বাস করছেন দীর্ঘদিন ধরে। আমরা পাঁচ বন্ধু— সমীর, সৌম্য, ওয়াসিম, অরিজিত আর আমি—যখন এঁদের মধ্যে কিছুদিন কাটিয়ে এঁদের সঙ্গে পরিচিতি গড়ে তোলার কাজ শুরু করা মনস্থ করলাম, তখন প্রাথমিক অপরিচয় ও জড়তা কাটানোর জন্য আমাদের আশা-ভরসা ছিলেন ধনীরাম টোটোর মতো কয়েকটি নাম—যাঁদের সঙ্গে তখনও আমাদের মুখোমুখি দেখা হয়নি।

মাদারিহাটগামী আঞ্চলিক মানুষজনে ভর্তি বাসে পিঠে বড়ো ঝোলা নিয়ে কয়েকজন শহুরে চেহারার লোক দেখে ধনীরামই আমাদের চিনে নিলেন। ডেকে বললেন, আপনারাই কলকাতা থেকে আসছেন তো, আমিই ধনীরাম টোটো।

ধনীরাম টোটোর বয়স পঞ্চাশের উপর। তাঁর আচরণভঙ্গি তরতাজা আমুদে এক যুবকের মতো। সদ্য পরিচিতকে একটানে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন। তাই অপরিচয়ের গণ্ডি বেমালুম উবে গিয়ে বাস থেকে নামার আগেই তিনি আমাদের 'ধনীরামদা' হয়ে গেলেন।

মাদারিহাটে নেমে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, টোটোপাড়ায় যাওয়ার জিপগাড়ি ভাড়ার বন্দোবস্ত করা—সব দায়িত্বই ধনীরামদা সামলালেন, যেন, এমনটাই তো হওয়ার কথা! জিপগাড়ি যখন মাদারিহাট ছেড়ে রওনা হল, তখন তাতে সওয়ার আমরা পাঁচজন, ধনীরাম টোটো আর টোটোপাড়ার বাসিন্দা এক মহিলা ও দুই শিশু। তখন মাঝদুপুর। মাদারিহাট ছাড়িয়ে একটা নদীখাত পেরিয়ে অপর পাড়ে উঠতেই হইহই ডাকে জিপ থেমে গেল। ধনীরামদা জিপ থেকে নেমে এক মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন—বোঝা গেল যে ইনি ধনীরামদার বউ, বাজার করা ও অন্যান্য কাজে এখানে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কিছু স্থানীয় যুবক-যুবতী—তাদের মধ্যে অনেকে স্কুলের পোশাক পরা, স্কুল থেকে ফিরছে। তারা সবাই ফেরার গাড়ির অপেক্ষায়। অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের মনে হচ্ছিল যে জিপের ভিতরে বসে এই অনিন্দ্যসুন্দর যাত্রাপথকে ঠিকমতো ইন্দ্রিয়ানুভূতিগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না—তাই এই সুযোগে আমরা পাঁচজন চটপট জিপের ভিতর থেকে বেরিয়ে জিপের ছাদে চড়ে বসলাম। আরও কয়েকজন স্থানীয় যুবকও আমাদের সঙ্গে ছাদে উঠল, আর বারো-তেরোজন মেয়ে ও মহিলা ঠাসাঠাসি করে উঠল জিপের ভিতরে।

স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে টুকিটাকি কথা বলতে বলতে জিপের মাথায় চড়ে আমরা পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললাম। দুপাশে চা-বাগান, মাঝেমধ্যে ছোটো লোকালয়। তারপর থেকে শুধুই জঙ্গল, একের পর এক নদীখাত। মসৃণ পিচরাস্তা ছেড়ে পথ এখন নুড়ি-পাথর- গাছের শিকড়ের উপর দিয়ে টালমাটাল। নদীখাতগুলোর উপরে কোনো সেতু নেই। নদীখাতে নেমে এসে ঝিরিঝিরি জলধারার উপর দিয়েই তা পেরোতে হয়। এখন

গ্রীষ্মমাসের এই ঝিরিঝিরি স্রোত বর্ষায় ফুলে ফেঁপে প্রায় অনতিক্রম্য হয়ে ওঠে, মাঝেমধ্যেই ছুটে চলে দুর্দম রূপে হড়পা বান।

হাওড়ি নদীর বিস্তীর্ণ নদীখাত পেরোতেই ভুটান সীমান্তের শেষ পাহাড়ের দক্ষিণ কোল। এই কোলেই টোটোপাড়া। টোটোপাড়ায় ঢুকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে সরকারি আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর, গ্রামীণ ব্যাংক, সীমারক্ষীবাহিনীর ছাউনি—এইসব ফেলে এসে জিপ দাঁড়াল টোটোপাড়ার বাজার এলাকায়। বেশিরভাগ যাত্রী এখানে নেমে গেল। ধনীরামদাও নেমে গেলেন। ওখানেই অপেক্ষা করছিল উদয় টোটো—ধনীরামদা তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে গেলেন যে উদয়ই আমাদের থাকার জায়গা দেখিয়ে দেবে, অন্যান্য বন্দোবস্তও করে দেবে—আর তিনি নিজে আবার সন্ধ্যাবেলা আসবেন। উদয় টোটো জিপে উঠে বসল। জিপ আরও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে আমাদের নামাল পাহাড়ের গায়ে খাঁজকাটা এক মাঠের ধারে। সেই মাঠে টোটোদের পুরানো প্রথার বাড়িঘর—অর্থাৎ মাটির থেকে কিছুটা উপরে তৈরি মাচার উপর একটা ঘর ও প্রশস্ত বারান্দা নিয়ে তৈরি বাঁশ ও কাঠের বাড়ির একটা ধাঁচা তৈরি করা আছে। আর তার পাশেই আধুনিক তিন কামরার এক পাকা বাড়ি—টোটোদের নিজেদের গড়া 'টোটো কল্যাণ সমিতি'-র তৈরি অতিথিনিবাস। আমাদের সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুলল উদয় টোটো। আমরা থিতু হতে হতে সে চাল, আলু, ডিম, তেল-ও কিনে নিয়ে চলে এল যাতে আমরা নিজেদের খাবার রান্না করে নিতে পারি। ধনীরামদার মতো বাংলায় সে অনর্গল নয়। ভাঙাচোরা বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে টোটোপাড়া সম্পর্কে প্রাথমিক নানাকিছু জানা গেল। তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে—উদয় টোটো সেইদিনের মতো বিদায় নিয়ে তার নিজের বাড়ির পথ ধরল।

গোল বাধল রাতের খাওয়ার জন্য রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে ভাত চাপাতে গিয়ে। দেখা গেল যে সিলিন্ডারে গ্যাস নেই। রাত তখন ন'টা হবে। টোটোপাড়ায় নেমে এসেছে অন্ধকার। পাহাড় ও জঙ্গলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার শহরে মেলে না। মনে হল যে টোটোপাড়ায় প্রথম রাত অনশনেই কাটাতে হবে। তবু একবার ধনীরামদাকে ফোন করা হল। ফোন পেয়েই ধনীরামদা বললেন যে ভাবনার কোনো কারণ নেই, একটা ব্যবস্থা তিনি তখনই করছেন। ঘড়ির কাঁটা দশটা ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চলে গেছে।

মোমবাতির আলো চারপাশের অন্ধকারকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছে। ধনীরামদা একটা ব্যবস্থা করলেন। তাঁর পড়শি রূপচাঁদ টোটোর বাড়ি থেকে তাদের বাড়ির রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার খুলে নিয়ে তিনি আর রূপচাঁদ নিজেরা তা বয়ে নিয়ে এসে হাজির। বললেন, আজ এই কাঁচা ব্যবস্থায় চালান, কাল সকালে পাকা ব্যবস্থা করা যাবে। রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার লাগিয়ে দিয়ে তিনি আর রূপচাঁদ আমাদের সঙ্গে আড্ডায় বসে গেলেন। রূপচাঁদের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। টোটোপাড়ার নানা কাজে দক্ষ সংগঠক হওয়া ছাড়াও সে সুন্দর ছবি আঁকতে পারে—টোটোপাড়ায় এইটি এক বিরল গুণ কারণ টোটোদের সংস্কৃতিতে চিত্রশিল্পের কোনো পরম্পরা নেই। কথায় কথায় রাত বারোটা পেরিয়ে গেল। এই প্রথম রাতের ঘটনা আমাদের প্রত্যেকের মনেই বেশ ছাপ ফেলে গিয়েছিল। আমরা ভাবার চেষ্টা করেছিলাম, কলকাতায় আমরা আমাদের কোনো অতিথির জন্য এমন রাতবিরেতে কি এমনটা করতাম? মনে হয়েছিল, যে আন্তরিকতা ও সহজ সাবলীলতার সঙ্গে তাঁরা আমাদের আপন করে নিলেন, তা বুঝি বা তাঁদের সহজাত, তাঁদের সামাজিক জীবনযাপনের মধ্যে এভাবেই একে অন্যকে জড়িয়ে জাপটে বেঁচে থাকার রীতি বুঝিবা প্রচলিত।

এরপর প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলাতেই সাতটা-আটটার পর চলে আসতেন ধনীরাম টোটো—রাতে বারোটা-সাড়ে বারোটা অবধি চলত অনর্গল কথাবার্তা।

আমাদের থাকার জায়গার কাছেই ছিল সত্যজিৎ টোটোর বাড়ি। মাঠে চাষের কাজ সেরে সে মাঝ-দুপুর বা বিকেলে বাড়ি ফিরত। তারপর তার বাড়ির বারান্দায় একাধিকবার জমাটি আড্ডা হয়েছে—তার লেখা টোটো ভাষায় কবিতা পড়েছি, টোটো ভাষায় তার লেখা ও সুর দেওয়া গান শুনেছি। তার বয়সও চল্লিশের কাছাকাছি।

এছাড়াও দিনের বেলা পাহাড়-নদীখাত-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছু মানুষজনের সঙ্গে কথা হয়েছে।

একদিন টোটোপাড়া পেরিয়ে জিতি নদীর স্রোতের উল্টোমুখে ভুটানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভুটানে ঢুকে গিয়েছিলাম। ভুটানের মধ্যে জেংচু গ্রাম পেরিয়ে পাহাড়ের উপর জঙ্গলের গভীরে ডয়া উপজাতিদের গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সেইদিন ছিল মঙ্গলবার, টোটোপাড়ায় সাপ্তাহিক হাট বসার দিন।

প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টার সেই আসা-যাওয়ার পথে হাটমুখী বা হাটফেরতা বহু পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে দেখা—কখনো কিছু কিছু কথাও হল। তাঁদের মধ্যে টোটো, নেপালি, ভুটিয়া, ডয়া...এমন নানা উপজাতিরই মানুষ ছিলেন।

টোটো জনজাতি ও তাদের জীবনাচরণ-সংস্কৃতি নিয়ে কলকাতায় ছাপার অক্ষরে পড়া তথ্য-তত্ত্বগুলো রক্তমাংসের দেখা-শোনা-অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাদ-বিসংবাদ লাগিয়ে দিচ্ছিল মগজে আর টোটোপাড়া এক অদ্ভুত আকর্ষণে বেঁধে ফেলছিল আমাদের। সেই বৃত্তান্তই এখন বলি।

নিজেদের তৈরি জমি নিজেদের হাতছাড়া হওয়ার বৃত্তান্ত, বা, অবাক 'ভূমিসংস্কার'

জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বসতভূমি ও কৃষিভূমির পত্তন করে টোটোপাড়ার জন্ম দিয়েছিল টোটো জনজাতির মানুষরাই। টোটো লোককথায় যেমন এর ইঙ্গিত মেলে, তেমনই নৃতাত্ত্বিক-গবেষকরাও এমনটাই মনে করেছেন। ১৯৫৫ সালে নৃতাত্ত্বিক চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছিলেন:

> পূর্ববর্তী বসতির ইতিহাস নির্দেশ করে যে তিন থেকে চার প্রজন্ম আগে ভালো সংখ্যক টোটো পশ্চিম ডুয়ার্স-এ বসবাস করত। তিস্তার পশ্চিমে বা সঙ্কোশ-এর পূর্বে টোটোদের বসতিস্থাপনের কোনো চিহ্ন নেই। তাই ধরা যেতে পারে যে তারা পশ্চিম ডুয়ার্সেই থাকত। গোটা পশ্চিম ডুয়ার্স তখন ভুটানের অধীন ছিল। ভুটিয়াদের হাতে পীড়ন, অন্য সংস্কৃতির প্রভাব এবং তার সঙ্গে পশ্চিম ডুয়ার্সের কুখ্যাত ম্যালেরিয়ার কোপ—এই সমস্ত কারণে টোটোদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। কমতে কমতে শেষাবধি ডুয়ার্সের সমতল অঞ্চলের পুরানো বসতিগুলোয় টোটোদের আর চিহ্ন রইল না। প্রাণরক্ষা করতে পারা অল্প সংখ্যক টোটো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে ভবঘুরে গোষ্ঠী হিসেবে আশ্রয় খুঁজতে থাকল। এমন প্রমাণ আছে যে তাদের মধ্যে একটা অংশ মেচ জনজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, একটা অংশ নেপাল ও উত্তর ভুটানে গিয়ে সম্ভবত সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে মিলেমিশে গেল। আর অল্প কয়েকজন আশ্রয় নিল গভীর জঙ্গলে ঘেরা এক পাহাড়ের স্বাস্থ্যকর অংশে এবং সেই এলাকার চৌহদ্দির মধ্যে তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখল। এই স্থানটিই হল টোটোপাড়া, যেখানে ধীরে ধীরে তারা

> সংখ্যায় বাড়ছে। আজকের টোটোপাড়ায় এমন একজনও নেই যে সেই প্রাচীন বাসস্থানগুলোয় টোটোদের দুর্ভোগের গল্প শোনাতে পারে। (সূত্র ১, ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা)

১৯৬৪ সালে সরকারি আধিকারিক ও সমাজ-গবেষক বি কে রায়বর্মন রচিত সরকারি প্রতিবেদনেও আমরা পাই:

> টোটো লোককথা অনুযায়ী, তারা কমপক্ষে সাত পুরুষ ধরে এই টোটোপাড়ার বাসিন্দা। আগে জায়গাটি ভুটানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তা ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অধীনে আসে।... ১৮৮৯-৯৪ সালে সান্ডার্স দ্বারা পরিচালিত প্রথম জরিপ কর্মসূচিতে ৩.১২ বর্গমাইলের এই গোটা মৌজা টোটোদের সমগ্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের 'মণ্ডল' বা 'প্রধান'-এর নামে ৮ নথিভুক্ত হয়েছিল। (সূত্র ২, ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা)

টোটোদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে চোদ্দটি টোটো পরিবার এই অঞ্চলে এসে প্রথম জঙ্গলের মধ্যে বসত-কৃষি-পশুপালন-এর সূচনা করেন—তাদেরই উত্তরপুরুষ আজকের টোটোরা। সেই চোদ্দোটি পরিবারের এক একটির উত্তরপুরুষেরা এক একটি গোষ্ঠী—এইভাবে টোটোসমাজ আজও চোদ্দটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সেই বসত পত্তনের সময় থেকেই টোটোপাড়ার সমস্ত জমি টোটোদের গোষ্ঠীগত মালিকানাভুক্ত হিসেবে তারা ভেবে এসেছে—জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা তাদের ছিল না। বসত, কৃষি ও পশুপালনের জন্য কোন্ জমি কে ব্যবহার করবে তা তারা তাদের গ্রামীণ পরিষদের মাধ্যমেই ঠিক করত।

১৯৬৯ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের আধিকারিক ও জমি জরিপকারীরা টোটোপাড়ায় 'ভূমিসংস্কার' করার উদ্দেশ্য নিয়ে হাজির হলেন। সেই সময়কার সরকারি প্রতিনিধি স্থানীয় আধিকারিক অমল কুমার দাসের মুখ থেকেই শোনা যাক সরকারি ভাবনাচিন্তা কী ছিল। ১৯৬৯ সালে অমল কুমার দাস লিখেছিলেন:

> 'সিডিউলড কাস্টম অ্যান্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট'-এর আঞ্চলিক দফতরের দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে টোটো পরিবারদের মধ্যে ১১.৩৬% ১ একরের কম জমির মালিক, ৪৮.৮৭%-এর ১-২

> একর জমির, ১২.৫০% ২-৩ একর জমির। ১৫.৯১%৩ একরের উপর জমির এবং বাকি ১১.৩৬%-এর কোনো জমি নেই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৮৮৯-৯৪ সালে সান্ডার্সের করা প্রথম জমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় টোটোদের গোটা মৌজা নথিভুক্ত করা হয়েছিল টোটোদের সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে টোটো মণ্ডল বা প্রধান-এর নামে এবং এই জমিব্যবস্থাই এখনও অবধি চালু আছে। কিন্তু সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জমি নথিভুক্ত করা হবে আলাদা আলাদা ব্যক্তি টোটোর নামে, যে পরিমাণ জমি এখন তার অধিকারে আছে তার ভিত্তিতে। এটা করার উদ্দেশ্য তাদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং অন্যদের দ্বারা তাদের জমি দখল হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। এটাও জানা গেছে যে ব্যক্তি টোটোদের নামে জমির মালিকানার নথিভুক্তিকরণ প্রাথমিকভাবে হওয়ার পর সরকার ভূমিহীন টোটোদের জমি দিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে এবং একজনের অধিকারে কী পরিমাণ জমি রাখা বাস্তবসম্মত ও সমীচীন তা নির্ধারণ করবে যাতে টোটোদের মধ্যে ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে একটা ন্যূনতম ভারসাম্য বজায় রাখা যায় এবং ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে অভাবিত কোনো জটিলতা এড়ানো যায়।... সংশ্লিষ্ট প্রাধিকারগণের কাছ থেকে এও জানা গেছে যে ব্যক্তি টোটোদের নামে জমি নথিভুক্তিকরণ হওয়ার পর, প্রত্যেকের অধিকারস্থ জমি-সম্পত্তির ভিত্তিতে সরকারকে প্রদেয় খাজনা স্থির করা হবে, যা তাদের অধিকারস্থ জমির কম উর্বরতাকে বিচারে রেখে খুব একটা বেশি হবে না। এই ব্যবস্থা আপনা হতেই তাদের ভূ-সম্পত্তির নিশ্চয়তাকে জোরদার করবে। (সূত্র ৩, পৃ. ৬৪-৬৫, ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

উপরের ভাবনা, যা ১৯৬৯ সালের সরকারি 'ভূমিসংস্কারক'- দের পরিচালিত করেছিল, তার মধ্যে অদ্ভুত কিছু স্ববিরোধিতা, বিভ্রম চোখে পড়ে, যেমন:

১. বক্তব্যের শুরুতে 'টোটো পরিবারদের মালিকানা'-য় থাকা জমির যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তা কী ধরনের জমি? বসতজমি, কৃষিজমি ও পশুচারণক্ষেত্র—ব্যবহারের নিরিখে টোটোপাড়ার জমিকে এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। ওই জমির হিসাব কি এই তিন ধরনের জমি মিলিয়ে মোট জমির? তা হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ, টোটোপাড়ার

ইতিহাসে গৃহহীন (রাস্তায় দিন কাটানো) কোনো পরিবার বা প্রজা হিসেবে কোনো পরিবার ছিল না। বসতজমি সব পরিবারেরই কিছু না কিছু ছিল— ফলে মোট জমির হিসাব ধরলে কোনো পরিবারই ভূমিহীন হতে পারে না। তাহলে হিসাব কি কৃষিজমি ও পশুচারণভূমির?

২. হিসাবটা যদি কৃষিজমি ও পশুচারণভূমির বলেই ধরে নিই, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে জমির উপর পরিবারগুলোর মালিকানা বলতে কোন ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে? লেখাটিতে যেভাবে জমির মালিক হওয়ার কথা (মূল ইংরেজিতে 'possess' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে) বলা হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তীতে যেভাবে ভূ-সম্পত্তির ভারসাম্য আনার কথা বলা হয়েছে, শোষণ থেকে রক্ষার কথা বলা হয়েছে, তা মিলিয়ে পড়লে মনে হয় বুঝি বা টোটো পরিবারগুলির প্রধান ব্যক্তিদের জমির উপর ব্যক্তিমালিকানা কায়েম ছিল, যাকেই নথিভুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে গোচরে এনে সংস্কার করতে চাইছে সরকার। এর চেয়ে হাস্যকর বিভ্রম আর কী হতে পারে! কারণ, টোটোদের সমস্ত জমি যে তাদের গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে গোষ্ঠীপতি বা মণ্ডলের নামে নথিবদ্ধ হয়েছিল, যার উল্লেখ অমল কুমার দাসও করেছেন, তা তো জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি ও গোষ্ঠীগত মালিকানার উপস্থিতিকেই নির্দেশ করে। ফলে, ভূ-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতি এবং সেই সম্পদ ব্যবহার করে হওয়া উৎপাদনের ফলের উপর ব্যক্তিগত আত্মীকরণের প্রথা চালু আছে এমন সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে টোটো সমাজের বিচার করা বিভ্রম উৎপাদন ছাড়া আর কী বা হতে পারে? সরকারি দফতরের সংগৃহীত তথ্য কি তাহলে প্রকৃতই টোটো সমাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা দিচ্ছে, না কি তা টোটো সমাজের মৌলিক চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞানতাকেই পুষ্ট করছে? ভূ-সম্পত্তির উপর গোষ্ঠীমালিকানাভুক্ত একটি সমাজে যেখানে ভূ-সম্পত্তি ভিত্তিক উৎপাদনের কাজ ও তার উৎপাদনের বণ্টন গ্রামীণ পরিষদের যৌথ তত্ত্বাবধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে শোষণ, ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদির রূপটা কী তা আদৌ স্পষ্ট হল না, অথচ তা দূর করার ব্যবস্থাপত্র সরকার রচনা করে ফেললেন!

৩. এই ব্যবস্থাপত্রের অন্যতম বিধান হল মালিকানাভুক্ত জমির পরিমাণের ভিত্তিতে সরকারকে প্রদেয় খাজনা নির্ধারণ, যা নাকি টোটোদের 'ভূ-সম্পত্তির নিশ্চয়তাকে জোরদার করবে'। এই খাজনা তো দিতে হবে অর্থে, ফলত প্রতিটি পরিবারের অর্থকরী রোজগার থাকতে হবে, নাহলে সে এ খাজনা দেবে কীভাবে? যে টোটোরা মূলত কৃষিকাজের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যই উৎপাদন করেন, তাঁরা খাজনা দেবেন কীভাবে? অর্থ মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার ভারই কি তাকে জমি মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে না—নিশ্চয়তাকে জোরদার করার নাম করে কি অনিশ্চয়তারই আমদানি করা হবে না?

এই বিভ্রমপূর্ণ ধ্যান-ধারণাকে 'অগ্রগতি-উন্নতির একমাত্র পথ' বলে জয়ঢাক পিটিয়ে সরকারি 'ভূমিসংস্কারক' আধিকারিকরা কী করলেন আর তার ফল কী দাঁড়াল? নৃতাত্ত্বিক বিমলেন্দু মুজমদারের ১৯৯৬ সালের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি:

> ১৯৬৯ সালের আগে পর্যন্ত টোটোপাড়ার ১৯৯১.৫৯ একর জমি টোটো দলপতি ধনপতি টোটোর নামে টোটোদের যৌথ সম্পত্তি হিসেবে নথিভুক্ত ছিল। ১৯৬৯ সালে কোনো কারণ না দেখিয়ে ৩৪৭.৪৩ একর বাদে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন (৩৮)-এর ৪৪ (২ক) ধারামতে টোটোদের সব জমি জেলাশাসকের খাস জমি হিসেবে নথিভুক্ত করে। অন্যদিকে ৩৪৭.৪৩ একর জমি (যা সেবছর টোটোদের চাষের এলাকা ছিল) ৮৯টি টোটো পরিবারের ব্যক্তিগত জমি হিসেবে নথিভুক্ত করে। এর ফলে বর্তমানে (১৯৯১-এ) ৯১টি পরিবারের নথিভুক্ত কোনো জমি নেই। নিজেদের জমিতেই তাঁরা ভূমিহীন। আবার যেসব পরিবারের জমি আছে, তাদের মধ্যে ৬০টি পরিবারের জমির পরিমাণ ৪ একরেরও কম। অথচ কৃষিবিশেষজ্ঞদের মতে টোটোপাড়ার মতো জায়গায় ৫ একরের কম জমি অর্থনৈতিক দিক থেকে চাষের পক্ষে লাভজনক নয়। অন্যদিকে বহিরাগতরা টোটোপাড়ার সবচেয়ে ভালো জমিগুলি দখল করে নিয়েছে এবং তাঁদের জমির পরিমাণ ৫-১৫ একরের বেশি। এভাবে আর্থিক অবস্থার অবনতির ফলে টোটোরা সারাক্ষণ জীবিকার তাড়নায় ব্যস্ত থাকেন...। (সূত্র ৪, পৃ. ১৬১)

ভাষাতাত্ত্বিক সুধীর কুমার বিষ্ণু-র ২০১২ সালের লেখা থেকেও আমরা পাই:

> ব্রিটিশ সরকার প্রায় ১৯৯১.৫৯ একর জমি তাদের (টোটোদের) প্রধানের নামে সংরক্ষিত রেখেছিল যাতে তা বহিরাগতদের দ্বারা দখল না হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬৯-এর ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী টোটোদের চাষজমির সিংহভাগ 'ভেস্ট' বলে ঘোষণা করা হয় এবং বহিরাগতরা তা দখল করে নেয়। সেই সময় থেকে টোটোরা তাদের নিজেদের জমিতেই শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে এবং নিক্ষিপ্ত হয়েছে চরম দারিদ্র্যে। (সূত্র ৫, পৃ. ২৮, ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

সরকারের 'অবাক ভূমিসংস্কার'-এর মাধ্যমে নিজভূমে শরণার্থী হওয়ার জন্য ক্ষোভ টোটোদের সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলোচনার সূত্রপাত ঘটালেই টের পাওয়া যায়। ধনীরাম টোটো এখনও এক নিঃশ্বাসে বর্ণনা করে যান কীভাবে সেইদিন তাঁরা সরকারের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন—তাঁর কথা শুনে সেই সময়ে কী ঘটেছিল তা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ও আধিকারিকেরা ১৯৬৯ সালে এসে টোটোদের বলেছিলেন যে সমস্ত জমি গোষ্ঠীগত মালিকানাধীনে টোটোদের প্রতিনিধি হিসেবে গোষ্ঠীপতি বা প্রধান-এর নামে নথিভুক্ত করা যাবে না। তা করলে সে জমি প্রধানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ধরা হবে। ফলে প্রধান বিবেচিত হবে 'বড়ো জমিদার' হিসেবে এবং ভূমিসংস্কার আইনবলে 'সিলিং বহির্ভূত' সমস্ত জমি সরকার খাসজমি রূপে বাজেয়াপ্ত করে নেবে। সরকারি প্রতিনিধিরা বলে যে জমি প্রতি পরিবার পিছু একজনের নামে ব্যক্তিমালিকানাভুক্ত হিসেবেই নথিভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি আর একটা ব্যাপারও ছিল। ১৯৬৯-এর আগে অবধি পরিবার পিছু গড়ে বাৎসরিক ২ টাকা ধরে একটা মোট খাজনা একলপ্তে মণ্ডল বা প্রধানের কাছ থেকে সরকার আদায় করত। ১৯৬৯-এ সরকারি প্রতিনিধিরা বলল যে প্রতিটি টোটো পরিবারের প্রধানকে আলাদাভাবে অর্থ খাজনা দিতে হবে তার পরিবারের মালিকানাভুক্ত জমির মাপ অনুযায়ী। সে খাজনা দিতে না পারলে সরকার তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করে নেবে। টোটোরা চকিত বিহ্বল হয়ে পড়ল। জমির উপর ব্যক্তি মালিকানার কোনো ধারণা তাদের সংস্কৃতিতে না থাকায় তাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে কীভাবে তারা

পশুচারণভূমি, কৃষিভূমিকে পরিবার পিছু ভাগ করবে—সাধারণভাবে কোনো পরিবারের নির্দিষ্ট একখণ্ড কৃষিজমি বা নির্দিষ্ট একখণ্ড পশুচারণভূমি তাদের রীতিতে ছিল না। তার উপর বেশির ভাগ পরিবারের ক্ষেত্রেই টাকায় রোজগার ছিলই না বা যৎকিঞ্চিৎ ছিল, ফলে অর্থ খাজনা নিয়মিতভাবে সরকারকে দেওয়া তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। ওদিকে, খাজনা না দিলে সরকার শাস্তি দেবে, জমিও কেড়ে নেবে—এই আশঙ্কা বড়ো হয়ে উঠল। তাই বহু পরিবার ভয়েই জমি নথিভুক্ত করাল না। আর যারা জমি নথিভুক্ত করালও বা, তারাও খাজনার ভয়ে অল্পস্বল্প জমি করাল। ফল দাঁড়াল এই যে ১২৩টি পরিবারের মধ্যে ৮৯টি পরিবার মাত্র ৩৪৭.৪৩ একর জমি নথিভুক্ত করাল, ৩৪টি পরিবার হয়ে দাঁড়াল 'ভূমিহীন' আর ১৯৯১.৫৯ একর জমির বাকিটা খাসজমি হিসেবে সরকারের দখলে চলে গেল। সরকার সেই জমি দখলে নিয়ে যখন দখলদারি পাট্টা দিতে শুরু করল, তখন দেখা গেল যে 'ভূমিহীন টোটোদের' জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করা হল না। ব্যক্তি মালিকানা ও অর্থকরী লেনদেনে অভ্যস্ত নেপালিরা বাইরে থেকে এসে সরকারি 'খাস' জমির দখলদারি পাট্টা দখলে নিতে লাগল। টোটোপাড়ার মোট জমির ৮০ শতাংশের উপর থেকে এভাবে টোটোদের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল, টোটোপাড়ায় নেপালিদের সংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি টোটোদের ছাপিয়ে গেল। এই সুযোগে টোটোদের নিজেদের গ্রামীণ পরিষদের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনার ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপিত করে দেশের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হল। পঞ্চায়েতেও সদস্যসংখ্যায় টোটোরা হয়ে দাঁড়াল নেপালিদের তুলনায় সংখ্যালঘু।

টোটোপাড়ায় টোটোদের পাড়া সংকুচিত হয়ে গেল। ধনীরাম টোটো বলছিলেন যে এই নিয়ে তাঁরা তাঁদের ক্ষোভ ও ন্যায্য প্রতিবিধানের দাবি এই ২০১১ সালে রাজ্যে বিধানসভায় পরিবর্তনের পরের নতুন সরকারের কাছে এসে জানিয়ে গেছেন আবারও। টোটোদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতি কীভাবে সরকার-বাহিত 'আধুনিকতা' ও 'উন্নয়ন'-এর অভিঘাতে দ্বন্দ্ব-সমস্যায় অস্থির হয়ে উঠছে তা আরও কিছুটা বিশদে বোঝার জন্য টোটোপাড়ায় টোটোদের পাড়াগুলোর দিকে এবার নজর ফেরানো যাক। টোটোপাড়ার যে গ্রামগুলোতে মূলত টোটোরা বাস করে, সেগুলো হল:

১. পঞ্চায়েত গাঁও (১২০টি পরিবার)।
২. সুব্বা গাঁও বা কাইজি গাঁও (৬৮টি পরিবার)।
৩. মণ্ডল গাঁও বা গাঙ্গু গাঁও (৩৫টি পরিবার)।
৪. মিত্রং গাঁও (৩৪টি পরিবার)।
৫. দুমসি গাঁও বা বৌদুবে গাঁও (৩২টি পরিবার)।
৬. পুজা গাঁও বা বুদুবে গাঁও (২৩টি পরিবার)।
৭. পাখা গাঁও (২০টি পরিবার)।
(বন্ধনীর মধ্যে পরিবারের সংখ্যাগুলো যে টোটোদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, তাঁদের বলা আন্দাজ থেকে দেওয়া হয়েছে।)

এছাড়া টোটোপাড়ার মধ্যে মঙ্গর গাঁও, পোয়ারগাঁও, কাবরাবতি-র মতো গ্রাম আছে, যেখানে মূলত নেপালিদের বাস।

বর্তমানে (২০১৫-র জুনে) টোটোপাড়ায় টোটোদের সংখ্যা ১৫০০-র অল্প কিছু বেশি, আর নেপালিদের সংখ্যা ১৮০০-র কিছু বেশি (এই সংখ্যা ধনীরাম টোটোর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী)। ১৯৯১ সালে নৃতাত্ত্বিক বিমলেন্দু মজুমদারের করা ক্ষেত্রসমীক্ষা আমাদের বলে যে সেই সময়ে টোটোপাড়ায় টোটোদের সংখ্যা ছিল ৯২৬ (টোটোপাড়ার মোট জনসংখ্যার ৪১.৩%), নেপালিদের সংখ্যা ছিল ১১৬৬ (মোটের ৫১.৯%) আর বাকি ৬.৮% মধ্যে বিহারী (৮৩ জন, ৩.৭%) ও হাতে গোনা কয়েকজন রাজবংশী, গারো, লেপচা ও মেচ। (সূত্র ৪, পৃ. ১৬০)

টোটোদের সংখ্যা একসময় খুব কমে গেলেও, ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে তাদের সংখ্যা বাড়ার দিকেই। এই ওঠাপড়ার ছবিকে সময়-সারণি রূপে দেখলে, তা এইরকম:

বছর	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা পুরুষ	জনসংখ্যা মহিলা	জনসংখ্যা মোট	১০ বছরে পরিবর্তন (+বৃদ্ধি, −হ্রাস)
১৯০১	৩৬	৭২	৯১	১৬৩	
					+ ৭২
১৯১১	৬০	১২৫	১১০	২৩৫	
					+ ৩৬
১৯২১	৬০	১৪০	১৩১	২৭১	
					+ ৬৩

বছর	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা			১০ বছরে পরিবর্তন (+বৃদ্ধি, −হ্রাস)
		পুরুষ	মহিলা	মোট	
১৯৩১	৬৩	১৩০	২০৪	৩৩৪	
১৯৪১	—	১৫৯	১৬২	৩২১	– ১৩
১৯৫১	৬৯	১৬১	১৬০	৩২১	০
১৯৬২	৮৫	২০৬	১৮৯	৩৯৫	+ ৭৪
১৯৭১	৯৬	৩৩২	৩১৮	৬৫০	+২৫৫
১৯৮১	১৩৫	৩৫৭	৩৪৯	৭০৬	+ ৫৬
১৯৯১	১৪১	৪৭১	৪৫৭	৯২৮	+ ২২২
২০০১	২৩৮	৬১০	৫৬৫	১১৭৫	+ ২৪৭
২০১১	৩০৬	৭৩৯	৬৫০	১৩৮৯	+ ২১৪

(তথ্যসূত্র : বিভিন্ন সরকারি জনগণনার ফল থেকে একত্রিত করা হয়েছে। ১৯৬১ সালে টোটোদের সংখ্যা আলাদাভাবে না গুণে ভুটিয়াদের সঙ্গে মিলিয়ে গোনা হয়েছিল, ফলে ১৯৬১ সালের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তাই ১৯৬১ সালের বদলে ১৯৬২ সালের তথ্য নেওয়া হয়েছে।)

এই সারণি দেখাচ্ছে যে ১৯০১ থেকে ১৯৩১ পর্যায়ে টোটোদের সংখ্যা বর্ধমান থাকলেও ১৯৩১ সালের পর থেকে দুই শতক তা কমেছে, বাড়েনি। এই দুই দশকের মধ্যে গোটা ডুয়ার্স এলাকাতেই দেখা দিয়েছিল ভয়াল দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পার্শ্বফল হিসেবে। এছাড়া টোটোপাড়ায় আর কোনো বিশেষ কারণ কি কাজ করেছিল? ১৯৬০-এর দশকে জনসংখ্যা আবার সংকোচন বা স্থবিরভাব কাটিয়ে উঠে বৃদ্ধির পথে দ্রুতগতি হয়। কিন্তু আবার তা থমকে দাঁড়ায় ১৯৭১-এর পর এক দশক। কেন? ১৯৬৯-এ ভারত সরকারের ভূমিসংস্কারের নামে টোটোদের নিজভূমে শরণার্থীতে পরিণত করার প্রভাবই কি এর কারণ? যেভাবে সরকার তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনাচরণে মুষলাঘাত করে টোটোদের নিক্ষিপ্ত করল 'আধুনিক দারিদ্র্যে', তাই কি তাদের জীবনরস শুষে নিয়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধি স্তিমিত করে দিয়েছিল? ১৯৮১ সালের পর তাদের জনসংখ্যা

বৃদ্ধি আবার তেজি হয়ে উঠেছে — প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝে এই জীবনশক্তি টোটোরা আবার কীভাবে সংহত করল? এই প্রশ্নগুলোকে মাথায় রেখেই এবার টোটোদের জীবনাচরণের ঐতিহাসিক প্রবাহের দিকে নজর ফেরানো যাক।

টোটোদের জীবন-জীবিকার অর্থনৈতিক বিবর্তন

১৮৬৪-৬৫ সালের ডুয়ার্স যুদ্ধের মধ্য দিয়ে টোটোদের বাসভূমি সহ ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রিটিশদের আধিপত্যাধীনে আসে। তার আগে অবধি এই অঞ্চল ছিল ভুটানের অধীন। ভুটানের দুর্গাধিপতি সামন্তপ্রভুরা প্রায়শই সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে 'খাজনা' লুঠ করে নিয়ে যেত এই অঞ্চল থেকে। তাছাড়া, এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ছিল তাদের বাণিজ্য পথ। টোটো, শেরপা, ডয়া, জলদা—এইসব উপজাতির মানুষরা ছিল সেইসব ভুটিয়া প্রভুদের বেগার খাটিয়ে বা দাস-খাটিয়ে, যারা ছিল বিনা পারিশ্রমিকে পণ্য বহন করতে বাধ্য। ভুটিয়াদের জংখা ভাষায় এদের বলা হত 'জাগো', যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'দাসপ্রজা'। এই ভারবহন ব্যবস্থাকে জংখা ভাষায় বলা হত 'হুইওয়া', যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'বেগার শ্রমদান'। টোটোদের বসতিগুলো দুর্গম অরণ্য এলাকায় ভুটিয়াদের বাণিজ্যিক পথের উপর স্থাপিত হতো। টোটো-রা ব্যবসায়িক পণ্যগুলো ভুটান পাহাড় থেকে ডুয়ার্সের বাজার-হাটে বা ডুয়ার্সের বাজার-হাট থেকে ভুটানের পাহাড়ে পোঁছে দিত। ভুটান পাহাড় থেকে ভুটানের আরও ভিতরে আনা-নেওয়ার কাজে পণ্য বহন করত ডয়া ও ডুকপা জাতির বেগার খাটিয়েরা। এইভাবে 'হুইওয়া'-র অঞ্চলভাগ ছিল। এই বেগার খাটার পাশাপাশি টোটোরা তাদের গোষ্ঠীগত মালিকানাধীন কৃষিজমিতে ঝুমচাষের মাধ্যমে 'কাউন' বা 'সামা' খাদ্যশস্য উৎপাদন করত। বন থেকে সংগ্রহের মাধ্যমেও খাদ্য সংগ্রহ করত। আর ছিল 'আংদাইওয়া', যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'ছোট বাণিজ্যিক পরিক্রমা'। টোটোপাড়ায় প্রচুর কমলালেবুর গাছ ছিল। সেই গাছের কমলালেবু বাজারে বহন করে নিয়ে এসে টোটোরা কিছু উপার্জন করত বা বিনিময় প্রথায় কিছু ব্যবহার্য বস্তু সংগ্রহ করত। এরই নাম ছিল আংদাইওয়া।

১৮৬৬ সালের পর থেকে ডুয়ার্স ব্রিটিশ আধিপত্যে আসার পর টোটোরা বেগার খাটার প্রথা থেকে মুক্তি পায়, 'হুইওয়া' প্রথার অবসান ঘটে। এরপর থেকে তারা নিজেদের গোষ্ঠীমালিকানাভুক্ত জমিতে ব্যাপক হারে কমলালেবুর

চাষ বাড়াতে থাকে। সেই কমলালেবু বিক্রি করে অর্থ ও অন্য নানা পণ্য সংগ্রহের অভ্যাস গড়ে ওঠে। একে তারা বলত 'পীচ্‌কো হওয়া', যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'দীর্ঘ বাণিজ্যিক পরিক্রমা'। জমির উপর গোষ্ঠীগত মালিকানাভিত্তিক গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে পণ্য-বিনিময়-ভিত্তিক উপার্জনের এক সংমিশ্রণ তাদের বস্তুগত জীবনে অভূতপূর্ব উন্নতির সূচনা ঘটায়। কিন্তু তা হঠাৎই একধাক্কায় চুরমার হয়ে যায় ১৯৩১ সালে।

১৯৩১ সালে অজানা রোগের মড়কে কমলালেবুর চাষ টোটোপাড়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেন মরে গেল কমলালেবুর গাছগুলো? টোটোদের মধ্যে লোকমুখে এমন একটা কথা প্রচলিত আছে যে মেচ জনজাতির মানুষেরা বৈরী মনোভাব থেকে অভিশাপ দেওয়ায়, তার প্রভাবে কমলালেবু গাছগুলো সব শুকিয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ধনীরাম টোটো অবশ্য তাঁর নিজের অনুমান হিসেবে অন্য একটি কারণের কথা বলেছেন। ধনীরাম টোটো বলেছেন যে বনজঙ্গল কেটে কমলালেবু গাছ লাগনোর অতিরিক্ত প্রবণতা ধীরে ধীরে আলগা করে দিয়েছিল উপরের উর্বর মাটি-স্তরকে, বর্ষার জলে ধুয়ে তা নেমে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, পড়ে থাকা অনুর্বর মাটি স্তর অযোগ্য ছিল কমলালেবু চাষের জন্য।

এই ধাক্কা টোটোদের জীবন-জীবিকাকে ওলট-পালট করে দেয়। উপার্জনের যে পথ তাঁদের জীবনকে বস্তুগতভাবে উন্নত করে তুলছিল, তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁরা চরম দারিদ্র্যে পতিত হন। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সাধারণ পরিস্থিতি সেই সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে। বহু টোটো তাঁদের পরিচিত ভারবহনের কাজে আবার ফিরে যান তবে এবার আর বেগারে নয়, মজুরির বিনিময়ে। ভুটানের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল থেকে কমলালেবু বহন করে এনে শীতের কয়েকমাস তাঁরা বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। টোটোপাড়ায় গড়ে উঠেছিল ভুটানের কমলালেবু রপ্তানির আড়ত। এছাড়াও, ভুটানের বিভিন্ন জায়গায় দৈহিক শ্রমের কাজে অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য বহুজন যেতে থাকেন। কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে টোটো পরিবারগুলো তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, তাও গোটা বছর চলার মতো নয়, ফলাতে পারত। ১৯৩১-১৯৫১ সময়কালে টোটোদের জনসংখ্যা কমে যাওয়া বা না বাড়া এই সংকটকালীন পর্যায়কেই চিহ্নিত করে।

ভুটানের কমলালেবু রপ্তানি ও ভুটানে ঠিকা শ্রমিক হিসেবে খাটতে যাওয়া—এই দুটো টোটোসমাজে এখনও জীবিকা হিসেবে আছে, যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাতে কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। ১৯৮৯ সালে ভুটানে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভুটান সরকার টোটোপাড়ার সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। ফলে ওই পথে কমলালেবুর বড়োমাপের চালান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অন্যভাবে কিছু টোটো এখনও ভুটানের কমলালেবু রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন, যা আমরা জানতে পারলাম সত্যজিৎ টোটোর সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে। সত্যজিৎ টোটোর জীবিকা মূলত কৃষিকাজ আর ভুটানে শ্রমিক হিসেবে খাটতে যাওয়া। কিন্তু টাকা জমিয়ে উঠতে পারলে সে ভুটানের কমলালেবু চাষের অঞ্চলে চাষশুরুর সময় চলে গিয়ে কমলালেবুর বাগান ভাড়া নেয়। চাষের গোটা সময় সেখানে থেকে, ফল উঠলে তা বেচে, উপার্জিত অর্থ নিয়ে সে ঘরে ফেরে। ১৯৮৯-এর পর থেকে ভুটানে ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতে গেলেও টোটোদের ভুটানে 'ওয়ার্ক পারমিট' করাতে হয়। সত্যজিৎ টোটোর কাছেই শুনছিলাম তাঁর ঠিকা শ্রমিক হিসেবে ভুটানে কাজ করতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা করা বা রাস্তা সারাই, পাহাড়ি নদীর উপর সেতু তৈরি বা সেতু সারাই—এমন নানা ধরনের নির্মাণের কাজে অন্য টোটোদের মতো সত্যজিৎও যান। তিনি বলছিলেন যে কাজ চলাকালীন খাওয়া-দাওয়া ও মদ অঢেল দেয়, কিন্তু মজুরি বেশ কম। তাও আবার অনেক সময় কাজ করার পরও টোটোদের মজুরি মারা যায়, মজুরি না দিয়েই তাদের খেদিয়ে দেওয়া হয়, ভুটানে তাদের কিছু করার থাকে না। সেইজন্য অনেক টোটোই 'ওয়ার্ক পারমিট' করার সময় নিজেদের আসল নামে না করিয়ে কোনো একটা ভুটানি নামে করায়। সত্যজিতের নিজের 'ওয়ার্ক পারমিট'-এর কার্ডটাও দেখলাম: ছোটো নীল আয়তাকার কার্ড, প্লাস্টিকে মোড়া, তার উপর সত্যজিতের ছবি, কিন্তু নামের জায়গায় একটা ভুটানি নাম। এছাড়া আছে এই মজুরির কাজ করতে যাওয়ার আর একটা বিপদ— জীবন হারানোর ভয়। পাহাড়ের গায়ে রাস্তা বা সেতু তৈরির কাজ করানো হয় ঝুঁকিপূর্ণভাবে, শ্রমিকদের সুরক্ষার কোনো বন্দোবস্ত না করেই। বহু টোটো ভুটানে খাটতে গিয়ে খাদে পড়ে মারা গেছে। শ্রমিকদের জীবনের দাম অত্যন্ত কম—দুর্ঘটনায় মারা গেলে ক্ষতিপূরণের কোনো বালাই নেই।

সেই ১৯৩১ সালের পর থেকেই ভুটানের কমাললেবু রপ্তানি বা ভুটানে ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যাওয়ার পাশাপাশি আর একটা দিকেও টোটোরা নজর দিয়েছিল, তা হল টোটোপাড়ায় কমলালেবু ছাড়া অন্যান্য কৃষিকাজ।

বি কে রায় বর্মনের ১৯৬৪ সালের লেখা থেকে আমরা পাই:

> কমলালেবু উৎপাদন ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প জীবিকার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। একই সঙ্গে, জমি-বুভুক্ষু নেপালি মানুষেরা চাপ তৈরি করছিল কমলা বাগান মরে যাওয়ার পর আনাবাদি হিসেবে পড়ে থাকা জমিগুলো ব্যবহারের জন্য। টোটোরা যেহেতু লাঙলের দ্বারা স্থিতু চাষে অভ্যস্ত ছিল না, তাদের কিছু নেতা টোটোপাড়ায় নেপালিদের বসতিস্থাপনকে স্বাগতই জানিয়েছিল। তাদের উৎসাহপ্রদানে অল্প কিছু নেপালি পরিবার প্রথমে টেটোপাড়ায় বসত-স্থাপন করে প্রায় ৩০ বছর আগে। তারপর নেপালিদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, এখন প্রায় ৩০০ জন নেপালি বসবাসকারী আছে টোটোপাড়ায়। (সূত্র ২, ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

এর প্রায় ৩০ বছর পর, ১৯৬৯ সলে নৃতাত্ত্বিক বিমলেন্দু মজুমদরের পর্যবেক্ষণ হল:

> কমলাবাগান নষ্ট হওয়ার পর টোটোরা তাঁদের জীবিকার জন্য কৃষির ওপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়। কিন্তু ভারবাহীর কাজ ও পরে কমলালেবুর চাষের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকায় টোটোরা সাধারণ কৃষিকাজেও (এমনকি ঝুমপদ্ধতিতেও) প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। কয়েক দশক আগেও তাঁরা প্রধানত ঝুমচাষ করতেন, লাঙলের ব্যবহার জানতেন না। পরে তাঁরা লাঙলের ব্যবহার শিখেছেন। ১৯৭৫ সালের পর প্রধানত সরকারি কৃষিবিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে তাঁরা বর্তমানে ধানচাষের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। কিন্তু এখনও টোটোদের অদক্ষ কৃষকই বলা যেতে পারে, তার বেশি নয়। উন্নত সার, বীজ ও সেচের ব্যবহারে এখনও তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তাঁরা এখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তার জন্য প্রয়োজনীয় জমিও এখন আর সকলের নেই। (সূত্র ৪, পৃ. ১৫৯)

দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৩৯-পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যশস্য চাষ টোটোপাড়ার অর্থনীতিতে বড়ো জায়গা করে নিয়ে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও, সেই ক্ষেত্রে টোটোদের

তুলনায় নেপালিদের আধিপত্য ক্রম-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুইটি কারণে—প্রথমত, প্রথাগতভাবে টোটোরা কৃষিকাজে অদক্ষ হওয়ায় ও দ্বিতীয়ত, ১৯৬৯ সালের সরকারি 'অবাক ভূমিসংস্কার'-এর ফলে টোটোদের হাত থেকে কৃষিজমি ও পশুচারণক্ষেত্রের সিংহভাগ নেপালিদের হাতে হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়ায়। তাই, এখনও অবধি টোটোদের কৃষিকাজ মূলত নিজেদের খোরাকি উৎপাদনের স্তরেই আছে। বাজারের জন্য কৃষি উৎপাদন ও সেই সূত্রে রোজগার নেপালিদের হাতে কেন্দ্রীভূত। প্রধানত যে ফসলগুলো টোটোরা চাষ করে, এবং সে চাষের সময় ও পদ্ধতি হল :

ফসল	চাষের সময়	চাষের পদ্ধতি
ভুট্টা	জুলাই-সেপ্টেম্বর	স্থিতু চাষ
কাওনি	আগস্ট-অক্টোবর	যাযাবরি চাষ
টোটো মারুয়া (প্রথাগতভাবে চাষ হওয়া মারুয়া)	মার্চ-এপ্রিল	যাযাবরি চাষ
নেপালি মারুয়া (নেপালিদের চালু করা মারুয়া চাষ)	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	স্থিতু চাষ

ধান মূলত নেপালিরা চাষ করে, টোটোদের মধ্যে ধান চাষ খুবই কম। এক একটি টোটো পরিবার তাদের নিজেদের চাষের ফসল দিয়ে গড়ে ছয়-সাত মাসের খোরাকি তুলে নিতে পারে, বছরের বাকি সময়ের খোরাকির জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় কৃষি ছাড়া অন্যান্য সূত্রে উপার্জন করে সেই টাকায় বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারার উপর।

টোটোপাড়ায় দোকানপাট চালানো, খুচরো ব্যাবসা করা—এসব করেন মূলত বিহারিরা, আর কিছু নেপালিরা। টোটোদের এ জীবিকায় দেখা যায় না বললেই চলে। প্রতি মঙ্গলবার টোটোপাড়ার সুব্বাগাঁও-এর বাজার এলাকায় হাট বসে। শুধু টোটোপাড়া নয়, আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে, এমনকি কাছাকাছি ভুটানের গ্রাম থেকে, ভুটানের ডয়া উপজাতিদের গ্রাম থেকেও, বহু মানুষ পাহাড়ি

পথে হেঁটে এই হাটে এসে জড়ো হয়। এই হাটের বিক্রেতারা বেশিরভাগই মাদারিহাট থেকে এসে একদিনের জন্য এখানে দোকান বসায়। 'ইউ' (মাড়ুয়া বা কাওনি থেকে তৈরি পানীয়)-এর কিছু 'ঠেক' টোটোরা এই হাটে বসায়—কিন্তু তা ছাড়া এখানে আর কোনো টোটো ব্যাপারি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে বছর কুড়ি সময়কাল বাঁশ একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে দেখা দিয়েছিল। টোটোপাড়ায় তখন প্রচুর বাঁশঝাড় ছিল। বাঁশ টোটোদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল। বাড়ি তৈরি থেকে শুরু করে রান্নার পাত্র বা পানপাত্রও টোটোরা বাঁশ দিয়ে তৈরি করত। সরকারি আধিকারিকরা টোটোদের উৎসাহিত করে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলোয় বাঁশ বিক্রি করার জন্য। সরকারি দফতর টোটোদের একটা সমবায় সংস্থাও গড়ে দেয় এই ব্যবসার কাজ পরিচালনার জন্য। বছর কুড়ি সময়কাল প্রচুর বাঁশ বিক্রি হয়, টোটোরা বেশ কিছু উপার্জনও করেন। তারপর কমলালেবু গাছের মতোই, বাঁশের ঝাড়ও টোটোপাড়ার মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। এখন বাঁশের ঝাড় প্রায় দেখাই যায় না। ফলে, বাঁশ বিক্রি তো বন্ধ হয়েছেই, নিজেদের নিত্য-ব্যবহারের জন্যও এখন টোটোদের বাঁশ মেলে না।

'আধুনিক' শিক্ষা এবং 'আধুনিক' জীবিকা

টোটোপাড়ায় ১৯৬০-এর মার্চে নৃতাত্ত্বিক চারুচন্দ্র সান্যাল দেখেছিলেন :

> বহু টোটোই ভাঙা বাংলা বলতে পারে। কিন্তু সাক্ষরতার কোনো অগ্রগতি এখনও ঘটেনি। টোটোদের ভাষা চর্চা করবে এবং তাদের নিজেদের ভাষায় তাদের প্রাথমিক পাঠ দেবে এমন কেউ নেই। তেমন কেউ থাকলে শিক্ষা গ্রহণ করতে তাদের উৎসাহ বাড়ত। (সূত্র ১, পৃ. ৩২, ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

১২ বছর পর, ১৯৭২-এর নভেম্বরের চারুচন্দ্র সান্যাল টোটোপাড়ায় দেখেছিলেন :

> একটা বড়ো স্কুলঘর বানানো হয়েছে যেখানে অনুঘা এক্কা নামে এক ওঁরাও হলেন শিক্ষক এবং ৫৫ জন ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থী হিসেবে নাম লিখিয়েছে। (সবাই টোটো এমনটা লেখক বলেননি, সুতরাং ধরা যেতে পারে যে এর মধ্যে বড়ো সংখ্যায় নেপালিরা আছেন।— বর্তমান লেখক) সম্প্রতি স্কুলটিকে জলপাইগুড়ি স্কুল বোর্ডের অধীনস্থ করা হয়েছে।

> দেখলাম যে বহু টোটোই বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছে। (সূত্র ১, পৃ. ৩৪, ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

তার আবার ২৪ বছর পর, ১৯৯৬ সালে নৃতাত্ত্বিক বিমলেন্দু মজুমদার লিখেছেন:

> বর্তমানে টোটোপাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা, গ্রামপঞ্চায়েতের সব কাজকর্ম বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীরাও বাংলাভাষী। ফলে টোটোপাড়ায় বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ও বর্তমানে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। নতুন যুগের টোটো যুবক-যুবতীরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছেন। শ্রীমান ধনীরাম টোটো বাংলা ভাষার মাধ্যমে গল্প লেখার কাজও শুরু করেছেন। এভাবে টোটো জনজাতি ক্রমশ দেশের মূল সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নিজেদের মিলিত হবার প্রয়াস পাচ্ছেন। তবে সংস্কৃতি গ্রহণের এই প্রবাহ এখনও টোটো জনজাতির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রমূলে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। (সূত্র ৪, পৃ. ১৬২)

সম্প্রতি, ২০১২ সালে, ভাষাতাত্ত্বিক সুধীরকুমার বিষ্ণু টোটোপাড়া সম্পর্কে লিখেছেন:

> একটি প্রাথমিক এবং একটি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল এবং শেষ চার দশক ধরে তারা শিক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কেবলমাত্র স্কুল নয়, টোটোপাড়া এখন সুসজ্জিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাংক, সরকারি দফতর, অতিথিশালা, গ্রামীণ পাঠাগার, ভিডিও প্রেক্ষাগৃহ, হোটেল, দোকান এবং আধুনিক জীবনের আরও বহু উপকরণ দিয়ে। নিয়মিত বাস পরিষেবা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। নেপালি, বাঙালি ও হিন্দিভাষী মানুষজনের সঙ্গে ঘনঘন সংস্পর্শে আসা টোটো সমাজকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। তার ফলে টোটোরা তাদের নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলছে, এমনকি তাদের মাতৃভাষাও হারিয়ে ফেলছে। (সূত্র ৫, পৃ. ৩২, ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের।)

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা দেখি যে:

১. ১৯৭০-এর দশক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন টোটোপাড়ায় হয় মূলত বাংলা ভাষা মাধ্যমে। টোটোদের নিজস্ব ভাষা, অর্থাৎ টোটো ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি।

২. এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে টোটো সমাজের যে অংশ বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির চর্চায় 'আগ্রহী' হয়ে উঠেছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে (১৯৯৬ সালে) এসেও দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা 'জনজাতির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রমূলে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি', যা ইঙ্গিত করে যে হয় তাঁরা টোটো সমাজের খুব ছোটো একটা অংশ, অথবা তাঁরা এমন একটা অংশ যাঁরা 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে টোটো সমাজ থেকে একপ্রকার সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে ফেলছেন, অথবা একসঙ্গে এই দুটোই, যার ফলে 'জনজাতির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রমূলে' তাঁদের প্রভাব খুবই কম। এই ইঙ্গিতগুলোর মধ্যে কোনটা কতটা সত্য?

৩. ২০১২-তে স্কুল ছাড়াও 'আধুনিক জীবনের আরও বহু উপকরণের' যে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাংক, সরকারি দফতর, অতিথিশালা, গ্রামীণ পাঠাগার ইত্যাদি পূর্বোল্লিখিত অল্পসংখ্যক টোটো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের বিকল্প জীবিকার, অর্থাৎ বেতনভুক কর্মচারী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করছে। ফলে টোটো সমাজে একটি নতুন স্তর—সরকারি কর্মচারী বা বেতনভুক কর্মচারী—আয়তনে ছোটো হলেও, তৈরি হচ্ছে। তাছাড়াও, যে কয়জন এই সমস্ত চাকরি পাচ্ছেন, তার চেয়ে একটা অনেক বড়ো অংশের কাছে এমন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা একটা বাস্তব সম্ভাবনা রূপে হাজির হতে বাধ্য এবং পূর্বালোচিত জীবিকার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে তা আকর্ষণীয় হয় উঠতেও বাধ্য। ফলস্বরূপ, এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার পথ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আকর্ষণও বাড়তে বাধ্য। এইভাবেই কি ক্রমশ আরও ব্যাপক সংখ্যক টোটো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা-মাধ্যম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলছে, নিজেদের ভাষা হারিয়ে ফেলছে?

এই সমস্ত প্রশ্নের কোনো উত্তর তৈরির জায়গা কি আমরা ২০১৫ সালের জুনে টোটোপাড়ায় আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেলাম? তাই-ই এবার দেখা যাক। আমাদের আলাপচারিতা যে তিনজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে হতে পেরেছে, সেই ধনীরাম টোটো, সত্যজিৎ টোটো ও উদয় টোটো তিনজনেই টোটোদের

মধ্যে সেই অল্পসংখ্যক জনেদের মধ্যে পড়েন যাঁরা মাধ্যমিক পাশ করেছেন। প্রথম দুইজন বাংলা বলা, লেখা ও পড়ায় খুবই সাবলীল—টোটো ভাষায় লেখা তাঁদের নিজেদের কবিতা তাঁরা নিজেরাই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে থাকেন, ধনীরাম টোটো বাংলা গদ্যও সাবলীলভাবে লিখতে দক্ষ। তৃতীয়জন, অর্থাৎ উদয় টোটো, বাংলা পড়া বা লেখায় সমর্থ নন, বলতে পারেন ভাঙা-ভাঙা। এই তিনজনই বাংলা ও ইংরেজি শেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন সরকারি বা বেসরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য। গ্রামীণ ব্যাংকে চাকরি পাওয়া ভক্ত টোটো, সরকারি আদিবাসী কল্যাণ দফতরে চাকরি পাওয়া ধনীরাম টোটো, স্কুলে পার্শ্বশিক্ষকের চাকরি পাওয়া সদ্যপ্রয়াত জগদীশ টোটো এবং কলকাতায় টাটার কোম্পানিতে কাজ পাওয়া টোটোদের মধ্যে প্রথম মহিলা স্নাতক রীতা টোটো তাঁদের সামনে উদাহরণ। সত্যজিতের নিজের সহোদর শিক্ষিত এবং যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের চাকরি না পাওয়ায় সত্যজিৎ ক্ষোভও প্রকাশ করেছে--সরকার কোনো গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত না করায় গ্রন্থাগারটি এখন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এঁরা তিনজনই বর্তমান সময়ে বাংলা শেখার থেকেও ইংরেজি শেখার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা বাড়ানোর দিক থেকে। তিনজনেই সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছেন টোটোপাড়ার ভিতরেই বিদেশী এনজিও সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা 'চিত্তরঞ্জন টোটো মেমোরিয়াল স্কুল'-এর যেখানে একেবারে বাচ্চাদের ইংরেজি অক্ষর ও শব্দের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা হয়। আমরা যে অতিথিশালায় থাকতাম, তার সামনেই এই একঘরের ইংরেজি শেখার স্কুল—কুড়িজনের মতো বছর সাত-আটের ছেলেমেয়েদের আমরা সেখানে পড়তে দেখেছি। ধনীরাম, সতজিৎ বা উদয়—তিনজনের কেউই বাংলা বা ইংরেজি ভাষাকে চাকরি বা কাজের মাধ্যম হিসেবে নেওয়ার সঙ্গে টোটোভাষা চর্চার কোনো বিরোধ বা বৈরিতা আছে বলে স্বীকার করেননি। এঁরা নিজেরা টোটোভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। উদয় টোটো তো আমাদের সটান বলেই দিলেন যে তাঁরা আমাদের বাংলা ভাষা কষ্ট করে শিখছেন, আমাদেরও উচিত তাঁদের টোটো ভাষা শেখা—কেবল তাঁরাই বাংলা শিখবেন এমনটা ঠিক নয়। সত্যজিৎ টোটো কবিতা লেখেন, গান বাঁধেন টোটো ভাষায় আর নিজেই সুর দিয়ে টোটো বাচ্চাদের মাঝে গিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সেইসব গেয়ে শোনান। এভাবে সেই বাচ্চাদের কণ্ঠেও তিনি টোটো ভাষার গান

তুলে দেন, বাৎসরিকভাবে নাচ-গানের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন তাদের নিয়ে। এভাবেই তিনি টোটো ভাষাকে সজীব রাখতে চান। টোটোদের প্রথাগত গান ও প্রথাগত পোশাকও বাচ্চাদের মধ্যে জনপ্রিয় করার চেষ্টা সত্যজিৎ চালিয়ে যাচ্ছেন—এই ব্যাপারে তিনি আশাবাদীও বটে। ধনীরাম টোটো কবিতা, গদ্য, লোককথা টোটো ভাষা ও বাংলা ভাষা—এই দুই ভাষাতেই লেখেন। তিনি গুরুত্ব দিলেন বাচ্চাদের টোটো ভাষায় পড়া-লেখা-র ব্যবস্থা তৈরি করার উপর। এই ভাবনা থেকে তিনি টোটোভাষার নিজস্ব লেখ্য রূপ তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিলেন। এই প্রয়োজন মেটাতে তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছেন। টোটো ভাষা ছিল একটি কথ্য ভাষা, তার কোনো লেখ্য রূপ ছিল না। ১৯৭০-এর দশক থেকে বাংলা ভাষা মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা শিকড় গাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা হরফে টোটো ভাষা লেখার রীতির প্রচলন হয়। এখনও তাই-ই চালু আছে। ধনীরাম টোটোর বক্তব্য এই যে টোটো ভাষার বহু ধ্বনিই বাংলা অক্ষরের মাধ্যমে প্রকাশ করা অসম্ভব, তাই টোটো ভাষাকে অবিকৃত রেখে তার লেখ্যরূপ নির্মাণ করতে হলে প্রয়োজন টোটো বর্ণমালা। টোটোপাড়ায় গবেষণার কাজে যাওয়া ভাষাতাত্ত্বিক টোবি অ্যান্ডারসনের সাহায্য-সহায়তায় ধনীরাম টোটো একটি নতুন বর্ণমালা তৈরি করেছেন যা টোটো ভাষার ধ্বনিসমূহকে প্রকাশ করতে পারবে। প্রতিটি টোটো ধ্বনিমূলের প্রতীক হিসেবে অক্ষর তৈরি করার সময় তিনি জোর দিয়েছেন যাতে সেই অক্ষরের 'ছবি'-রূপ আভাস বহন করে সেই অক্ষরে নাম শুরু এমন কোনো অতিপরিচিত বস্তুর আকারের। ধনীরাম বলেছেন যে তিনি তা করেছেন এইজন্য যাতে টোটো শিশুদের পক্ষে সহজ ও সহজাতভাবে এই বর্ণমালা আয়ত্ত করা সম্ভবপর হয়। 'চিত্তরঞ্জন টোটো মেমোরিয়াল স্কুল'-এর ঘরেও তিনি একটি বড়ো দেওয়ালপত্রে এই বর্ণমালা লিখে টাঙিয়ে দিয়ে এসেছেন যাতে সেখানে পড়তে আসা বাচ্চারাও দেখতে দেখতে এর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন টোটোর এইভাবে টোটোদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য সচেতন ভূমিকা নেওয়া এইটা প্রমাণ করে না যে টোটো ভাষা ও সংস্কৃতি বিলোপের আশঙ্কার মুখে দাঁড়িয়ে নেই। বরং উল্টোদিক থেকে এইটাই বলা যায় যে তেমন বিলোপের আশঙ্কাই ধনীরাম বা সত্যজিতকে উপরোক্ত ভূমিকা পালনের দিকে ঠেলছে। সত্যজিতের কথায়

Toto Alphabet

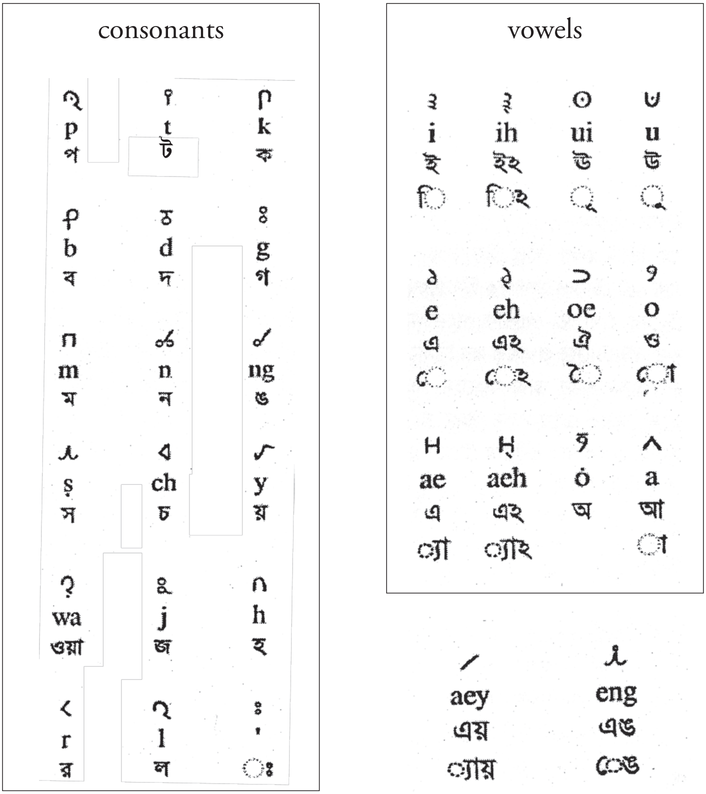

ধনীরাম টোটো উদ্ভাবিত টোটো বর্ণমালা

উঠে এসেছে যে টোটোদের বহু পুরানো গান হারিয়ে যাচ্ছে, পুরানো গানের ভাষাও এখনকার বহু টোটো তরুণের কাছে অবোধ্য ঠেকছে। বাংলা ও নেপালি শব্দের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে বহু টোটো শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। টোটো ভাষা ও সংস্কৃতি বিলোপের দিকে যাওয়ার নানা কারণ হিসেবে ধনীরাম টোটো যেগুলোকে চিহ্নিত করেছেন, সেইগুলো হল : নেপালিদের সঙ্গে সংমিশ্রণ, নেপালিদের প্রভাব, অর্থ রোজগারের জন্য ক্রমশ টোটো সমাজের গণ্ডী ছেড়ে বার হওয়ার বহির্মুখী টান। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভক্ত টোটো, ধনীরাম

টোটো, সত্যজিৎ টোটোদের প্রজন্মে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা চাকরি পেলেও তা মূলত টোটোপাড়ার মধ্যেই স্কুল বা সরকারি দফতরে পেত। রীতা টোটো টাটার কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে টোটোপাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর এখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষিতদের মধ্যে এমনভাবে বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদ বাড়ছে। ফলে ধনীরামের মতো শিক্ষিতদের নিজস্ব চেতনা ও পরিচয়ের শিকড় যেভাবে টোটো ভাষা-সংস্কৃতির মধ্যে প্রোথিত ছিল বা আছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিতদেরও তেমনটাই থাকবে কি না—তাও একটা বড়ো প্রশ্ন।

টোটোসমাজের গড়ন

টোটোসমাজ চোদ্দটি গোষ্ঠী এবং চারটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। চোদ্দোটি গোষ্ঠীর নাম হল: (১) বাঙ্গাবে, (২) বৌদুবে, (৩) বুদুবে, (৪) ধিরিংচান কোবে, (৫) নুরিন চান কোবে, (৬) মাংত্রচে, (৭) মানচিংচে, (৮) দাংত্রবে, (৯) নুবেবে, (১০) রেকানজিবে, (১১) নিশবান কোবে, (১২) দিগবে, (১৩) বানাংনা, এবং (১৪) জংকোবে। চারটি উপগোষ্ঠীর নাম হল: (১) মাইপা, (২) জাপা, (৩) মাচপা, এবং (৪) থাপা। আগেই বলেছি যে টোটোদের বিশ্বাস টোটোপাড়ায় বসত-প্রতিষ্ঠা করেছিল প্রথম যে চোদ্দটি টোটো পরিবার, এক একটি গোষ্ঠী সেই এক একটি পরিবারের বংশ। প্রথাগতভাবে এক একটি গোষ্ঠীর মানুষরা টোটোপাড়ার এক এক অঞ্চলে বাস করতেন, প্রতিটি গোষ্ঠীর একটা সাধারণ ঘর থাকত গোষ্ঠীগত আচার-অনুষ্ঠানের জন্য এবং গোষ্ঠীবিশেষে কবরস্থানও আলাদা আলাদা হত। বাঁদর ও কাঠবিড়ালির মাংস খাওয়া বা না খাওয়া এবং ডয়া, ডুকপা-র মতো ভুটিয়াদের সঙ্গে মেশা বা না মেশা—এমন প্রশ্নে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ফারাক থাকত। একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সাধারণত নিষিদ্ধ ছিল, বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে হওয়ারই চল ছিল। টোটোদের সঙ্গে অ-টোটোদের বিবাহের উপরও নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে ভারতীয় সমাজের জাতপাতপ্রথাকে মেলানো সম্পূর্ণ ভুল হবে, কারণ, এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সামাজিক মেলামেশার নিরিখে কোনো বাধা ছিল না এবং গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কোনোটা উঁচু, কোনোটা নীচু—সম্মান বা ক্ষমতার এমন কোনো বিভাজনও ছিল না। যেমন ধরা যাক, বুদুবে গোষ্ঠীর মানুষদের উপরই

দায়িত্ব থাকে টোটোদের উপাসনাস্থল 'দেমসা'-র রক্ষণাবেক্ষণের এবং বিয়ে বা মৃত্যু-পরবর্তী অনুষ্ঠানে পুরোহিতের কাজ করার। কিন্তু, সনাতন হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা যেমন সামাজিক সোপান- তান্ত্রিকতায় উচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন, তেমন কোনো আলাদা ক্ষমতা বা মর্যাদা বুদুবে-দের নেই।

টোটো সমাজ প্রথাগতভাবে একটি গ্রামীণ পরিষদের ধাঁচায় গঠিত হত। এই গ্রামীণ পরিষদের বিশেষ অধিকারিকরা এবং তাদের ভূমিকা ছিল এইরকম :

১. **কাইজি:** ইনি টোটোসমাজের ধর্মীয় প্রধান। বংশানুক্রমিকভাবে এই পদ পূরণ হত। এঁর বিশেষ দায়িত্ব ছিল সামাজিক রীতি-নীতি বা আচরণের বিষয়ে কোনো অসমাধিত প্রশ্ন দেখা দিলে তা গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করা।

২. **গাপ্পু বা মণ্ডল:** ইনি টোটোসমাজের ব্যবহারিক- বৈষয়িক ক্ষেত্রের প্রধান। এই পদটিও বংশানুক্রমিকভাবে পূরণ হত। চাষের জমি, পশুচারণের জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো বিবাদ দেখা দিলে ইনি সমস্ত গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করে তার সমাধান করতেন।

৩. **পঞ্চায়েত:** এঁর মূল দায়িত্ব ছিল চৌকিদারি খাজনা নির্ধারণ করা এবং গ্রামের সকলের কাছ থেকে তা আদায় করা। এছাড়াও, ছোটোখাটো বিবাদ-বিসংবাদ মেটানোর কাজ গ্রামের বয়স্কদের মতামত নিয়ে করাও এনার কাজের মধ্যে পড়ত।

৪. **নামপন বা সংবাদবাহক:** এঁর দায়িত্ব কাইজি ও মণ্ডলের মত/নির্দেশ গ্রামের সবার মধ্যে প্রচার করা।

৫. **চৌকিদার:** ইনি পঞ্চায়েতের অধীনে থেকে তাঁর নির্দেশমতো কাজ করতেন।

৬. **পাও:** কারো অসুখ করলে মন্ত্রপাঠ বা কবিরাজি ওষুধ দেওয়া, নতুন কারো জন্ম হলে বিজোড় সংখ্যক দিনে গিয়ে তার নামকরণ করা, উৎসব অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করা—এইসব ছিল তাঁর দায়িত্ব।

টোটোদের গোষ্ঠীগত জীবনাচরণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তভাবে এই সমাজগড়ন রূপ নিয়েছিল। জীবিকার বিবর্তন/পরিবর্তন, গোষ্ঠীগত চৌহদ্দির বাইরে মানুষজনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংযোগ/মিশ্রণ, বহির্জগতের সঙ্গে রাজনৈতিক-

অর্থনৈতিক-সামাজিক সম্পর্ক ক্রমনিবিড় হওয়া—এই সবের প্রক্রিয়ায় এই সমাজগড়ন নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে। সেই দিকে এবার চোখ ফেরানো যাক।

টোটোপাড়ায় প্রথম 'আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র' স্থাপিত হয় ১৯৫১ সালে 'ভারত মহাজাতিমণ্ডলী' নামক এনজিও ব্যবস্থাপনায় এবং তার আর্থিক দায়ভার পুরোপুরি সরকার বহন করেছিল। মণ্ডলীর পক্ষ থেকে যোগেন্দ্রনাথ সরকার টোটোপাড়ায় থেকে টোটোদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেন। টোটোদের মধ্যে নিজেকে ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দিয়ে যোগেন্দ্রনাথ সরকার 'পরিচ্ছন্নতা', 'স্বাস্থ্যবিধি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে টোটোদের অভ্যাস পরিবর্তন ও সরকারি সাহায্য হিসেবে সাবান, দুধ, কিছু ওষুধ বিবরণের মধ্য দিয়ে টোটোদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে সচেষ্ট হন। বাংলা ভাষা মাধ্যমে শিক্ষারও সূচনা করেন। ১৯৫৪ সালে হঠাৎই যোগেনবাবু ব্যাখ্যারহিতভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এই ঘটনার পরে ১৯৫৫ সাল থেকে সরকার এই আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্রের দায়ভার সরাসরি নিজের হাতে তুলে নেয়, ডি এস রানা নামে এক সরকারি আধিকারিক নিযুক্ত হন এই কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে। ডি এস রানা বিভিন্ন সরকারি শাখার সঙ্গে যোগসূত্র রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করেন যাতে এই সমস্ত শাখার প্রভাবের শিকড় এই অঞ্চলে গাড়া যায়। সরকারি সাহায্য যা অনুদান রূপে নানা দান-খয়রাতি টোটোদের মধ্যে বিতরণ করা, আশপাশের চা-বাগানে বা স্থানীয় বাজারে টোটোদের বাঁশ বিক্রিকে একটা সংগঠিত নিয়মিত রুপ দেওয়ার জন্য 'এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি' তৈরি করা, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে টোটোদের উপর ও তাদের কাজকর্মের উপর নিয়মিত তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য-পঞ্জি তৈরির কাজ করা, ইত্যাদি করতে থাকেন। ১৯৬৯ সালের সরকারি জমি জরিপ কাণ্ড, যার মধ্য দিয়ে টোটোদের গোষ্ঠী- মালিকানাভুক্ত ৮০% জমি তাঁদের হাতের বাইরে চলে গেল ও জমির উপর ব্যক্তিমালিকানার ধারণা জোর করে বাইরে থেকে আমদানি করা হল, সেই কাণ্ডেও এই আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই সমস্ত সরকারি আধিকারিক, সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে টোটোদের সম্পর্ক কীরকম ছিল? ১৯৫৩ সালে চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছিলেন: 'তারা (টোটোরা) সরকারের বনরক্ষী এবং আধিকারিকদের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের ভয় করে বলেই সম্মানও করে।' (সূত্র ১, পৃ. ২৭) এই ভয়-সম্মানের

উল্টোপিঠে ছিল ‘সহায়তা’র নামে দান-খয়রাতির ডালি—বাড়ি বানানোর জন্য হাতে গোনা কয়েকজনকে সরকারি ‘সাহায্য’, বাইরের পণ্য প্রাথমিকভাবে বিনা পয়সায় সরবরাহ করে তা ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা (যেমন বাইরের সাজ-পোশাক, রেডিও, ভোগ্যদ্রব্য), ইত্যাদি। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য এইসময় কী ছিল? তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৬৯ সালে টোটোপাড়ায় গিয়ে কাজ করা সরকারের অন্যতম বরিষ্ঠ আধিকারিক অমলকুমার দাসের সেই সময়ের লেখায়:

> (টোটোপাড়ায় নেওয়া) জনহিতকর ব্যবস্থাগুলোর সাফল্যের জন্য গ্রামের সংগঠনকে জোরদার করে তোলার এবং এই জনজাতির কাম্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, যাদেরই ব্যবহার করা যাবে এই উপজাতির মধ্যে উন্নতিকে হজম করানোর সহায়ক বস্তু হিসেবে। কিছু তরুণ টোটোকে বেছে নিয়ে এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এই সূত্রে দীনেশ, রমেশ, রবি, হরকে, দুরসে, গরবে, লাসে-দের মতো টেটোদের নাম করা যায়। বেশ ঘনঘন তারা শার্ট-প্যান্ট পরে, সিনেমা দেখতে যায়, অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যেও তারা বাইরের বহু জিনিসকে তাদের সমাজে চালু করার চেষ্টা করছে। এই তরুণ টোটোরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরনের রেডিও প্রোগ্রাম শোনে (টোটো গ্রামে একটা/দুটো ট্রানজিস্টার রেডিও পাওয়া যাবে)। যদিও বেশিরভাগ টোটো হিন্দি সিনেমার গানে ও নেপালি গানে আগ্রহী, এই তরুণ টোটোরা নেপালি ভাষায় সম্প্রচারিত খবরও শোনে, যার মধ্যে দিয়ে বাইরের বিশ্ব সম্পর্কে তারা খোঁজখবর রাখে। এদেরই ধরা যেতে পারে এই জনজাতির মধ্যের নতুন মেজাজের মাপক হিসেবে এবং বুদ্ধি-বিবেচনা করে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে তাদের আদিবাসী জীবনকে নতুন স্থায়িত্বে ঢালাই করার উপযোগী সংকর ধাতু হিসেবে। (সূত্র ৩, পৃ. ১২২-১২৩, ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের।)

কেবল রেডিও, প্যান্ট-শার্ট, সিনেমা, ভোগ্যবস্তু-র প্রতি আকর্ষণ নয়, টোটো সমাজের মধ্যে এই ‘নতুন মেজাজের মাপক’-দের সম্বন্ধে চারুচন্দ্র সান্যালের ১৯৫৩ সালের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়:

> গারগাপা-র বর্তমান নাম দীনেশ টোটো। তার এই নতুন নামকরণ করেছেন সদ্যপ্রয়াত যোগেন সরকার যিনি কয়েক মাস টোটোদের মধ্যে

> কাজ করেছিলেন। সে এলে দেখলাম যে সে বেশ বড়ো হয়ে গেছে। তার পরনে একটা হাফপ্যান্ট ও শার্ট, টোটো প্রাপ্তবয়স্করা যে প্রথাগত 'অ্যাং ডাং' নামক পোশাক পরে তার পরিবর্তে। দীনেশের সঙ্গে এল আরেকটি ছেলে, লম্বা খাঁকি প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে—সেও নাম বদলে একটা বাঙালি নাম নেওয়ার কথা ভাবছে। (সূত্র ১, পৃ. ৩০, ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষান্তর বর্তমান লেখকের করা।)

এই সবের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারের আদিবাসী কল্যাণ দফতরের পৌরোহিত্যে সরকারি সাহায্য অনুদান ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার একদিকে যেমন টোটোদের বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত করে তুলল, পণ্য ও ভোগবস্তু কিছুটা মাত্রায় তাদের কাছে লভ্য করে তুলল, অন্যদিকে তেমনই নিজেদের পোশাক, নিজেদের ভাষা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পরা, বাংলায় নাম রাখাকে 'আধুনিকতা-অগ্রগতি'-র সমতুল বলে তুলে ধরল।

১৯৬৯-এর আগে থেকেই টোটোপাড়ায় নেপালিরা বেশ ভালো সংখ্যায় বসতস্থাপন করেছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। ফলে টোটোদের চিরাচরিত গ্রামীণ পরিষদের ধাঁচা—যা কেবল টোটোদের নিয়েই তৈরি—তা গোটা টোটোপাড়ায় সমাজ-সংগঠনের কাজে আর যথেষ্ট হয়ে উঠছিল না। সরকারি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা সরকারি আধিকারিকদের উপর থেকে করা সংস্কার হিসেবে এলেও তা গৃহীত হওয়ার পিছনে চিরাচরিত টোটো গ্রামীণ পরিষদের নেপালি ও টোটো জনগণের সমবায়কে ধারণ করার অক্ষমতাও কাজ করেছিল। ১৯৬৯ সালে পূর্বকথিত 'অদ্ভুত ভূমিসংস্কার' হওয়ার সময় টোটোপাড়া গ্রামপঞ্চায়েত ছিল নয়জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত—তার মধ্যে ৬ জন নেপালি ও ৩ জন টোটো। তিনজন টোটো সদস্য ছিলেন আমেফা টোটো, দীনেশ টোটো ও লামসিং টোটো। আমেফা টোটো ছিলেন নির্বাচিত গ্রাম-অধ্যক্ষ।

এই আমেফা টোটোই হলেন টোটোসমাজের প্রথাগত গ্রামীণ পরিষদের শেষ বংশ পরম্পরাগতভাবে নিযুক্ত পঞ্চায়েত। ১৯৭৭ সাল থেকে সরকারি গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়মিতভাবে চালু হওয়ার পর থেকে গ্রামীণ পরিষদে বংশানুক্রমিকভাবে 'পঞ্চায়েত' নিযুক্ত হওয়ার প্রথা উঠে গেছে।

টোটোপাড়া বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট ব্লকের টোটোপাড়া-বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। সেই মেতাবেক বিধানসভা নির্বাচন,

লোকসভা নির্বাচন ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিয়মিত চক্রের মধ্যে অন্তর্গত হয়ে দেশজোড়া কেন্দ্রীভূত প্রশাসন-ব্যবস্থার অধীন সে চলে এসেছে। ফলে গ্রামীণ পরিষদের কিছু পদে, যেমন কাইজি-র পদে, বংশানুক্রমিক নিযুক্তি এখনও বহাল থাকলেও তা ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে।

২০১৫ সালের জুনে মাঠে-ময়দানে এ-সবের কী প্রকাশ আমরা দেখলাম—সেই কথা এবার কিছু বলা যাক। টোটোপাড়ায় পুরুষদের মধ্যে প্রথাগত পোশাক অ্যাং ডাং পরার চল পুরোপুরিই উঠে গেছে। মহিলাদের মধ্যেও উঠে গেছে বললেই চলে—বয়স্ক দুই-একজন মহিলা এখনও সেই পোশাক বুনতে পারে ও পরে বলে আমরা শুনলাম, কিন্তু দেখিনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা ও টোটোদের মধ্যে বাংলায় নাম রাখার প্রচলন এখন ব্যাপক। সত্যজিৎ, জগদীশ, ভক্ত, সনজিৎ, বকুল, রবি, রীতা, শোভা—এমন বহু বহু নাম। উদয় টোটো-র নাম 'উদয়'-টাও তো বাংলাতেই, যদিও সে নিজে বাংলা বলা বা লেখায় স্বচ্ছন্দ নয়। ফলত বাংলায় নামকরণ 'আধুনিকতা' বা 'অগ্রগতির' সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। সত্যজিৎ টোটো সাধারণভাবে প্রথাগত পোশাক ব্যবহার না করলেও বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানে প্রথাগত পোশাক ব্যবহার করার পক্ষে, এটা তাঁর কাছে জাতিগত আত্মসম্মানের বিষয়। এই বিষয়ে তিনি বেশ কিছু উদ্যোগও নিচ্ছেন। টোটোদের প্রথাগত উৎসবের সময়গুলোতে টোটো শিশু কিশোরদের নিয়ে টোটোদের প্রথাগত পোশাক পরে নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তিনি সংগঠিত করে থাকেন। টোটোদের প্রথাগত ঘর নির্মাণের কৌশল ছেড়ে পাকা ঘর-বাড়ি নির্মাণ এখন যাদের পক্ষে সম্ভব তারা করছেন—এ ব্যাপারে অবশ্য সত্যজিতের বক্তব্য এই যে পুরানো ঘরের চেয়ে নতুন পাকা ঘরেই থাকার সুবিধা অনেক, তাই টোটোরা কেন সে সুবিধা নেবে না? ধনীরাম টোটো এ বিষয়ে তাঁর একটা সাম্প্রতিক লেখা দেখালেন, যেখানে তিনি লিখেছেন:

> এই সহজ সরল জনজাতি (টোটো) প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে যুগের পর যুগ তাদের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষাকে বহন করে চলেছে। আধুনিক সমাজ নিয়মে আবদ্ধ হয়ে মূলস্রোতে তাল রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে আধুনিকতার পথে।...তবে বর্তমানে এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী টোটো সম্প্রদায় তার সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা ইত্যাদির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

> বজায় রাখতে কঠিনতর সংগ্রামের সম্মুখীন। আধুনিক কালের নিয়মে টোটো জনজাতির সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি P: Population, Politics, Pollution অর্থাৎ জনসংখ্যা, রাজনীতি, দূষণ। (সূত্র ৬)

ধনীরাম টোটোর মধ্যে আধুনিকতাকে গ্রহণ করার ইচ্ছার পাশাপাশি নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা নিয়ে গর্ব ও তা বিলোপের আশঙ্কা—এই দুইই যে আছে তা তাঁর উপরের লেখায় যেমন, তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতাতেও তেমনই বারবার উঠে এসেছে। টোটো সমাজে চুরি-ডাকাতি অজানা, আজ অবধি কোনো টোটো মানুষ গ্রামে বা গ্রামের বাইরে এই অপরাধে অভিযুক্ত হয়নি, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের জন্মের বহু আগে থেকেই টোটো সমাজে বিধবা বিবাহ স্বাভাবিক ঘটনা, বহুবিবাহ সাধারণভাবে টোটো সমাজে প্রচলিত নয়, মহিলাদের উপর লিঙ্গবৈষম্য প্রায় নেই, যৌননিপীড়নের ঘটনা এ সমাজে অজানা—এই সমস্ত তুলে ধরে ধনীরাম টোটো টোটোদের প্রথাগত সমাজ-সংগঠন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গর্ব প্রকাশ করেন, বলেন যে 'আমরা অনেক ভালো আছি' (কাদের তুলনায় অনেক ভালো আছেন? তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে যাঁরা তাঁদের 'নোংরা', 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন', 'অসভ্য' বলে 'সভ্য আধুনিক, আলোক- প্রাপ্ত' করে তোলার 'গুরুদায়িত্ব' নিজেরাই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাঁদের তুলনায়।) একইসঙ্গে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি, তা নিয়ে জানা বোঝা, নিজস্ব ধারণা তৈরি করাতেও তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ও সক্রিয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় আছে। কেবল তাই নয়, ভুটান, নেপাল, তিব্বত, চীনের সমাজ-ইতিহাস থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, বাংলার 'নবজাগরণ'—ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর নিজস্ব বেশ কিছু মতামত আছে। আবার তিনিই তাঁদের নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির 'নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে কঠিনতর সংগ্রামের' প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনটি, P-কে—Population, Politics, Pollution। এই তিনটি 'P' দিয়ে তিনি আসলে কী বলতে চাইছেন? আলাপচারিতার মাধ্যমে তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। যা বুঝতে পেরেছি তা বলি। জনসংখ্যা হ্রাস হয়ে একসময় প্রায় লুপ্ত হতে বসা টোটো জাতি এখন সেই বিপদ কাটিয়ে উঠে লাগাতারভাবে তার জনসংখ্যা বাড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। কয়েকশো থেকে এখন তাদের জনসংখ্যা দেড়

হাজার ছাড়িয়েও ক্রমবর্ধমান। কিন্তু চিরাচরিতভাবে যে ভূখণ্ড তাঁরা নিজেদের শ্রম দিয়ে বাসভূমি ও কর্মভূমি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, তার ৮০%-ই এখন তাঁদের হাতছাড়া, সে ভূখণ্ডে এখন নেপালিদের তুলনায় তাঁরা সংখ্যালঘুও বটে। এছাড়াও তাঁদের চিরাচরিত জীবিকাগুলো এখন আর সবার জীবিকাপ্রদান করতে অসমর্থ, নতুন জীবিকা বা আধুনিক জীবিকাও গুটিকয়কেই আশ্রয় দিচ্ছে, ব্যাপক অংশের কাছে চাকরি, ব্যবসার মতো সেসব আধুনিক জীবিকা নাগালের বাইরে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা তাঁদের কাছে কেবলমাত্র আশীর্বাদ না থেকে জীবন-জীবিকার সংকটকেও আরো ঘনীভূত করে তুলছে। আর এখানেই কাজ করছে দ্বিতীয় P অর্থাৎ Politics। সরকার দান-খয়রাতি, ছোটো একটা সুবিধাভোগী অংশ তৈরি করার মাধ্যমে যে রাজনীতি চালু করেছে তা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বগর্বে বাঁচার পরিবর্তে দান-খয়রাতির জন্য আবেদন-নিবেদন ও ক্ষমতাবানদের তুষ্ট করার পরনির্ভরতা- পরমুখাপেক্ষিতার জন্ম ও প্রসার ঘটাচ্ছে—ক্রমশ যা নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতি ত্যাগ করে অন্যের অক্ষম অনুকরণের প্রবণতা বাড়াচ্ছে। একে কেন্দ্র করেই টোটোদের সমাজে যা অপ্রচলিত ছিল, সেইসব দূষণ (Pollu tion) প্রবেশ করছে। ধনীরামের চোখে এই দূষণের একটা প্রধান রূপ হচ্ছে ঘুষের সর্বময় প্রচলন—ওপরতলাকে সন্তুষ্ট করা বা অন্যদের বঞ্চিত করে নিজের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করা—এইসব চিন্তার আগাছা এখন টোটোপাড়ার মাটিতেও মাথা তুলছে। এইসবের বিরুদ্ধেই ধনীরাম টোটো কঠিনতর সংগ্রামের কথা বলেছেন, যে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল টোটোদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য টিকে থাকতে পারে আধুনিকতার পর্যায়ে প্রবেশ করেও। ফলত, বোঝা যায়, বহির্বিশ্বের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংযোগ ও সংস্পর্শ টোটো সমাজের মধ্যে 'ক্ষমতাশালী আধুনিকতা'-র কাছে আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের একরৈখিক কোনো প্রক্রিয়া শুরু করেনি, বরং বহুমাত্রিক বহুস্বরীয় মন্থন প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। সেইখানে আত্মসমর্পণ, আত্মনিবেদন যদি থাকে, তবে তার পাশাপাশি যাচাই বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করার আত্মবর্গী আত্মসচেতনতাও আছে।

এই মন্থন প্রক্রিয়া, এই বহুমাত্রিক বহুস্বর টোটোপাড়াকে ঘিরে রাখা অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতির মতোই আকর্ষণীয়। তা 'কেবল একবারের চারদিনের

আবাসের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি জানাবোঝার নয়। আমাদের তাই আবার টোটোপাড়ায় যেতে হবে, বারবার যেতে হবে—জানাবোঝার জন্য, নিজেদের ঋদ্ধ করার জন্য।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৫

সূত্রনির্দেশ

১. চারুচন্দ্র সান্যাল লিখিত 'দি মেচেস অ্যান্ড টোটোস : টু সাব- হিমালয়ান ট্রাইবস অফ নর্থ বেঙ্গল', দক্ষিণবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত।
২. বি কে রয় বর্মন দ্বারা ১৯৬৪ সালে তৈরি করা সরকারি প্রতিবেদন 'এ নোট অন দি সোসিও মেডিকাল সার্ভে অ্যামঙ দি টোটোস'।
৩. অমলকুমার দাস লিখিত 'দি টোটোস', ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সিডিউলড কাস্টস অ্যান্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট' কর্তৃক প্রকাশিত।
৪. বিমলেন্দু মজুমদার লিখিত প্রবন্ধ 'টোটো জনজাতির আর্থ-সামাজিক বিবর্তন ও সংস্কৃতি' যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-র পত্রিকা 'লোকশ্রুতি'-র ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।
৫. সুধীরকুমার বিষ্ণু লিখিত 'এ ডেসক্রিপটিভ স্টাডি অফ টোটো ল্যাংগুয়েজে' গ্রন্থি, ২০১২ সালে কলকাতার 'দি শী বুক এজেন্সি' কর্তৃক প্রকাশিত।
৬. ধনীরাম টোটো লিখিত 'টোটো জনজাতির সমাজজীবন' প্রবন্ধ, দেবব্রত চাকী সম্পাদিত, দিনহাটা কোচবিহার থেকে প্রকাশিত 'ডুয়ার্সের বনে বাদাড়ে' গ্রন্থে সংকলিত।

[সম্পাদকীয় মন্তব্য: এই লেখা এবং টোটোপাড়ায় তৎপরবর্তী সমীক্ষাভিত্তিক বিপ্লব নায়কের অন্যান্য লেখা এবং ধনীরাম টোটো ও সত্যজিৎ টোটোর লেখা নিয়ে 'মাতৃভাষা থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'টোটোজাতির কথা' (তৃতীয় সংস্করণ, ২০২০) বইটি। ধনীরাম টোটোর লেখা উপন্যাস 'ধানুয়া টোটোর কথামালা' 'অন্যতর পাঠ ও চর্চা' থেকে প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালে। আগ্রহী পাঠকরা আরও বিশদ চর্চার জন্য এই বইদুটো দেখতে পারেন।]

তামাঙ জনজাতির কথা

বিপ্লব নায়ক

কালচিনি রেল স্টেশন। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জংশনগামী দূরপাল্লার দ্রুতগামী ট্রেনগুলি এই ছোট্ট স্টেশনকে পাত্তাই দেয় না—না থেমে উপেক্ষার ধুলো উড়িয়ে গমগম করে চলে যায়। দিনে দু'বার আঞ্চলিক সাধারণ যাত্রীদের ট্রেন হেলেদুলে এসে দাঁড়ায়। চা-শ্রমিক, মুটে-মজুর লোকজন হইচই করে গাড়িতে ওঠে বা গাড়ি থেকে নামে। সেই রেশ কেটে গেলে আবার আনমনা একলা স্টেশন কালচিনিতে স্তব্ধতা নামে। স্টেশনটার চারদিকে চা-বাগান। চা-বাগানগুলোয় কাজ চালু থাকলে হাঁকাহাঁকি-ব্যস্ততার একটা প্রলেপ চারদিকে পড়ে থাকে। কিন্তু ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের এই মার্চ মাসে এখন চারদিক শুনশান, কারণ চা-কোম্পানিগুলো বাগান বন্ধ করে রেখেছে, কাজ হচ্ছে না, টুকটাক কিছু তদারকি-মেরামতের কাজ ছাড়া।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা মাঝারি প্রস্থের পিচ-বাঁধানো পথ রেললাইনের সমান্তরাল দু'দিকে চলে গেছে। সেই পথ দিয়ে ডানদিকে এগোলে একটু পরেই এক তিন রাস্তার মোড়। সেখানেই বাস ও ট্রেকার দাঁড়ানোর জায়গা। সোজা পথটা চলে গেছে হ্যামিল্টনগঞ্জের দিকে আর লম্বভাবে ডানদিকে যাওয়া পথটা গেছে মাদারিহাটের দিকে। এই মোড় ঘিরে দুটো হোটেল আর কয়েকটা বড়ো দোকান। রাস্তার দু'দিকে কাঠ ও সিমেন্টের বাড়ি—কিছু পাকা ছাদের, কিছু টিনের ছাদের। মূল রাস্তা থেকে শাখাপ্রশাখা রাস্তা বেরিয়ে দু'দিকে বসতির

মধ্যে ঢুকে গেছে। বড়ো বড়ো গাছ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। গাছগুলো বেশ অন্যরকম। চারদিকে কংক্রিটের জঙ্গলের মধ্যে ইট-পাথর-সিমেন্টে হাঁটু ডোবানো বিষণ্ণ ম্রিয়মান গাছ নয়, যেমনটা আমরা শহরে দেখি। গাছগুলো বেশ আপন বশে মাটি থেকে খাড়া উঠে সুপুষ্ট গুঁড়ির উপর চারদিকে ডালপালা মেলে দিয়েছে। আর সেই ডালপালা ও গুঁড়ি জড়িয়ে-পেঁচিয়ে নানা রকমের আরোহী লতা ও মস ঝুরি নামিয়েছে, বিচিত্র সবুজের সমারোহ লাগিয়েছে—ঠিক যেমন জঙ্গলের গাছ হয়। জঙ্গল পরিষ্কার করেই এখানে চা-বাগান ও লোকবসতি দানা বেঁধেছে। আর আগের, আড়াইশো-তিনশো বছর আগেকার জঙ্গল এই গাছগুলোর মধ্য দিয়েই বেঁচে আছে। বসতির মধ্যে বেশির ভাগ পরিবারের জীবিকাই চা-বাগানের সঙ্গে যুক্ত। চা-বাগান বন্ধ থাকায় চা-বাগানে কাজের ভবিষ্যৎ আদৌ কী হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা গোটা অঞ্চলেই ছেয়ে আছে। কিন্তু চারপাশে রঙের অভাব নেই। বসতির বেশিরভাগ একতলা দু-তিন কামরার ঘরগুলো ঘিরে উঠোনে হরেক রঙের ফুলের গাছ—বাড়ির বাসিন্দাদের আদরে-আহ্লাদে ডগমগিয়ে উজ্বল ফুলের হাসি মেলে রেখেছে। বেশির ভাগ হলুদ বা কমলা কদম ফুলের ঝাড়, হঠাৎ হঠাৎ চমকে দিয়ে অন্য নানারকম ফুলের গাছও আছে। আর বাড়ির উঠোনে পোঁতা আছে তিন-চারতলা সমান উচ্চতার একটা লম্বা সোজা বাঁশ—তার মাথায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধাতুর ঘটি-আকারের পাত্র আর গায়ে জড়ানো ও ঝোলানো বৌদ্ধ মন্ত্র লেখা নানারঙের কাপড়। বেশির ভাগ উঠোনে কিছু কিছু ফলের গাছও আছে। তবে, এই ফুলের গাছ ও বৌদ্ধ ধর্মদণ্ড দেখলেই চেনা যায় যে এই বাড়িটি তামাঙদের। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানে যতই ভিন্নতা থাকুক, এই ফুলের গাছ ও ধর্মদণ্ড ছাড়া কোনো তামাঙের বাড়ি পাওয়া যাবে না।

বসতির মধ্যে শাখা-প্রশাখা গলি ঘুরে আবার হ্যামিলটনগঞ্জমুখী প্রধান রাস্তায় উঠে এলাম। বেশ কিছুটা রাস্তা ধরে এগিয়ে বাঁদিকে তামাঙদের গুম্‌ফা। চৌকো একটি পাঁচিলঘেরা জমিতে এক ছোট্ট গুম্‌ফা। পাঁচিলের গায়ে ঢোকার দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকলেই পাশে কাঠের তৈরি বসার জায়গা। গুম্‌ফার চারদিকে ঘাসের চাদর বিছানো, বড়ো বড়ো গাছ, ফুলগাছ তো আছেই। তখন ভোরবেলা। সকাল ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে এক সময়। গুম্‌ফার ভিতর থেকে সুরেলা বৌদ্ধ প্রার্থনা

সঙ্গীত ও বাদ্য ভেসে এসে চারদিকে এক থমথমে পরিবেশ তৈরি করেছে। গুম্‌ফায় ঢুকে দেখলাম ভিতরে কোনো মানুষ নেই, দরজার মুখোমুখি দেওয়ালে বুদ্ধের মূর্তি, চারদিকের দেওয়াল জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাখ্যানের নানা ছবির টালি বসানো আর তাকে রয়েছে লাল কাপড়ে মোড়া কিছু পুঁথির সংগ্রহ। সংগীত ও বাদ্য সিডি থেকে বাজছে। গুম্‌ফার ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের ঘাসমোড়া গাছভরা উঠোনে দু’জন যুবককে চোখে পড়ল—আগে খেয়াল করিনি। লম্বা লাঠির শেষে বাঁধা নারকেল কাঠির ঝাঁটা দিয়ে তারা উঠোন পরিষ্কার করছে, ঝরে পড়া পাতা একসাথে করে কোণের এক গর্তে ফেলছে। তাদের বয়স খুব বেশি হলে আঠারো-উনিশ হবে। পায়ে প্যায়ে তাদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কথা চালাতে লাগলাম। বাংলা বোঝে। তারা এই গুম্‌ফার পিছন দিকে কয়েকটা পাড়া পেরিয়ে এক তামাঙ পাড়ায় থাকে। তারা একই পরিবারের। তাদের পরিবারের উপর আজ দায়িত্ব পড়েছে ভোরে গুম্‌ফা সাফ্‌সুতরো করার। তাই তারা দুজন এসে সেই কাজ করছে। এমনভাবে ঘুরে ঘুরে এক এক পরিবারের উপর এক একদিন দায়িত্ব পড়ে, তামাঙ সমাজের বয়স্ক-অভিজ্ঞদের সভা তা ঠিক করে দেয়। তারা হাইস্কুলে পড়ে—স্কুলে ইংরেজি, বাংলা, নেপালি পড়ার সুযোগ আছে। তামাঙ ভাষা পড়ার সুযোগ নেই। তারা কী তামাঙ ভাষা জানে, তামাঙ ভাষায় কথা বলে? না, তারা জানে না, সাধারণভাবে নেপালি ভাষাতেই কথা বলে। তামাঙ ভাষা বলতে পারে না, কেউ তামাঙ ভাষা বললে তার অর্থও করতে পারে না। ওদের পরিবারে ঠাকুরমা-ঠাকুরদারা তামাঙ ভাষা বলতে পারে, নিজেদের মধ্যে বলেও। বাবা-মা-কাকা-কাকিরা তামাঙ ভাষা কিছু কিছু বুঝতে পারে কিন্তু সাবলীলভাবে বলতে পারে না। আর তাদের প্রজন্ম তো বলতে-বুঝতে কিছুই পারে না। তাদের চেনাশোনা সবার ঘরেই এমন অবস্থা। বৃদ্ধদের প্রজন্ম চলে গেলে তামাঙ ভাষায় কথা বলার আর কেউ হয়তো থাকবে না। তাদের নিজেদের ভাষা এভাবে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, তাদের খারাপ লাগে না? তারা একটু থমকে দাঁড়াল, কোনো উত্তর দিল না।

তাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে গুম্‌ফার লামার সাথে কখনো দেখা করা যাবে। তারা বলল যে, গুম্‌ফার লামা বহুদিন ধরেই অসুস্থ, এখন এত বাড়াবাড়ি হয়েছে যে বাড়ি থেকেই বেরোতে পারছেন না, ফলে গুম্‌ফায় তার সঙ্গে দেখা করা

যাবে না। বললাম যে, তার বদলে অন্য কোনো লামা আসে না? তারা বলল যে এখনকার প্রধান লামা মারা গেলে তবেই আবার নতুন লামা নিয়োগ করা হবে। জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে নিয়োগ হবে? তারা বলল যে তামাঙ সমাজের বয়স্ক ও অভিজ্ঞদের সভা ঠিক করবে কাকে নিয়োগ করা যায় তামাঙ সমাজের মধ্য থেকে।

মনে আর একটা প্রশ্ন ঘুরছিল, করে ফেললাম। লামা হওয়ার যোগ্যতা কী? তারা বলল যে, প্রায় প্রতি পরিবার থেকেই কেউ না কেউ ছোটোবেলা থেকে লামা হওয়ার প্রশিক্ষণ নেয় নির্দিষ্ট গুম্ফায় গিয়ে। সেখানে তাদের তিব্বতি ভাষা শেখানো হয় ও তিব্বতি ভাষায় লেখা ধর্মপুঁথি পড়ানো হয়। তামাঙদের ঐতিহ্যবাহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মমতের রীতিনীতি শেখানো হয়। এই প্রশিক্ষণ যে শেষ করে, তার পদবি, আগে যাই থাকুক না কেন, বদলে 'লামা' হয়ে যায়। এদের মধ্যে থেকেই এই গুম্ফার প্রধান লামা নিয়োগ করা হয়। জিজ্ঞাসা করলাম এমন প্রশিক্ষণকেন্দ্র এখানে কোথায় আছে? তারা বলল যে কাছেপিঠে দুটো আছে, তার মধ্যে একটা আছে জয়গাঁয়।

তাদের কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। হাত-পা ধুয়ে তারা এবার বাড়ির পথ ধরবে। সূর্যের আলো তখনও প্রখর হয়নি।

২

কালচিনির তেমাথার মোড় থেকে গুম্ফার দিকে কিছুটা এগোনোর পর মূল রাস্তা থেকে নেমে তামাঙদের বসতির মধ্যে নেমে এলাম। বসতির নাম 'গোরে লাইন'। চা-বাগানের শ্রমিকদের বসত হিসেবে এর সূত্রপাত। সরু রাস্তার দু'পাশে পর পর বাড়ি, ধর্মদণ্ড ও ফুলভরা উঠোন-এর মাঝে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বেশ প্রশস্ত রোদ এসে পড়েছে রাস্তার এক পাশে, সেখানে সকালের রোদ পোহাচ্ছিলেন এক বয়স্ক পুরুষ। তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম। তাঁর নাম ভীম লামা, পাশের বাড়িটাই তাঁর বাড়ি। আমাকে তাঁর বাড়িতে ঢুকিয়ে উঠোনে বসালেন। একদিকে দু-কামরার টিনের চালের কাঠ ও কংক্রিটের দেওয়ালের ঘর, অন্যদিকে উজ্জ্বল ফুলের ঝাড়। তার মাঝে কাঠের তৈরি বসার জায়গায় আমরা বসলাম। ভীম লামার বউ কাঞ্চি লামাও আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। এঁরা দুজনেই চা-বাগানে কাজ করেন, এখন বাগান বন্ধ বলে

রোজগারও বন্ধ। বাগান খোলা থাকলে তাঁরা বেতন পান মাথাপিছু দৈনিক ১২৫ টাকা, মাসে দাঁড়ায়ে ২,৮০০ টাকা। বেশ কয়েক মাস তো বাগান বন্ধ, তাঁদের চলছে কী করে, দৈনিক খাওয়ার জুটছে তো? তারা বললেন যে, তাঁদের দুই ছেলে চা-বাগানে কাজের অনিশ্চয়তা দেখে বাইরে চলে গেছে, তারা একজন শিলিগুড়িতে, আরেকজন ভুটানে 'মজুরি' করে, তারা মাঝে মধ্যে কিছু টাকা পাঠাতে পারে, নিয়মিতভাবে না হলেও। আর তাঁদের ভরসা তাঁদের নিজেদের জাতির অর্থাৎ তামাঙ জাতির পড়শিরা। সবাই তো কেবল বাগানে কাজ করে না, 'খেতিজমিও করে' (কৃষিকাজ করে)। তারা অভাবের দিনে চাল, ভুট্টা জোগায়। তামাঙদের মধ্যে কারো ঘর চাল, ভুট্টায় ভরে থাকবে আর তার পাশের কেউ অনাহারে মরবে, এ তো তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যাবে। এখনও তাই তাঁদের চলে যাচ্ছে।

গণেশ লামা ও কাঞ্চি লামা দু'জনের বয়সই ষাটের কাছাকাছি। একটা হাসির রেখা যেন অচেতনভাবেই তাঁদের মুখে লেগে থাকে। তামাঙ ভাষা নিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ, তাঁরা তামাঙ ভাষা বলতে ও বুঝতে পারেন, তবে অল্প অল্প। তাঁদের বাবা-মায়েদের প্রজন্মের লোকেরা সবাই তামাঙ ভাষা ভালো বলতে ও বুঝতে পারতেন, লিখতেও পারতেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েদের প্রজন্ম তামাঙ ভাষায় কথা বলতেও পারে না, বোঝেও না। এখনও তামাঙ সমাজে বিয়ে ও শ্রাদ্ধের সময় তামাঙ ভাষায় মন্ত্র পড়তে হয়, এভাবেই তামাঙ ভাষা যা টিকে আছে। নেপালি ও বাংলা ভাষাই এখন তাঁদের রোজকার ব্যবহারের ভাষা হয়ে উঠেছে।

তাঁরা কি এভাবে তাঁদের মাতৃভাষাকে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে যেতে দেখছেন না? কিছুই কি করার নেই? তাঁরা বললেন যে, তামাঙ ঘরের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের তামাঙ ভাষা শেখানোর একটা চেষ্টা হয়েছিল। কাজিমান গোলের বাড়িতে বাচ্চাদের তামাঙ ভাষা শেখানোর একটা পাঠশালা চালু হয়েছিল। বাকসিন লামা পড়াতেন। কয়েক মাস কিছু বাচ্চা সেখানে পাঠানো গিয়েছিল। কিন্তু চা-বাগান বন্ধের পর জীবন-জীবিকার অস্থিরতায় সেদিকে আর হুঁশ থাকেনি। বাচ্চারা একে একে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করেছিল। তারপর সে পাঠশালা উঠে গেছে।

কথায় কথায় তামাঙ গুম্‌ফার প্রধান লামার অসুস্থতার কথাও উঠল। তাঁরা বললেন যে প্রধান লামার এখন বয়স অনেক হয়ে গেছে, অসুখও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, উনি আর গুম্‌ফায় আসতে পারবেন বলে মনে হয় না। সবাই মিলে সভা করে নতুন লামা ঠিক করতে হবে, সবার মাসিক চাঁদা নির্দিষ্ট করে লামার বেতনও তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন চা-বাগান বন্ধ বলে কিছুই করা যাচ্ছে না।

৩

কালচিনির তেমাথার মোড় থেকে মাদারিহাটের দিকে যাওয়া রাস্তায় কিছুটা এগোলে রাস্তার ডানদিকে এক বিশাল মহীরুহ। তার পাশ দিয়ে মূল রাস্তা থেকে পথ নেমে গেছে 'কালচিনি টি এস্টেট'-এর সদর দরজার দিকে। বাগান চালু থাকলে সকালের এই সময়ে শ'য়ে শ'য়ে মানুষের ভিড় ও যাওয়া-আসায় গমগম করতো এই জায়গা। অজ শুনশান, কারণ বাগান বন্ধ। এই সদর দরজার দিকে পথে অল্প ঢুকে বাঁদিকে কাজিমান গোলে-র বাড়ি। কংক্রিটের ছাদওয়ালা ছিমছাম একতলা বাড়ি। সদ্য কিছুদিন হল তিনি মারা গেছেন। তাঁর আসল পরিচয় তামাঙ ভাষা ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার এক অগ্রপথিক হিসেবে।

কাজিমান গোলে-র একটা সাক্ষাৎকার আমি আগে পড়েছিলাম। সাক্ষাৎকারটা প্রকাশিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র' দ্বারা প্রকাশিত 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের জুনে প্রকাশিত সংখ্যায়। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন দীপঙ্কর ঘোষ। সেখানে কাজিমান গোলে বলেছিলেন:

> (তামাঙদের ভাষার নাম) তামি। এখানে খুব করুণ অবস্থা। লিপি আছে—আমরা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছি। (এখন তামাঙরা) বাড়ির মধ্যেও তামিতে কথা বলে না। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে, বিয়েতে তামির ব্যবহার আছে। যাঁরা সমাজের একটু জ্ঞানী, গানবা বা তামবা বলে, যাঁরা পূর্বজের কথা একটু জানে, তাঁরা বিয়ের সময় সম্প্রদান করার সময় ভাষাটা ব্যবহার করে। তামাঙদের মধ্যে প্রকৃতির কথা আছে সবসময়। এখন যাঁরা বয়স্ক তাঁরা এগুলো করে।

বাচ্চাদের তামাঙ ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করতে তাঁর এবং বাকসিন লামার উদ্যোগে যেমন পাঠশালা চালু হয়েছিল কিছুদিনের জন্য, তেমনই তিনি তামাঙ যুবকদের নিয়ে নাচের দল তৈরি করেছিলেন। সেই নাচের দলকে দিয়ে তিনি তামাঙদের পরম্পরাগত নাচের অনুষ্ঠান করতেন বিভিন্ন জায়গায়। কালচিনির বাইরেও নানা জায়গায় তাদের নিয়ে অনুষ্ঠান করেছেন। তাঁর নিজের বাড়িতে তিনি একটি সংগ্রহশালা তৈরি করেছিলেন। সেখানে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তামাঙদের পরম্পরাগত নাচে ব্যবহৃত নানা মুখোশ, তামাঙদের পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্র, দৈনিক ব্যবহারের জিনিস, বহু পুরানো পুঁথি ও পুরানো বাড়িঘর, পোশাক-পরিচ্ছদের ছবি। এছাড়াও সংগ্রহ করেছিলেন নানা বই ও পত্রিকা যাতে তামাঙ সহ বিভিন্ন জনজাতির ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস নিয়ে আলোচনা আছে।

কাজিমান গোলের বাড়িতে ঢুকলেই সামনের প্রশস্ত লম্বাটে ঘরটায় তাঁর তৈরি করা এই সংগ্রহশালা। এখন তাঁর দুই ছেলে এর দেখভাল করে। বড়ছেলে কোশল গোলে ও ছোটছেলে কুবীর গোলে। কুবীর গোলে তাঁর তৈরি করা নাচের দলটাকেও এখন পরিচালনা করে। সংগ্রহশালায় বসে কুবীর গোলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হল।

কুবীর গোলে বলছিলেন যে নাচের দলটাকে এখনও চালানো যাচ্ছে বটে, তবে সমস্যাও আছে। প্রধান সমস্যা হল নাচের দলের লোকেদের একসঙ্গে পাওয়া। চা-বাগান বন্ধ হওয়ার পর রোজগারের খোঁজে সবাই চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে, একসঙ্গে পাওয়াই মুশকিল। তবু, তামাঙ নববর্ষের লোছার উৎসবের সময় আর বুদ্ধপূর্ণিমায় তামাঙ গুম্ফার উৎসবে দিন-রাত ধরে তাঁদের দল পরম্পরাগত নৃত্য পরিবেশন করে। এই পরম্পরাগত নৃত্যগুলো কী কী? কুবীর বললেন, যে তামাঙ ভাষায় নৃত্যকে বলে 'ছ্যাম'। তিনি পাঁচটি পরম্পরাগত ছ্যামের নাম করলেন, সেগুলো হল: (১) বাকপা ছ্যাম, (২) তামাঙ সেলো, (৩) তামাঙ ওয়াই, (৪) জুহারি, (৫) মেহেন্দো মায়া। এরপর তিনি নাচগুলো নিয়ে কিছু কিছু কথা বিস্তারিত করে বলতে লাগলেন।

বাকপা (বা বাগপা) ছ্যাম-এ পনেরো-বিশজন হলে ভালো হয়, অন্তত সাত-আটজন তো লাগেই। এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে পদ্মসম্ভব গুরু রেমপোচের

দ্বারা দুষ্ট আত্মা দমনের কথা বলা হয়, তাই এ নৃত্য একপ্রকার যুদ্ধনৃত্য। এই নাচে তিনটি বিশেষ মুখোশ ব্যবহার করা হয় গুরু রেমপোচের ধারণ করা তিনটি রূপ বোঝাতে। এই তিনটি রূপ হল: ঢাকপো (লাল রঙের মুখোশ দিয়ে বোঝানো হয়), মানিঙ (নীল রঙের মুখোশ দিয়ে বোঝানো হয়) ও সিংদুঙ (সাদা রঙের মুখোশ দিয়ে বোঝানো হয়)। এই নাচে সাদা মুখোশ পরা একটি পার্শ্ববর্তী চরিত্রও আছে, যার নাম 'চেকর', তা মূলত বিদূষকের চরিত্র। মুখোশগুলো হয় কাঠের। নর্তকদের চমরি গাইয়ের মতো সাজতে হয়। বাদ্যযন্ত্র লাগে অনেক, যেমন, দুটো গ্যালিং (সানাই-এর মতো বাদ্যযন্ত্র), ঢ্যাঙড়ো (বড় ঢোল), গ্যাবুক (বড় করতাল)। এর মধ্যে দিনের ও রাতের দু'ধরনের নাচ আছে। বুদ্ধপূর্ণিমার সময় দিন-রাত ধরে এই নাচ হয় গুম্ফায়। প্রথায় আছে যে কোনো নতুন গুম্ফার উদ্বোধনের সময় এই নাচ করতে হবে। এই নাচেরই আরেকটি ধরনকে বলে 'চই' নাচ যা তামাঙ লামারা নাচেন কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিকে পদ্মাসনে বসিয়ে সৎকার ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তামাঙ লামারা এই নাচ নাচেন দুষ্ট আত্মাদের কবল থেকে মুক্ত করে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে স্বর্গে পৌঁছে দিতে।

তামাঙ সেলো হল ডম্ফু নিয়ে তামাঙ ছেলেমেয়েদের নাচ। ডম্ফু হল তামাঙদের পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্র। 'ঘোড়াল' বলে এক পাহাড়ি পশুর চামড়া গোল কাঠের ফ্রেমের উপর বেঁধে তা তৈরি। এর পরিধি বরাবর ৩২টা কাঠি থাকে। মানুষের গলার আওয়াজ যেমন ৩২টা দাঁতের মধ্য দিয়ে বেরোয়, তার মতোই এই ৩২টা কাঠি ডম্ফুর আওয়াজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ডম্ফু বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে নাচা হল তামাঙ সেলো। এ যেন ময়ূরের নাচকে অনুকরণ করা। কুবীর গোলের কথা শুনতে শুনতে মনে পড়ে গেল যে কাজিমান গোলের পূর্বকথিত সাক্ষাৎকারে পড়েছিলাম:

> ডম্ফুর যে সৃষ্টিকর্তা বেন দোরজি, তাঁর স্ত্রীকে খুশি করার জন্য একটা হরিণ শিকার করল। শিকার করার পর চামড়া দিয়ে কাঠ দিয়ে তৈরি করে, চামড়া দিয়ে মুড়ে ডম্ফুটা তৈরি করল। তৈরি করার পর তাঁর স্ত্রী খুব অসুন্তুষ্ট হয়ে তাঁর স্বামীকে বলল যে, সে কেন প্রাণীহত্যা করল। তখন আর কী করবে! তখন দেখল ময়ূর—আমাদের 'মুনাল' বলা হয়—

> নাচতেছে, বিশেষ ঘুরে ঘুরে নাচতেছে। তখন ভাবল যে আমাকে এভাবে মানাইতে হবে। তখন ময়ূর পাখির মতো নেচে ডম্ফু বাজিয়ে স্ত্রীকে বলল, আমি ভুল করেছি। বলল যে, 'এটা আর হবে না—প্রাণীহত্যা করব না।' সেজন্য আমাদের নাচের মধ্যে ময়ূর পাখির নাচ আছে।...

কুবীর গোলে বলে যাচ্ছিল যে তামাঙদের বিয়ে তামাঙ সেলো ছাড়া হবেই না। ডম্ফু বাজিয়ে নাচার দল থাকবে দু'পক্ষেই—ছেলের পক্ষে ও মেয়ের পক্ষে।

তামাঙ ওয়াই ও জুহারিও তামাঙদের বিয়েবাড়ির নাচ-গান। তামাঙ ওয়াই-এর মাধ্যমে প্রথাগত কাহিনি বলা হয়। আর জুহারি হল দুই পক্ষের মধ্যে প্রশ্নোত্তর করে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার নাচ-গান, যার গানের কথা তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি হতে থাকে, সারা রাত জুড়েও তা চলতে পারে।

আর মেহেন্দো মায়া তামাঙ জনজাতির ঐতিহ্যের এক অনেক পুরানো নাচ। এ নাচের মধ্য দিয়ে ফুলের ভালোবাসার কথা বলা হয়। ডুয়ার্সে এই নাচ এখন আর দেখা যায় না। কালিম্পং ও নেপালে যে তামাঙরা থাকেন তাদের মধ্যে কদাকচ্চিৎ হয়ত দেখা যেতে পারে।

কুবীর গোলে তামাঙ ভাষা কিছু কিছু বুঝতে পারলেও সে ভাষায় কথা বলতে পারেন না। তামাঙ ভাষা-সংস্কৃতি যে বিলুপ্তির খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে, তা নিয়ে তাঁর বেদনাবোধ আছে বলে মনে হল, এই ভাষা-সংস্কৃতি উজ্জীবনের জন্য তাঁর বাবার নানা উদ্যোগ নিয়ে গর্ববোধও আছে। অসহায়তাবোধও আছে। তাঁর বাবা আর বাকসিন লামার তৈরি তামাঙ ভাষা পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেল। রোজগারের খোঁজে তাঁদের সমাজটাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। তাঁদের দুই ভাইকেও উপার্জনের ধান্দায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে। তাঁর বাবা তৈরি করে গিয়েছিলেন 'ডুয়ার্স লোকসংস্কৃতি সংস্থা'। তার নাম লেখা বোর্ড এখনও তাঁদের বাড়ির সামনে লাগানো আছে। তাকে চালু রাখার চেষ্টাও করছেন কুবীর গোলে। কিন্তু...

৪

তামাঙ জনজাতির ইতিহাস ও পরম্পরা সম্বন্ধে জানতে চাই। কার থেকে তা জানতে পারি? কুবীর গোলে বললেন যে একমাত্র বাকসিন লামা-র কাছ

থেকেই তা জানা যেতে পারে। ডুয়ার্সে থাকা তামাঙদের মধ্যে বাকসিন লামা-ই তামাঙ ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাসের পরম্পরাবাহিত জ্ঞানের ভাণ্ডারী। কুবীর গোলে-র মোটরসাইকেলের পিছনে আমাকে তুলে নিয়ে সে আমাকে নিয়ে চলল বাকসিন লামার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে।

কুবীরদের বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে উত্তর লোথাবাড়ি গ্রামে বাকসিন লামার বাড়ি। উঠোনের একদিকে একটা দোতলা ও একটি একতলা ঘর। অন্যদিকে একটি একচালা ঘরের মধ্যে ধান-গম পেষাই করার একটি কল। এই কল বাকসিন লামা নিজেই চালান, আশপাশের মানুষ ধান, গম বা ভুট্টা পেষাই করে নিতে আসে। তাঁর সাড়ে বাইশ বিঘে চাষের জমি ছিল, আট ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে তা ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়েছেন। তাঁর বয়স তিয়াত্তর বছর। কিছুদিন হল স্ত্রী মারা গেছেন। তারপর বাকসিন লামা বেশ একাকী হয়ে পড়েছেন।

কুবীর গোলে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। একতলা ঘরটার সামনের বারান্দায় আমরা বসলাম। বাকসিন লামা তাঁর বাড়ির গাছের কলা আমাদের খেতে দিলেন। ধীরে ধীরে কথাবার্তা শুরু হল। খানিকক্ষণ পর কুবীর বেরিয়ে গেল। বাকসিন লামার সঙ্গে আমার আলাপ চলতেই লাগল। সে আলাপ তো কোনো প্রশ্নোত্তরে বাঁধা কথোপকথন নয়, তা হল বাকসিন লামার স্বতঃস্ফূর্ত কথকতার মধ্যে নিমজ্জন। তামাঙ জাতির উৎস ও ইতিহাস নিয়ে বাকসিন লামা একটি পুরানো তামাঙ ভাষায় লেখা পুঁথি সুর করে পড়ছিলেন আর বাংলা ভাষায় তা ব্যাখ্যাও করছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। সেই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে যা উঠে আসছিল, বাকসিন লামার বাকবিভূতির জাদুহীন করে তার কঙ্কালসার চেহারাটাই কেবল লিখনে হাজির করা সম্ভব। সেই কঙ্কালসার চেহারাটাকেই এখন দেখা যাক।

তামাঙ জাতির উৎপত্তি সম্পর্কিত কিংবদন্তী

তামাঙ কিংবদন্তী অনুসারে সৃষ্টির শুরুতে ছিল নিরাকার প্রকৃতি। ক্রমে প্রকাশকুঞ্জ প্রকট হয়েছে। তৈরি হয়েছে আকাশ। আকাশে দেখা দিয়েছে জল। সেই জল মাটিতে খসে পড়েছে। নিচে তৈরি হওয়া ব্রহ্মাণ্ড জলে ডুবে গেছে। জলে ভরকেন্দ্র তৈরি হয়েছে, ফেনা দেখা দিয়েছে। ফেনার মাঝে দেখা দিয়েছে

বালি। সেই বালি থেকে পাথর আর মাটি দেখা দিয়েছে। মাটি-পাথর স্তূপাকারে উঁচু-নিচু পর্বতমালার রূপ নিয়েছে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই দিক্-বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমে তৈরি হয়েছে সাতটা বড়ো দ্বীপ, আঠারোটা উপদ্বীপ আর সাগর-মহাসাগর। বিভিন্ন বীজের উৎপত্তি হয়েছে। আকাশ ও বায়ুর তেজ থেকে জন্ম নিয়েছে আগুন। জলধারা রূপ নিয়েছে নদীর। বিভিন্ন রঙ সৃষ্টি হয়েছে। আর সৃষ্টি হয়েছে তিনশো ষাটটি ভাষা। সেইসব ভাষার তিনশো ষাটটি লিপিও তৈরি হয়েছে। আকাশে বাস গেড়েছে দেবতারা, পাতালে নাগেরা আর অন্তরীক্ষে বিভিন্ন শিকারি দেব-দানবরা। এর মাঝে তামাঙদের আঠারোটা 'তামাঙ-রুই' বা তামাঙ গোত্রের বাসস্থান গড়ে উঠেছে। প্রতিটি 'রুই' নিজেদের কুলদেবতা, অগ্নিদেবতাকে চিহ্নিত করেছে। দৈবী নারী 'মা ডাসিন' ও দৈবী বানর বোধিসত্ত্ব 'টেহ জাঙছুপ সেমবা'—এঁরাই তামাঙদের আদি নারী ও আদি পুরুষ।

তামাঙ কিংবদন্তী অনুসারে, সুমেরু পর্বতে এক সুন্দর 'তাল' (পুকুর) ছিল। সেখানে মহাগুরু পদ্মসম্ভব বিমবোরচে পদ্মের উপর বসেছিলেন। 'দোরজি গেরম' (সুদর্শন চক্র) ছিল তাঁর কাছে মানুষ সৃষ্টির জন্য। মহাগুরু তিনজন ভিক্ষুকে তৈরি করলেন ও তাদের মানুষ সৃষ্টি করার নির্দেশ দিলেন। এই তিনজন ভিক্ষু হলেন—ছেগু ধর্মকায়া, লুংগু সম্ভোবাকায়া ও টুলগু রূপকায়া। ভিক্ষুরা মানুষের দেহ তৈরি করল কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাতে প্রাণ সঞ্চারিত করতে পারল না। তখন আবার তারা মহাগুরুর স্মরণ নিল। মহাগুরু স্মরণ নিলেন সুদর্শন চক্রের। সুদর্শন চক্র মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য একটা বজ্র দিল মহাগুরুর হাতে। মহাগুরু সেই বজ্রকে তিন টুকরো করলেন। সেই তিন টুকরো থেকে জন্ম নিল তিন কন্যা। সেই তিন কন্যার নাম ডাসিন ডোলমা, ডাসিন টাসি ও ডাসিন টুকু। মহাগুরু সেই তিন কন্যাকে পাঠালেন ভিক্ষুদের সেবা করার জন্য। ভিক্ষুদের কাছে এসে তারা থাকতে লাগল। প্রতিদিন ভোরবেলা তারা শুদ্ধ জল ও ফুল, ফল সংগ্রহ করার জন্য জঙ্গলে যেত। কিন্তু প্রতিদিনই তাদের শুদ্ধ জল সংগ্রহে বাধা হয়ে দাঁড়াল এক বানররূপী অপূর্ব জন্তু। কন্যারা জল নিতে গেলেই সে জল ঘোলা করে দূষিত করে দিত। ফুল ও ফল সংগ্রহ করার সময়েও সেই বানর নানা বাধাবিপত্তি তৈরি করত। দিনের পর

দিন হয়রানির পর কন্যারা ভিক্ষুদের কাছে নালিশ করল। ভিক্ষুরা তখন ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্য জঙ্গলে গেল ও সেই অপূর্ব জন্তু বানরকে দেখতে পেল। ভিক্ষুরা তাকে দেখে অবাক হল এবং চেংড়েশি (ব্রহ্মা)-কে জিজ্ঞাসা করল যে এই জন্তুটি কে? চেংড়েশি বললেন যে তিনিই এ বানর তৈরি করেছেন। ভিক্ষুরা তখন সেই বানরের সঙ্গে তিন কন্যার বিয়ে দিয়ে দিল।

সেই দৈব বানর ও তিন কন্যার মিলনের ফলেই তামাঙদের উদ্ভব। ডাসিন ডোলমা-র থেকে বংশধর তামাঙরা হল ঘিসিঙ, বল, থোকর, হিঙ,, ইঁয়াসুর, গ্লান ও রুমরা পদবিধারী। ডাসিন টাসি-র বংশধর তামাঙরা হল ইয়নজন, বোমজন, দোঙ, ইঁয়েকে, স্যাঙবো ও জিম্বা পদবিধারী। আর ডাসিন টুকু-র বংশধররা হল পাখরিন, মোক্তান, ওয়াইবা, টুপা ও লুংবা পদবিধারী। এইভাবে আদিতে আঠেরো পদবির তামাঙ জাতির সূত্রপাত হয়েছিল।

এই কিংবদন্তী অনুসারে তামাঙ জাতিকে তিনটি সমূহে ভাগ করা যায়। এক একটি সমূহের মধ্যে নানা 'ফলা'-য় ভাগ আছে আর এদের মধ্যে নির্ধারিত করা আছে 'সোঁয়াগে' সম্পর্ক। এই 'সোঁয়াগে'-র মধ্য দিয়ে কোন কোন গোষ্ঠীদের মধ্যে বিবাহ হবে আর কাদের মধ্যে হবে না তা নির্ধারিত করা থাকে।

তামাঙ লোকইতিহাস

তামাঙ ভাষায় বলে 'সামদেন লিঙ', সেই দেশ এখন মঙ্গোলদের দেশ বলেই পরিচিত। তিরিশ হাজার বছর আগে সেখানেই বাস করতেন তামাঙদের প্রাচীন ঠাকুরমা 'চাঙমি নান' ও প্রাচীন ঠাকুরদা 'সেলে রুসটা'। তাঁদের ছিল পাঁচ ছেলে, যাদের নাম—দুঙদু পাল, সিঙ্গি পাল, মিন্‌গি পাল, রালুঙ পাল ও দুনদুল পাল। এই পাঁচ ছেলে 'সামদেন লিঙ' বা মঙ্গোল দেশ থেকে পরিব্রজন পথে তিব্বতে এসে, সেখানটাই ভালো লেগে যাওয়ায় সেখানে থাকতে শুরু করে। পরবর্তীকালে সিঙ্গি পাল ও তার বংশধররা নেপালে তামাঙদের 'কিপট' গড়ে তোলে। তামাঙ লোকশ্রুতি অনুযায়ী অন্যান্য ভাইয়েরা পরবর্তী পরিব্রজন পথে বিভিন্ন জায়গায় থিতু হয়ে তাদের বংশধারার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জনজাতির জন্ম দিয়েছে। যেমন, মিন্‌গি পাল-এর বংশধারা থেকে এসেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগা, খাসি, গারো, আদি, মিসমি ও আরও অনেক জনজাতি। রালুঙ পাল-এর বংশধারা থেকে

এসেছে মায়ানমার (পূর্বতন বর্মা)-এর বিভিন্ন বর্মী জনজাতি, দুনদুল পাল-এর বংশধারা থেকে এসেছে রাই, লিম্বু, সুব্বা, মেচ, ধিমাল ইত্যাদি জনজাতি।

নেপালে তামাঙদের নয়খানা গণরাজ্য ছিল, সেইসব গণরাজ্যের দরবারের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। নেপালে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে হিন্দু রাজারা তামাঙদের গণরাজ্য দখল করে নেয়, তামাঙদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে। তখন থেকেই তামাঙরা নেপাল ছেড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বাকসিন লামার ইতিহাস বর্ণনাকে নথিবদ্ধ ইতিহাসের কিছু ভাষ্যের পাশাপাশি রেখে দেখা যাক।

আঠেরো শতকের শেষার্ধে, নেপালের কাঠমাণ্ডু উপত্যকার পশ্চিমে অবস্থিত গোর্খা নগরের ঠাকুরী সম্প্রদায়ের অধিস্বামীরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। তাদের প্রধানজন পৃথ্বী নারায়ণ শাহ ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে কাঠমাণ্ডু উপত্যকা দখল করে নেয় নেওয়ার শাসকদের হাত থেকে। কাঠমাণ্ডুতেই তারা তাদের শাসনকেন্দ্র স্থাপন করে। এরপর সামরিক ও কূটনৈতিক কৌশল ফলিয়ে তারা নেপালের বিস্তীর্ণ অংশের ওপর কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পথ নেয়। নেপাল জুড়ে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র প্রবর্তনের এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই জরুরি হয়ে উঠেছিল নেপালের সমাজের বহু বিচিত্র জনজাতিকে একটি উচ্চাবচ ধাপবন্দি জাতবিভাজনের কাঠামোয় ন্যস্ত করা। ঠাকুরী অধিস্বামীরা নিজেদের হিন্দু ও রাজপুত যোদ্ধাদের বংশধর হিসেবে নেপালের অন্যান্য তিব্বতী-বর্মী ভাষা-সংস্কৃতি গোষ্ঠীর জনজাতিদের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করত। তারা মনে করত যে একমাত্র ব্রাহ্মণরাই জাতের কাঠামোয় তাদের থেকে ওপরে থাকতে পারে, বাকি সবাই তাদের নিচে। এই জাতের কাঠামো কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামোর ছাঁচ হয়ে ওঠে। ১৮১৯ সালে এক ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকের চোখে এই সদ্য গঠিত গোর্খা রাজ্য ধরা দিয়েছিল এইভাবে (এই ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক হলেন ফ্রান্সিস বি হ্যামিল্‌টন, যিনি কাঠমাণ্ডুতে সেই সময় চোদ্দ মাস বাস করেছিলেন):

> মূল নেপালের দুর্গম ও পাহাড়ি অংশগুলোর প্রধান বাসিন্দারা হল মুর্মি, যাদের অনেকে ভোটিয়া, অর্থাৎ, তিব্বতের মানুষদের শাখা হিসেবে গণ্য করে। যদিও এই মুর্মিরা ধর্মে ও মতাদর্শে তিব্বতীদের অনুসারি এবং

তাদের পুরোহিতরা, যাদের লামা বলা হয়, তারা তিব্বতী ভাষা ও বিজ্ঞান পাঠ ও চর্চা করে,... তবু সন্দেহ আছে যে তিব্বতী ও মুর্মিদের উৎস একই কিনা। তাদের ভাষার তুলনার মধ্য দিয়েই হয়ত সবচেয়ে ভালোভাবে এই সন্দেহ নিরসন হওয়া সম্ভব।... গোর্খালিদের কাছে লামাদের মতাদর্শ এতই ঘৃণ্য যে 'চোর' অপবাদ দিয়ে কোনো মুর্মিকেই কাঠমাণ্ডুতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। উপহাস করে মুর্মিদের 'সিয়েনা ভোটিয়া' অর্থাৎ 'পশু-মরদেহ খাদক ভোটিয়া' বলা হয় কারণ, এই মুর্মিদের কাছে গরুর মাংস এতই লোভনীয় যে স্বাভাবিকভাবে মারা যাওয়া মোষেদের মাংস খাওয়া থেকেও এরা বিরত থাকতে পারে না, আর এখন তো তাদের প্রথামাফিক ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী পশুবলি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।... সরকার ও প্রশাসন চালনায় তাদের কোনো অংশগ্রহণ কোনোদিনই ছিল বলে মনে হয় না। অস্ত্রচালনাতেও তাদের কোনো ঝোঁক নেই, তারা সর্বদা কৃষিকাজের পেশাই অবলম্বন করে এসেছে, বা নেওয়ারদের হয়ে বোঝা বহন করেছে, তাদের অসাধারণ শারীরিক সবলতার সুবাদে। মাচার ওপরে তৈরি খড় বা পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরে তাদের বাস।...'[সূত্রঃ ফ্রান্সিস বি হ্যামিলটন, অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দি কিংডম অফ নেপাল অ্যান্ড অফ দি টেরিটরিজ অ্যানেক্সেড টু দিজ ডমিনিয়ন বাই দি হাউজ অফ গোর্খা, (প্রথম ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) ১৯৭১ সালে মঞ্জুশ্রী (নিউ দিল্লি) কর্তৃক পুনঃমুদ্রণ, পৃ. ৫২-৫৩। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের]

এই বিবরণ থেকে দেখা যায় যে মুর্মি বা ভোটিয়া জনজাতিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলির রীতি বা মৃত পশুর মাংস খাওয়ার রীতিকে 'ঘৃণ্য' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, 'চোর' অপবাদ চাপিয়ে তাদের 'ইতর' স্বভাবের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে এই কৃষিজীবী সাধারণ মানুষদের সমাজচালনায় রাজনৈতিক সক্রিয়তার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যুক্তি নির্মাণ করা হয়েছে।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকার পূর্বদিকে তিব্বত সীমান্তের কাছে বসবাসকারী মুর্মি বা ভোটিয়া জনজাতিদের প্রতি নেপালের প্রথম রাজা পৃথ্বী নারায়ণ শাহ যে হুকুম জারি করেছিলেন তা ১৮৫৫ সালের একটি নেপাল রাজতন্ত্রের প্রশাসনিক নথিতে এভাবে পাওয়া যায়ঃ

যেহেতু তোমরা সীমান্ত অঞ্চলে বাস করো, যুদ্ধে কাজ ও মাল বহন করার কাজ উভয়ই বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে। তিব্বতে বেআইনিভাবে চালান যাওয়ার পথে গোলাবারুদ, শোরা, গন্ধক তোমরা বাজেয়াপ্ত করবে, বাজেয়াপ্ত মাল নিলাম করবে এবং নিলামে যা পাওয়া যাবে তা রাজপ্রাসাদের হাতে তুলে দেবে। কোনো বিদ্রোহী ওই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তিব্বতে পালানোর চেষ্টা করলে তোমরা তাকে গ্রেফতার করবে। নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে 'স্যারটো' (Sirto) সরবরাহের কাজে তোমাদের মাল বহন করতে হবে। ওই অঞ্চল থেকে 'স্যারটো' পাওনা হিসেবে নির্দিষ্ট লতাপাতা, ওষধি ও অন্যান্য যোগানের নিয়মিত বরাদ্দ তোমাদের মেটাতে হবে। খারসা ও পারসিয়াঙ সমেত দশটি গ্রামের বাসিন্দাদের 'হুলাক' পরিষেবা প্রদান করতে হবে। অন্যান্য গ্রামের বাসিন্দারা বারুদ তৈরির কারখানায় কাজ করবে। নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে বাণিজ্য হওয়া বস্তুর উপর 'জগৎ' শুল্ক সংগ্রহে তোমরা সহায়তা করবে। এলাকায় যারা অশান্তি তৈরি করবে, তাদের গ্রেফতার করে তোমরা রাজপ্রাসাদের হাতে তুলে দেবে। সমস্ত রকম কর ও 'ঝারা' বাধ্যতামূলক দায়িত্ব থেকে 'হুলাকি' (ডাক সরবরাহকারী)-দের ছাড় দেওয়া হবে। তারা তাদের বাস্তুভিটে ও ধানজমির উপর দখলদারির বিষয়ে নিশ্চয়তা পাবে। যে অঞ্চলে ধানজমির পরিমাণ বেশি নয় এবং কেবলমাত্র সেচহীন পাহাড়গাত্রের জমি থেকে জীবনসংস্থান করা সম্ভব নয়, সেখানের মানুষরা তিব্বত থেকে নুন আনতে পারবে, যে দশটি গ্রামের বাসিন্দারা 'হুলাক' পরিষেবা দেবে, তারা 'জগৎ' 'নিরখি', 'টাক' বা অন্যান্য খাজনা থেকে নিস্তার পাবে। বারুদ তৈরির কারখানায় কাজ করে যে গ্রামের লোকেরা, সেই গ্রামের প্রতিটি পরিবার তিব্বত থেকে পাঁচজন বহন করে আনতে পারে এমন পরিমাণ নুন আনতে পারবে।'

[সূত্র: মহেশ রেগমি সম্পাদিত ও অনূদিত 'ফিসকাল অ্যান্ড লেবার অবলিগেশনস অফ ইনহ্যাবিটান্টস অফ পঞ্চসায়াখোলা ইন নুয়াকোট', রেগমি রিসার্চ সিরিজ, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪, পৃ. ৭৮। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের]

মুর্মি বা ভোটিয়া মানুষদের উপর রাজতন্ত্র আরোপিত এই নির্দেশাবলী তাদের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণের দলিল। রাজতন্ত্রের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের শাসনে

বাঁধা পড়ার আগে তাদের সমাজগুলো 'ঘালে' (তামাঙ উচ্চারণে গ্‌লে) শাসন ছিল। সেই পর্যায়ে সমাজরীতি ও রাজনীতির কথা একমাত্র তামাঙ ভাষায় প্রজন্মবাহিত লোকশ্রুতির মধ্যেই আবছা অবয়বে খুঁজে পাওয়া যায়। বাকসিন লামা তামাঙদের নয়টি গণরাজ্যের কথা বলেছেন, বলেছেন যে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত মুসতাঙে তামাঙ রাজা ছিলেন ওয়াংগেল দোরজে। কিন্তু এই তামাঙ শাসন রাজনৈতিক রূপের দিক থেকে কেমন ছিল? রাজা কে হবেন তা কীভাবে ঠিক হত? রাজার দায়িত্ব ও ক্ষমতাই বা কী ছিল? এসব কী সবকটা 'ঘালে'তেই একরকম ছিল, না কি তার মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল? এসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাইনি। তবে, বাকসিন লামার কাছ থেকে লোকশ্রুতির পথ বেয়ে আসা সেই পুরানো দিনের আরও কিছু কথা শোনা গেল। যেমন 'কিপট'-এর মধ্যে বাস্তুজমি ও চাষজমি ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন পরিচালনার যে ব্যবস্থা ছিল তার কিছু কথা বাকসিন লামা বলছিলেন। যে পরিবারে কাজ (অর্থাৎ চাষ) করার লোক যত, তাকে সেই পরিমাণে জমি দেওয়া হত, বাস্তুজমিও বরাদ্দ হত প্রয়োজন অনুযায়ী, কিন্তু সব জমির উপর গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জাতিগোষ্ঠীর মালিকানা কায়েম বলে ধরা হতো, চাষের পর সব ফসল একসঙ্গে জড়ো করা হতো গ্রামের যৌথ শস্যভাণ্ডারে, তারপর বয়স্ক ও জ্ঞানীজনদের মধ্যস্থতায় তা বণ্টন হতো। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র নয়, এর মধ্য দিয়ে বয়স্কজনেদের গ্রামসভার মধ্য দিয়ে পরিচালিত একটা বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থার আদল ভেসে ওঠে। গ্রামজীবনে আরও তিনজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে বাকসিন লামা বললেন। এই তিনজন হল 'বোম্বো', 'লামা' ও 'লম্বু'। 'বোম্বো' মানে বিশেষ ক্ষমতাধারী নিরাময়কারী, যে তার বিশেষ ক্ষমতাবলে সাধারণ মানুষের কাছে যা অদৃশ্য সেই 'আত্মা'-র জগৎ দেখতে পায়, পথভ্রষ্ট আত্মা (তামাঙ ভাষায় 'ব্লা')-কে আটক করে ফিরিয়ে আনে এবং জীবনশক্তি (তামাঙ ভাষায় 'সো')-কে পুনরুজ্জীবিত করে। 'লামা' হলেন বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত জন, বৌদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডারী। 'লম্বু' দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন উপচার ও উৎসর্গ অনুষ্ঠান পরিচালনকারী। তামাঙরা সাধারণভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের ধর্মীয় আচার-বিচারের বিশেষত্ব আছে। কারণ, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের আগে তামাঙদের আদিপুরুষদের নিজস্ব ধর্ম ছিল 'বোনপা' (বা 'বোনপো'), সে ধর্মের নানা অনুষঙ্গ বৌদ্ধধর্মের

সঙ্গে মেশামেশি হয়ে আজও তামাঙদের আচারবিশ্বাসে টিকে আছে। বাকসিন লামা বলছিলেন যে, তামাঙদের আদিপুরুষরা তখন তিব্বতের বাসিন্দা, তিব্বতী রাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর নির্দেশ জারি করল যে তিব্বতের সকলকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে হবে। বোনপা ধর্মাবলম্বী আদিপুরুষদের নিজস্ব ধর্ম পালন নিষিদ্ধ হয়ে গেল, জোর করে ধর্মান্তরকরণের মুখে পড়তে হল। এর থেকে বাঁচতেই তারা তিব্বতরাজের আওতার বাইরে নেপালে এসে বাসা বেঁধেছিল। তারা সেই নেপালের 'কিপট'-এ কৃষিকাজ করে ও তিব্বতীদের কাছ থেকে ফসলের বিনিময়ে নুন ও অন্যান্য ধাতুসামগ্রী সংগ্রহ করে 'সুন্দর জীবন' গড়ে তুলেছিল। বাকসিন লামা বললেন যে, ঐতিহ্যসচেতন তামাঙদের কাছে সেই 'কিপট'-এর জীবনই আজও 'সুন্দর জীবন'-এর আদর্শ, এখন সম্ভব হলেই তাঁরা অনেকেই নেপালের সেইসব গ্রামে তীর্থ করতে যান তাঁদের পূর্বপুরুষদের সমাজের ধবংসাবশেষ যেখানে যতটুকু টিকে আছে তার খোঁজে।

গোটা নেপালকে কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের শাসনে বাঁধার প্রক্রিয়া তামাঙদের পূর্বপুরুষ সেই মুর্মি বা ভোটিয়া মানুষদের 'সুন্দর জীবন'-এর উপর আঘাত নামিয়ে আনল। 'কিপট'-এর অন্তর্গত বাস্তুজমি ও ধানজমির উপর মুর্মিদের গোষ্ঠীগত অধিকারকে রাজশক্তির জোরে নাকচ করে সেইসব জমি রাজ-অনুগত বাউন (ব্রাহ্মণ) ও ছেত্রি (ক্ষত্রিয়দের) ব্যক্তি-মালিকানায় বন্দোবস্ত করা হল। মুর্মিদের ওপর বাধ্যতামূলক নানারকম কর/খাজনা ও পরিষেবা প্রদানের দায় চাপানো হল। তিব্বতীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যে বাণিজ্য তারা চালিয়ে আসছিল, তাকে বেআইনি ঘোষণা করে সে বাণিজ্যের ওপর রাজপ্রাসাদের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করা হল। নজরদারি ও বিদ্রোহদমনের কড়া ব্যবস্থার সূত্রপাত করা হল। 'ঘালে' (গ্‌লে) আমলের শেষ যেমন হল, তেমনই রাজতন্ত্রের কেন্দ্রীভূত শাসন-শোষনের কাঠামোর মধ্যে মুর্মিদের সমাজজীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। রাজতন্ত্রের প্রশাসনে আধিকারিক পদে নিযুক্ত হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়রা এবং গুরুংদের মতো রাজ অনুগত কিছু তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠী। মুর্মিদের গ্রামগুলোয় জমি-জায়গার দখল নিতে তারাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠল। এর বিরুদ্ধে মুর্মিরা প্রতিরোধের চেষ্টাও করেছে বিচ্ছিন্নভাবে। যেমন, জানা যায় যে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা নরভূপাল শাহ্-র সেনাবাহিনীর উপর গোর্খা থেকে নুয়াকোট

যাওয়ার রাস্তায় আক্রমণ হানে ঘালে-ভোট বিদ্রোহীদের একটি দল।[সূত্রঃ ধনবজ্র বজ্রাচার্য ও টেক বাহাদুর শ্রেষ্ঠ, নুয়াকোটাকো ঐতিহাসিক রূপরেখা, ইনস্টিটিউট অফ নেপাল অ্যান্ড এশিয়ান স্টাডিজ, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬] এইরকম বিফল বিদ্রোহের পর মুর্মিদের উপর দমন-পীড়ন আরও তীব্র হয়েছে। তখন থেকেই এই দমন-নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ভোট-মুর্মিরা নেপাল ছেড়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, দার্জিলিং, সিকিম, ডুয়ার্স ও ভুটান অঞ্চলে গিয়ে নতুনভাবে ঘর বাঁধতে প্রয়াসী হয়।

১৮১৯ সালে ফ্রান্সিস বি হ্যামিলটনের পূর্বোদ্ধৃত বর্ণনার মধ্যে নেপালে ভোট-মুর্মিদের এই পতিত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তার সঙ্গে আরও খেয়াল করা যায় যে মৃত পশুর মাংস খাওয়ার মতো ভোট-মুর্মিদের নানা প্রথাকে 'অপবিত্র', 'অহিন্দু' বলে দেগে তাদের ইতর, নীচ, অশুদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে বিচার করার চলও চালু হয়ে গেছে। অর্থাৎ, হিন্দু উচ্চাবচ ধাপবন্দি জাতকাঠামোকে প্রসারিত করে তার নিচের কোঠায় অধস্তন মনুষ্যেতর রূপে ভোট-মুর্মিদের গণ্য করার অভ্যাস বাউন (ব্রাহ্মণ), ছেত্রি (ক্ষত্রিয়) ও গুরুংদের মতো রাজ-অনুগতরা আয়ত্ত করে নিয়েছে।

এর প্রায় একশ বছর পর, ১৯৩২ সালে, নেপালের রাজা ত্রিভুবন ও প্রধানমন্ত্রী ভীম শামসের রানা ঘোষণা করেনঃ

> এই মুহূর্ত থেকে, আমাদের নেপালের গোর্খা রাজত্ব জুড়ে, (বারো গোত্রের) সমস্ত তামাঙ নিজেদের জাত (caste) উল্লেখ করার সময় লিখবে এবং লিখে থাকবে 'তামাঙ' (একই সঙ্গে) সামরিক ও দেওয়ানি প্রশাসনের সমস্ত নথিতে, সরকারি দপ্তরে ও বাহিনীতে, জনমধ্যে ও দৈনন্দিন জীবনে ভোট জাত (caste)-এর তামাঙ-দের 'ভোট' বা 'লামা' লিখবে না, কেবল এবং কেবলমাত্র 'তামাঙ' লিখবে।
>
> [সূত্রঃ ডেভিড এইচ হল্মবের্গ, অর্ডার ইন প্যারাডক্সঃ মিথ রিচুয়াল অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অ্যামঙ নেপালস তামাঙ-গ্রন্থে ১১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ বর্তমান লেখকের]

'মুর্মি' বা 'ভোট' মুছে 'তামাঙ' নাম আরোপ কেন? তিব্বতী 'মুর্মি' কথার অর্থ 'সীমান্তে বসবাসকারী মানুষ', 'ভোট' বলতে তিব্বত থেকে আগত মানুষদের

বোঝায়। তাই 'মুর্মি' বা 'ভোট' নামের মধ্যে এই জনজাতির পূর্ব ইতিহাসের ভৌগোলিক বিবরণ নিহিত ছিল। অন্যদিকে, তিব্বতী ভাষায় 'তা' মানে ঘোড়া আর 'মাং' মানে ভূত, অর্থাৎ তামাঙ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'ঘোড়াভূত'। এই অভিধার মধ্যে জনজাতির পূর্ব ইতিহাসের কোনো ঐতিহাসিক ভৌগোলিক সংকেত নেই, বরং এই জনজাতির মানুষদের তুচ্ছার্থে, ব্যাঙ্গার্থে, মনুষ্যেতর রূপে দেখার ঝোঁক আছে। মুর্মি-ভোট-রা কি কোনো দিনও নিজেদের তামাঙ বলেছে? হয়তো না। হয়তো বাওন-ছেত্রি- গুরুংরা হীনার্থে এই অভিধার জন্ম দিয়েছে, আর রাজতন্ত্র এই নামটিতেই সীলমোহর লাগিয়ে উচ্চাবচ ধাপবন্দি জাতকাঠামোয় নীচ মহলের স্থানটিকেই চিরনির্দিষ্ট করতে চেয়েছে।

'তামাঙ'—বিশশতকে চালু হওয়া এই নামটিই এখন বহু বহু শতকের ঐতিহ্যবাহী এই জনজাতিটির নাম-পরিচয় হয়ে উঠেছে।

৫

একজন পড়শি এসেছিলেন এক থলি ভুট্টা নিয়ে গুঁড়ো করার জন্য। বাকসিন লামা তার সঙ্গে উঠে গিয়েছিলেন কলঘরে তা গুঁড়ো করে দেওয়ার জন্য। ভুট্টাগুঁড়ো নিয়ে সে চলে যাওয়ার পর আবার বাকসিন লামা এসে বসলেন। একটি যুবতী (হয়ত তাঁর ছেলের বউ হবে) দুটো বড় বড় গ্লাসে দুধহীন চা দিয়ে গেল। আমরা এবার কথা শুরু করলাম তামাঙ ভাষা নিয়ে।

বাকসিন লামা প্রথমেই বললেন যে তামাঙ ভাষা বৈচিত্র্যময়, এক এক অঞ্চলে তা এক এক রূপ নিয়ে দেখা দেয়। নেপাল থেকে ভুটান-অসম পর্যন্ত তামাঙদের মোট বসবাস অঞ্চল ধরলে সেখানে ভাষার মূল রূপগুলো এই রকম:

পূর্বদিকে থাকা তামাঙদের ভাষা—পুবিলি ডাঙ বা শ্যেরফাঁট

উত্তরদিকে (নেপালে)-র তামাঙদের ভাষা—তোরফাঁট

নেপালের 'তেমাল' অঞ্চলের তামাঙদের ভাষা—তেমালে ভাষা

ডুয়ার্স সমেত উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের তামাঙদের ভাষা—খৈরি ভাষা

এক এক অঞ্চলের ভাষা কি অন্যরা বুঝতে পারেন? কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষরা একে অন্যের ভাষা বলতে ও বুঝতে পারেন, কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষদের একে অন্যের ভাষা বুঝতে অসুবিধে হয়, চেষ্টা করে বুঝতে হয়।

বাকসিন লামা বলছিলেন যে তামাঙ ভাষার লিপি হাজার হাজার বছর আগেই তামাঙ জনজাতি অর্জন করেছিল। সেই প্রাচীন তামাঙ গণরাজ্যের আমলে রাজা সন্‌চেন গোম্‌ফো ছিলেন জ্ঞানের উপাসক, তিনি সুসাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি তামাঙ ভাষা লেখার লিপি চালু করেন, সেই লিপিকে বলে সম্বোটা লিপি। এখন সেই লিপিকে অনেকে তামিক লিপিও বলে। তামাঙ ভাষা ও তার লিপি দুই-ই তিব্বতি ভাষা ও তিব্বতি লিপির কাছাকাছি, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সপ্তম শতাব্দীতে তামিক লিপিতে তামাঙ ভাষায় লেখা পুঁথি, যার নাম 'জিকতেন তামছই' তা তাঁদের কাছে আছে, সে পুঁথিতে তাঁদের পূর্বপুরুষরা তামাঙ সমাজব্যবস্থার কথা লিখে রেখে গেছেন।

তামিক লিপি ও তিব্বতি লিপির মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য তিনি একটা কাগজ টেনে নিয়ে আমার নাম 'বিপ্লব নায়ক' দুটো লিপিতে লিখলেন এইরকম:

তিব্বতি লিপিতে: 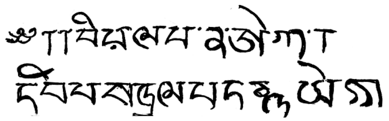

তামিক লিপিতে:

লিখে আমার সামনে ধরে বললেন যে তিব্বতি লিপিতে লিখতে অনেক বেশি বর্ণ দরকার হয়, তামিক লিপিতে অনেক কম বর্ণে লেখা যায়। বলতে বলতেই আর এক লাইন লিখলেন তামিক লিপিতে, লেখাটা এইরকম:

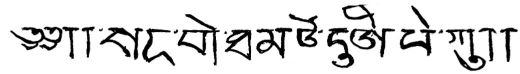

জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটা কী লিখলেন? বাকসিন লামা বললেন, এটি তামাঙ ভাষায় একটি প্রার্থনা স্তব: 'সংঘে থামচে দুইপেকু', যার বাংলা রূপান্তর করলে দাঁড়াবে: 'একই কায়ায় ভগবান সম্পূর্ণ।' শব্দগুলোর স্থানবদল না করে অনুবাদ করলে দাঁড়াবে: 'সম্পূর্ণ ভগবান একই কায়ায়।' অর্থাৎ, ক্রিয়াপদ এখানে বাক্যের গোড়ায় বসছে, বাংলায় যেখানে তা শেষে বসে। এর থেকে তামাঙ ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার বাক্য গঠনরীতির পার্থক্য বোঝা যায়। যদিও বাকসিন

লামা বললেন যে তামাঙ ভাষার কোনো সর্বমান্য বা মান ব্যাকরণ কোনোদিন তৈরি হয়নি, নানারকম বৈচিত্র্য ও পার্থক্যকে তা একই সঙ্গে ধারণ করে চলেছে।

বাকসিন লামা বলছিলেন যে অধুনায় অনেকে তামাঙ ভাষাকে তামিক লিপিতে না লিখে অন্য লিপিতে লেখা চালু করতে চাইছে, কিন্তু এই চেষ্টা তামাঙ ভাষার চরম ক্ষতি করছে। যেমন, নেপালে ও সিকিমে তামাঙ ভাষাকে নেপালি ভাষার মতো দেবনাগরি লিপিতে লেখায় মদত দিচ্ছে অনেকে। কিন্তু 'ৎস'(ts), 'ৎসহ' (tsh), 'ড্‌স' (ds)-এর মতো তামাঙ ভাষার স্বনিম(phoneme)-গুলিকে লেখ্যরূপ দেওয়ার মতো চিহ্ন দেবনাগরি লিপিতে নেই, ফলে দেবনাগরিতে লিখলে তামাঙ ভাষা তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ভজকট এক সংস্কৃতায়িত রূপ নেবে। ভাষার মৃত্যু ঘটবে।

এইখানে আমি বলে ফেললাম, 'কিন্তু ভাষার মৃত্যু কি অন্যভাবে, তামাঙ জনজাতির তরুণদের মুখ থেকে হারিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আরও দ্রুত ঘটে যাচ্ছে না?' এক গভীর বেদনার ছায়া নেমে এল বাকসিন লামার মুখে। তামাঙ জনজাতির ইতিহাস, পরম্পরা, ভাষার কথা বলতে বলতে যে উচ্ছল আনন্দ তাঁর গোটা শরীরী ভাষায় বিকীর্ণ হচ্ছিল, এক ঝাপটে যেন তা নিভে গিয়ে অন্ধকার থমথম করে উঠল। সেই অন্ধকার, সেই বেদনাই যেন গুঁড়ো গুঁড়ো শব্দ হয়ে ঝরে পড়ল যখন তিনি বললেন যে হ্যাঁ, তামাঙ ভাষা নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, এভাবে তামাঙ স্ব-পরিচয়টাই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তামাঙ জাতির অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই স্রোতের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াতে চেয়েছেন বারবার। ২০১০ সালে কাজিমান গোলের সঙ্গে যৌথভাবে কাজিমান গোলের বাড়িতে তাঁরা স্কুল খুলেছিলেন বাচ্চা ছেলেমেয়েদের তামাঙ ভাষা শেখানোর জন্য। চল্লিশ জনের মতো ছাত্রও তাঁরা জোগাড় করেছিলেন, তিন মাস ক্লাস চলেছিল। তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন নতুন প্রজন্মের কাছে পুরানো ইতিহাস বলে, পুরানো গল্প ও গান বলে তামাঙ ভাষার প্রতি ভালোবাসা জাগানোর জন্য। কিন্তু সফল হতে পারেননি। ধীরে ধীরে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি অনিয়মিত হচ্ছিল, কমছিল। তারপর সে স্কুলের ক্লাসঘর ফাঁকা হয়ে গেল, তিনি শিক্ষক কেবল একা, পড়ানোর কেউ নেই। স্কুল তারপর উঠে গেল। আদরের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিত্যক্ত শিক্ষকের চোখে যে শূন্যতা

সেই শূন্য ক্লাসঘর থেকে ঘনীভূত হয়ে এসে বাসা বেঁধেছিল, তা যেন আবারও ভেসে বেড়াচ্ছিল বাকসিন লামার চোখে।

বাকসিন লামা তখন বলছেন, কিন্তু, শুধু স্কুলে পড়ালেই কি হবে? আমাদের এখানে তামাঙ ভাষা স্কুলে পড়ানোর সুযোগ নেই। কিন্তু নেপালে উচ্চমাধ্যমিক স্তর অবধি তামাঙ ভাষা পড়ার সুযোগ আছে, সিকিমে মাধ্যমিক অবধি তামাঙ ভাষা পড়ার সুযোগ আছে, সেখানেও তো তরুণ প্রজন্মের মুখ থেকে তামাঙ ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে, নেপালি ভাষা চেপে বসছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে তরুণদের নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি এই অবজ্ঞা, অনীহার কারণ কী বলে তাঁর মনে হয়? বাকসিন লামা আনমনা ভাবে বলতে লাগলেন, যেন তিনি নিজের মনেই কারণ সাজাচ্ছেন। বাকসিন লামা বলতে লাগলেন যে বাংলা ভাষা, নেপালি ভাষা ও হিন্দি ভাষার চাপেই তামাঙ ভাষার এই দশা। বাংলা, হিন্দি, নেপালি ভাষা রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ দেখায়, বড়লোক হওয়ার লোভ দেখায়, সেইসব ভাষার বাচকরা এলাকার উপর দাপট দেখায়, শাসন করে। সে রাজনৈতিক ক্ষমতা তামাঙদের নেই, তামাঙ ভাষারও নেই।

তবু নিজের মাতৃভাষাকে বাঁচানোর চেষ্টা তো করতেই হবে কারণ তা তো স্ব-পরিচয়কে বাঁচানোরই শামিল। আর মাতৃভাষা তো বুকের ভিতরের আবেগের বিষয়, আবেগ কবে সাফল্য বা ব্যর্থতার সম্ভাবনা মেপে কাজ করেছে? বাকসিন লামা তাই একটি বই লিখেছেন তামাঙ ভাষায় আজকের প্রজন্মের জন্য। তারা তো আর তামাঙ লিপি এখনই পড়তে পারবে না, তাই তিনি নেপালি ও হিন্দি লেখায় ব্যবহৃত দেবনাগরি লিপি ব্যবহার করেই লিখেছেন, যাতে তারা পড়তে পারে। সেই বইয়ে তামাঙ ভাষার শব্দ, প্রবাদ, প্রবচন, গণনার রীতি, সমাজসম্পর্ক সব কিছু লিখেছেন নিজেকে উজাড় করে, আর বইটির নাম দিয়েছেন 'তামাঙ গিয়ইলা ছেরেঙগাই' অর্থাৎ, 'তামাঙ ভাষা দীর্ঘজীবী হোক।' বইটি তিনি সম্পূর্ণ নিজের খরচে ছাপিয়েছেন। বইটি ৯৬ পাতার। বইটি তিনি নতুন প্রজন্মের অনেককে দিয়েছেন, যদি কেউ পড়ে, আজ না হোক কাল...

বইটার একটা কপি তিনি আমাকেও দিলেন। আমি তার দাম দিতে চাইলে কিছুতেই নিলেন না। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। তিনি এক পড়শিকে ডেকে তাকে বললেন, মোটরসাইকেল করে কালচিনি মোড় অবধি পৌঁছে দিতে।

৬

কালচিনি তেমাথা মোড় থেকে মাদারিহাটের দিকে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই ডানদিকে কালচিনি চা-বাগানের প্রবেশপথ। আর তার উল্টোদিকেই বাঁ হাতে পথ নেমে গেছে ঘন হয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িঘরের মধ্যে। এই পাড়ার নাম 'পিপলতলা লাইন'। চা-বাগানের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মজুরদের বসতি বা 'লাইন' হিসেবে গড়ে ওঠার শুরুর দিন থেকেই এই নামে পরিচিত। মূলত তামাঙদের পাড়া। এই পাড়ায় থাকেন লাকপা লামা, কালচিনির তামাঙ সমাজের অন্যতম মান্য বয়স্ক ব্যক্তি। খুঁজে খুঁজে তাঁর বাড়িতে গিয়ে সেখানে তাঁকে পেলাম না, শুনলাম তিনি কাছেই তাঁর জামাই গণেশ তামাঙ-এর বাড়িতে গিয়েছেন। গণেশ তামাঙ-এর বাড়ি গিয়ে তাঁর দেখা মিলল। সাজানো গোছানো বাড়ির সামনে ফুলগাছে ঘেরা উঠোনের যে জায়গাটায় মিঠে রোদ ওমভরা পাটি বিছিয়ে রেখেছে সেখানে আমরা বসলাম আলাপ করতে। সকালে তাঁর মেয়ে-জামাই ও নাতনির কোথাও বেরোনোর প্রস্তুতি চলছিল, সেই কাজেই তিনিও জামাই বাড়িতে এসেছিলেন। তারই মধ্যে কোনো কিছু না বলে কয়ে অচেনা আগন্তুক হিসেবে আমি হাজির হয়ে গেলেও কোনো বিরক্তি দেখলাম না। লাকপা লামা তো আমার সাথে আলাপে বসে গেলেনই, তাঁর জামাই ও মেয়েও মাঝে মধ্যে এসে তাতে যোগ দিয়ে যাচ্ছিল আর তারা বেরিয়ে যাওয়ার পরও তাদের উঠোনে বসে লাকপা লামার সঙ্গে আলাপ চলল রোদ ঢলে পড়ার উপক্রম হওয়া অবধি।

লাকপা লামা-র পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছিলেন চা-বাগানের পত্তন হওয়ার সেই গোড়ার পর্বেই। সেই গোড়ার পর্ব সম্পর্কে কাজিমান গোলে লিখেছিলেন:

> ১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভুটান রাজার সঙ্গে তৎকালীন ভারতের ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভুটানের রাজা পরাজিত হন। তখন এই ডুয়ার্স অঞ্চল ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পূর্বে এইসব এলাকা ঘন জঙ্গল এবং পশুপাখির আবাসস্থল ছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ঘন জঙ্গল কেটে চা বাগান করার পরিকল্পনা করে। জঙ্গল সাফাই অভিযান শুরু হয়। কোম্পানির গোরা সাহেব দালাল মারফত রাঁচি, সিংভুম, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের

> শ্রমিক এবং নেপালের তেমাল, ওয়াফল, মাওয়ার, থংয়াল, হয়োলমো প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নেপালি সম্প্রদায়ের শ্রমিক নিয়ে আসে। তৎকালীন নেপালের সামন্ত রাজার অত্যাচারে নেপালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক তামাঙ সম্প্রদায়ের শ্রমিক এই অঞ্চলে চলে আসেন। শুরু হয় বৃক্ষছেদন এবং চা গাছ রোপণ।... কালাজ্বর এবং মানুষখেকো বাঘের উপদ্রবের মধ্যে ভোর থেকে রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম কাজ করতে হতো। অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। গোরা সাহেবের হুকুমই ছিল আইন। এইভাবে এই অঞ্চলের জনজাতির পূর্বপুরুষেরা সাহেবের অত্যাচারে, কালাজ্বরে ভুগে সারাদিন পরিশ্রম করে কোম্পানির লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছিল। এই সকল শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল নেপালিদের মধ্যে তামাঙ সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মানুষ শুধু চা-বাগান নয়, বনবস্তি, কৃষিজ অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন করে আসছে। (সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত চা ও আদিবাসী উৎসব ২০১৫-১৬-র 'স্মরণিকা'-য় কাজিমান গোলের লেখা 'আলিপুরদুয়ারের তামাঙ জনজাতি ও তার সংস্কৃতি', পৃ. ৭)

লাকপা লামা তাঁর স্মৃতি থেকে পূর্বপুরুষদের থেকে শোনা যে সমস্ত কথা বলছিলেন, তা কাজিমান গোলের বক্তব্যেরই অনুরূপ। লাকপা লামার কথায় তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্তি নিয়ে গর্বের প্রকাশও ছিল প্রচ্ছন্ন। বলতে বলতে তাঁর চোখমুখ চকচক করে উঠল যখন তিনি তাঁর ঠাকুমার প্রসঙ্গে এলেন। এই ঠাকুমা হ্যামিল্টন সাহেবের কাছ থেকে 'সেরা শ্রমিক' এর পুরস্কার পেয়েছিলেন। হ্যামিল্টন সাহেব কাজিমান গোলে কথিত 'কোম্পানির গোরা সাহেব'-দের একজন, যিনি চা-বাগানের পত্তনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর নামে কালচিনি-সংলগ্ন জনপদ 'হ্যামিল্টনগঞ্জ' নামে এখনও পরিচিত। সেই হ্যামিল্টন সাহেব লাকপা লামা-র ঠাকুমাকে 'সেরা শ্রমিক' হিসেবে 'ইনাম' দিয়েছিলেন। কী ছিল সেই 'ইনাম'? লাকপা লামা শুনেছেন যে ইনাম হিসেবে মাংস, মদ ও টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই কথা শুনতে শুনতে আমার দুটো বিষয় মনে হল। প্রথমটি হল এই যে হুকুম-জবরদস্তির পাশাপাশি এই 'সেরা শ্রমিক'-কে ইনাম দেওয়ার 'নরম দাওয়াই'ও তাহলে গোরা সাহেবরা ব্যবহার করতেন শ্রমিকদের

দিনরাত কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য। আর দ্বিতীয় কথা মনে হলে যে তখনকার শ্রমিকবাহিনীতে পুরুষের সঙ্গে মহিলারাও তাহলে পাল্লা দিয়ে কাজ করেছিলেন।

কিন্তু লাকপা লামার পূর্বপুরুষরা এখানে আসার আগে, অর্থাৎ চা-বাগান পত্তনের আগে এখানে কী ছিল? কাজিমান গোলে লিখেছিলেন 'ঘন জঙ্গল এবং পশুপাখির আবাসস্থল' -এর কথা। লাকপা লামা-র কথার আরও কিছু পাওয়া গেল। তিনি বললেন, দাদু-ঠাকুমার মুখে শুনেছেন যে তাঁরা আসার আগেও এখানে মানুষের বসত ছিল, সেই মানুষরা ছিল মেচ জনজাতির, ব্রিটিশরা নানাভাবে তাদের জমি কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

লাকপা লামার স্মৃতিতে রক্ষিত এই প্রাচীন মেচ বসতির কথা আরেকজনের লেখাতেও আমি পড়েছিলাম। তিনি হলেন রমেশ চন্দ্র সুবা। ইনি জয়সিং সুবা-র বংশধর, যে জয়সিং সুবা-র নামে কালচিনি-সংলগ্ন ভুটান সীমান্তের বাজার-জনপদ এলাকা প্রথমে 'জয়গ্রাম' ও তার থেকে 'জয়গাঁও' নামে নামাঙ্কিত হয়। এই জয়সিং সুবা ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভুটান ও ব্রিটিশদের মধ্যে 'চিঞ্চুলা সন্ধি' স্থাপনে দৌত্যের কাজ করেছিলেন। সেই ভূমিকায় সন্তুষ্ট ব্রিটিশ প্রতিনিধিই প্রথম ভুটান সীমান্তের একটি গ্রামের নাম 'জয়গ্রাম' রাখেন। সেই জয়সিং সুবার বংশধর রমেশ চন্দ্র সুবাও তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনেছিলেন:

> চা-বাগানের জমি ছিল মেচদের কৃষিজমি। চা-বাগান তৈরির জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় ব্যবসায়ী ব্রিটিশরা মেচদের জমি ক্রমান্বয়ে দখল করতে থাকে। শুধু জয়গাঁওয়ের জমি নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর বহু কৃষিজমি দখল করে দলসিংপাড়া চা-বাগান, বীচবাগান, সৌদামিনী বাগান (ইদানিং এই বাগানটার নাম সুভাষিনী বাগান), সাতালি বাগান, মেচ বাগান, রায়মাটাং বাগান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। কালচিনি থানায় গারোপাড়া বাগান বাদে যতগুলি চাবাগান সবই ছিল মেচদের কৃষিজমি। উচ্ছেদ হওয়া মেচ কৃষকদের বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বলেছিল ব্রিটিশরা, কিন্তু মেচ সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্রিটিশের গোলাম হয়ে কাজ করতে অস্বীকার করে। তারা আসামে পাড়ি দেয়। তখনকার দিনে আসামে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হতো। তাছাড়া ভুটান ও ব্রিটিশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে অনেক মেচ ভয়ে নিজ গ্রাম ছেড়ে আসামে চলে যায়। বললে অত্যুক্তি হবে না যে

বিনামূল্যে মেচরা ব্রিটিশদের হাতে জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। যারা জমি ছেড়ে দিতে চায়নি তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। বিশেষ করে মেচ রমণীদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। যারা স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছে তাদেরকে জমির ক্ষতিপূরণ দিলেও অতি সামান্যই দিয়েছে। তাও কেউ পেয়েছে, কেউ পায়নি। এইসব কারণে এই এলাকায় মেচ জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পায়। (সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত চা ও আদিবাসী উৎসব ২০১৫-১৬-র 'স্মরণিকা'-য় রমেশ চন্দ্র সুবা-র লেখা 'জয়গাঁও-এর ইতিহাস' পৃ. ৩২-৩৩)

লাকপা লামা-র ঠাকুমা-দাদু-রা সেই মেচ বিতাড়ন পর্ব কিছুটা দেখেছিলেন, সে কথা লাকপা লামা তাঁদের কাছে শুনেছিলেন। আন্দাজ করা যায় যে সে সব কথা ১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দের পরের কয়েক দশকের ঘটনা। আন্দাজ মিলিয়ে নেওয়ার জন্য লাকপা লামার কাছ থেকে তাঁর ঠাকুমা-ঠাকুর্দার সময়কাল সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। ঠিক কত বছর আগে কোন সালে তাঁর ঠাকুমা, ঠাকুর্দা মারা গেছেন, তাঁর জন্মই বা কোন সালে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে এক অদ্ভুত সমস্যা উঠে এল। লাকপা লামা যে পদ্ধতিতে সময় গোনেন তা আমার পরিচিত খ্রিস্টাব্দে, বঙ্গাব্দ বা শকাব্দের নিরিখে গণনা পদ্ধতি নয়। উনিশ শতক-বিশ শতক—এই সব শতকিয়া গণনাপদ্ধতিও তাঁর নয়। তিনি বছর চিহ্নিত করছেন কোনো এক জন্তুর নামে—যেমন ইঁদুরের বছর বা কুকুরের বছর। আর সে বছরও '২০১৯' সালের মতো সময়প্রবাহের সরলরৈখিক প্রবাহে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু নয়, সেই ইঁদুরের বছর বা কুকুরের বছর এক বৃত্তিয় ঘূর্ণনে বারবার ফিরে আসছে বহু কালের ওপার থেকে। আর তাঁর এই সময় গণনা পদ্ধতি তামাঙদের প্রথানুগ পদ্ধতি।

লাকপা লামাকে বললাম যে তাঁদের এই সাল-বছরের হিসাবটা একটু বুঝিয়ে বলতে, কারণ তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। লাকপা লামা সোৎসাহে রাজি হলেন। উঠে গিয়ে তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের ঘর থেকে কিছু ছাপা কাগজপত্র নিয়ে এলেন। সেই কাগজপত্রে ছবিসহ চক্রাকারে বছর গোনার পদ্ধতি দেওয়া আছে। তিনি তা আমায় ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তাঁর কাছ থেকে বোঝা তামাঙদের এই সময় গোনার পদ্ধতি কিছুটা বিশদে দেখা যাক।

৭

তামাঙ ভাষায় সাল বা বছর-কে 'লো' বলা হয়। কালপ্রবাহ বারোটি লো দিয়ে তৈরি এক চক্রে ঘূর্ণায়মান। প্রতিটি লো-এর নাম কোনো একটি জন্তুর অনুষঙ্গে করা হয়েছে। সেগুলো হল:

১।	জিওয়া লো	—	ইঁদুরের বছর
২।	লাং লো	—	গরুর বছর
৩।	তাক লো	—	বাঘের বছর
৪।	হই লো	—	খরগোসের বছর
৫।	ড্রুক লো	—	ড্রাগনের বছর
৬।	ডুক লো	—	সাপের বছর
৭।	তা লো	—	ঘোড়ার বছর
৮।	লুক লো	—	ভেড়ার বছর
৯।	টে লো	—	বাঁদরের বছর
১০।	জে লো	—	পাখির বছর
১১।	খ্রি লো	—	কুকুরের বছর
১২।	ফাক লো	—	শুকরের বছর

জিওয়া লো অর্থাৎ ইঁদুরের বছর থেকে শুরু হয়ে এক এক করে ফাক লো অর্থাৎ শুকরের বছর অবধি এসে আবার ইঁদুরের বছর থেকে শুরু হয় বছর গোনা। বছরের নামের সঙ্গে বিশেষ জন্তুর অনুষঙ্গ যুক্ত করার কি কোনো তাৎপর্য আছে? লাকপা লামার কথা আমি পুরোটা বুঝতে পারলাম না। এইটুকু বুঝলাম যে তিব্বতী গণনাশাস্ত্র অনুযায়ী এই অনুষঙ্গের নানা নিহিতার্থ আছে যার উপর দাঁড়িয়ে কোনো ব্যক্তির জন্ম-পত্রিকা বা কোষ্ঠী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমাজকর্মের শুভাশুভ সময় নির্ধারণ করা হয়।

তামাঙ লোক-অভ্যাসে দূর বা নিকট অতীতের যে কোনো সময়বিন্দুর সঙ্গে দূরত্ব এই ১২ বছরের চক্রের ঘূর্ণনের সংখ্যা ও বছর-নাম দিয়ে হিসাব করা হয়। কোনো এক পাখির বছরে দাঁড়িয়ে কেউ যদি বলে যে তার জন্ম পাঁচটি ঘূর্ণন আগে ঘোড়ার বছরে, তাহলে আমাদের হিসেবে তার বয়স হবে (৫×১২+৩=) ৬৩ বছর।

কেবলমাত্র দুই সময়বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব মাপার একটি পদ্ধতি নয়, তামাঙদের বিবেচনায় এই ১২ বছর চক্রের গহন যোগ আছে জীবন ও প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে। যেমন, তারা মনে করে যে একটি শিশু জন্ম নেওয়া থেকে বছর চক্রের একটি ঘূর্ণন পর, অর্থাৎ ১২ বছর পর তার দেহে জীবন-শক্তি (তামাঙ ভাষার 'সো') বিকশিত হয় এবং তারপর থেকে বছর-চক্রের প্রতি ঘূর্ণন শেষে অর্থাৎ ১২ বছর পর পর সেই জীবন-শক্তি ('সা')-র পুনর্নবীকরণ হয়। তাই কোনো তামাঙ শিশু ১২ বছর বয়সের আগেই মারা গেলে তার পুরোদস্তুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয় না।

১২ বছর চক্রের মধ্যে প্রতিটা বছরকে ১২টি চান্দ্র মাসে ভাগ করে তামাঙরা। আমাদের ১২ মাসের সঙ্গে তামাঙদের এই ১২ মাস মোটামুটি সাযুজ্যপূর্ণ:

বাংলা মাস	তামাঙ মাস
বৈশাখ	দুগু
জ্যৈষ্ঠ	ড্রমফে
আষাঢ়	ব্লালবো
শ্রাবণ	গোলে
ভাদ্র	ইয়ানদে
আশ্বিন	মোনিং
কার্তিক	সোরাতি
অগ্রহায়ণ	বৈতাপা
পৌষ	তাপা
মাঘ	খ্রেলা
ফাল্গুন	বেনে
চৈত্র	নামদুং

প্রতিটি বছরকে তামাঙরা দুটি ভাগে বিভক্ত করে: ফাল্গুনের (বেনে-র) পূর্ণিমা থেকে ভাদ্রের (ইয়ানদে-র) পূর্ণিমা অবধি সময়টিকে বলা হয় ইহ্‌য়ারসুঙ এবং অন্য অর্ধটি অর্থাৎ ভাদ্রের পূর্ণিমা থেকে ফাল্গুনের পূর্ণিমা অবধি সময় হল ম্হাসুঙ। ইহ্‌য়ারসুঙ মূলত শুখা মরসুম আর ম্হাসুঙ মূলত বর্ষার মরসুম। মরসুমের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কৃষিজীবনের নানা উদ্‌যাপন এই দুই বর্ষার্ধের জন্য নির্দিষ্ট আছে। এছাড়াও, তামাঙরা চান্দ্র-উপমা ব্যবহার করে বছরের মধ্যে চারটি

মাসকে ক্ষয়প্রাপ্তির মাস ও চারটি মাসকে পুনরভ্যুত্থানের মাস হিসেবে দেখে—এই দেখার মধ্যেও প্রকৃতির লয় ও ছন্দ সম্পর্কে নিজস্ব বোধ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

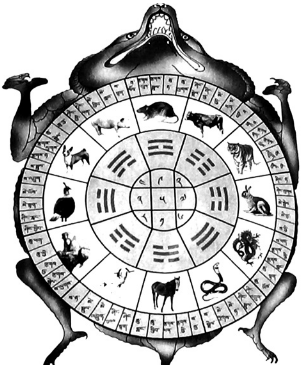

তামাঙ বর্ষচক্র

তামাঙ বর্ষচক্রের ইংরেজি সংস্করণ

লাকপা লামা বর্ষচক্রের দুটো ছবি আমাকে দেখালেন। প্রথম ছবিতে তামাঙদের প্রথানুগ চিহ্ন ও ভাষা ব্যবহার করে বর্ষচক্র আঁকা হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিতে বর্ষচক্রকে তামাঙ ভাষা ও চিহ্নের সঙ্গে অপরিচিত হয়ে ওঠা প্রজন্মের কাছে বোধগম্য করার চেষ্টা করা হয়েছে ইংরেজিতে বছরগুলোর জন্তু-নাম দিয়ে ও প্রতি বছরের সঙ্গে সমতুল্য খ্রিস্টাব্দের হিসাব দিয়ে। যেমন, জিওয়া লো বা ইঁদুরের বছরের স্থানে ইঁদুরের ছবি ও 'RAT' লিখনের সঙ্গে দেওয়া আছে: ১৯৩৬, ১৯৪৮,১৯৬০, ১৯৭২, ১৯৮৪, ১৯৯৬, ২০০৮। নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির শিকড় ছিঁড়ে গিয়ে আধিপত্যকারী ভাষা-সংস্কৃতির সাজানো টবে বনসাই হিসেবে বাঁচার এক করুণ চেষ্টা এই দ্বিতীয় ছবিটি। কিন্তু প্রথম ছবিতে একটা বিষেয়ে আমার চোখ আটকে গেল। প্রথম ছবিটিতে বর্ষচক্রকে দেখানো হয়েছে এক অতিকায় প্রাণীর দেহের অংশ হিসেবে। বর্ষচক্রটি সেই প্রাণীর উদর ও বক্ষের স্থানে, তার চারদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধারালো দাঁতের সারি সমেত প্রাণীটির হাঁ-করা মুখ ও দুটি গোলাকার চোখ সমেত উর্ধোত্থিত মাথা, চারটি হাত-পা ও একটি লেজ। আমি লাকপা লামাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে বর্ষচক্রকে আত্মস্থকারী এই বিকটদর্শন জন্তুটি কী বোঝাচ্ছে? লাকপা লামা

বললেন যে এই জন্তুর দেহে বর্ষ-চক্রের অন্তঃস্থতা বোঝাচ্ছে যে বর্তমানে বর্ষচক্র কলিযুগের মধ্যে ঘূর্ণায়মান। এই কলি যুগে মানুষের মধ্যে মন্দ মাথা চাড়া দেয়, এ কলি যুগ ক্ষয়প্রাপ্তির যুগ। বুঝতে পারলাম যে ১২ বছর দীর্ঘ এই বর্ষ চক্রগুলো ছাড়াও তামাঙদের পরম্পরাবাহিত কল্পনায় সময়ের আরও বৃহৎ একটি ঘূর্ণন গতি বর্তমান, যার অভ্যন্তরে ১২ বছরের বর্ষচক্রগুলো ঘুরছে। লাকপা লামা কেবল কলি যুগ সম্পর্কেই বললেন, কিন্তু তা আমার মধ্যে বৃহত্তর এক অনুরণন জাগিয়ে তুলল। ভারতীয় আর্য পুরাণে কালপ্রবাহ সম্পর্কে ধারণা চারটি যুগ নিয়ে তৈরি যুগচক্রের মধ্যে ঘূর্ণনগতির রূপ নিয়েছে। কৃত যুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগ ও কলি যুগ—এই চার যুগের প্রায় ৪৩,২০,০০০ বছর দীর্ঘ চক্রে ঘূর্ণনের মধ্যে দিয়ে মহাজাগতিক কাল প্রবাহিত এবং শুরু থেকে এই চক্র ক্রমশ ক্ষয় ও বিশরণের পথে এগোয়—এ কল্পনা আর্য-কল্পনা হিসেবে জানা ছিল। কিন্তু তামাঙদের মতো অনার্য কিরাতদের পরম্পরাবাহিত কল্পনায় একই ধরনের ছবি ফুটে ওঠে কী করে? সময়ের গতি-লয়-ছন্দ সম্পর্কে এ কল্পনা কি তাহলে আর্যভিত্তির থেকে আরও প্রসারিত কোনো ভিত্তির উপর বিকশিত, নাকি নেপালের রাজতন্ত্রের প্রভাব ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এই কিরাতদের এমন এক সংস্কৃতায়ন ঘটিয়েছে যার ফল এটা?

এসব প্রশ্নে বিচরণ করতে করতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। লাকপা লামার কথায় আবার মনোযোগ ফিরিয়ে আনলাম। মহাকালের গতি থেকে লাকপা লামার আলোচনা আবার তামাঙ সাধারণজনের দৈনন্দিন জীবনের সময়-ছন্দে নেমে এসেছে। তামাঙ জীবনের সাধারণ ছন্দটা তিনি বর্ণনা করছিলেন এভাবেঃ জন্মের পর শুদ্ধিকরণ ও নামকরণ (নামছুঙ), প্রথম ভাত খাওয়া (কেন য়াহপা), ৩/৫/৯ বছর বয়সে ছেলেদের মস্তকমুন্ডন ও বোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি (ছেওয়ার), মেয়েদের ৭ বছর বয়সে প্রথম পরনের ঘাগরা দেওয়া (সিয়ামা পিম্‌পা), বিবাহ (পে রিহম্‌বা), পিতা-মাতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও সর্বশেষে নিজ মৃত্যু। পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে আবার জীবনচক্রের ঘূর্ণন শুরু হয়। শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম যে সময়, প্রকৃতি বা মানবজীবন সম্পর্কে ধারণার কেন্দ্রে বসে আছে এই নিরন্তর চক্রগতি এবং ক্ষয় ও পুনর্নবিকরণের ছন্দোবদ্ধ পুনরাবৃত্তির কল্পনা।

৮

তামাঙ সমাজের মধ্যে বিবাহের পরম্পরাগত রীতিনীতির কথা বলছিলেন লাকপা লামা। এই বিবাহের রীতিনীতি সমাজরক্ষার প্রয়োজনে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন। তামাঙদের মধ্যে আঠারোটা গোত্র আছে। একই গোত্রে বিবাহ হয় না, ভিন্ন গোত্রে বিবাহ হয়। সাধারণত কোনো ছেলের বিয়ে হয় তার মামার মেয়ের সঙ্গে। বিয়ের পর মেয়ে বরের বাড়িতে গিয়ে থাকলেও এবং বরের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেও তার নিজস্ব গোত্র কিন্তু বদল হয় না। তাছাড়াও মেয়ের ওপর তার ভাই ও বাবার অধিকার থেকে যায় 'রুইবা'-র অধিকারের মধ্য দিয়ে। এই রুইবার অধিকার আক্ষরিক অর্থে হল 'হাড়ের অধিকার'। অর্থাৎ মেয়েটির হাড়ের উপর অধিকার তার বাপ-ভাইদেরই থেকে যায়। এই অদ্ভুত অধিকার কীভাবে পালিত হয় দেখা যাক। তামাঙদের বিয়ের শুরু হয় বাগদান অনুষ্ঠান থেকে, যাকে তামাঙ ভাষায় বলে 'তামেন ব্লি'। তবে এখন নেপালি শব্দ 'চারদম'-ই বেশি চালু এই অনুষ্ঠান বোঝাতে। এই অনুষ্ঠানে মেয়ের বাবা ও ভাই একটা থালায় আতপ চাল, কোকোমেন্দো ফল ও চারটি মুদ্রা সাজিয়ে তা গ্রামের বয়স্ক মান্য মানুষজনের উপস্থিতিতে ছেলের বাবা বা ভাইয়ের হাতে তুলে দেয়। এই তুলে দেওয়ার সময় তামাঙ ভাষায় একটি প্রচলিত ঘোষণা করা হয়। ঘোষণাটির মধ্যে বলা হয় যে হিমালয় থেকে সমুদ্র অবধি সব গাছ-গাছালি ও প্রাণীর সম্মতিতে এই যুবক ও যুবতীকে সামাজিকভাবে বিবাহে দায়বদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল। বরের পরিবারের কাছে কন্যাকে সম্প্রদান করে কন্যার ভাই, যাকে তামাঙ ভাষায় 'ময়ুঙ' বলা হয়। সম্প্রদানের ঘোষণায় ময়ুঙ তামাঙ ভাষায় যে প্রচলিত মন্ত্র বলে তার অর্থ এই যে কন্যার সমস্তকিছু পাত্রের হাতে তুলে দিলেও কন্যার শরীরের হাড় সর্বদা পাত্রীপক্ষের থাকবে। চারদমের থালার একটি মুদ্রা এই হাড়ের প্রতীক। বরপক্ষ সেইটি পাত্রীর ভাইকে অর্থাৎ ময়ুঙ-কে ফিরিয়ে দেয় 'রুইবা'-র প্রতীক হিসেবে। এরপর যেদিন বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং বিবাহ শেষে পাত্রী প্রথম পাত্রের বাড়ি আসে, সেদিনও পাত্রীর ভাই অর্থাৎ 'ময়ুঙ' তার সঙ্গে আসে। ময়ুঙ যখন পাত্রের বাড়ি থেকে ফিরে আসে তখন তাকে ঘরে তৈরি মদ (তামাঙ ভাষায় 'ছ্যাঙ') উপহার দিতে হয় পাত্রীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকার স্বীকৃতি হিসেবে। জীবনের শেষে

পাত্রী যখন মারা যায়, পাত্রপক্ষ তখন তার মৃতদেহ সৎকার করার অধিকারী নয়, তখন তার ভাই অর্থাৎ ময়ুঙ বা তার বংশধরদের খবর দিতে হবে। তারা এসে সৎকার করবে। কোনো কারণে তারা আসতে না পারলে মৃতদেহ পোড়ানোর পর ছাই রেখে দিতে হবে পরে ময়ুঙ বা তার বংশধরদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। এছাড়াও, যে কোনো বিবাহের পর পাত্রীপক্ষ 'কন্যাদাতা' (তামাঙ ভাষায় 'আসিয়াঙ-সিয়াঙপো') হিসেবে পাত্র ও তার পরিবারের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকে, এই দুই পরিবারের সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। আলোচনা করতে করতে লাকপা লামা বলছিলেন যে তাঁদের সমাজ একসময় মাতৃতান্ত্রিক ছিল। মায়েরাই সমাজের প্রধান ছিলেন। বিবাহের পর পুরুষদের কন্যার বাড়ি গিয়েই থাকতে হত। তামাঙদের প্রথাগত ডম্ফু নাচের শুরু হয় মাতৃবন্দনার গান দিয়ে:

> আমাইলে আমাইলে আমাইলে
> ঘাইলা লা—।

সন্তান-সন্ততিরাও তখন মায়ের পরিচয়েই পরিচিত হত। সেই সামাজিক গঠন ও রীতিনিতি এখন পাল্টে গেছে, কিন্তু তার চিহ্ন এখনও এই 'রুইবা'-র মধ্য দিয়ে রয়ে গেছে।

এই 'রুইবা' যেমন দূর অতীতের তামাঙ সমাজের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে, তেমনই বিবাহের বিভিন্ন পর্বের তামাঙ ভাষার মন্ত্রগুলো বর্তমান সমাজে তামাঙ ভাষার স্মৃতিরক্ষা করে চলেছে। আজকের তরুণ প্রজন্মের কেউই তামাঙ ভাষায় কথা বলতে বা লেখাপড়া করতে পারে না, তামাঙ পরিবারগুলোর অভ্যন্তরেও তামাঙ ভাষার ব্যবহার তাই ক্ষীণ হতে হতে প্রায় মিলিয়ে যেতে বসেছে। কেবল এই বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় চারদম ও কন্যা-সম্প্রদানের মন্ত্র এখনও তামাঙ ভাষাতেই বলা হয়। তামাঙ ভাষায় স্বচ্ছন্দ বয়স্ক মানুষজনদের জন্যই তা সম্ভব হয়। নেপালি ও ইংরেজি (এবং বাংলা) ভাষার আধিপত্য-প্রসারে ভেসে যেতে যেতে তামাঙ ভাষা যেন খড়কুটোর মতো এই আচার-অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরে আছে।

বাকসিন লামার মতো লাকপা লামার চোখে মুখেও বিষাদ-বিষন্নতার সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তামাঙ ভাষার এই বিপন্নতার প্রসঙ্গ ওঠায়। কাজিমান গোলে ও

বাকসিন লামার প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে, তরুণ প্রজন্মের মুখে তামাঙ ভাষা ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁদের চেষ্টা যে শুকিয়ে মরেছে, তা তাঁর কাছে অত্যন্ত হতাশার। রোদ তখন ঢলে পড়েছে। সূর্য অস্তাচলের পথে। বোধের মধ্যে ছটফটানো এক অসহায়তা নিয়ে লাকপা লামা বলছিলেন যে একসঙ্গে ঘর বেঁধে থাকাই তো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, ভাষা-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করার বাঁধন বাঁধা যাবে কী করে? তাঁর কথাটা বোঝার জন্য তাঁকে তাঁর কথা আরেকটু খুলে বলার অনুরোধ করলাম। বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষটির কথাগুলো এই শেষবেলার মিঠে আলোতেও গহন অন্ধকারের বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে লাগল। তিনি বলে চললেন চা-বাগানের দুরবস্থার ফলে জীবিকার খোঁজে তামাঙ তরুণদের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার কথা, যা চা-বাগান এলাকায় তামাঙ পরিবারগুলোর বাঁধুনিকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। তিনি বলে চললেন ভুটান থেকে উৎখাত হয়ে হাজার হাজার তামাঙ মানুষদের শরণার্থী হয়ে ছড়িয়ে পড়ার কথা...

৯

ভুটান থেকে হজার হাজার তামাঙ মানুষদের উৎখাত হওয়ার কথা যখন লাকপা লামা বলছিলেন, তখন তাঁর অভিব্যক্তির বিপন্নতাবোধ ও অসহায়তা আমায় নাড়িয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি অবাক হয়েছিলাম, আত্মগ্লানিও হয়েছিল এই ভেবে যে এত কাছের একটা অঞ্চল থেকে এত মানুষের উৎখাত হওয়ার ঘটনা কী করে এতদিন আমার নজরে আসেনি!

লাকপা লামার সঙ্গে কাটানো সেই দিনটির পর এক বছরের উপর কেটে গেছে। এখন ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস। আজ আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সীমান্তের টোটোপাড়ার মঙ্গর গাঁওয়ে ইচ্ছাবাহাদুর লামার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ১৯৯০ সালে ভুটান থেকে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছিল ১ লাখেরও বেশি মানুষকে, যাদের ভুটানের জঙ্‌খা ভাষায় বলা হত 'লোথসাম্‌পা', অর্থাৎ 'দক্ষিণে বসবাসকারী লোক'। উৎখাত হওয়া এই ১ লাখের উপর মানুষ ভুটানের দক্ষিণ অংশেরই বাসিন্দা, মূলত কৃষিজীবী এবং ভুটানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ ভাগের এক ভাগ। এক সঙ্গে কোনো দেশের জনসংখ্যার এত বড় অংশকে উৎখাত করার নজির পাওয়া দুষ্কর। ইচ্ছাবাহাদুর লামা এই উৎখাত হওয়া মানুষদের একজন।

তিনি তামাঙ জনজাতির মানুষ, ভুটানে ঘর জমি সব হারিয়ে তিনি সীমানা পেরিয়ে এই টোটোপাড়ায় এসে আবার শূন্য থেকে সব শুরু করেছেন।

ইচ্ছাবাহাদুর লামার বয়স এখন প্রায় ৬৫ বছর। তিনি তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন আমাদের। আমাদের বলতে আমি আর আমার টোটো বন্ধু সত্যজিৎ টোটো। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট ঘর, আসবাব বলতে একটি কাঠের চৌকি ও দেওয়ালে দুটো তাক। সেই চৌকির ওপরই আমরা বসলাম। ইচ্ছাবাহাদুর লামা বাংলা জানেন না, তাই সত্যজিৎ টোটোর মধ্যস্থতায় নেপালি ভাষাতেই আলাপ শুরু হল।

১৯৯০ সালে উৎখাত হওয়ার আগে ইচ্ছাবাহাদুর লামা থাকতেন ভুটানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের গ্রাম 'গৈরীগাঁও ১ নম্বর'-এ। গৈরীগাঁও-য়ে তাঁর বসবাস ছিল ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। সেখানে চাষের জমি তৈরি করেছিলেন, চাষ করতেন। গৈরীগাঁওয়ে অধিকাংশ বাসিন্দা তামাঙ জনজাতির। কিন্তু তাঁর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এক ভুটানি মেয়ের সঙ্গে, দুজনের বিয়েও হয়। আজ এই টোটোপাড়াতেও সেই ভুটানি স্ত্রী তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।

কেন তাঁদের জমি-বাড়ি ছেড়ে আসতে হল? কারা তাঁদের উৎখাত করল? ইচ্ছাবাহাদুর লামার যন্ত্রণার স্মৃতি থেকে সেইসব কথা উঠে এল। তাঁদের গ্রামে তামাঙ- জনজাতির মানুষই বেশি ছিল, তাঁদের গ্রামপ্রধান (তাঁদের ভাষায় 'ভোঁড়ে মণ্ডল')-ও ছিলেন তামাঙ, নাম ছিল রামবাহাদুর। কারবারী (পঞ্চায়েত-এর সঙ্গে তুলনীয়)-র ছোকপা (পঞ্চায়েত প্রতিনিধি)-রাও অনেকে তামাঙ-ই ছিল। ১৯৯০ সালে ভুটানের রাজার সেনা এসে অত্যাচার করতে শুরু করে এবং চাপ দিতে থাকে যে গ্রামের অর্ধেক লোক বার করে দিতে হবে, তাহলে বাকিদের সরকার থেকে টাকা দেওয়া হবে। সেনার অত্যাচার ও সরকারের চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ভোঁড়ে মণ্ডল ও ছোকপারা পিঠ বাঁচাতে ও সরকারি অনুগ্রহে লাভবান হওয়ার লোভে ক্রমশ সেনা ও সরকারের অনুগত হয়ে ওঠে। তারাই তামাঙ পরিবারদের বলতে থাকে যে তাদের অনেকের 'কাগজপত্র ঠিক নেই', তাই তাদের ভুটান ছেড়ে চলে যেতে হবে। ইচ্ছাবাহাদুর লামার পরিবারকেও তাই বলা হয়। অথচ ইচ্ছাবাহাদুর লামার পরিবারের 'কাগজপত্র' ঠিকঠাকই ছিল। ১৯৫৮ সালের আগে থেকে ভুটানে বসবাসের কাগজ থাকলে

সরকারের তাকে ভুটানের নাগরিক বলে মেনে নেওয়ার কথা, ইচ্ছাবাহাদুর লামার পরিবারের তা ছিল। ১৯৮৮ সালের প্রথম জনগণনাতেও তাঁদের নাম উঠেছিল। অথচ কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করা হল না। বলা হল যে তাঁদের গ্রাম ছেড়ে ভুটান ছেড়ে চলে যেতে হবে। 'গৈরীগাঁও ১ নম্বর' থেকে এমন প্রায় ৩০ ঘর তামাঙ জাতির মানুষকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। বেশির ভাগই নেপালে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল। তিনি সে পথ নেন নি, পরের দয়ায় বেঁচে থাকতে চান নি। তখন তাঁর ৪৫ বছর বয়স। পরিবার নিয়ে ভুটান ছেড়ে এই টোটোপাড়ায় এসে নতুন করে আবার ঘর, চাষবাস গড়ে তুলতে গতর খাটিয়েছেন। আজ আবার পায়ের নিচে দাঁড়ানোর মতো মাটি পেয়েছেন। যারা শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিল কেউই আর দেশে ফিরতে পারেনি। দেশে অর্থাৎ ভুটানে তাদের ছেড়ে যাওয়া বাস্তুজমি, চাষজমি ও অন্যান্য সম্পদ ভুটানের দক্ষিণ থেকে মূলত ঙ্গালঙ (ভুটানের রাজার সম্প্রদায়) জাতির লোকদের এনে বসতি করিয়ে তাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু ওখানে থেকে যাওয়া রাজার অনুগত হয়ে বাঁচতে চাওয়া তামাঙরাও দখল করেছে। শরণার্থী শিবিরে যাওয়া মানুষদের সবার কী হয়েছে তিনি জানেন না। তিনি শুনেছেন যে উৎখাত হয়ে ভিনদেশে শরণার্থী হয়ে গিয়েও তারা সহায়-সহানুভূতির স্থল খুঁজে পায়নি। অনেকে বেঘোরে মরেছে, কাউকে আশ্রয় খুঁজতে আরও দূর দেশে অচেনা-অজানা পরিবেশে অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকা-য় পাড়ি জমাতে হয়েছে আন্তর্জাতিক নানা সংস্থার ব্যবস্থাপনায়।

কিন্তু ভুটানে তাঁদের উপর এমন অত্যাচার-অবিচার নেমে এল কেন? ইচ্ছাবাহাদুর লামা ধীরে ধীরে নানা কথা বলতে লাগলেন থেমে থেমে, ভাবনার থেকে গুছিয়ে কথা তৈরি করতে করতে। তাঁর পরিবারের একটি তরুণী মেয়ে তিন কাপ চা আমাদের জন্য দিয়ে গেছে, সঙ্গে কিছু নোনতা বিসুকটও। তা দিয়ে যাওয়ার সময় অতিথির প্রতি সম্মানসূচক অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। নিজভূম থেকে উৎখাত হওয়ার পর গোটা পৃথিবীর নির্মম উদাসীনতার মুখোমুখি এই জাতির মানুষরা কিন্তু তাদের নিজস্ব আচারে অতিথির প্রতি সম্মান ও সমাদর করার সৌজন্য একটুও খোয়ায়নি। ইচ্ছাবাহাদুর লামার কথার মধ্য দিয়ে উঠে আসা ছবির দিকে আবার মনোনিবেশ করলাম। ইচ্ছাবাহাদুর

লামা বলছিলেন যে শুধু তামাঙদেরই অবিচার-অত্যাচারের শিকার হতে হয়নি, 'লোথসাম্পা' (দক্ষিণের অধিবাসী) বলে চিহ্নিত সমস্ত নেপালি জনজাতিদেরই তা হতে হয়েছে, আর কেবল নেপালি কেন, ঙ্গালঙ নয় এমন বহু অ-নেপালি ভুটিয়া জনজাতিদেরও হতে হয়েছে। ভুটান বহু জনজাতির দেশ কিন্তু সেখানে কেবলমাত্র ঙ্গালঙ জাতির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে।

ভুটানকে জঙ্‌খাভাষী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের্ দেশ হিসেবে সাধারণত তুলে ধরা হলেও ভুটান আসলে বিভিন্ন বিচিত্র জনজাতির সমাবেশ, যেখানে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যও বিপুল। ঙ্গালঙ জাতির মানুষের ভাষা জঙ্‌খা ও ধর্মবিশ্বাসে তারা তিব্বতী বৌদ্ধমতের দ্রুকপা কাগয় ধারার অনুসারী। অষ্টম-নবম শতকে তারা তিব্বত থেকে ভুটানে প্রবেশ করে এখানেই থাকতে শুরু করে। ভুটানের বর্তমান রাজপরিবার ঙ্গালঙ জাতির, রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে জঙ্‌খা ভাষা ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে দ্রুকপা কাগয়ু ধারার বৌদ্ধমতকে ঘোষণা করা হয়েছে। 'ভুটানের সংস্কৃতি' বলতে এই ঙ্গালঙদের সংস্কৃতিকেই একমেবাদ্বিতীয়ম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়। অথচ ভুটানে আরও বহু ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির ধারা আছে। যেমম, পূর্ব ভুটানে বসবাসকারী সংখ্যায় প্রায় ঙ্গালঙদের সমান আর এক জনজাতি হল স্যারশপ, এই স্যারশপরা উৎসের বিচারে ইন্দো-বর্মী, এঁরা ঙ্গালঙদেরও আগে থেকে ভুটানে বসবাস স্থাপন করেন। এঁদের ভাষার নাম স্যাঙ্‌লা এবং এঁরা তিব্বতী বৌদ্ধমতের ন্যিংমা ধারার অনুসারী। এরপর আছে দক্ষিণ ভুটানের আধিবাসী বিভিন্ন নেপাল থেকে যাওয়া জনজাতি, মূলত আঠারো শতক থেকে যাঁরা ভুটানে বসবাস গড়ে তুলেছেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মমতের মানুষই আছেন, তামাঙরা যেমন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এঁদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন: তামাঙ, লিম্বু, নেওয়ার, নেপালি ইত্যাদি। সাধারণভাবে নেপালি ভাষা এঁদের মধ্যে সাধারণ যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও আছে বিভিন্ন সংখ্যাল্প আদিবাসী গোষ্ঠী, তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা, ধর্মবিশ্বাস ও সমাজরূপ নিয়ে। ভুটানের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তের কাছে বসবাসকারী এমনই এক আদিবাসী গোষ্ঠী হল ডয়া। তাদের ভাষা ডয়া ভাষা, ধর্মাচরণে তারা সর্বপ্রাণবাদী প্রকৃতি পুজার অনুসারী।

ইচ্ছাবাহাদুর লামা বলছিলেন যে সমস্ত বৈচিত্র্য-বিভিন্নতাকে মুছে দিয়ে ঙ্গালঙদের আধিপত্যাধীন একটি এক-ছাঁচে ঢালা সমাজ তৈরির চেষ্টা চলছে

'ভুটানি সংস্কৃতি' রক্ষা করার নামে। ইতিহাসে স্যারশপদের নিজস্ব রাজাদের কথা জানা যায়, পুনাখা জঙ (দুর্গ)-কে কেন্দ্র করে যাদের শাসন ছিল। স্যারশপরা নির্বিবাদে ঙ্গালঙ আধিপত্য মেনে নিতে চায়নি। ঙ্গালঙরা যুদ্ধ করে করে স্যারশপদের পরাজিত করে তাদের উপর আধিপত্য কায়েম করেছে, নিজেদের ভাষা ও ধর্ম তাদের ওপর আরোপ করেছে। সামাজিক জীবনেও ঙ্গালঙদের অধীনস্থ হয়ে থাকতে হয় স্যারশপদের, সেনা-পুলিশ বা চাকরি-বাকরিতে স্যারশপরা তলার দিকের পদ পায়, উপরের দিকের বড় বড় পদ ঙ্গালঙদের একচেটিয়া। লোথসাম্পাদের উপর তো এই জবরদস্তি আরও প্রবল। ঙ্গালঙদের ভাষা, ঙ্গালঙদের ধর্ম, এমনকি ঙ্গালঙদের পোষাকও জোর জবরদস্তি লোথসাম্পাদের উপর চাপানো হয়েছে, তাদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ১৯৮০ সালের আগে কিছু নেপালি উচ্চশিক্ষা অর্জন করে সরকারি দফতরে নিয়োগ জোগাড় করতে পেরেছিল। তাতে যেন ঙ্গালঙরা আরও খেপে ওঠে। ১৯৯০-এ বেছে বেছে উচ্চশিক্ষিত নেপালিদের উৎখাত করা হয়েছে, স্কুলে নেপালি ভাষা পড়ানোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একলাখ মানুষ উৎখাতের পর এখন এই ঙ্গালঙদের আধিপত্য আরও গেঁড়ে বসেছে।

ইচ্ছাবাহাদুর লামার ঘরের বাইরে তখন মধ্যদিনের রোদ চকচক করছে। বাড়ির পিছনে ধাপে ধাপে পাহাড় উঠে গেছে ভুটান পাহাড়ের গায়ে। সুপুরি গাছের সারি পেরিয়ে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল ক্রমশ ঘন হয়ে উঠেছে। এইখান থেকে এখন হাঁটা শুরু করলে পাহাড়ি পথে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নদীর ধার দিয়ে ঘন্টা চার হাঁটলেই গৈরীগাঁও ১ নম্বরে পৌঁছে যাওয়া যায় অথচ তাঁর সেই চল্লিশ বছরের মাতৃভূমিতে ইচ্ছাবাহাদুর লামা হয়ত আর এ জীবনে পা রাখতে পারবেন না। কারণ,মাঝখানে বাধা হয়ে আছে ভারত-ভুটান সীমান্ত, মাঝখানে বাধা হয়ে আছে জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতিতে তাঁর ঙ্গালঙ না হওয়া। ইচ্ছাবাহাদুর লামার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এই জঙ্গল-পাহাড়ের মন-ভোলানো সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ভাবছিলাম যে এই সুন্দর প্রকৃতিকে মানুষই কীভাবে বীভৎস অসুন্দর করে তোলে রাষ্ট্রসীমানার কাঁটাতার দিয়ে, রাষ্ট্রসীমানার মধ্যে 'জাতীয় ভষা-ধর্ম-সংস্কৃতি'-র একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত বৈচিত্র্য-বিভিন্নতাকে খুনের অভিযানের মধ্য দিয়ে।

বাড়ির বাইরে উঠোনে ইচ্ছাবাহাদুর লামার পরের দুই প্রজন্ম কাজে বা অবসরে নিজেদের মতো করে নিয়ত। এই টোটোপাড়ায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা যে প্রজন্ম, তারা তামাঙ ভাষা বলতেও পারে না, বুঝতেও পারে না, নেপালি ভাষাই তাদের ভাষা হয়ে উঠেছে। মঙ্গর গাঁওয়ের রাস্তা পেরিয়ে পঞ্চায়েত গাঁওয়ের দিকে যেতে যেতে ইচ্ছাবাহাদুর বলছিলেন যে গৌরীগাঁওয়ে ঘরে-বাইরে তামাঙ ভাষাই চলত, ছোটরাও সে ভাষা নিজে থেকেই শিখে যেত, এখানে তো ঘরে-বাইরে তামাঙ ভাষা চলে না, বাচ্চারা শিখতেও পারে না। তাঁর পরিবারে এরপর আর তামাঙ ভাষায় কথা বলার মতো কেউ থাকবে না—এ তাঁর খরাপ লাগে না? এ প্রশ্নে ইচ্ছাবাহাদুর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি উদাস হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল, হয়ত সেই ফেলে আসা 'গৈরীগাঁও-১নং' গ্রামের দিকেই।

১০

ভুটানের মধ্যে থেকে যাওয়া 'লোথসাম্পা'-রা আজ কেমন আছেন? তাঁদের কারো ঘরে গিয়ে কি কথাবার্তা বলা যায়? মুশকিলের ব্যাপার। কারণ, ভুটানের সরকার বা গ্রাম -স্তরের কর্তৃপক্ষও সে 'অনুমতি' দেবে না। তাই কথা বলতে গেলে তাঁদের অনুমতি ছাড়াই, তাঁদের চোখ এড়িয়ে সে কাজ করতে হবে। এই 'বেআইনি' কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়েই আজ সকালে বেরিয়েছি টোটোপাড়া থেকে। টোটোপাড়া ও লঙ্কাপাড়া জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওড়ি নদীর পাশ দিয়ে উজানের দিকে চড়াইয়ে হেঁটে চলেছি। এই পথ গিয়ে যেখানে ভুটান বর্ডারে ধাক্কা খেয়েছে, সেখানে ভুটানের দিকে গড়ে উঠেছে এক পাথর খনি, এখানকার মানুষদের ভাষায় 'ভুটান মাইনিং'। ভুটান সরকারের পৃষ্ঠপোষণায় রাজপরিবার ঘনিষ্ঠ এক ঙ্গালঙ-এর তত্ত্বাবধানে চলছে এই খনি। পাহাড় থেকে পাথরের চাঙড় কেটে ছোট-বড় বিভিন্ন মাপে তা খন্ড খন্ড করে 'স্টোনচিপ' তৈরি করা হয়। যেখান থেকে পাথর কাটা হয় দূর থেকে সেই পাহাড়ের মাথার কাছের জায়গাটা দেখলে মনে হবে কোনো অলৌকিক দৈত্য যেন থাবা বসিয়ে পাহাড়ের মাথা খুবলে নিয়ে চলে গেছে। অলৌকিক দৈত্য নয়, এ কীর্তি মানুষের—মানুষের তৈরি 'আধুনিক' যন্ত্রের। মানুষের এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলও প্রকট হতে শুরু করেছে—হাওড়ির নদীখাতে ও নদীপাশের পাহাড়ের

গা বেয়ে বেশ কিছু ধ্বসের চিহ্ন চোখে পড়ে, টোটোদের কিছু কিছু চাষজমিও সে ধ্বসের তলায় চাপা পড়েছে। এই ধ্বসের ফলে চাষজমি ও নদী ধ্বংস হওয়ার বিপদ সম্পর্কে টোটোরা যে সচেতন তা তাঁদের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়। কিন্তু এইসব 'আধুনিক অবিমৃষ্যকারিতা' যারা করে তারা বেশ গুছিয়ে নামে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সরকারি স্তরে ভুটান সরকার ভারত সরকারের অনুমোদন নিয়ে রেখেছে আর আঞ্চলিক স্তরে খনি কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু টোটো যুবককে যেমন শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে 'অর্থোপার্জনের বন্দোবস্ত' করেছে, তেমনই টোটো সমাজের বেশ কয়েকজন মান্যগণ্য প্রধান ব্যক্তিকে বিনা পরিশ্রমেই ভালো 'মাসোহারা'-র বন্দোবস্ত করেছে।

ভোরবেলা। সূর্য উঠেছে কয়েক ঘন্টা হবে। টোটোপাড়া থেকে খনির শ্রমিকরা ছোট ছোট দলে খনির দিকে চলেছে। আমিও তাদের সঙ্গে চলেছি। আমার লক্ষ্য অবশ্য ভুটান সীমান্ত পেরিয়ে, খনি পেরিয়ে ভুটানের মধ্যের গ্রামে পৌঁছনো। ভুটান সীমান্ত পেরিয়ে ঠিক ওপারেই খনির দপ্তরের চাতালে এসে পৌঁছলাম। এ চাতাল থেকে নিচের দিকে তাকালে সবুজ-নীল-সাদা-খয়েরি রঙে ভরা মায়াঘন ছবি—টোটোপাড়া ও লঙ্কাপাড়ার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উচ্ছল হাওড়ির খাত আর সবের উপর সদ্যোজাত আলোর মায়া। উপর দিকে তাকালে পাহাড়ের মাথা আর তার নীচে কমলালেবু বাগান ও জঙ্গলের সঙ্গে মিলেমিশে ভুটানের গ্রামের টুকরো আভাসের সিল্যুট। কিন্তু সুন্দরের এ সভায় তালভঙ্গ করে এই চত্বরটাই ধুলোয় ভরা, নানা মাপের টুকরো পাথরের স্তুপ এদিক ওদিকে মাথা তুলেছে, কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ তুলে নড়াচড়া করছে মাঝারি ট্রাক ও পাথর-কাটা, পাথর-ভঙার যন্ত্র বসানো গাড়ি। শ্রমিকরা জাড়ো হয়েছে, দলে দলে তাদের গাড়িতে তুলে খনির মূল খাদানের দিকে চড়াই ভেঙে রওনা দেবে এসব ট্রাক ও গাড়ি।

এ চাতাল পেরিয়ে যাওয়ার আগেই কর্তাব্যক্তি গোছের এক তরুণ ভুটানি যুবক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমার পরিচয়, আমার উদ্দেশ্য। তাকে বললাম যে আমি এখানে টোটোপাড়ায় ঘুরতে এসেছি, এমনি ঘুরে দেখছি চারদিক। সে বেশ গম্ভীর কর্তৃত্বের সঙ্গে বলল যে এদিকটা ভুটান, এরপর আর আমার এগোনো ভুটানের আইনে নিষেধ। বুঝলাম যে এই খনি-কর্মচারী তরুণটিই এখন আমার সামনে ভুটান সরকারের প্রতিভূ। কিছু না বলে পাশে

একটা পাথরের উপর বসলাম। চড়াইপথে ভুটানের গ্রামগুলোর আভাসের উপর চোখ বোলাতে লাগলাম। কয়েকটা ট্রাক ও গাড়ি শ্রমিকবোঝাই হয়ে খনি খাদানের দিকে রওনা হয়ে গেছে। শেষ গাড়িটিও বুঝি চলে গেল। চড়াইপথে কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ঝর্ণা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে আবার খাদ বেয়ে নেমে গেছে। আমি সেই ভুটান সরকারের প্রতিভূকে বললাম আমি কি ওই ঝর্ণা অবধি গিয়ে একটু হাত-মুখ ধুয়ে আসতে পারি না? কিছুটা বিরক্ত হয়ে, কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে সে বলল যে যাও, কিন্তু আর বেশিদূর যাবে না, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

যাক, এ গাঁট পেরোনো গেল। আমি ধীরপায়ে চড়াই ভেঙে সেই ঝর্ণায় এলাম। অপূর্ব ঠাণ্ডা জল মুখে চোখে ছিটিয়ে নিলাম, হাত পা ধুয়ে নিলাম। হাঁটার ক্লান্তি যতটুকু ছিল নিমেষে উধাও। পিছন ফিরে দেখলাম সেই অবিমৃষ্যকারী খনি এখন দূরে বেশ ছোট ও গুরুত্বহীন দেখাচ্ছে। ওদিকে আর না ফিরে আরও চড়াইপথে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে রাস্তা থেকে বাঁদিকে ঢুকে গেছে একটা শাখা কমলালেবু বাগান ও গ্রামের মধ্যে। সেই পথে ঢুকলাম। খনির চাতাল এখন আর চোখেই পড়ছে না। রাস্তার বাঁদিকে পাহাড়ের ঢালু গায়ে কমলালেবু গাছের সারি। কিছুটা এগোতেই দেখলাম সেই ঢালু গা বেয়ে রাস্তার দিকে নেমে আসছে বছর তিরিশ বয়সী এক পুরুষ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লাম তার অপেক্ষায়। সে কাছে এলে বললাম যে কমলালেবুর বাগান থেকে কিছু কমলালেবু আমি কিনতে চাই, কার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কাকতালীয়ভাবে এই ব্যক্তিই আমার বাঁপাশের কমলালেবুর বাগানের মালিক, এ কথা জানিয়ে সে আমাকে তার বাগানে ঢুকতে বলল। কাকতালীয় যোগাযোগের আরও কিছু বাকি ছিল। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উঠে তার বাগানে ঘাস-পাথরের জমিতে পা ছড়িয়ে বসে জানতে পারলাম যে তার নাম বিমল ঘালে (প্রথম নামটা পরিবর্তিত করলাম, কোনোভাবে ওই ব্যক্তির দুর্ভোগের কারণ যাতে না হতে হয় সেই জন্য)। এই গ্রামটির নামও 'হাওড়ি' (নিচের হাওড়ি নদীর সমনামী) আর এ গ্রামের ৪০-৪৫ ঘর বাসিন্দা, সবাই ঘালে সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ না জেনেই আমি তামাঙদের গ্রামে এসে পৌঁছেছি, কারণ বাকসিন লামা, লাকপা লামার কাছ থেকে তামাঙদের যে আঠারোটি গোত্রের নাম জেনেছিলাম, ঘালে তাদের মধ্যে একটি।

আমি তিরিশখানা কমলালেবু নেব বললাম। বিমল ঘালে ঘুরেঘুরে গাছ থেকে পাকা কমলালেবু দেখে পাড়তে লাগল। তার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে টুকটাক কথা চলতে লাগল, তারপর কমলা পাড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাগানের ঘাসে বসে আরও খানিক্ষণ কথা হল।

ভুটানের দক্ষিণ পূর্ব কোণের এই হাওড়ি গ্রামে বিমলদের পরিবারের বাস তার দাদাজির (ঠাকুরদার) বাবার আমল থেকে। দাদাজির দাদাজি আরও উপরে ভুটানে ভিতরের দিকে কোনো গ্রামে থাকত। সেখান থেকে এসে দাদাজির বাবা এখানে বাস পত্তন করে। তখন পছন্দমতো ফাঁকা জমি বেছে নিয়ে বা জঙ্গল কেটে জমি বানিয়ে যে যেখানে খুশি বাস পত্তন করতে পারত, কারো অনুমতি নেওয়ার দরকার পড়ত না, দখলদারির নথিপত্র তৈরিরও কোনো ব্যাপার ছিল না। ১৯৫০-এর দশকে জমি রেজিস্ট্রি ব্যবস্থা চালু হয়, ইচ্ছেমতো বাসপত্তন বা চাষ জমি পত্তন বন্ধ হয়ে যায়। বিমলদের এখন ভিটেজমি ছাড়া কমলালেবু বাগান, সুপারি বাগানের কিছু জমি ও ভুট্টা চাষের অল্প জমি 'রেজিস্টার্ড' আছে।

১৯৯০ সাল থেকে শুরু করে বছর পাঁচ-ছয় চূড়ান্ত আতঙ্কে দিন কেটেছে। এখন সেই আতঙ্ক না থাকলেও ভয় ও অনিশ্চয়তার চোরাস্রোত রয়ে গেছে। কখন কী হয়ে যায় কে বলতে পারে! ওই সময়ে ১ লাখ লোথসাম্পা-দের ভুটান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে সে শুনেছে। তাদের গ্রাম থেকেও অনেককে চলে যেতে হয়েছে ঘর-ভিটে-জমি সব ছেড়ে। শুনেছে তাদের নেপালের শরণার্থী শিবিরে ঠাঁই হয়েছিল, কেউ আর ফিরে আসতে পারেনি। অনেকে মরে গেছে, অনেকে ভারতে নানা জেলে বন্দি আছে, ভুটানের জেলেও বন্দি আছে। নেপালে তাদের শরণার্থী শিবির কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে প্রায় জেলখানার আকার দেওয়া হয়েছিল বলে শুনেছে। এও শুনেছে যে কেউ কেউ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় আশ্রয় পেয়েছে—কিন্তু তারা কেমন আছে কী করছে জানে না।

তাদের গ্রামে তখন কী হয়েছিল? সে ঘোর দুর্দিনের কথা সব বলা সম্ভব নয়। ভুটান রাজার সেনা তাদের গ্রামে এসে হাজির হয়েছিল। অকথ্য হামলা শুরু করেছিল গ্রামের মানুষদের ওপর। ঘরে ঘরে হানা দিয়ে সোমত্ত পুরুষদের মারধোর করত, ধরে নিয়ে যেত। মা-বোনেদের নিয়ে ইচ্ছামতো নোংরামো

করত। কেবল ঘরে ঘরে হানার সময়েই নয়, ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে বা বনে কাঠ আনতে গিয়েও কত মেয়ে সেনাদের লালসার শিকার হয়েছে। বেছে বেছে মেয়েদের সেনার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেত 'কাজ' করে দেওয়ার জন্য। বিমলের তখন বারো-তের বছর বয়স। তার বাবা তার আগেই মারা গেছে। ঘরে মা আর তার ছোট ছোট ভাই বোনেরা। ঘরে কোনো সোমত্ত পুরুষ না থাকায় তাদের ঘরে সেনাদের হামলা কিছুটা কম হয়েছিল। সেনারা বলে যে গ্রামের অর্ধেক লোককে গ্রাম থেকে চলে যেতে হবে কারণ তারা নাকি ভুটানের লোক নয়, তারা নেপালের লোক। ভুটানের নাগরিক কাগজপত্র তাদের সাধ্যমত ছিল, কিন্তু সে সবের রেওয়াত করা হয়নি। গ্রাম থেকে উৎখাত করার আগে সেনারা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল, জোর করে দাঁত বার করিয়ে ছবি তুলে সে ছবি সে কাগজে সেঁটেছিল। শুনেছে যে সে কাগজে লেখা আছে যে স্বেচ্ছায় সানন্দে তারা চলে যাচ্ছে আর সেই ছবি নাকি তাদের সানন্দ হাসির ছবি। কোনো পরিবার গোটাটাই উৎখাত হয়েছে, কোনো পরিবার আবার ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরোটুকরো হয়ে গেছে।

কেন এমন হল? বিমল ঙ্গালঙদের বলতে শুনেছে যে নেপালির সংখ্যা বেড়ে গেলে ভুটানেরও সিকিমের মতো অবস্থা হবে, ঙ্গালঙদের রাজপাট আর থাকবে না, নেপালিরাই রাজ করবে বা ভারতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। (বিমলের বয়ান বোঝার সুবিধার জন্য কয়েকটা কথা এখানে উল্লেখ করা যাক। সিকিমের ভারতে অন্তর্ভুক্তি ঘটে ১৯৭৫ সালে, যার মধ্য দিয়ে সিকিমের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। সিকিমের শেষ রাজার সঙ্গে ভুটানের রাজার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। ভুটানের রাজার কাকা ছিলেন সিকিমের শেষ রাজা। ঙ্গালঙদের মতো সিকিমের আদি বাসিন্দারাও ভোট-মোঙ্গল উৎসের। নেপাল থেকে আসা জনজাতিদের তুলনায় এই আদি বাসিন্দাদের সংখ্যালঘু হয়ে পড়াই তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারানোর কারণ বলে ভুটানের ঙ্গালঙরা মনে করে।) এছাড়া ছিল লোথসাম্পাদের প্রতি ঙ্গালঙদের ঈর্ষা। একজন লোথসাম্পা শিক্ষাদীক্ষায় খুব উন্নতি করে, আমেরিকা থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে ফিরে আসে। ভুটানের রাজা তাকে সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা দেখভালের কাজে নিয়োগ করেছিল। সেই পদে কাজ করতে শুরু করে সে বহু ঙ্গালঙ মন্ত্রী ও অমাত্যদের দুর্নীতি, আর্থিক নয়ছয়, স্বজনপোষণ

ধরে ফেলে তার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল। লোথসাম্পাদের উপর অন্যায় বঞ্চনা চাপানোর বিরুদ্ধে বলেছিল। এতেই ঙালঙ ক্ষমতাধারীরা তাকে হঠানোর জন্য তার উপর নানা মিথ্যা অপবাদ চাপায়। লোথসাম্পাদের খেপিয়ে সে রাজদ্রোহ ঘটাতে চাইছে বলে প্রচার করে। এরপরই লোথসাম্পাদের গ্রামে গ্রামে রাজা সেনা পাঠায় দেশ থেকে তাদের বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে।

লোথসাম্পাদের গ্রামে গ্রামে হামলা চালানোর জন্য রাজা বিশেষভাবে সেনাকে তৈরি করেছিল। স্যারশপ জনজাতির ১০,০০০-এরও বেশি জনকে সেনায় নেওয়া হয়েছিল এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে লোথসাম্পাদের দমনের পর তাদের জনজাতিকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের তা দেওয়া হয়নি। ফলে ভুটানের পুবে ও দক্ষিণে ১৯৯৪ সালে স্যারশপরা সরকারের বিরুদ্ধে রাজার প্রতিশ্রুতিপালনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। সেই বিক্ষোভের উপরও পুলিশ গুলি চালিয়ে আটজনকে মেরে ফেলেছিল।

১৯৯৬-এর পর থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। কিন্তু লোথসাম্পাদের অনেক সমস্যা মাথায় নিয়ে থাকতে হয়। সরকারি নাগরিক পরিচয়ের কাগজ ড্রুকপা (ঙালঙ ও স্যারশপ)-দের জন্য একরকম, লোথসাম্পাদের জন্য আরেক রকম। এই কাগজের তফাৎই সরকারের কাছ থেকে পাওয়া পরিষেবা, নাগরিক অধিকার ও সুবিধার ক্ষেত্রে বহু পার্থক্য ঘটিয়ে দেয়। বিমল তার ছোটবেলায় তাদিং-এর স্কুলে নেপালি ভাষা পড়েছে, কিন্তু ১৯৯০-এর পর থেকে নেপালি ভাষা পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে জঙ্‌খা ও ইংরেজি পড়তে হয়। লোথসাম্পাদের বাচ্চাদের এর ফলে খুব অসুবিধা হয়। এছাড়াও স্কুলে লোথসাম্পাদের বাচ্চাদের নানা বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়। তার বাচ্চারা এখান থেকে দেড় ঘন্টা হেঁটে তাদিং-এ স্কুলে যায়।

বিমলদের নিজেদের ভাষা অর্থাৎ ঘালেদের মাতৃভাষা নেপালির থেকে আলাদা তো বটেই। এ ভাষা তাদের মধ্যে মুখেই চলে, এর কোনো লিখিত রূপ সে দেখেনি। সাধারণভাবে বাজারে হাটে, এমনকি ঘরে পরিবারের মধ্যেও নেপালি ভাষা ব্যবহারেরই চল বেশি, তবে মাতৃভাষাও লোকে জানে এবং পরিবারে ঘরের মধ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারও করে। এই বিশেষ ক্ষেত্র হল গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্র। ঘরে যখন অন্য জাতির কোনো অতিথি আসে

আর তার সামনেই তার থেকে গোপন করে কিছু বলতে হয় তখন তারা এই মাতৃভাষা ব্যবহার করে। তবে হ্যাঁ, তার বাবা-দাদাজিরা যেভাবে এভাষা ব্যবহার করতে পারত, অতটা তারা পারে না, অনেক কিছু ভুলে গেছে।

বিমলের নেপালি, হিন্দি মিশিয়ে বলে যাওয়া কথাগুলো এইরকম। একদম শুরুতে সে কথা বলতে ইতস্তত করছিল। বলতে গিয়েও আটকে যাচ্ছিল। তারপর কোথায় যেন নিজে থেকেই তার মধ্যে কোন বাধা কেটে গেল, স্মৃতি-উদ্বেগ-চিন্তা কথার প্রবাহ বইতে লাগল অনর্গল। ইতিমধ্যে সে কমলালেবু গুছিয়ে দিয়েছে একটা থলিতে। ৩০টার জন্য যা দাম চেয়েছিল সেই দামে সে নিজে থেকেই আরও ১০টা বেশি দিয়ে দিল। তার বাগান থেকে রাস্তায় নামার পথে পা বাড়াতে সেও কাঁধে একটা থলি ঝুলিয়ে আমার সঙ্গ নিল। আজ মঙ্গলবার—টোটোপাড়ায় সাপ্তাহিক হাট বসার দিন। সে ভুটান-ভারত সীমানা পেরিয়ে বাজার করতে যাবে টোটোপাড়ার হাটে। আমিও তো টোটোপাড়াতেই ফিরব। সে তাই আমার সঙ্গী হল।

বিমলের কমলা বাগান থেকে উৎরাই পথে হাঁটতে হাঁটতে আমি আর বিমল ঝর্ণা পেরিয়ে ভুটান সীমানার সেই ‘মাইনিং কোম্পানি’-র চাতালে এসে পৌঁছলাম। সেই ‘ভুটান সরকারের প্রতিভূ’ তখনও সেখানে উপস্থিত। সে বিমলকে আলাদা করে ডেকে কী সব কথা বলল। আমার কাঁধের কমলালেবুর ঝোলাটার দিকেও তাকিয়ে দেখল। তারপর যেন সন্তুষ্ট হয়ে সীমানা পেরোনোর ‘অনুমতি’ দিল। বিমল আর আমি সীমানা পেরিয়ে টোটোপাড়ায় ঢুকলাম, হাওড়ির পাশের পথ দিয়ে নামতে লাগলাম।

১১

আজ ভাইফোঁটার দিন। লাকপা লামার কাছে শুনেছিলাম যে তামাঙদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কোথাও কোথাও তা গুরুত্বে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ককেও ছাড়িয়ে যায়। ভাইফোঁটার দিন তামাঙ দিদি-বোনেরা তাদের ভাইদের ফোঁটা দেয়। আমি টোটোপাড়াতে তো সত্যজিৎ টোটোর বাড়িতেই থাকছি। শুনলাম যে আজ সত্যজিৎ টোটো তার দুই তামাঙ দিদির কাছে ফোঁটা নিতে যাবে। সত্যজিতের বাবার সঙ্গে এই তামাঙ দিদিদের বাবার

বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রেই সত্যজিৎ ও তার ভাই এই দুই তামাঙ দিদির ভাই। বছর বছর ফোঁটা নিতে যেতে হবেই। সত্যজিৎকে আমি বললাম যে আমিও ওর সঙ্গে যাব তামাঙদের ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানের রীতিনীতি দেখার জন্য। সত্যজিৎ এককথায় রাজি।

মঞ্জু তামাঙ ও রাধা তামাঙ সত্যজিৎ টোটোর দুই তামাঙ দিদি। হাওড়ি নদীর পারে ভুটান সীমান্তের ওদিকে যেখানে 'ভুটান মাইনিং', সেখানেই সীমান্তের এদিকে পাহাড়ের ওপরে পাশাপাশি দুটো বাড়ি দুজনের। সন্তান ও স্বামী নিয়ে পরিবার। তাঁদের বাবাও তাঁদের সঙ্গেই থাকেন। সত্যজিৎ ও আমি গিয়ে পৌঁছলাম শেষ বিকেলে।

প্রথমে বড় দিদি মঞ্জু তামাঙ-এর বাড়ি গিয়ে উঠলাম। বাড়ির সামনে চৌকিতে বসে ছিলেন মঞ্জু তামাঙ এর বাবা। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। বেশ কিছুদিন আগে এক দুর্ঘটনায় একটা পা হারিয়েছেন। তাঁর পাশে একটা 'ক্রাচ'—তাঁর সচলতার হাতিয়ার। বেশ আদর করেই সত্যজিৎকে পাশে বসালেন। সত্যজিতের বন্ধু হিসেবে আমার পরিচয় পাওয়ার পর আমারও আদরের কমতি হল না। বেশ খোলামনের হাসিখুশি মানুষ। কথা বলতে ভালোবাসেন। নেপালি ভাষায় নানা কথা শুরু হল। তাঁদের আদি বাড়ি পুব নেপালের এক তামাঙ গাঁয়ে। কাজ খুঁজতে তিনি আর তার ভাই বছর পঞ্চাশ আগে এই টোটোপাড়ায় আসেন নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে। তাঁর দুই মেয়ে বিয়ে করে এখানেই বাসা বেঁধেছে। এখানে তিনি থাকেন বটে, তবে বছরে অন্তত একবার তিনি নেপালে তাঁদের আদি গাঁয়ে যান। সেখানে তাঁদের আত্মীয়দের ঘরবাড়ি-ভিটে এখনও আছে। সেখানেও গিয়ে থাকেন। তামাঙ ভাষা তো তিনি জানেন ও বলতে পারেন বটেই—সে তো তাঁর নিজের ভাষা। কিন্তু আজকাল তামাঙ ভাষায় কথা বলার লোক কমে গেছে। তাঁর মেয়ে জামাইরা তামাঙ ভাষায় কথা বলতে পারে না, নাতনিরা তো জানেই না। নেপালে যখন যান, বয়স্ক লোকদের সঙ্গে তামাঙ ভাষায় কথা বলার আনন্দ হয় অপরিসীম। কিন্তু সেখানেও তরুণরা ক্রমশ এভাষা হারিয়ে ফেলে নেপালিকেই একমাত্র ভাষা করে ফেলছে।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। বৃদ্ধের রাতে শুতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। বারান্দায় একটা মশারি টাঙিয়ে তিনি শুতে গেলেন। এবার মঞ্জু তামাঙ ঘরের

মধ্যে 'ভাইটীকা'-র (ভাইফোঁটাকে তামাঙরা ভাইটীকাই বলে) আয়োজন করেছেন। সত্যজিৎ 'ভাইটীকা' নেবে, আমি সেই আচার-অনুষ্ঠান দেখব, এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমায় অবাক করে মঞ্জু তামাঙ বললেন যে তিনি যদি আমায় ভাইটীকা দেন, আমি কি তা গ্রহণ করব? আমার কাছে এ এক অভাবিত পাওনা। তিনি যে এভাবে আমাকে ভাই করে নেবেন, এ তো আমার কল্পনার সীমার ওপারের এক অমূল্য প্রাপ্তি—আমি তা গ্রহণ করব না! ঘরে পাশাপাশি দুটো আসনে আমি আর সত্যজিৎ বসলাম। মঞ্জু তামাঙ আমাদের সামনে দুটো থালা রাখলেন। থালায় ছোট ছোট শালপাতার বাটিতে নানা খাবার—গোল আংটির আকারের মিষ্টি ভাজা রুটি, মাংস, ডিমকষা, ছোলার তরকারি। থালার পাশে রাখলেন একটা বড় গ্লাস ভর্তি মদ। তারপর হলুদ গাঁদা ফুলে তৈরি একটা মালা গালায় পরিয়ে দিলেন। বহুরঙা গাঁদা ফুলের কুঁচি দু-হাতে নিয়ে মাথার উপরে দিয়ে সারাদেহে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর একটা ছোট্ট রেকাবিতে লাল, নীল, হলুদ ও সবুজ আবির নিয়ে কপালে এঁকে দিলেন বহুবর্ণ 'টীকা'। একটা কাপড়ের রুমাল দিলেন উপহার স্বরূপ। ফিরতি উপহার তো কিছু নিয়ে যাই নি, তাই কিছু টাকাই তাঁর হাতে তুলে দিলাম, পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। একইভাবে সত্যজিতেরও 'ভাই টীকা' নেওয়া হল। পাশের বাড়ি যাওয়ার পালা। সেখানে রাধা তামাঙও একইভাবে ভাইটীকা দিলেন আমাদের দুজনকেই। দুই দিদি যা খেতে দিয়েছিলেন, তার অনেকটাই খেতে পারিনি, পেটে আর ধরছিল না। তাঁরা হেসে বললেন যে অসুবিধা নেই পরদিন সকালে আমাদের বাড়িতে অর্থাৎ সত্যজিতের বাড়িতে বাকি সব পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ, এই একদিনের টীকাদানেই শেষ নয়। তামাঙ দিদি বা বোনেরা পরদিন সকালে ভাই বা দাদার বাড়িতে নিজেরা গিয়ে উপহার সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে আসে। এটাই রীতি। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। পাহাড়ি পথে আধঘন্টা মতো হেঁটে আবার ফিরতে হবে সত্যজিতের বাড়িতে। আমরা তাই বেরিয়ে পড়লাম।

হাওড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। সত্যজিৎ আর আমি। চাঁদের আলোয় আবছা চারিদিক। রক্তে মদের নেশাও খেলা করছে। হাওড়ির স্রোতের শব্দ, ঝিঁঝির শব্দ, জঙ্গলের আরও নানা অস্ফুট শব্দ যেন আত্মমগ্নতার তান তৈরি করেছে। ভাবছিলাম যে তামাঙ জনজাতিকে কত না যন্ত্রণা, সংকট, অনর্থ ও

বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে যুগ থেকে যুগ দেশ থেকে দেশে ক্ষমতা, হিংসা, জাতিবিদ্বেষের আবর্তনচক্রে। অথচ এই তামাঙ জনজাতির একটি ঘরের দুজন মহিলার কাছেই অবাক পাঠ আমার হল যে কত সহজ সাবলীলতায় অচেনা জনকে আপন ভালোবাসার জন করে নেওয়া যায়। অপরকে আপন করার, অপরকে ভালোবাসতে চাওয়ার এই প্রবৃত্তিই কি তাহলে মানুষের সহজাত স্বাভাবিক? হয়ত হ্যাঁ, তা ভাবতেই ইচ্ছা করে যে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মে ২০১৯
'মাতৃভাষা' পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০১৯

তাপা গ্রামের ডয়াদের কথা

বিপ্লব নায়ক

তাপা গ্রামে

সা-তি এক উচ্ছল পাহাড়ি নদী—বড় বড় পাহাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে। তার উপর দিয়ে একটা লোহার তারের ঝুলন্ত সেতু, যার বুকে পা ফেললেই তা বেশ ডগোমগোভাবে দুলে ওঠে। সেতুর একদিকে ডেনচু গ্রাম, অন্যদিকে একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ সবুজ পাহাড়ের গায়ে বেড় দিয়ে বেশ খাড়াই ভাবে উঠে গেছে। সে পথে পাহাড়কে বেড় দিয়ে ঘুরে কিছুটা এগোলে জঙ্গলে ক্ষেতে মেলামেশা প্রান্তর, তারপর ডয়া জনজাতির মানুষদের গ্রাম। গ্রামের নাম তাপা।

প্রথানুগ বাড়িগুলো কাঠের খুঁটির উপর তৈরি মাচানের উপর একাংশ বারান্দার জন্য ছেড়ে বাকি অংশে মূলত কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি। হালের কিছু বাড়ি পাথরের ভিত্তির উপর দেওয়াল কাঠ বা পাথর দিয়ে, আবার কিছু দেওয়াল বাঁশের কঞ্চির ঘন বুননের উপর গাঁথনি চড়িয়ে তৈরি। স্মরণাতীতকাল থেকে এই ভূমি ডয়াদের বাসভূমি।

প্রায় তিনশো বছর আগে এই সা-তি নদীর নাম সা-তি-ই ছিল, আর এর দুইপারে ছিল এই অঞ্চলের দুই আদি জনজাতি ডয়া ও টোটোদের বাস। এই এখনকার তাপা গ্রাম যেদিকে, সেদিকে ছিল ডয়াদের আদি বাসস্থান, যার নাম ছিল ‘শেষাং’। আর আজ যেখানে ডেনচু, সেই দিকে ছিল টোটোদের আদি বাসস্থান, যার নাম ছিল ‘জেদে’, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুখে মুখে বাহিত হয়ে

এই কথা আজও শোনা যায় টোটোদের বয়স্কজনদের মুখে। আরও শোনা যায় টুকরো টুকরো নানা ইতিহাস। টোটো ও ডয়াদের মধ্যে একসময় বিরোধ-বিবাদ বড় সংঘাতের চেহারা নেয়। এই এলাকারই আরেক নদী 'ডয়ামারা নদী' নাম নিয়ে আজও সেই সংঘাতের স্মৃতি বহন করছে। এই নদীর ধারেই এক টোটো তাদের প্রথাগত বাঁশের অস্ত্র দিয়ে এক ডয়াকে মেরে ফেলেছিল, তারপর সেই অস্ত্র এই নদীর জলেই ধুয়েছিল। এই নদীর জল এখনও টোটোদের পান করা নিষিদ্ধ। এই সমস্ত সংঘাতের ফলেই হয়তো বা টোটোরা ক্রমশ এই অঞ্চল থেকে সরে যেতে থাকে—সরে যেতে যেতে জিতি নদী পেরিয়ে ওপারের টোটো পড়ায় গিয়ে বাসা বাঁধে—যেখানে এখনও তাদের বাস।

তাপাগ্রামে ২০১৭ সালের এই শরৎ-উপান্তে আমি আর সুরজিৎ এসে হাজির হয়েছি সত্যজিৎ টোটোকে সঙ্গে নিয়ে। টোটোপাড়া থেকে হাঁটা পথে জিতি, ডাংতি, ডয়ামারা, সা-তি নদী পেরিয়ে এই তাপা গ্রামে বছর খানেকের ব্যবধানে আগেও দুইবার এসেছি, কিন্তু ডয়া ভাষা না-জানার জন্য ও ডয়া মানুষদের সঙ্গে দূরত্ব-অপরিচয়ের বাধা ঘোচাতে না পারার জন্য তাদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা আদানপ্রদান করতে পারি নি। এবার সত্যজিৎ টোটো বড় ভরসা—ওকে ডয়ারা চেনে আর ও কিছু কিছু ডয়া শব্দ জানে, ওর টোটো ও নেপালী ভাষার কথাবার্তাও ডয়ারা বুঝতে পারবে, ফলে এবার ডয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা আদানপ্রদান করা যাবে বলে আশা।

জঙ্গল-ক্ষেত মেশা প্রান্তরের ওপর দিয়ে প্রথম যে বাড়িটায় এসে আমরা উঠলাম, তা হাল আমলে তৈরি। ঘরের সামনের বারান্দায় এক কুড়ি একুশ বছরের ডয়া যুবতী বসে দুই বছরের এক শিশু কোলে নিয়ে, তার পাশে তিন-চার বছরের আর এক শিশু। সত্যজিৎ তার সঙ্গে দু-এক কথা শুরু করতেই এসে হাজির হল তার বর—একুশ বাইশই বয়স হবে বোধ হয়, বেশ গোলগাল হাসি-হাসি মুখ। তার সঙ্গে আমরা ওই বারান্দাতে বসেই কথা শুরু করলাম সত্যজিতের মধ্যস্থতায়।

তার নাম জানা গেল থিমপা ডয়া। বারান্দায় বসা যুবতীটির সাথে তার বছর পাঁচেক হল বিয়ে হয়েছে। তার কাছ থেকে জানা গেল যে ডয়াদের সমাজে বিয়ের পর ছেলেকে গিয়ে মেয়ের বাড়িতে থাকতে হয় ন্যূনতম তিন বছর। এই

তিন বছর কাটলে পর মেয়ের বাড়ি থেকে মেয়ে-জামাইকে জমি-জায়গা দেওয়া হয়। সেই জমি জায়গা নিয়ে বিবাহিত দম্পতি মেয়ের বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে পৃথক বাড়ি তৈরি করে পৃথক পরিবার হিসেবে থাকতে পারে, আবার মেয়ের পুরানো বাড়িতেও থেকে যেতে পারে। থিমপা আর তার বউ সদ্যই বউয়ের পুরানো বাড়ির থেকে আলাদা সংসার শুরু করেছে এই নতুন বাড়ি তৈরি করে সেখানে উঠে এসে।

থিমপা ও তার বউ তাদের ঘরটা বেশ পাকাপোক্ত করে বানিয়েছে, কাঠের কাজ থিমপা নিজে হাতেই করছে। বারান্দার কাছে কাঠ ছ্যাঁচার যন্ত্র পড়ে আছে। একটা কাঠের টুকরোয় কিছু খোদাই করা ফুল ফুটে আছে। তবে এই সবই কিছুটা হাল আমলের ব্যাপার। প্রথাগতভাবে ডায়ারা তাদের ঘর এত পাকাপোক্ত করে গড়ত না, কারণ তাদের ঘরের মধ্যে একটা অস্থায়ী ব্যাপার ছিল, যা বোঝা যায় তাদের মৃতদেহ সৎকারের প্রথাগত উপায় থেকে। কোনো ডয়া পরিবারে কেউ মরলে তার মৃতদেহ ঘরের পাশেই মাটির উপর বসানো অবস্থায় আলগা ভাবে পাথরের চাঁই দিয়ে চারদিক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো, তারপর পুরানো ঘরটি খুলে কিছুটা দূরে নতুন ঘর করে বাকি পুরো পরিবার উঠে যেত। নতুন ঘর এমন জায়গায় করা হতো যাতে মৃতদেহের পচনের গন্ধ বাতাসে চড়ে সেই ঘরে পোঁছতে পারে—কারণ সেই গন্ধ নেওয়া ডয়াদের পক্ষে আবশ্যিক। ফলে পরিবারে কোনো মৃত্যু ঘটলেই ঘর বদল হয়ে যায়। এই রীতি এখনও পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায়নি।

বাড়িঘর অবশ্য অন্য নানাভাবেও ধ্বংস হতে পারে। এই যেমন থিমপা বলল যে তার দাদার দুটো ঘর আগুন লেগে পুড়ে গেছে কয়েকদিন আগে। ভুটান সরকার এখন ডয়াদের সব ঘরবাড়ির বীমা করে দিয়েছে, ফলে দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঘরবাড়ি ভাঙলে ডয়ারা এখন কিছু ক্ষতিপূরণ পায়। থিমপার দাদাই যেমন ‘গেয়ক’ থেকে ১০ হাজার টাকা পেয়েছে, (‘গেয়ক’ একটি জংখা ভাষার শব্দ, যার কাছাকাছি অর্থ হতে পারে বি ডিও অফিস) পুলিস এসে তদন্ত করে গেলে সরকার থেকে আরও টাকা পাবে। শীত জাঁকিয়ে পড়ার আগে নতুন বাড়ি পাকাপোক্ত করে নিতে হবে—দাদার এই ভাবনা থিমপারও মাথায় আছে।

শীত পড়তে আর বেশি দেরি নেই। ডয়াদের হিসেবে ঋতুচক্র তিনটে ঋতু নিয়ে গঠিত—সেক্কা (অর্থাৎ শীতকাল), জা (অর্থাৎ গ্রীষ্ম) এবং সোকা (অর্থাৎ বর্ষাকাল)। এই ব্যাপারে টোটোদের সঙ্গে ডয়াদের মিল লক্ষ্যনীয়, কারণ, টোটোদের হিসেবেও ঋতু তিনটি—সেগু (অর্থাৎ শীতকাল), সকোং (অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল) এবং ইয়েচপং (অর্থাৎ বর্ষাকাল)।

একবছরকালকে ডায়ারা ১২টা মাসে ভাগ করে, থিমপার কাছ থেকে ডয়াভাষায় সেই মাসগুলোর নাম জানা গেল এইরকম—১। তাংবু, ২। ইপু, ৩। সুম্‌পু, ৪। সিবু ৫। নাবু, ৬। টুবু, ৭। দিম্‌পু, ৮। জিবু, ৯।গুবু, ১০। চুবু, ১১। চুচিপ, ১২। চুনিক। থিমপা বলল যে ডয়া হিসেবে প্রতিটা মাসেই দিনের সংখ্যা ৩০। তাহলে কি ডয়া হিসেবে ৩৬০ দিনে এক বছর, ৩৬৫ দিনে নয়? তেমনটাই মনে হল।

বারান্দায় যে চেয়ারে থিমপার বউ বসে ছিল, তার পাশে একটি কাঠের চৌকির উপর চার-পাঁচটা লতার পাতা-ছাড়ানো ডাল দেখছিলাম। ওগুলো কী? জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে ওগুলো যে লতার ডাল তার নাম ডয়া ভাষায় 'ডুকরেন'—আশপাশের জঙ্গল থেকেই তা সংগ্রহ করে আনা। বহু প্রজন্ম ধরে ডয়াদের মধ্যে প্রচলিত এক মহৌষধ এটি। ডয়াদের, বিশেষ করে বাচ্চাদের, নিমোনিয়া রোগে প্রায়ই আক্রান্ত হতে হয়, এই 'ডুকরেন' লতার ডাল চুষে বা চিবিয়ে খাওয়াই ডয়াদের কাছে নিমোনিয়ার প্রতিষেধক ও ঔষধ।

হাসপাতালকে ডয়ারা বলে 'বেচু'। 'বেচু' অবশ্য কোনো ডয়াভাষার শব্দ নয়, এটা জংখা ভাষার শব্দ। বোঝা যায় যে 'হাসপাতাল' বস্তুটি ডয়াদের সমাজ-সভ্যতায় 'বাইরে থেকে আসা' বস্তু বলে তা নির্দেশক শব্দটিও ডয়াদের কথনে এক বাইরের ভাষার শব্দ থেকে গেছে। তাপা গ্রাম থেকে সবথেকে কাছের 'বেচু' প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে পানবাড়িতে। ডয়াদের মধ্যে শেষ দুই প্রজন্ম 'বেচুর'-র চিকিৎসার নাগালে এসেছে কিছুটা পরিমাণে।

শেষ দুই প্রজন্ম আরও একটি বহিরাগত ব্যবস্থার নাগালে আসছে ক্রমাগত আরও বেশি বেশি করে—সেই ব্যবস্থা হল স্কুল-ব্যবস্থা। ভুটান সরকারের ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাপা গ্রামের কাছে তাদিং-এ। এই স্কুলে শিক্ষা অবৈতনিক, পড়ানো হয় ইংরেজি ও জংখা ভাষা। ডয়ারা তাদের মাতৃভাষা ডয়া ছাড়াও আশপাশে নেপালিদের বসতি হওয়ার পর তাদের সঙ্গে

আদানপ্রদানের কারণে বেশিরভাগই নেপালি ভাষাও রপ্ত করে ফেলেছে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় ডয়া ভাষার কোনো স্বীকৃতি নেই। স্কুলশিক্ষার প্রাথমিক স্তরের শেষ পরীক্ষায় জংখা ভাষার উপর বেশি জোর দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। জংখা ভাষার পরীক্ষায় ভালো করতে পারলে ছাত্র-ছাত্রীদের পরবর্তী স্তরের স্কুলে শহরে থেকে পড়ার ব্যবস্থা করে সরকার, প্রশাসনিক স্তরে সরকারি পদ বা চাকরির সুযোগও খুলে যায়। ডয়াদের শেষ দুই প্রজন্মের বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী বিভিন্ন স্তর অবধি প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছে। জংখা এবং ইংরেজি ভাষা বেশ কিছুটা রপ্ত করার ফলে সরকার-প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডয়া জনজাতির মানুষদের হয়ে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা তারা ক্রমশ নিচ্ছে, গেয়ক বা পুলিশ থানায় গিয়ে কথাবার্তা চালানো, আবেদন-দরখাস্ত করায় আগের যে কোনো প্রজন্মের ডয়াদের থেকে তারা অনেক স্বচ্ছন্দ, ফলে তাদের মাধ্যমে সরকার-প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব ডয়া সমাজের উপর ক্রমশ বাড়ছে।

ভুটান সরকারের স্কুলে থিমপা পড়েনি, সেখানে কয়েক বছর অন্তত পড়েছে এমন চার জনের সঙ্গে দেখা হল, তাদের বয়স পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে, সবার কাছেই তাদের নিজেদের মাতৃভাষা বিবর্জিত শিক্ষার অঙ্গনকে বেশ খটোমটো ও কঠিন লেগেছে। এই খটোমটো কঠিন শিক্ষা কষ্ট করে অর্জন করতে পারলে সরকারি দাক্ষিণ্য লাভ করা যাবে এমন একটা বোধ তাদের মধ্যে আছে, কিন্তু এই শিক্ষা তাদের মধ্যে জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার নতুন কোনো উত্তেজনা তৈরি করতে পেরেছে বলে মনে হল না।

অধুনার সরকারি-প্রশাসনিক কাঠামোর পাশাপাশি ডয়াদের নিজস্ব কৌম-ভিত্তিক সমাজ-প্রশাসনিক কাঠমোর প্রথাগত ব্যবস্থা এখনও টিকে আছে, এই দুইয়ের মধ্যে কিছু যোগাযোগও তৈরি হয়েছে। যেমন, থিমপার কাছ থেকে কথায় কথায় জানা গেল যে, ডয়াদের নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধ/কলহ উপস্থিত হলে প্রথমে গ্রামের মধ্যে সমঝদার/বয়স্কদের সভায় উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে আলাপ-আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়, সমাধানের এই প্রথাগত চেষ্টা ব্যর্থ হলে তখন গোষ্ঠীর বিচারে যে অপরাধী তাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিসও নাকি এক সপ্তাহ

সেই অপরাধীকে বোঝানোর মাধ্যমে সংশোধন করার চেষ্টা করে, তা ব্যর্থ হলে তবে কোর্টে বিচারের জন্য পাঠায়।

ডয়াদের ধর্মবিশ্বাস পাহাড়-নদী-গাছ-পাথরকে মানুষের কল্যাণ/অকল্যাণ ঘটানো নিজস্ব নিয়মে চলা প্রাণময় অস্তিত্ব রূপে গণ্য করার সর্বপ্রাণবাদের আধারে বিকশিত। টোটোদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার মিল প্রচুর। অবশ্য টোটোরা যেমন প্রতি বছরে নির্দিষ্ট তিন-চার দিন সবাই একত্র হয় তাদের গোষ্ঠীগত পুজো-ঘরে একত্রে উপাসনার জন্য, তেমন কোনো প্রথা ডয়াদের মধ্যে নেই, গ্রামে কোনো গোষ্ঠীগত পুজো-ঘরও নেই। থিমপা বলল যে গ্রামের এক একটা ঘরে এক এক দিন পুজো হয়। যেদিন যে ঘরে পুজো হয়, সেই দিন সেই ঘরে গ্রামের আরও অনেকে জড়ো হয়ে ডয়া ভাষায় প্রথাগত নাচ-গান করা হয়।

থিমপাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাপা গ্রামের আরও কিছু বাড়ি ঘুরে ক্ষেত গাছ-গাছালি ফুলগাছ সুপুরি গাছের মধ্য দিয়ে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে একটা বাড়িতে চোখে পড়ল যে একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা কোমর সমান লম্বা ফাঁপা বাঁশের নলাকার পাত্রের মধ্যে মন্থনদণ্ড দিয়ে অনবরত আঘাত করতে করতে কিছু একটা তৈরি করছেন। কাছে এসে দেখা গেল যে এভাবে তিনি গরুর দুধ থেকে মাখন তৈরি করছেন। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন উঠোনে একটা অর্ধসমাপ্ত ঘরের সামনে। ঘরটি নতুন ধারায় পাথরের শক্ত ভিতের উপর তৈরি হচ্ছে। চারপাশের দেওয়ালের বাঁশের কঞ্চির বুনন তৈরি হয়ে গেছে, সেই বুননের উপর পাথর-মাটির গাঁথনি এখনও বাকি। দেওয়ালের মাথায় কাঠের চালও প্রস্তুত হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে কাঠ ও ঘর তৈরির নানা সামগ্রীর সঙ্গে গৃহস্থালি কিছু সামগ্রীও দেখা যাচ্ছে। বাঁশের কঞ্চির বুননের ফাঁক দিয়ে চারদিক থেকে ঢোকা সূর্যের আলো আলোছায়ার মায়াবী আঁচল পেতে রেখেছে ঘরের অভ্যন্তরে, সেই ঘরের কোণাকুনি অপরদিকে উঠোনের অন্য প্রান্তে পুরোনো প্রথার ডয়াদের ঘর—কাঠের স্তম্ভের উপর মাটি থেকে কিছুটা উপরে তৈরি মাচানের উপর বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি ঘর ও বারান্দা। মন্থনরত মহিলার কাছে গিয়ে আমরা দাঁড়ানোর পর সত্যজিতের সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা চলতে চলতেই তাঁর তিন মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, বড় মেয়ের নাম জানা গেল পুপ ওম ডয়া, তার বিয়ে হয়ে গেছে, তার বোন দুজন এখনও অবিবাহিত, পুপ

ওম ডয়ার বয়স তেইশ-চবিবশ হবে। সে বা তার বোনরা স্কুলে পড়েনি। তার দুই সন্তান—একজন দশ বছরের, সে স্কুলে যেতে শুরু করেছে, চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে, অন্যজন সবে চার বছরের, স্কুলে ভর্তি হবে, এখনও হয়নি।

তারা সবাই মিলে আমাদের বেশ সাদরে গ্রহণ করল। গাছের গুঁড়িতে খাঁজ-কটা সিঁড়িতে পা দিয়ে তাদের প্রথাগত কাঠের ঘরের সামনের বাঁশের বারান্দায় উঠে ছায়া দেখে আমরা বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। পুপ ওম ডয়া ও তার বোনও বসল, সহজ স্বাভাবিক ভাবেই সত্যজিৎ নেপালি টোটো ডয়া ভাষা মিলিয়ে কথোপকথন শুরু করে দিল। ভাষা-সেতু তৈরি করে আমাদেরও আলাপচারিতার অংশ করে নিল। বারান্দার পাশেই বাঁধা ছিল একটা গরু। পুপ-রা গরু, ছাগল, শুকর পালন করে, আর চাষ করে কাউন-এর। প্রায় সব ডয়ারাই এমনটা করে। দুটো ছোট বাটি করে কাউনের বীজ আমাদের এনে দেখাল। একটা বাটিতে খোসা-না-ছাড়ানো কাউন বীজ, কালচে-সবুজ রঙের, প্রায় গোলমরিচের মতো দেখতে। আর একটা বাটিতে খোসা ছাড়ানো কাউন বীজ, সোনা রঙের। খোসা ছাড়ানোর পর কাউন বীজকে ভেঙে গুঁড়ো করা হয়, তারপর তা জলে সিদ্ধ করলে গলা ভাতের মতো হয়ে যায়—তাই-ই ডয়াদের প্রধান খাদ্য। সেই কাউন-ভাত পচিয়ে ওরা একধরনের সুরা তৈরি করে—তাকে ওরা বলে ‘ইউ’। এই ‘ইউ’ কথাটাতেও টোটোদের সঙ্গে ডয়াদের ভাষায় ও অচারে মিল ফুটে ওঠে। টোটোরাও কাউন বা ভুট্টা বা চাল থেকে একই পদ্ধতিতে তৈরি সুরাকে ‘ইউ’ বলে। আমরা পুপদের তৈরি ইউ আস্বাদন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে পুপ-রা বেশ খুশি হয়েই তিনটে মাঝারি আকারের বাটি ভর্তি করে ইউ এনে দিল। দু’হাতে বাটি ধরে ইউতে চুমুক দিতে দিতে আলাপচারিতা আরও জমে উঠল।

পুপ-এর কাছ থেকে জানা গেল যে ডয়াদের গ্রামে আগে সন্তান প্রসব বাড়িতেই হতো, এখনও তা হয়, তবে সন্তান প্রসবের জন্য ফুনটসোলিং-য়ে সরকারি প্রসবকেন্দ্রে যাওয়ার চল বেড়েছে।

আর কী বদল সে খেয়াল করছে জিজ্ঞাসা করায় পুপ বলল সুপুরি গাছের কথা। আগে সব জমিতেই প্রায় কাউন চাষ হতো, কিছু জমিতে ভুট্টাও হতো, এখন সুপুরি গাছের বাগান করার খুব চল হয়েছে, চারদিকে তাই প্রচুর সুপুরি

গাছ। সপুরি বিক্রি করে টাকা হাতে আসছে—বিক্রির জন্য চাষের চল এই সুপুরির হাত ধরেই ডয়াদের মধ্যে সবে জেঁকে বসছে।

চাষ ও পশু-পালনের কাজ ছেলে মেয়ে উভয়ে মিলেই করে, তবে কর্তৃত্ব মেয়েদের হাতে থাকে বলেই মনে হল।

প্রকৃতিপুজো ও তৎসংক্রান্ত নাচ-গান নিয়ে কথা হতে হতে আমরা গান শুনতে চাওয়ায় পুপ ও তার বোন পাশাপাশি গুছিয়ে বসে সমবেত কণ্ঠে আমাদের দুটো প্রথাগত ডয়া গান গেয়ে শোনাল। সেই গানের কথার অর্থও নেপালি ভাষায় কিছুটা ব্যাখ্যা করে বলল, যা থেকে বোঝা গেল যে গান দুটিতে দুঃখ-যাতনার সামনে মানুষের বিপন্নতার কথা ও তার একমাত্র সহায় যে প্রকৃতির দয়া, সে কথা বলা হয়েছে, পাহাড়-নদী-পাথর-বৃক্ষের কাছে কৃপা ও সহায়তা প্রার্থনা করা হয়েছে।

আধুনিক নেপালি গান ডয়াদের কাছে কিছু কিছু পৌঁচেছে মূলত মোবাইলের মাধ্যমে। তবে, ডয়ারা এখনও নিজেদের ভাষায় প্রথাগত গান স্বাভাবিকভাবে, আচার পালনার্থে অথবা প্রাণের তাগিদে গেয়ে থাকে।

আলাপচারিতা চলতে চলতে আশপাশের বাড়ি-ঘর থেকে কিছু মানুষজন এসেছে, গেছে, আলাপে অংশও নিয়েছে। এমনই একজন একটি বছর আঠারোর মেয়ে, সে এখন এই গ্রামে সব থেকে বেশি দূর অবধি স্কুলে পড়েছে—নবম শ্রেণি অবধি পড়ে সে পড়া ছেড়ে দিয়েছে, এখন তার বিবাহও হয়ে গেছে।

অর্ধসমাপ্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পুপ-এর মা যে মাখন তৈরি করছিলেন তাঁর এখন কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে, মাখন পাত্রে ঢেলে, মন্থননল ও মন্থনদণ্ড ধুয়ে পুপের হাতে তুলে দিলেন ঘরে তুলে রাখার জন্য। আমরাও এবার পুপদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার হাঁটা লাগালাম গাছ-গাছালি- পাথর-এর মধ্য দিয়ে গ্রামের অন্য প্রান্তে।

চলতে চলতে বেশ কিছু জনের সঙ্গে দেখা ও কথা হতে হতে একজনের সঙ্গে সত্যজিৎ বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলল। আমরা এই গ্রামের পুরোনো-নতুন নানা কথা জানতে চাই শুনে তিনি তাঁর বাড়ির আঙিনায় আমাদের নিয়ে এলেন। ডয়াদের প্রথাগত আকারের বাড়ির পাশে গাছ-গাছালিতে ঘেরা পাথুরে উঠোনে গাছের ছায়ায় মাটির উপরেই আমরা বসে পড়লাম। তাঁর নাম যেচুঙ

ডয়া, বয়স ৫৭ বছর। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন তাঁর বউ বকু ডয়া-ও, তাঁর বয়স ৫৬ বছর। আমাদের পিছনে তাঁর উঁচু পাটাতনের উপর তৈরি ঘরের সামনের বাঁশের বারান্দায় বাঁশের রেলিঙ-এ পরপর ঝুলছে শুয়োরের মাংসের কাটা টুকরো। এগুলো রোদে শুকনো করা হচ্ছে। শুকিয়ে গেলে এগুলো ঘরে তুলে রাখা হবে, তারপর প্রয়োজনমতো অল্প অল্প করে রান্না ও খাওয়া চলবে অনেকদিন ধরে। এই মাংসটা বকু ডয়া দুদিন আগে টোটোপাড়ার হাট থেকে কিনে এনেছে। টোটোপাড়ায় প্রতি মঙ্গলবার যে হাট বসে হাঁটা-পথে ডায়ারা সেখানে যায়-আসে, কোনো বেচাকেনার জন্য সেখানেই তাদের সুবিধা কারণ নইলে শামসি বা ফুনট্সোলিঙের বাজারে যেতে হলে গাড়িভাড়ার ভালো খরচ আছে। এখানকার সুপুরি বেশিরভাগ টোটোপাড়ার হাটে গিয়েই ডয়ারা বেচে আসে, ফুনট্সোলিঙ ও শামসিতে বেচে কম। সেই টোটোপাড়ার হাটেই বকু ডয়া দুদিন আগে মঙ্গলবার গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই শুয়োরের মাংস কিনে এনেছিলেন, দুদিন ধরে সেই মাংসই শুকোচ্ছে।

যেচুঙ ডয়া ও বকু ডয়া-র কাছ থেকে জানা গেল যে ডয়ারা মূলত গরু, শুকর, মুরগী-র মাংস খায়। বেশিরভাগ মাংস আসে নিজেদের পালন করা পশু থেকে, কেনা খুব কমই হয়। যেচুঙ ডয়া এমন একটা হিসাব দিলেন যে ডয়াদের খাওয়ার মাংস ৮০ শতাংশই আসে নিজেদের পশুপালন থেকে, বাকি ২০ শতাংশ কেনা হয়। যেচুঙ ডয়া আরও বললেন যে ভুটানের রাজ-সরকার গোটা ভুটানে গরু ও শুকর মারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, গরু শুকর মারতে গিয়ে কেউ ধরা পড়ে গেলে তাকে 'অ্যারেস্ট'-ও করা হয়। ফলে ডয়ারা গরু-শুকুর মারলে ভুটান সরকারের কর্তা-ব্যাক্তি-প্রতিনিধিদের থেকে লুকিয়ে মারে, নয়তো টোটোপাড়া বা ফুনট্সোলিঙ থেকে কিনে আনে। টোটোপাড়া না হয় ভারতে, কিন্তু ফুনট্সোলিঙ তো ভুটানে—গরু শুকর মারা নিষিদ্ধ হলে, তার মাংস সেখানে বিক্রি হয় কী করে? বকু ডয়া বললেন যে মারা নিষিদ্ধ হলেও গরু-শুকরের কাটা মাংস কিনে খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা নেই, ফুনট্সোলিঙ-য়ে গরু-শুকর-এর মাংস প্রচুর বিক্রি হয় মূলত দার্জিলিঙ থেকে নিয়ে এসে।

যেচুঙ ও বকু ডয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে জানা গেল যে ফল-মূল -সব্জি ডায়াদের খুব একটা কিনতে হয় না, তা তারা নিজেরাই চাষ করে অথবা

জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। তাঁদের ছোটবেলায়, অর্থাৎ বছর পঞ্চাশ আগে, কিছুই কিনতে হতো না। জঙ্গলে ঝুম চাষ করে যে পরিমাণ কাউন হতো তা ডয়াদের প্রধান খাদ্য জোগানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ভুটান রাষ্ট্র এই অঞ্চলের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ আঁটো করার সঙ্গে সঙ্গে যখন জঙ্গলে ঝুম চাষ নিষিদ্ধ করে দিল, তখন থেকে ডয়ারা আর আগের মতো কাউন চাষ করতে পারছে না, ফলে তাদের প্রধান খাদ্যেই টান পড়ছে। সেই থেকে ক্রমশ চাল কেনার ও তার জন্য অর্থ জোগাড় করতে অন্যান্য বেচাকেনায় তাদের ঢুকতে হয়েছে। আগে ডয়াদের রান্না মূলত জলে সিদ্ধ করেই হতো। তেলের ব্যবহার ছিল না, নুনের ব্যবহারও ছিল না। ১০ বছর হল তেলে রান্না চালু হয়েছে। তার ফলে এখন তেল কিনতে হচ্ছে, নুন কিনতে হচ্ছে। যেচুঙ ডয়া আবার তাঁর নিজের আদবে বললেন যে তেল ডয়াদের ৭৫শতাংশ কিনতে হয়। মাখন মূলত নিজেরাই তৈরি করে নেয় বলে কিনতে হয় না।

এই গ্রামে অন্যান্য ডয়াদের মতো যেচুঙ ও বকু ডয়াও কৃষিকাজের ভিত্তিতে বিন্যস্ত জীবনরূপকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন ও অতিবাহিত করে যাচ্ছেন। তাঁরা বললেন যে জঙ্গলের মধ্যে ঝুম চাষ প্রথায় কাউন চাষ স্মরণাতীত কাল থেকেই ডয়ারা করে আসছে। তার ফলে জঙ্গল ধবংস হয়নি, শ শ বছর ধরে জঙ্গলের প্রাণ রক্ষা করেই ডয়ারা ঝুম চাষ করে এসেছে। যে জমি পরিষ্কার করে ডয়ারা চাষ করছে, সে জমিতে আবার জঙ্গল বেড়ে উঠতে দিয়ে অন্য জমিতে ফসল বুনেছে। অথচ জঙ্গল ধবংস করার অজুহাতে ঝুম চাষ নিষিদ্ধ করে দিল ভুটান সরকার। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যতো গেঁড়ে বসল, ডয়াদের চিরাচরিত কৃষিকাজ ততো অসম্ভব হয়ে উঠল। অন্যদিকে, ডয়াদের গ্রামের চারপাশে গড়ে ওঠা নেপালিদের বসতিতে নেপালিরা (তামাং, রাই জনজাতির মানুষরা) স্থায়ী চাষের জমি তৈরি করে ভুট্টা (মারওয়া) চাষ করতে শুরু করে। যেচুঙ ডয়ার মতে ৬০ বছরের মতো সময়কাল আগে থেকে ডয়ারা নেপালিদের কাছ থেকে ভুট্টা (মারওয়া) চাষ করা শেখে, হাল বানানো ও জমিতে হাল দেওয়া শেখে। প্রথানুগ কৃষিকাজ ডয়াদের যে স্বনির্ভরতা দিয়েছিল, এই নতুন চাষ তাদের তা দিতে পারেনি, বরং ক্রমশ পর-নির্ভরশীল করে দিয়েছে, নতুন ধরনের দীনতার জন্ম দিয়েছে।

প্রকৃতির মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু পরিবর্তন যেচুঙ ও বকু ডয়ার মনে নানা উত্তরহীন প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। স্নেহময়ী প্রকৃতি হঠাৎ যেন খামখেয়ালী হয়ে উঠেছে। ১৫-১৬ বছর বয়স অবধি (অর্থাৎ ৪০ বছরের কিছু বেশি সময় আগে অবধি) যেচুঙ ও ও বকু ডয়া তাঁদের গ্রামে প্রচুর কমলার বাগান দেখেছেন, প্রচুর কমলা ফলতো তাতে। ধীরে ধীরে সব কমলা গাছ মরে গেছে। এখন কমলা গাছ নতুন করে লাগালেও তা বাঁচেনা। এই ব্যাপারেও ডয়াদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে টোটোদের অভিজ্ঞতা মিলে যায়। টোটোপাড়াতেও একই রকমভাবে আগে প্রচুর কমলা ফলতো, এখন একটাও কমলা গাছ নেই। কেন এমন হচ্ছে? যেচুঙ ও বকু ডয়ার মনে হচ্ছে যে আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে, গরম বেড়ে যাচ্ছে, তাই কমলা গাছ বাঁচছে না। আগে এলাচ গাছও খুব ভালো হতো, এখন এলাচ গাছও লাগালে মরে যাচ্ছে। কমলা গাছ সব মারা যাওয়ার পর ডয়ারা জমিতে ভুট্টা চাষ শুরু করে। আর বছর পঁচিশ হল অর্থকরী চাষ হিসেবে সুপুরি গাছ লাগানো শুরু হয়েছে, এখন চারিদিক সুপুরি গাছে ছেয়ে যাচ্ছে।

অর্থকরী ফসল বেচে টাকা আয় করার প্রয়োজনীয়তা যেচুঙ বা বকু ডয়ার ছোটবেলার কালে ডয়াদের মধ্যে তেমন ছিল না। এখন এই প্রয়োজনীয়তা তৈরি হওয়ার পিছনে ভুটানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আদায়ের বড় ভূমিকা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় রাজস্ব যেহেতু নগদ টাকায় মেটাতে হয় আর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ যেহেতু আগের দিনের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে ও ক্রমশ বাড়ছে, তাই রাজস্ব না মিটিয়ে উপায় নেই, ফলে নগদ টাকা আয় না করেও উপায় নেই। রাজস্বগুলো কেমন? ৫ বছর হল চালু হওয়া রাজস্বগুলোর হিসাব যেচুঙ ডয়া এইভাবে দিলেন—বাড়ির জন্য বছর প্রতি রাজস্ব দিতে হয় ১০০ ভুটানি টাকা (ভুটানি টাকা-কে ডয়া ভাষায় বলে 'পেল' আর জঙখা ভাষায় বলে 'তিরু'), জমির জন্য বছর প্রতি দিতে হয় ৪৫০ ভুটানি টাকা, গরু পিছু বছরে দিতে হয় ভুটানি ১ টাকা আর ছাগল পিছু ১ ভুটানি টাকা।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র অবশ্য কেবল নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব কায়েম করেনি, 'জনকল্যাণমূলক আধুনিক উপচার' প্রদানের মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতাও উৎপাদন করেছে। এহেন প্রধান দুই উপচার হল শিক্ষা ও বিদ্যুৎ-সংযোগ। যেচুঙ ডয়া বলছিলেন যে সরকার স্কুল বানিয়ে খুব ভালো করেছে,

৩০ বছর আগে একজন ডয়াও লেখপড়া জানত না, এখন ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করেছে, ছেলে-মেয়েরা যা শিখেছে তা আমরাও কিছুকিছু তাদের কাছ থেকে শিখে যাচ্ছি। আরও বললেন যে বিজলীবাতি হয়েও অনেক সুবিধা হয়েছে, আগের থেকে কষ্ট কমেছে।

৩০ বছর আগে বিদ্যায়তনিক শিক্ষা ডয়াদের মধ্যে প্রবেশ করেনি, কিন্তু সে সময় পরম্পরবাহিত লোকজ্ঞানের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, সেই ধারার নানা অরূপরতন অতি সাধারণ জ্ঞান হিসেবে যেচুঙ ও বকু ডয়ার কথাতেও প্রকাশিত হচ্ছিল—এ এমন জ্ঞান যা জ্ঞানধারীকে অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন অনন্য করে না, বরং সবার মাঝে সবার সাথে সাধারণ করে রাখে। এই জ্ঞান চাষ, পশুপালন, প্রকৃতির অদলবদল এমন বহু বিষয় সম্বন্ধে। তারই একটা বিশেষ অংশ হল প্রকৃতির ওষধি সম্বন্ধে জ্ঞান। ডুকরেন লতার কথা তো আমরা আগেই শুনেছি, যেচুঙ ডয়া আমাদের আরও দুটো প্রাকৃতিক ওষধি চেনালেন। একটি হল ডয়া ভাষায় 'নেলকন'—এক প্রকার গাছ যার শিকড় পিষে ফেলে জ্বর কমে। আর একটি হল 'মাইসিং' গাছ, যার ছাল জলে ফোটালে চায়ের মতো রঙ হয়, সেই পানীয় খেলে ডাইরিয়া সেরে যায়।

ভুটানের রাজার উদ্যোগে ভুটানে আইনসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে সম্প্রতি কয়েক বছর। রাজা আইনসভার স্থায়ী প্রধান, বাকি আইনসভার সদস্যপদের জন্য বিভিন্ন 'পার্টি' তৈরি করে সেই 'পার্টি'-দের প্রার্থীদের মধ্যে দেশজুড়ে নির্বাচন হচ্ছে। তাপা গ্রামের ডয়ারাও সা-তি নদী পেরিয়ে ডেনচু-তে গিয়ে ভোট দিয়ে এসেছে। যেচুঙ ও বকু ডয়াও দিয়ে এসেছে। যেচুঙ বলছিলেন যে ভোট হয়েছে ঘোড়া পার্টি আর পাখি পার্টির মধ্যে (পার্টিদুটোর নাম খেয়াল নেই, পার্টিদুটোর নির্বাচনী চিহ্ন ধরেই তাদের পরিচয়)। আগের বার পাখি পার্টির জিগমে থিনলে ইয়েজার ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল, এবার ঘোড়া পার্টির শিরিং তোবগে ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। সংসদীয় নির্বাচনের অভিজ্ঞতা সদ্য কয়েক বছরের হলেও ইতিমধ্যেই সংসদীয় রাজনীতির একটি লব্জ ডয়াদের ভাবনায় সেঁধিয়ে গেছে, যা যেচুঙ ও বকু ডয়ার মুখে শোনা গেল— 'এক পার্টিকে বারবার জেতালে তারা কাজ করবে না, বদলে বদলে জেতালে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে।'

কথায় কথায় বেলা পড়ে আসছিল। পাহাড়ের কোলে রঙগুলো সব গাঢ় হয়ে আসছিল। যেচুঙ ও বকুর বাড়ির উঠোন থেকে এবার আমাদের ওঠার পালা। বকু ডায়া বারবার বললো ভাত খেয়ে যেতে, কিন্তু আমাদের তখন আর খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। যেচুঙ ও বকু ডয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডয়াদের বাড়ির উঠোন পেরিয়ে পেরিয়ে আমরা চললাম উৎরাইয়ের পথে সা-তি নদীর দিকে। যে পথ দিয়ে তাপা গ্রামে ঢুকেছিলাম, এ সে পথ নয়, এ এক অন্যদিকের পথ। এই পথে সা-তি'কে পেরোতে হবে পায়ে হেঁটে। গোড়ালি-ডোবা জলে হেঁটে আমরা সা-তি পেরিয়ে গেলাম।

তাপা গ্রামের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে সামনে যে পাহাড় খাড়া উঠে গেছে জঙ্গল বুকে নিয়ে, তার গা বেয়ে চড়াই পথে কয়েক ঘন্টা পেরোলে ডয়াদের আর একটা গ্রাম আছে, তার নাম রামতি। আর পাহাড়ের ওপিঠেও ডয়াদের গ্রাম আছে। থিমপা ডয়া একটা হিসাব দিয়েছিল যে তাপা ও রামতি মিলে ডয়াদের জনসংখ্যা প্রায় চার হাজার। এবার নয়, অন্য কোনো বার ডয়াদের ওই গ্রামগুলোতে যাওয়া যাবে।

আমরা টোটোপাড়ায় ফেরার পথ ধরলাম।

গ্রামের বাইরে রাষ্ট্রের মুখোমুখি

সা-তি পেরিয়ে ডেনচু-র দিকে কিছুটা চড়াই পথে উঠে ভুটান সরকারের বনদপ্তরের করণ। তার আশেপাশে আরও কিছু সরকারি করণ-ঘর তৈরি হচ্ছে। সেখানে একটা ক্যান্টিনও চালান একজন নেপালি অধিবাসী। ক্যান্টিনে ঢুকে তিন বাটি নুডলস বানাতে বলে আমরা বসলাম। নুডলস তৈরি হয়ে আসার আগে এক গ্লাস করে ভুটানি হুইস্‌কি নিয়ে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট খাওয়ার চাহিদাটা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। জানতাম যে ভুটানে প্রাকাশ্যে সিগারেট খাওয়ার উপর বিধিনিষেধ আছে। তাই সন্তর্পণে ক্যান্টিন পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে বসে সিগারেট খাওয়া যাবে কিনা। সে বলল যে হ্যাঁ এখানে বসে খাওয়া যেতে পারে, তবে বাইরে বেরিয়ে যেন আমরা না খাই। বেশ খুশি হয়ে আমরা তিনজনই সিগারেট ধরালাম। এমন সময়ই সেই ক্যান্টিনে এসে প্রবেশ করল সংলগ্ন বনদপ্তরের করণের এক আধিকারিক। তার উর্দির বুকে সেলাই

করা নামফলকে তার নাম লেখা, পদবী 'রাই', অর্থাৎ সে একজন নেপালি। আমাদের দেখে তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজি জানি কিনা জেনে নিয়ে ইংরেজিতে কথা শুরু করলেন। আমরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি, সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি কি না, এসবই তাঁর জিজ্ঞাস্য। আমরা বললাম যে আমরা এখানকার প্রকৃতি ও মানুষজন দেখতে এসেছি—অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমরা ডয়াদের গ্রামে গিয়েছিলাম শুনে বেশ তির্যকভাবে বললেন 'ও! আপনারা আদিবাসী নিয়ে কৌতূহলী!' তারপর তিনি একটি বেশ নাতিদীর্ঘ ভষণ দিলেন আমাদের প্রতি। বললেন যে, ভুটানে আদিবাসীদের কোনো গ্রামে ছবি তোলা বা কোনোরকম 'ডকুমেন্টেশন' করা নিষিদ্ধ, ভুটান সরকারের কাছ থেকে কোনো অনুমতিপত্র না নিয়ে সরকারকে না জানিয়ে এমন কাজ করা আমাদের অন্যায় হয়েছে, আমরা চাইলে ভুটান সরকারই ডয়াদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমাদের দিয়ে দিত, আর সেই সরকারী তথ্যই 'সঠিক', আমরা নিজেরা গ্রামে গিয়ে যে 'তথ্য'-ই সংগ্রহ করি না কেন, তা 'ভুল' হতে বাধ্য। এরপর তিনি আমাদের সিগারেট খাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন যে এর মধ্যে দিয়েও আমরা ভুটানের নিয়ম লঙ্ঘন করছি। তিনি এই সমস্তই বলছিলেন বেশ মোলায়েম ভাবে। বাচনভঙ্গি আরও মেলায়েম করে বুকে হাত রেখে তিনি বললেন যে 'উই আর কাইন্ডহার্টেড', তাই এই সমস্ত সরকারি বিধি লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও তিনি আমাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, কেবল আর যেন আমরা এমন না করি সেই সাবধান বাণী শুনিয়ে যাচ্ছেন। এই বলে তিনি সবার সঙ্গে হাসি মুখে হাত মিলিয়ে চলে গেলেন। তাঁর ভদ্র মসৃণ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের বজ্রকঠিন ঘোষণা—'আমাদের তথ্যই ঠিক, তোমরা যা দেখছ ভুল দেখছ, যা ভাবছ ভুল ভাবছ'—আমাদের মনে ঢেউয়ের মতো বার বার ফিরে আসছিল। নুডলস খাওয়া শেষ করে আমরা আবার ব্যাগপত্র পিঠে তুলে রাস্তায় নামার জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় হাজির হল রাষ্ট্রের আর এক প্রতিনিধি। আগের আধিকারিকের সঙ্গে কথা চলার সময়েই সে হাজির হয়েছিল এবং একপাশে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে বেশ জমকালো ভুটিয়া পোষাক—যে পোশাককে ভুটানের জাতীয় পোষাক হিসেবে সরকার ঘোষণা করেছে এবং বারোয়ারী ক্ষেত্রে সেই পোষাক পরা

ব্যধ্যতামূলকও করা হয়েছে। সেই পোষাকের বুকে একটা চাপরাস আটকানো, সেই চাপরাসে ভুটানের রাজার ছবি। সে অনেকক্ষণ ধরেই পায়চারি করতে করতে বিভিন্ন জনকে তার মোবাইল থেকে ফোন করছিল। আমরা বেরোতে যেতেই সে এসে সত্যজিৎকে নেপালিতে বললো যে এখন আমাদের বেরোনো চলবে না, সরকারি লোক এসে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তাই আমাদের ওখানেই বসে থাকতে হবে। বেশ গম্ভীর ও কঠোর মুখ করে আমাদের পক্ষ থেকে কথাবার্তা বলার নানা চেষ্টাকে উপেক্ষা করে সে তার মোবাইল ফোনে নানা ফোন করে মনে হল যে ডয়াগ্রামে বেআইনি প্রবেশের বার্তা ছড়িয়ে নানাজনকে ডেকে আনতে চাইছে। সত্যজিৎ চেনে একে, এর বাড়ি কাছের গৈরীগাঁও-য়ে, এ একজন তামাং। সদ্য এ 'ছোকপা' নির্বাচিত হয়েছে। দুটি গ্রাম মিলিয়ে একজন ছোকপা নির্বাচিত হয়, যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের থাকবন্দী কাঠামোয় নীচের থাকের রাষ্ট্র-প্রতিনিধি। বোঝা যাচ্ছিল যে সদ্য থাকবন্দী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রবেশ করতে পারায় রাষ্ট্রীয় বিধি-নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তিপ্রদানে তৎপরতা দেখাতে সে একটু বেশি উৎসাহী। আমাদের বেশ ঘন্টাখানেক সেখানে আটকে থাকতে হল, তারপর এই ছোকপার থেকে উচ্চতর থাকের একজন ছোকপা এলো। এই এলাকায় অভিবাসনের নথি রক্ষা করা তার দায়িত্ব। সে আমাদের তিনজনের নামধাম একটা কাগজে লিখে নিল, তারপর বললো যে যেহেতু আমরা রাত কাটাইনি, তাই আমাদের আটকে রাখার অধিকার তাদের নেই। এরপর আমরা তাদের সঙ্গে করমর্দন করে আবার টোটোপাড়ার পথ ধরলাম।

আবার আসিব ফিরে

জিতি নদীর তীরে পৌঁছে গেছি, এরপর টানা খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠার পথেই ভুটানের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে যাব, আর কিছুটা উঠলে পৌঁছে যাব টোটোপাড়ার 'সীমানা গাঁও'-য়ে। প্রকৃতির আলো নিভু নিভু। জিতি নদীর এই জায়গাটায় পাথর দাঁড়িয়ে নদীপথে একটা অনুচ্চ দেওয়াল মতো খাড়া করেছে, ফলে এখানে বেশ কিছুটা জল এসে জমে থাকে, অবশ্য প্রাবাহহীন ভাবে নয়, প্রবাহের মধ্যেই। জামা-প্যান্ট খুলে, একটা গামছা পড়ে আমি আর সুরজিৎ এখানে স্নান করলাম। নদীর নুড়ি বেছানো গর্ভের উপর বসে পড়লে

গলা অবধি জলে ডুবে যায়। এভাবে বসে নিভু নিভু আলোয় চারদিকের পাহাড় জঙ্গল দেখতে দেখতে মনে মনে ভাবছিলাম যে ডয়াদের কাছে আবার ফিরে আসব—না, সরকারি তথ্য-এর 'সত্য'-এ আমার প্রয়োজন নেই, আমার প্রয়োজন ডয়াদের সাথে মানুষ হিসেবে পারস্পরিক মেলামেশার অভিজ্ঞতা—রাষ্ট্রীয় অনুমতি বিহনেই হয়তো আবার তা করতে হবে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০১৭

কথোপকনে (বাঁ দিক থেকে) সত্যজিৎ টোটো, বকু ডয়া ও যেচুঙ ডয়া

অরুণাচলের অস্তরাগ: জনজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি

বিপ্লব নায়ক

ভূমিকাপর্ব: অস্তিনাস্তির সংকট

অরুণাচল প্রদেশ নামে বর্তমানে পরিচিত ভূখন্ডটি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বুনটে বোনা এক বিস্ময়কর স্থান। পাহাড়-নদী-জঙ্গল ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর এক নিবিড় মোজেয়িক-এর মধ্যে মানুষের ভাষা-সমাজরূপ-সংস্কৃতির বহুবিচিত্র ধারা এখানে প্রবাহিত। বিচিত্র পল্লব-মর্মর, ঝোরা-নদী-প্রস্রবণ-এর বিচিত্র জলধ্বনি, পাখির বিচিত্র কুঞ্জন, প্রাণীদের বহু স্বর—এই সবের সঙ্গেই মিশে আছে এখানকার মানুষদের অসংখ্য কথ্য ভাষা। সর্বশেষ ভাষাতাত্ত্বিক নিরীক্ষণে এই অঞ্চলে প্রায় ১৬৫০টি কথ্যভাষার রূপ চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রত্যেকটি কথ্যভাষার আবার এলাকা বিশেষে আঞ্চলিক রূপের ভিন্নতা চিহ্নিত করা যায়। ভাষা-সর্বেক্ষণকারীরা এই সমস্ত কথ্যভাষার মধ্য থেকে ৮২টি মূল ভাষারূপ চিহ্নিত করে তাদের তিব্বতী-বর্মী ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই সমস্ত ভাষার আধারে সঞ্চিত রয়েছে মৌখিক লোকসাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার যার মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হয়ে চলেছে লোকইতিহাসের বিবরণ, লোকজ্ঞানের প্রসারণ।

এই সম্পদসম্ভার আজ বিপদের মুখে। বহু ভাষার বাচক কমতে কমতে এত কমে গেছে, নতুন প্রজন্মের মধ্যে এত কম তা প্রবাহিত হচ্ছে যে অচিরেই

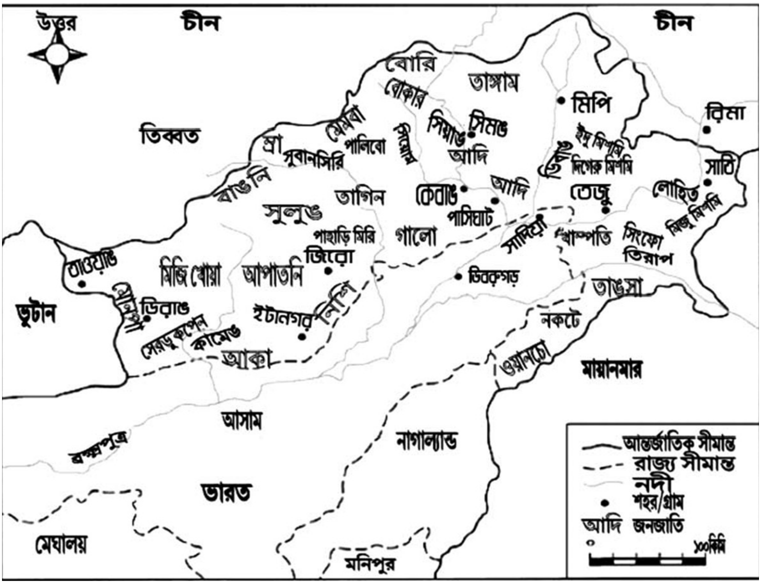

অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন উপজাতিদের বসবাসের অঞ্চল

বাচকহীন হয়ে গিয়ে তা পুরোপুরি লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিপন্ন ভাষা বিষয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদনেও এই আশঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে এই অঞ্চলের যে যে ভাষাগুলিকে বিভিন্ন মাত্রায় বিপন্ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তা এইরকম:

চরম সংকটে (critically endangered) যে সব ভাষা

ভাষার নাম	কোন অঞ্চলে কথিত হয়	বর্তমান বাচকসংখ্যা (মোটামুটি)
নাহ	সুবানসিরির উপর দিক	৩৫০
তাঙ্গাম	পশ্চিম সিয়াঙ	১০০
ভ্রা	সুবানসিরির উপর দিক	৩৫০
মেয়োর	আনজাও জেলা	৫০০

নিশ্চিত সংকটে (definitely endangered) যে সব ভাষা

ভাষার নাম	কোন অঞ্চলে কথিত হয়	বর্তমান বাচকসংখ্যা (মোটামুটি)
ডাকপা	তাওয়াঙ	১,০০০
লিসফা	তাওয়াঙ	১,৫০০
খোয়া/উগুন	পশ্চিম কামেঙ	১,০০০
মিজি	পশ্চিম কামেঙ	৫,০০০
কোরো	পশ্চিম কামেঙ	৮০০-১,০০০
সুলুঙ	পূর্ব কামেঙ	৬,০০০
পার্বত্য মিরি	সুবানসিরির উপর দিক	১২,০০০
বোরি	পশ্চিম সিয়াঙ	২,০০০
খাম্বা	পশ্চিম সিয়াঙ	১,৫০০
মিলাঙ	পূর্ব সিয়াঙ	২,০০০
পাসি	পূর্ব সিয়াঙ	১,০০০
ইদু	দিবাঙ উপত্যকা	১১,১০০
সিঙফো	চাঙলাঙ	৫,০০০
মোতোউমেম্বা	পশ্চিমসিয়াঙ	৯,০০০
বোকার	পশ্চিম কামেঙ	৫,০০০
শেরডুকপেন	পশ্চিম কামেঙ	৩,০০০
মিজু	লোহিত ও আনজাও	৬,৭০০

সংকটের মুখে(vulnerable) যে সব ভাষা

ভাষার নাম	কোন অঞ্চলে কথিত হয়	বর্তমান বাচকসংখ্যা (মোটামুটি)
ৎসাঙলা	তাওয়াঙ ও পশ্চিম কামেঙ	৫৫,০০০
নিশি	সুবানসিরির নিচের দিক, কুরুঙ কুমে	১,৭০,০০০
বাঙনি/বাঙরু	কুরুঙ কুমে	২০,০০০

ভাষার নাম	**কোন অঞ্চলে কথিত হয়**	**বর্তমান বাচকসংখ্যা (মোটামুটি)**
আপাতনি	সুবানসিরির নিচের দিক	৩৫,০০০
তাগিন	সুবানসিরির উপর দিক	৩০,০০০
গালো	পশ্চিম সিয়াঙ	৩৫,০০০
আদি	পূর্ব সিয়াঙ ও উত্তর সিয়াঙ	১,৭০,০০০
পদম	পূর্ব সিয়াঙ ও দিবাঙ উপত্যকার নিচের দিক	২০,০০০
খাম্পতি	লোহিত	১৩,০০০
তাঙসা	চাঙলাঙ	৪০,০০০
নকটে	তিরাপ	৩৩,০০০
ওয়ানচো	লঙডিঙ	৪৯,০০০
কুয়োনোমেম্বা	তাওয়াঙ	৫০,০০০

দেখা যাচ্ছে যে জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চরম সংকটের মধ্যে ৪টি ভাষা, নিশ্চিত সংকটে ১৭টি ভাষা আর সংকটের মুখোমুখি ১৩টি ভাষা। এই ভাষাগুলোর বিপন্নতার প্রধান দিক হল এই যে তার বাচকগোষ্ঠীর নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই সব ভাষার ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে, অর্থাৎ, নতুন প্রজন্ম বেশি বেশি করে তার ব্যবহারের ভাষা হিসেবে অন্য ভাষাকে গ্রহণ করছে। সেই অন্য ভাষা কী? সেই অন্য ভাষা হল অসমিয়া, হিন্দি বা ইংরেজি। কিন্তু নতুন প্রজন্ম কেন বেশি বেশি করে অসমিয়া, হিন্দি বা ইংরেজি গ্রহণ করছে?

এই শেষ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের এই সমস্ত বাচকদের সামাজিক জীবন বর্তমানে যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার দিকে তাকাতে হবে। এই ভাষাগুলোর বাচক অরুণাচল প্রদেশের যে সমস্ত বিভিন্ন জনজাতির মানুষ, দীর্ঘদিন ধরে তারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজরূপ ও জীবনযাপনপদ্ধতি গড়ে তুলে পরম্পরাগতভাবে তা বহন করে চলেছে। এই সমাজরূপ ও জীবনযাপনপদ্ধতির্ স্বকীয় ক্ষেত্রজুড়ে বিস্তৃত তাদের ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্র। যেমন, তাদের সমাজ-রাজনৈতিক অনুশাসনের পীঠ ছিল প্রতিটি গ্রামের

গ্রাম-পরিষদ, যেখানে অংশ নেওয়া বা যা সম্পর্কিত বিধি-নিয়ম শ্রুতিমাধ্যমে বয়স্কদের মধ্যে সঞ্চিত থাকা বা তরুণদের মধ্যে প্রবাহিত হওয়া, সবই হতো তাদের নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে। আবার শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের সমাজে লোকজ্ঞানের নতুন প্রজন্মে প্রাসারণ যেভাবে গ্রামপরিষদের সভা, অবিবাহিত পুরুষদের ও মেয়েদের যৌথ থাকার ঘর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঘটত, সেখানেও তার মাধ্যম স্বাভাবিকভাবেই ছিল মাতৃভাষা।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত এই সমাজরূপ ও জীবন পদ্ধতি আজ ভাঙনের মুখে। গ্রামপরিষদে গণ-অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজ-রাজনৈতিক অনুশাসন ক্রমশই প্রতিস্থাপিত হচ্ছে শহরে কেন্দ্রীভূত অভিজাত দ্বারা নির্বাহিত শাসনে, যে অভিজাতদের পিছনে আবার রয়েছে সুদূর দিল্লিতে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার আর্থিক ও সামরিক ক্ষমতার শক্তি। সুদূর ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত এই নব্য শাসনব্যবস্থার লিখিত দলিল-দস্তাবেজ-আপিল-নির্দেশ-এ বাঁধা রীতিনীতিতে অসংখ্য লিখনরীতিহীন কথ্য ভাষার কোনো স্থান নেই, আইন-প্রশাসনের ভাষা রূপে সেখানে বিরাজ করছে সবার উপরে ইংরেজি, তার নিচের ধাপে হিন্দি ও তার নিচের ধাপে অসমিয়া। ফলে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার ধাপবন্দী কাঠামোর তলার দিকের ধাপগুলোয় স্থান করে নেওয়া আঞ্চলিক অভিজাতদের সরণ ঘটছে ওই অসমিয়া, হিন্দি, ইংরেজির দিকেই। অসমিয়া, তার থেকে বেশি হিন্দি ও সবচেয়ে বেশি ইংরেজি-তে দখল হয়ে উঠেছে গ্রামসমাজগুলোর ভাঙতে থাকা অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার হাতিয়ার।

এই প্রক্রিয়ারই সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামসমাজে যে ভাবে লোকজ্ঞানের সঞ্চয় ও প্রসারণ মাতৃভাষার আধারে লোকশ্রুতির মাধ্যমে ঘটত, গ্রামের শামান ও বয়স্করা সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার ও প্রবাহক হিসেবে ভূমিকা নিত, তাকে অস্বীকার করে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত একটি প্রমিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষাপ্রদানের জন্য স্কুল-ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এই স্কুল-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ১৯৫৭ সালে ভেরিয়ার এলউইন-এর পর্যবেক্ষণ ছিল এইরকম:

> ...আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব চরিত্র যাতে নষ্ট করে দেওয়া (detribalization) না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু এতদিন

> অবধি আমাদের স্কুল এবং তার শিক্ষকরা এমন হয়েছে যা তা খেয়াল রাখার বদলে সেই বিপদটিকেই ঘটিয়েছে। স্কুল ও শিক্ষকদের আদিবাসীদের জীবন অনুযায়ী বদলানো বা আদিবাসীদের জীবনধারার স্বাদ তাতে নিয়ে আসার কোনো আন্তরিক চেষ্টা হয়নি। স্কুলবাড়ির আদল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একই পোষাক, শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে টাঙানো ছবি বা চার্ট, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত ভাষা, খেলাধুলো—সবই আঞ্চলিক জীবনে অপরিচিত, বেমানান। তার ফলে হয়েছে এই যে, স্কুলগুলো গ্রামজীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়ে ওঠার বদলে আলাদা হয়ে থেকেছে, এমনকি আদিবাসীদের পরম্পরার প্রতি বৈরী মনোভাবসম্পন্ন হয়ে থেকেছে। আমাদের স্কুলে এমন কিছু ছিল না যা একটি আদিবাসী শিক্ষার্থীর মনে তার জনজাতির নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে গর্ববোধ জাগাতে পারে, বরং এমন সবই ছিল যা তা সম্পর্কে তাকে লজ্জায় হীনমন্য করে তোলে।... আদিবাসী জনজাতিদের বয়স্ক জনেরা কখনও কখনও আশঙ্কা করে যে স্কুলগুলোর ফলে তাদের সমাজের পরম্পরাগত প্রাধিকারের প্রতি সম্মান ভেঙে পড়বে এবং স্কুলে যাওয়া ছেলে মেয়েরা তাদের সমাজের কোনো কাজে লাগবে না।

খেয়াল করা যেতে পারে যে, অরুণাচল প্রদেশের স্কুলগুলো সম্পর্কে এই পর্যবেক্ষণ ভেরিয়ার এলউইন করেছিলেন যখন তিনি সেখানে (তদানীন্তন NEFA-য়) সরকারি প্রশাসনের উপদেষ্টা হিসেবে বহাল ছিলেন এবং এই পর্যবেক্ষণ সমন্বিত বইটি (A Philosophy For NEFA) দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কাজ করতে যাওয়া সরকারি প্রশাসকদের প্রশিক্ষণে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এলউইন নিজে বেশ কিছু চেষ্টা করেছিলেন এই অবস্থা বদলানোর জন্য। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও কিছু বদল হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় জনজাতিদের মাতৃভাষাগুলো শিক্ষার মাধ্যম হয়নি। আদিবাসী গ্রামসমাজের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে কোনো শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব স্থান পায়নি। আজ ইংরেজি প্রায় একাধিপত্য করছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এবং সেই ইংরেজি-শিক্ষার পথ হয়ে উঠেছে গ্রামসমাজের পরম্পরা ত্যাগ করে সেই শহরকেন্দ্রিক অভিজাতকুলের অংশীভূত হওয়ার প্রবেশিকা, যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত ও কেন্দ্রীভূত করার কুশীলব হয়ে উঠেছে।

গ্রামসমাজের ভাঙনের উপর ধাপবন্দী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমপ্রসার অনুসারী এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার ফলে তাই আধিপত্যকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রতাপ-প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার ও নিজ নিজ মাতৃভাষা থেকে সরণও তাই বেড়ে চলেছে।

আদিবাসী জনজাতিদের মাতৃভাষাগুলোর সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র হারানো, গণধারণায় অসম্মানের বস্তু হয়ে ওঠা ও শেষাবধি বাচকদের মুখ থেকে হারিয়ে যাওয়া—এই ঘটনাগুলো আদিবাসীদের গ্রামসমাজের পরম্পরাগত কাঠামোর যে বিপর্যয়ের বা ভেঙে পড়ার মধ্য দিয়ে ঘটে চলেছে, সেই বিপর্যয় বা ভেঙে পড়ার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তন। সেই অর্থনৈতিক পরিবর্তন হল তাদের পরম্পরাগত স্বনির্ভর অর্থনীতির বিকাশের ধারা পরিত্যক্ত হয়ে শুকিয়ে আসা এবং বৃহৎ পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদকদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা পর-নির্ভরশীল ভোগবাদী অর্থনীতির বিকাশের ধারায় বাঁধা পড়া। পরম্পরাগত ধারায় ঘর, রাস্তা, সেতু এই সমস্ত নির্মাণের আঞ্চলিক প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল যৌথশ্রমে নির্বাহিত উপায় চালু ছিল। এর পরিবর্তে সরকারি উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষণায় চালু করা হয়েছে ও হচ্ছে পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদিত সিমেন্ট-ইস্পাত-লোহা ও অন্যান্য কাঁচামাল ব্যবহার করে পেশাদার নির্মাণকারী সংস্থাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পদ্ধতিতে নির্মাণকাজ, যার ফলে এই নির্মাণকাজে আদিবাসী জনজাতিদের নিয়ন্ত্রণ বা স্বনির্ভরতা কোনোটাই আর থাকছে না। একইভাবে, স্থানীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব ও আবর্তনচক্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষি-ব্যবস্থা, জঙ্গল থেকে সংগ্রহ, শিকার ও পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের পরম্পরার মধ্য দিয়ে জীবনের রসদ সংগ্রহের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, তাকে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা হচ্ছে সরকারি 'উন্নয়ন'-এর মধ্য দিয়ে। সরকারি ডোল ও নির্দেশাবলীকে অস্ত্র করে সরকারি উন্নয়ন-আধিকারিকরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করে বাণিজ্যিক চাষ ও পুঁজিবাদী ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার জারি করছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী, আমানতকারী, মহাজনদের পল্টন। টাকা যেমন গ্রামে ঢুকছে, তেমন হু হু করে বেরিয়েও যাচ্ছে। নবসৃষ্ট এক অভিজাতগোষ্ঠীর হাতে টাকা জমা হয়ে আবার তা পুঁজিবাদী ভোগ্যপণ্য খরিদের মধ্য দিয়ে বেরিয়েও যাচ্ছে।

আর এর ফলে ভেঙে পড়ছে কৃষিজমি ব্যবহারের উপর সমগ্র গ্রামের মানুষের নিয়ন্ত্রণের পরম্পরাগত ব্যবস্থা, ভেঙে পড়ছে কৃষি-উৎপাদের বন্টনে গ্রামের সব মানুষের ভাগ থাকার পরম্পরাগত ব্যবস্থা। অর্থাৎ, উৎখাত হতে হতে যাচ্ছে উৎপাদন ও বন্টনের উপর গ্রামসমাজের যৌথ নিয়ন্ত্রণের সমস্ত পরম্পরা। অর্থনৈতিক জীবনেও তাই গ্রামসমাজের যৌথ উদ্যোগ ও যৌথ অংশগ্রহণের পরম্পরাগত পরিসরগুলো ধবংস হয়ে পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ ও পুঁজিবাদী বাজারের উপর নির্ভরতাই প্রধান হয়ে উঠছে। যৌথ উদ্যোগ ও যৌথ অংশগ্রহণের পরিসরগুলো ছিল জনজাতিদের নিজেদের ভাষার ব্যবহার-ক্ষেত্র, আর পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ-নির্ভরতার পরিসরটি হল ইংরেজি বা হিন্দির মতো আধিপত্যকারী ভাষার ক্ষেত্র। জনজাতিদের ভাষাগুলোর মৃতুঘন্টা এভাবেও বেজে উঠছে।

এই প্রক্রিয়াই কি চলতে থাকবে? অনেকে বলে থাকেন যে এই প্রক্রিয়াই কাম্য, কারণ তাঁরা মনে করেন যে প্রগতির একমেবাদ্বিতীয়ম সরণি এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি এই পথ প্রগতির পথ? অরুণাচল প্রদেশের বহু বিবিধ জনজাতির বহু-বিবিধ ভাষা-সংস্কৃতি বিলোপের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে বাঁধা একটি শিকড়হীন জনগোষ্ঠী তৈরি মানে কি আগের থেকে ভালো হওয়া? যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও যৌথ অংশগ্রহণের পরিসরে উৎপাদন ও বন্টনের পরিবর্তে ভোগবৃদ্ধির অসীম তাড়নায় তাড়িত পুঁজিবাদী উৎপাদন কি আগের থেকে ভালো ব্যবস্থা?

এই প্রশ্নগুলো তুলতে গেলেই প্রগতির বাঁধা পথের পথিকরা দাবড়ানি দিয়ে বলবেন, থামো বাপু, অতীতকে নিয়ে আর সস্তা কাব্যি কোরো না। তাঁরা মনে করিয়ে দেবেন যে অরুণাচল প্রদেশের জনজাতিদের অতীত ইতিহাস আসলে অসভ্যতার ইতিহাস, অক্ষমতা-পশ্চাদপদতার ইতিহাস, জনজাতি-জনজাতিতে প্রাণঘাতী সংঘাত আর নরমুন্ড শিকারের ইতিহাস। ভয়াল-ভয়ঙ্কর সেই অন্ধকার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনাই চলতে পারে না। কিন্তু মুশকিল হল যে তাঁরা অতীতকে এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছেন যে সেখানে কিছু ঠাহর করাই যায় না। বহু শতাব্দীর মানুষের শ্রম-মনন-কীর্তির পথ বেয়ে চলেছে আদিবাসী-জনজাতিদের যে সমাজগুলো, পরস্পর হানাহানি আর নরমুন্ড-শিকার-ই তার

শেষ কথা? অজ্ঞানতার এই অন্ধকারকে কিছুটা ফিকে না করতে পারলে তাই সত্যিই পূর্বের জরুরী প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

আমরা তাই দৃষ্টিকে একটু নিবিড় করে এখন দেখার চেষ্টা করব অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন জনজাতির ইতিহাস, বোঝার চেষ্টা করব তাদের পরম্পরাগত গ্রামসমাজের কাঠামোর মধ্যে ধৃত ছিল ভাষা, সংস্কৃতি, লোকপ্রজ্ঞার কী সম্পদ। তারপর হয়ত আমরা ফিরতে পারব প্রগতি সম্পর্কে উত্থিত প্রশ্নগুলোর বিবেচনায়।

আদি, আপাতনি, মিশমি, তাঙসা, নিশিং, তাগিন, তাওয়াং, সেরডুকপেন, মোনপা, মেয়োর, টুটসা ইত্যাদি প্রায় ২৬টি জনজাতিগোষ্ঠী অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা, যারা আবার প্রায় ৭০টি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। আমরা তাদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় গড়ে তোলার চেষ্টা করব। শুরু করা যাক আদি জনজাতিদের দিয়ে।

প্রথম পর্ব: আদি জনজাতিদের কথা

আদি জনজাতির মানুষরা বাস করে অরুণাচল প্রদেশের মাঝ-বরাবর অবস্থিত সিয়াঙ জেলায় সিয়াঙ ও সিয়াম নদীর অববাহিকা ঘিরে। আসামের উপত্যকার অধিবাসী ও ঔপনিবেশিক বা তৎপরবর্তী শাসকরা এদের 'আবোর' বলে ডাকত। 'আবোর' কথাটার মানে অবাধ্য, অদম্য বা বিশৃঙ্খল। আদিরা নিজেরা কখনোই এই নামে নিজেদের পরিচয় দিত না, এখনও দেয় না। আদি হিসেবেই তারা তাদের নিজেদের পরিচয় দেয়। তাই আমরাও আদি জনজাতি হিসেবেই তাদের পরিচয় চিহ্নিত করব। কিন্তু শাসকপক্ষের দিক থেকে দেওয়া 'আবোর' নামটার মধ্যে কিছু ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। সেই ইঙ্গিত থেকেই কথা শুরু করা যাক। শাসকপক্ষীয়দের চোখে যারা অবাধ্য, অদম্য বা বিশৃঙ্খল, তারা নিশ্চয়ই শাসকদের সঙ্গে কোনো দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের মধ্যে দিয়ে গেছে। আদি জনজাতির ক্ষেত্রে তেমন কী ঘটেছিল বোঝা যাক।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন এবং আদি জনজাতির মধ্যে প্রথম সংস্পর্শের চিহ্ন হিসেবে চারটি চিত্রকে সামনে রেখে আলোচনা শুরু করা যায়। চিত্রগুলি এখানে চিত্র ১, ২, ৩, ৪ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

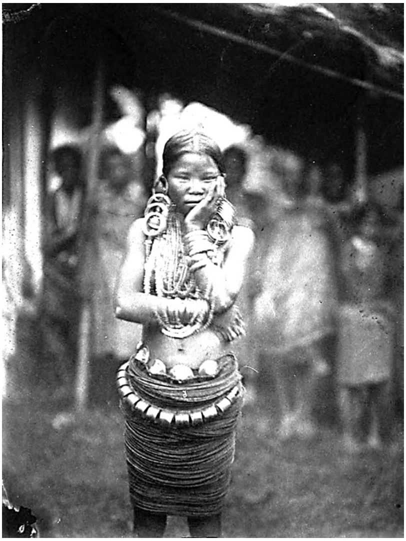

চিত্র-১: ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ

চিত্র-২: ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ

চিত্র-৩: ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ

চিত্র-৪: জানুয়ারি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম আলোকচিত্রটি ধর্মপ্রচারক রেভারেন্ড এডওয়ার্ড এইচ হিগস-এর তোলা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ডিবরুগড়-এর কাছে কোনো জায়গায়। চিত্রগ্রাহকের রেখে যাওয়া চিত্র-বিবরণ থেকে জানা যায় যে ছবিটি আবোর গোষ্ঠীর মানুষদের একজন গোষ্ঠীপ্রধান-এর কন্যার ছবি, ডিবরুগড়-এর উত্তরে যে পাহাড়ি অঞ্চল, সেখানে তাদের বাস।

দ্বিতীয় আলোকচিত্রটি অভিযাত্রী ডুগাল্ড ম্যাক্‌টাভিস লুমসডেন-এর তোলা ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। চিত্রগাহকের রেখে যাওয়া চিত্র-বিবরণ থেকে জানা যায় যে দৃশ্যটি কেবাঙ গ্রামের গ্রামপরিষদের। চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে সম্মিলিত গ্রামের মানুষদের মধ্যে বক্তব্য রাখছেন একজন, তিনি হলেন ‘গম’, বা গ্রামপ্রধান। কেবাঙ গ্রামটি আদি জনজাতিদের বসবাসের অঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম।

তৃতীয় আলোকচিত্রটি এর দুই বছর পর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ইংরেজদের সামরিক বাহিনীর কর্তা ক্যাপ্টেন ডি এইচ আর গিফোর্ড-এর তোলা বাহিনীর ‘আবোর এক্সপিডিশন’-এর স্মারক। ছবিটিতে পিছনের দিকে একটি গ্রামকে আগুনে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। গ্রামটি ওই কেবাঙ গ্রাম। চিত্রবিবরণী থেকে জানা যায় যে ছবিটির সামনের দিকের উর্দিধারীরা সব ইংরেজদের ‘অষ্টম গুরখা রাইফেলস’-এর জওয়ান যারা ইংরেজ শাসকদের পরিকল্পিত ‘আবোর এক্সপিডিশন’ বাস্তবায়িত করার জন্য কেবাঙ গ্রামটিকে ছারখার করে পুড়িয়ে দিয়েছে।

চতুর্থ আলোকচিত্রটি ঠিক তার পরের মাসে, অর্থাৎ ১৯১২-র জানুয়ারিতে তোলা। ছবিটি কার তোলা জানা যায় না, কেবল চিত্র-বিবরণী থেকে জানা যায় যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে সিয়াঙ-এর রিগা ক্যাম্পে বন্দী আবোরদের। অনুমান করা যায় যে ‘আবোর এক্সপিডিশন’-এ ইংরেজ বাহিনী যে আদি মানুষদের বন্দী করে এনেছিল তাদেরই এখানে দেখা যাচ্ছে। ছবিটিতে পুরুষ, মহিলা, শিশু সবাইকেই দেখা যায়।

প্রথম দুটি ছবিতে যদি অজানা অপর এক মানবগোষ্ঠীর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি প্রধান হয়, তাহলে পরের দুটিতে অপরকে পদানত করে আধিপত্যবিস্তারের হিংস্র উল্লাস-প্রধান। আর কৌতূহল থেকে হিংস্রতা অবধি এই যাত্রা পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ঘটেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রের সূত্রে আমরা আদিদের গ্রামপরিষদ, গ্রামপ্রধান, গোষ্ঠীপ্রধান কথাগুলো পাচ্ছি। কী এদের তাৎপর্য? ভেরিয়ার এলউইন-এর ১৯৫৮ সালে লেখা 'এ ফিলজফি ফর নেফা' বইতে আদিদের গ্রামপরিষদ সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। আদিদের ভাষায় এই গ্রামপরিষদকে 'কেবাঙ' বলে। উইলকক্স নামের এক ইউরোপীয় অভিযাত্রীর সাক্ষ্য এলউইন উদ্ধৃত করেছেন কেবাঙ সম্পর্কে বলতে গিয়ে। উইলকক্স ১৮২৫ সালে আদি জনজাতির গ্রামে গিয়েছিলেন এবং কেবাঙ-এর সভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, একজন গ্রামপ্রধান বা 'গম' কয়েকবার হাঁক পেড়ে গ্রামের মানুষকে সভায় ডাকে। সবাই সমবেত হলে গম প্রথাগত ভঙ্গিতে সকলের কাছে তার বক্তব্য সবিস্তারে রেখে আলোচনার সূচনা করে। এই বক্তব্য রাখার সময় সে একটানা দাঁড়িয়ে তার ডান পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে থাকে। এরপর সবাই বিতর্কে অংশ নেয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শেষে ভোট হয়। সবার সমান ভোট, তবে অন্যদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা কারো কারো অন্যদের চেয়ে বেশি।

উইলকক্স-এর এই বিবরণের পর এলউইন উদ্ধৃত করেছেন ফাদার ক্রিক-এর বিবরণ। ধর্মপ্রচারক ফাদার ক্রিক ১৮৫৩ সালে, অর্থাৎ উইলকক্স-এর ২৮ বছর পরে আদিদের গ্রাম মেম্বো-তে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কেবাঙ-এর সভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, সভা হচ্ছিল এক বড় সভাঘরের মধ্যে, সভাঘরের কেন্দ্রে একটি বৃত্ত তৈরি করে বসেছিলেন ছয়জন গ্রামপ্রধান, যাদের পরিধানে জাঁকজমকপূর্ণ প্রথানুগ পোষাক। সেই বৃত্তকে ঘিরে সমবেত গ্রামের পুরুষরা। সভায় বক্তৃতা হল, সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য ভোট হল এবং তারপর প্রধানজনেরা বাকি সভার থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য। ক্রিক-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, গ্রামের প্রতিটি প্রাপ্তমনস্ক পুরুষই কেবাঙ-য়ে অংশ নেওয়ার অধিকারী, কিন্তু গ্রামের মহিলারা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রতিটি গ্রামই স্বয়ংশাসিত ও স্বাধীন এবং কেবাঙ-ই হল সেই স্বয়ংশাসনের কেন্দ্র। প্রতিটি গ্রামে গ্রামবাসীরা পাঁচ থেকে ছয়জন গ্রামপ্রধান নির্বাচন করে। নির্বাচিত গ্রামপ্রধানরা সাধারণত আজীবন কেবাঙ-এর সভা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে ও যৌথজীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে নেতৃত্ব দেয়। কোনো একজন প্রধানের মৃত্যু হলে, তার ছেলেই

যে তার স্থলাভিষিক্ত হবে, তার কোনো মানে নেই, গ্রামবাসীরা আবার নতুন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেই স্থান পূর্ণ করবে। ক্রিক দেখেছিলেন যে প্রতি সন্ধ্যায় সমস্ত পুরুষ সমবেত হয় কেবাঙ-এর সভাঘরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্য। সেই আলোচনার বিষয় হতে পারে: ১। একে অপরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান ২। কোনো গ্রামপ্রধানের ওঠানো রাজনৈতিক প্রশ্ন ধরে আলোচনা, ৩। পরের দিন গ্রামবাসীদের কাজের পরিকল্পনা। এই আলোচনার শেষে প্রতিদিন রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে তরুণ যুবকরা গ্রাম ঘুরে হেঁকে ঘোষণা করে দেয়—'কাল শিকারের দিন', বা, 'কাল মাছধরার দিন', বা, 'কাল ক্ষেতে কাজের দিন', বা, 'কাল গেন্না (অর্থাৎ গণবসরের দিন)'! সেই অনুযায়ী গোটা গ্রামের যৌথজীবন পরের দিন নির্বাহিত হয়। ক্রিক লক্ষ্য করেছিলেন যে গ্রামের একটি নিজস্ব পাহারাদার বাহিনী আছে ১৮ বছরের বেশি সমস্ত তরুণদের নিয়ে। গ্রামের অবিবাহিত সমস্ত তরুণ যৌথভাবে একটি বড় ঘরে থাকে, অবিবাহিত তরুণীদের জন্যও আলাদা একটি বড় যৌথঘর আছে।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে দুইজন ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকের চোখে ধরা এই ছবির থেকে সাধারণ বিষয় হিসেবে উঠে আসে আদিদের গ্রামগুলোর স্বায়ত্তশাসনের গণ-রাজনৈতিক পরিসর। যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও যৌথভাবে তা কার্যকরী করার একটি লোকপরিসর আদিরা নির্মাণ করেছিল ও বহাল রেখেছিল। তাই তাদের অবাধ্য/বিশৃঙ্খল অর্থাৎ 'আবোর' বলা যায় কোন যুক্তিতে? ক্রিক তাঁর পর্যবেক্ষণে আদিদের নিজেদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার প্রতি প্রেম ও দায়বদ্ধতাবোধেরও উল্লেখ করেছিলেন। তাই বাইরের আধিপত্যবাদী শাসক যখন তার কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্য আদিদের পদানত করতে চেয়েছে, আদিদের স্বায়ত্তশাসনের লোকপরিসরকে খর্বিত করতে চেয়েছে, তখন আদিরা স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিরোধ করেছে তীব্রভাবে, প্রয়োজনে সশস্ত্রভাবে। শাসকদের বা আধিপত্য-বিস্তারেচ্ছুদের চোখে তাদের অবাধ্যতা বা বিশৃঙ্খলা বোধহয় এইখানেই।

উইলকক্স ও ক্রিক-এর বর্ণনার মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনই কিছু পার্থক্যও আছে। যেমন, উইলকক্সের বর্ণনা অনুযায়ী, গ্রামপ্রধান প্রয়োজন অনুসারে হাঁক দিয়ে কেবাঙ-এর সভা ডাকে, আর ক্রিক-এর বর্ণনা অনুযায়ী,

প্রতিদিন সন্ধ্যায় কেবাঙ বসার রীতি চালু আছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল এই যে ক্রিক বলেছেন যে কেবাঙ-এ মহিলাদের অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না, উইলকক্স তেমন কিছু বলেন নি। এই পার্থক্য পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণের আংশিকতার জন্য হতে পারে, আবার এ কারণেও হতে পারে যে বিভিন্ন আদি গ্রামের মধ্যে রীতি-নীতি-সংস্কারে মূলগত সাদৃশ্যের উপর দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্যও ছিল। দ্বিতীয়টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ আদি জনজাতিদের সবার মধ্যেই মহিলাদের কেবাঙ-এ অংশগ্রহণের অধিকার নেই এমনটা বলা যায় না, যেমন, আদিদেরই একটি উপগোষ্ঠী, মিনইয়ঙদের মধ্যে দেখা যায় যে কেবাঙ-য়ে অংশগ্রহণ করায় মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিচ্ছে, এমনকি গ্রামপ্রধানও নির্বাচিত হচ্ছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলোর জন্য আদি জনজাতি বলতে সমরূপীয় একধাঁচায়-বাঁধা কোনো মানবগোষ্ঠীর ধারণা করা ভুল হবে। আদি জনজাতি তার অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিন্যস্ত। আদি জনজাতির উপগোষ্ঠীগুলো হল :

১। **বোকার:** সিয়াঙ জেলার উত্তর-পশ্চিমে ৪০টি গ্রামে বোকারদের বাস। ১৯৮১-র জনগণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ৩,০৫২। তারা নিজেদের কার্বো কৌমের (ক্ল্যান-এর) উত্তরপুরুষ বলে মনে করে।

২। **বোরি:** সিয়াঙ জেলার উত্তর-পশ্চিমের দুর্গম অঞ্চলে ১২টি গ্রামে বোরিদের বাস। ১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ১,৮৫২। পশম ও কার্পাস তন্তু দিয়ে বস্ত্রবয়নে তারা দক্ষ। শিকার ও মাছধরা তাদের আদি জীবিকা। এছাড়াও এরা মিনইয়ঙ, গালঙ ও পশ্চিমের অন্য গোষ্ঠীদের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে মধ্যস্থতা করে।

৩। **কারকো:** সিয়াঙ জেলার পূর্বদিকে সিয়াঙ নদীর ডানপাশে ১,৬৭০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতায় জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে ৬-টি গ্রামে কারকোদের বাস। ১৯৮১-র জনগণনা অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা ১,৭৯৫। এরা নানা কৌমে (ক্ল্যান-এ) বিভক্ত। প্রতিটি কৌমের পৃথক আদিপুরুষ আছে, যে আদিপুরুষ থেকেই বংশানুক্রমে সেই কৌমের বিস্তার বলে তারা মনে করে। এই আদিপুরুষকে তারা বলে বোটুঙ। একই কৌমের মধ্যে

'পিনমিক' নামে নানা উপভাগে এরা বিন্যস্ত। কারকোরা নিজেদের মধ্যে, কিন্তু একই কৌমের বাইরে বিবাহ করে।

৪। **মিলাঙ:** সিয়াঙ জেলার মারিয়াঙ উপভাগের ৩-টি গ্রামে মিলাঙদের বাস। ১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ২,৫৯৫। 'মিলাঙ' নামে এক আদিপুরুষ থেকে বংশানুক্রমে তাদের বিস্তার বলে তারা মনে করে। তাদের লোকশ্রুতি অনুযায়ী, এই মিলাঙ জগতের প্রথম পুরুষ 'পেডঙ'-এর বংশধর, সেই বংশধারা এইরকম :

পেডঙ—>ডোডির—> ডিরবো—>বোমি—>মিলাঙ।

৫ ও ৬। **মিনইয়ঙ ও পদম:** আদিদের মধ্যে একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হল মিনইয়ঙরা। সিয়াঙ জেলার পশ্চিমে সিয়াঙ নদীর দুই দিকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের প্রায় ৭০-টি বড় গ্রাম। এই গ্রামগুলোতে প্রায় ৪০০-টি ঘরে তাদের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৭,০০০। তারাও নানা কৌমে বিভক্ত। তাদের সমাজে মহিলারা উচ্চ অবস্থান ভোগ করে। মহিলা শামান এবং কেবাঙ-এ মহিলা গ্রামপ্রধান দেখা যায়। সমরপ্রিয় ও সমরদক্ষ জাতি হিসেবেও তাদের খ্যাতি আছে। বিশ শতকের মাঝ বরাবর অবধি (ভারত সরকারের দ্বারা দাসপ্রথা বিলোপের উদ্যোগের আগে অবধি) তাদের সমাজে প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ভাবে দাস রাখার প্রচলন ছিল। যুদ্ধবন্দী অন্য জাতির মানুষ ছাড়াও, আদিদেরই অন্য একটি গোষ্ঠী 'পদম'-দের দাস করে রাখার চল ছিল। দাস হিসেবে রাখা মানুষজন বদ্ধশ্রম দিতে বাধ্য হতো, এছাড়া তারা গৃহস্থালির সাধারণ জীবনের অংশ হয়েই থাকত। পূর্বোল্লিখিত ধর্মপ্রচারক ক্রিক ১৮৫৩ সালে তাঁর পর্যবেক্ষণের উপর দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে পদমদের 'দাস' বললে তারা রেগে যায়, তারা নিজেদের স্বাধীন বলেই মনে করে, মিনইয়ঙদের সঙ্গে তদের সম্পর্ককে তারা স্বাভাবিক বলেই মনে করে। বর্তমানে পদমদের জনসংখ্যা প্রায় ৯,৫০০।

৭। **সিমোঙ:** কারকো ও টুটিঙ-এর মধ্যে সিয়াঙ নদীর উচ্চ অববাহিকায় নদীর বাঁ পাশে সিমোঙদের বাস। রীতি-নীতি-আচারে এরা প্রায় মিনইয়ঙ-দের মতো।

৮। **তাঙ্গাম:** সিয়াঙ নদীর উচ্চ অববাহিকায় কুগিয়াঙ, নিয়েরেঙ ও মায়ুঙ নামের তিনটে গ্রামে তাঙ্গামদের বাস। তাদের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৪০০। একসময়ে প্রায় ২৫টি গ্রাম জুড়ে ২০০০-এরও বেশি তাঙ্গামদের বাস ছিল, কিন্তু সিমোঙ-দের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধের কারণে তারা প্রায় মুছে যেতে বসেছিল। অবশিষ্টজনেদের বংশধররাই এখন ওই তিনটে গ্রামে বাস করে।

এছাড়াও ডোবাঙ, পাঙ্গি, পালিবো ইত্যাদি আরও কিছু উপগোষ্ঠী আছে আদি জনজাতিদের মধ্যে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে আদি জনজাতির বিভিন্ন উপগোষ্ঠী প্রধানত আলাদা আলাদা ভৌগোলিক অঞ্চলে তাদের বাসবাস গড়ে তুলেছে। সিমোঙ ও তাঙ্গামদের উদাহরণ থেকে এও বোঝা যায় যে এই বসবাসের এলাকার দখল নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ, এমনকি বিধবংসী হানাহানিও হয়েছে। বসবাসের এলাকার সঙ্গে আদি জনগোষ্ঠীদের এই সম্পর্ক বোঝার জন্য আদিদের মধ্যে প্রচলিত একটি লোককথার দিকে ফিরে তাকানো যাক।

লোককথাটি গামেঙ গ্রামের বোরি-দের কাছ থেকে ভেরিয়ার এলউইন সংগ্রহ করেছিলেন ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে এবং 'মিথস অফ দি নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া' বইতে সংকলিত করেছিলেন (পৃ. ১০৮)। লোককথাটি এইরকম:

> পাঁচ ভাই ছিল। তাদের নাম ছিল ইয়াইয়িং, নিজো, ইয়েবু, নিতান ও নিগাঙ। এই পাঁচ ভাই গেলিঙ-এর ওপার থেকে টুটিঙ-এ আসে ও সেখানেই থিতু হয়ে বসবাস করবে বলে ঠিক করে। কিন্তু মেম্বা-রা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে ও তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। পাঁচ ভাই তখন ঘুরতে ঘুরতে জানবো বলে এক জায়গায় এসে পৌঁছয়। নিজো-র এই জায়গাটিকে খুব ভালো লাগে এবং সে বলে, 'আমি এখানেই থাকব।' তাকে ওখানে রেখে বাকি চার ভাই আবার ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছয় কারকো-তে। তাদের চারজনেরই কারকোকে খুব ভালো লাগল এবং সেখানেই তারা ঘরবাড়ি বেঁধে থিতু হয়ে থাকতে লাগল। কারকোয় থাকাকালীন তারা ডোগিনের উদ্দেশ্যে বলিদান দেবে বলে ঠিক করল।

এই বলিদানে রীতি হল দুটো পুরুষ মিঠুনকে (এক প্রজাতির বাইসন) একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে তারপর তাদের বলি দেওয়া। মিঠুনদুটো যখন একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তখন একটা মিঠুনের পা মাটিতে গেঁথে গেল এবং সেইখান থেকে জলের ফোয়ারা বেরিয়ে এল। এর ফলে সবার মনে হল যে সেইখানে নিশ্চয়ই কোনো বিপজ্জনক উইয়ু Wiyu-আত্মা, শুভ বা দুষ্ট দুইই হতে পারে) বাস করে এবং সেই ভয়ে তারা সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেল। কেবল ইয়েবু সেখানে রয়ে গেল এবং তার থেকেই মিনইয়ঙ জনজাতি গড়ে উঠল।

বাকি তিন ভাই আবার ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছল এক জায়গায় যার নাম ইউয়িঙ-কেবে-রন্নে। ইয়াইয়িং বলল, 'আমার এই জায়গা ভালো লাগছে না, আমি চললাম।' কিন্তু নিতান এবং নিগাঙ-এর মনে হল যে জায়গাটা কৃষিকাজের জন্য খুব ভালো আর তাই তারা সেখানেই থেকে গেল।

ইয়াইয়িং ও তার পরিবার আবার ঘুরতে ঘুরতে টুলুঙ বলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছল এবং সেখানেই ঘর বাঁধল। কিন্তু কামকিঙ-এর গালোঙ-রা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দিল। বিতাড়িত হয়ে তারা নদী উপত্যকা ধরে আরও উপরদিকে যেতে যেতে গামেঙ-এ এসে পৌঁছল এবং এখনও সেখনেই তারা থাকে।

গামেঙ-এ জনবসতি গড়ে তোলার পর তারা পায়ুম-এর মানুষজনের সঙ্গে যুক্তভাবে তাগিন-দের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাগিনদের এই অঞ্চলের বাইরে বার করে দেয়।

লোককথাটির মধ্যে লোকইতিহাসের বুনট খেয়াল করা যায়। অনুমান করা যায় যে আদি জনজাতিদের পূর্বপুরুষরা খুব সম্ভবত বহু বহু দিন আগে তিব্বতের দিক থেকে এসেছিল। আরও খেয়াল করা যায় যে আদি জনজাতি তাদের মধ্যের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীকে পাঁচ ভাইয়ের বংশধারা হিসেবে ভাবে, যারা খুব সম্ভবত তিব্বতের কোনো জায়গা থেকে এসে এই অঞ্চলে বসতস্থাপন করেছিল। আর প্রত্যেকটি জনজাতির পৃথক বসবাস-অঞ্চলকে সেই স্থান হিসেবে গণ্য করে যেখানে তাদের বংশধারার আদিপুরুষরা প্রথম মনুষ্যবসতি স্থাপন করেছি। এর ফলে তাদের বসবাস-অঞ্চল তাদের কাছে কেবলমাত্র জল-জমি-জঙ্গল-

শস্যক্ষেতের প্রাকৃতিক ভাণ্ডার নয়, তাদের কাছে তা তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি-কীর্তি ও মৃত্যু-পরবর্তী উপস্থিতির স্থান। তাই সেই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হলে বা সেই অঞ্চলের উপর দখল হারালে তাদের কেবল বস্তুগত ক্ষতি, অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করার অধিকার হারানোর ক্ষতি হয় না, আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক শিকড় উপড়ে যাওয়ার অপূরণীয় ক্ষতিও হয় পূর্বপুরুষদের স্মৃতি-কীর্তি ও মৃত্যু-পরবর্তী উপস্থিতির সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। এর ফলে প্রতিটি জনগোষ্ঠী মনে করে যে তাদের টিকে থাকা নির্ভর করছে তাদের বসবাসের অঞ্চলের উপর তাদের দখল বজায় থাকার সঙ্গে। বসবাস অঞ্চলের উপর দখল রাখার জন্য তাই সর্বশক্তি জড়ো করে তারা লড়তে প্রস্তুত।

বসবাস অঞ্চলের সীমানা নদী-জঙ্গল-পাহাড়ের প্রাকৃতিক চিহ্ন দিয়ে লোকশ্রুতিতে রক্ষিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা যদি একটা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন নতুন বাস্তুভিটের খোঁজ বা ঝুম (বন কেটে ও পুড়িয়ে সাময়িকভাবে পরিষ্কার করা জমিতে চাষ)-এর নতুন জমির খোঁজ সেই সীমানায় টান ফেলে, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ ও তা অসমাধিত থেকে গেলে সংঘাতের জন্ম দেয়। এছাড়াও অন্য কোনো জায়গা থেকে আসা কোনো জনগোষ্ঠী নতুন করে থিতু বাস তৈরির জন্য আগে থেকে বসত করা অন্য জনগোষ্ঠীর এলাকায় ঢুকলেও সংঘাত তৈরি হয়। এই সংঘাতের কাহিনিও লোককথাটির মধ্যে বোনা আছে।

আদি জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত লোকইতিহাস অনুযায়ী, সিয়াঙ-এর প্রায় প্রতিটি গ্রাম তাদের কোনো না কোনো গোষ্ঠীর বা কৌমের আদিপুরুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সেই আদিপুরুষরাই সেই সব জায়গায় জঙ্গল কেটে প্রথম মানুষের বসত বসিয়েছিল আর তাই সেই জমি-জঙ্গলের আদি স্বত্ব তাদের। সেই আদিপুরুষদের কৌমের বংশধররাই উত্তরাধিকারসূত্রে সেই জমি-জঙ্গলের স্বত্বের অধিকারী। কোনো অন্য কৌমের মানুষ যদি পরে এসে সেই গ্রামে বা এলাকায় বসত স্থাপন করতে চায়, তবে তারা জমি-জঙ্গলের ব্যবহারের অধিকারী হতে পারে একমাত্র সেই আদি স্বত্বাধিকারী কৌমের অনুমতিক্রমে। বাস্তবে যখন আদি স্বত্বাধিকারী কৌম ভিন্ন অন্য

কোনো কৌমের মানুষকে কোনো গ্রামের কেবাঙ সেই গ্রামে থাকার অনুমতি দেয়, তখন সেই পরিবারকে বলা হয় জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন কোনো বসতভিটে গড়ে নিতে, বা, বেশ কিছুদিন অব্যবহারে পড়ে থাকা পুরানো কোনো বসতভিটেয় নতুন করে বসত বাঁধতে, বা, আদি স্বত্বাধিকারী কৌমের কোনো পরিবারের দখলে ব্যবহার-অতিরিক্ত কোনো জমি থাকলে তা ধার নিতে। যেটাই হোক না কেন, এই অন্য কৌমের অধিবাসী ততদিন অবধিই এই দখলীস্বত্বের অধিকারী যতদিন অবধি সে নিজে সেখানে জীবিত অবস্থায় বাস করছে। সে মারা গেলে, তার বংশধররা সেই স্বত্ব ভোগ করবে যদি গ্রামের কেবাঙ বিচার করে তার অনুমতি দেয়, তবেই। আর সে গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলে তার দখলে থাকা ভিটে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে।

প্রতি বছর কোন্ কোন্ জমিতে ঝুম চাষ করা হবে তা গ্রামের কেবাঙ-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেবাঙ-এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর ঘোষকরা রাতে ঘুরে ঘুরে সারা গ্রামে তা জানিয়ে দেয়। পরের দিন সেই নির্দিষ্ট জমিতে গোটা গ্রামের মানুষ সমবেত হয়ে চাষের প্রক্রিয়া শুরু করে। ঝুম চাষের প্রক্রিয়া গোটা গ্রামের মানুষের যৌথশ্রমের প্রক্রিয়া, তা কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিগোষ্ঠী বা পরিবারের পৃথক উদ্যোগে হওয়া সম্ভব নয়।

আদি জনজাতির বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যে ঝুম চাষের রীতিনীতি, প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতায় কিছু কিছু ফারাক আছে, তবু সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা তৈরি করার জন্য আদিদের সবচেয়ে বড় উপগোষ্ঠী মিনইয়ঙ-দের অনুসৃত ব্যবস্থাটা কীরকম দেখা যাক।

ঝুমচাষের জন্য ব্যবহৃত জমিকে বলে 'পাটাট' বা 'রিক্টাট'। এক একটি 'পাটাট' বা 'রিক্টাট' তিন বছর চাষ করার পর সেইটি বেশ কিছু বছরের জন্য অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়, তার উপর বন-জঙ্গল গজিয়ে যায়, তারপর গ্রামের কেবাঙ-এর শামান ও গ্রামপ্রধানদের হিসাব অনুযায়ী চাষ-চক্রের সময় (তাদের ভাষায়, 'রিক্টাট পাসুপ') পূর্ণ হলে তবে আবার সেই রিক্টাট-এ জঙ্গল পরিষ্কার করে আবার চাষ করা হয়। কোনো রিক্টাট-এ প্রথম বছরের চাষকে বলে 'রিকপা' আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের চাষকে বলে 'রিগাঙ'। কোনো

রিক্টাট-এ তৃতীয় বছরের চাষ, অর্থাৎ, দ্বিতীয় রিগাঙ চলার বছরই অন্য একটি রিক্টাট-এ প্রথম বছরের চাষ, অর্থাৎ রিকপা চালু করা হয়। এক-একটি গ্রামের এমন একাধিক রিক্টাট থাকে, যেমন বেগিঙ গ্রামের ছয়টি রিক্টাট আছে, রিউ গ্রামের আছে দশটি। বাইরে থেকে কোনো সার ব্যবহার করা হয় না, প্রাকৃতিক উপায়েই কর্ষিত জমির উর্বরতা আবার ফিরে আসতে দেওয়ার জন্য এই চাষ-চক্রের পদ্ধতি।

আগেকার দিনে, গ্রামের প্রতিটি মানুষের মুখস্থ থাকত গ্রামের কোন রিক্টাট চাষ-চক্রের কোন্ অবস্থায় আছে। রিক্টাট পাসুপের সময়কাল মানুষের বয়স হিসেবের একক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। একটি রিক্টাট পাসুপ পার করেছে যে মানুষ, তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে ধরা হতো, তিনটে রিক্টাট পাসুপ পার করলে বৃদ্ধাবস্থা, আর খুব কম মানুষই পাঁচটা রিক্টাট পাসুপ পার করতে পারত। এখনও গ্রামের বয়স্কজনেরা বয়সের হিসাব এইভাবেই রাখে।

রিক্টাট পাসুপ-এর সময়কাল অবশ্য সব গ্রামে একইরকম নয়। জমির উর্বরতা, গ্রামের জনসংখ্যার চাপ, হাতে থাকা রিক্টাটের সংখ্যা—এই সবের উপর নির্ভর করে রিক্টাট পাসুপ-এর দৈর্ঘ্য বদলে যায়। রিউ গ্রামে যেমন এখন রিক্টাট পাসুপের দৈর্ঘ্য ২১ বছর, কোমসিঙ গ্রামে ২৫ বছর, আবার বেগিঙ গ্রামে ১৩ বছর।

প্রকৃতির চক্রের তালে বাঁধা মিনইয়ঙদের জীবনধারার একটা চিত্র এইভাবে তুলে ধরা যায়:

ঋতু	আমাদের পঞ্জিকা	কৃষিকাজ
ডঙগুপ	জিনমুর (জানুয়ারি)	জোয়ার ফসলের শস্যসংগ্রহের কাজ শেষ করা, পুঁতি হিসেবে ব্যবহৃত ঘাসের বিচি সংগ্রহ শেষ করা, ঘর তৈরি বা সারাইয়ের রসদ সংগ্রহ।
	কোমবোঙ (ফেব্রুয়ারি)	ধানচাষের প্রস্তুতি।
	গালিঙ (মার্চ)	পরবর্তী পাটাট তৈরির কাজ, ঘর তৈরি ও সারাই শেষ করা, ‘উনয়িঙ’ ও ‘মোনপু’ উৎসব পালন।

ঋতু	আমাদের পঞ্জিকা	কৃষিকাজ
লোবো	লুকিঙ (এপ্রিল)	রিকপা-র কাজ।
	লোবো (মে)	দ্বিতীয় বছর রিগাঙ হয়ে যাওয়া জমিকে অকর্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখার জন্য তৈরি করা, ধান বোনা, বেড়া দেওয়া।
	য়িলো (জুন)	পুঁতি হিসেবে ব্যবহৃত বিচি দেয় যে ঘাস, তা বোনা, জোয়ার বোনা, 'ইটর' উৎসব পালন।
গাদি	টান্নো (জুলাই)	জমির আগাছা সাফ, ফসল পরিচর্যা, 'সোলুঙ' উৎসব পালন, ভুট্টা ফসল সংগ্রহ।
	য়িও (অগস্ট)	দ্বিতীয়বার জমির আগাছা সাফ।
	য়িতে(সেপ্টেম্বর)	জোয়ার ফসল সংগ্রহ, শাকসবজির জন্য ঝুম চাষ।
ডিগিন	আও (অক্টোবর)	ধানের ফসল সংগ্রহ শুরু, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ।
	আনে (নভেম্বর)	ধানের ফসল সংগ্রহ শেষ করা।
	বেসটিঙ (ডিসেম্বর)	জোয়ার ফসলের শস্যসংগ্রহের কাজ শুরু করা, পুঁতি হিসেবে ব্যবহৃত ঘাসের বিচি সংগ্রহ শুরু করা।

ঝুম চাষের ফসলের পাশাপাশি জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা খাদ্য, শিকার, গৃহপালিত মিথুনের মাংস—এইসবের মধ্য দিয়ে আদিরা খাদ্যে প্রায় স্বনির্ভর। কেবল নুনের জন্য তাদের পরের উপর নির্ভর করতে হয়েছে প্রথমে থেকেই, আর তার মধ্য দিয়েই বুঝি আদিদের সঙ্গে অন্যদের আদান-প্রদান বাণিজ্যের শুরু। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাদের লোককথা থেকেই। আদিদের মধ্যের বোরি উপগোষ্ঠীর মানুষদের কাছ থেকে ভেরিয়ার এলউইন-এর সংগ্রহ করা এমন দুটি লোককথা দেখা যাক।

প্রথম লোককথা

অনেক দিন আগের কথা। দুই ভাই টানি ও টারো-র মধ্যে খুব ঝগড়া হয়েছিল। টারো তার ফলে গ্রাম ছেড়ে মিমেট (তিব্বত)-এর দিকে পাড়ি

দিল। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের উপর ঘুরতে ঘুরতে, বিশাল বিশাল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একদিন তার এক সাদা চামড়ার মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। সেই মেয়ের মাথার লম্বা চুল প্রায় মাটি ছুঁয়েছে, তার নাক বিশাল বড় আর দাঁতগুলো বড় বড় আর ধারালো। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও টারো তাকে বিয়ে করল। তার গর্ভে টারোর সন্তানও হল। তারপর একদিন টারোর বউ মারা গেল। টারো তার মৃতদেহ জঙ্গলের মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানেই তাকে কবর দিল।

এইদিকে, টারো চলে যাওয়ার পর টানি তার ভাইয়ের অভাব বোধ করতে লাগল। একদিন সে ঠিক করল যে সে টারোকে খুঁজতে বেরোবে। সে বেরিয়েও পড়ল এবং তিব্বতের পথ ধরল। যেতে যেতে সে এসে পৌঁছল ঠিক সেই জায়গায় যেখানে টারো তার বউকে কবর দিয়েছে। তার খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল কিন্তু চারিদিকে কোথাও জল ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে সে সেই কবরে এসে সেখানে এক ছোট ফোয়ারা দেখতে পেল। সেই ফোয়ারার জলই সে আঁজলা ভরে খেল। কেমন অদ্ভুত স্বাদ সেই জলের। সে দেখল যে সেই ফোয়ারার দুইদিকে সাদা কিছু গুঁড়ো ঢিপি হয়ে আছে। সে তার স্বাদ নিল, সেই নোনতা স্বাদ তার বেশ ভাল লাগল। সে বোঝা ভর্তি করে সেই সাদা গুঁড়ো নিয়ে ফিরে এল ঘরে, তার ভাইয়ের কথা ভুলে গিয়ে। টারোর বংশধররা এখনও তিব্বতে থাকে, তাই তিব্বতের মানুষদের কাছে নুন পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় লোককথা

বহু দিন আগে বোরিরা নুন পেত না। বর্ষাকালে যখন সিকে নদীতে বান ডাকত, তখন সেই বানের জলে উপর থেকে কাঠের কাটা টুকরো ভেসে আসত। নিশ্চয়ই কোনো মানুষ এই কাঠ কেটেছে! তাই বোরিরা নিশ্চিত হল যে উপরদিকে উত্তরে নিশ্চয়ই মানুষের বাস আছে। সেই মানুষদের খোঁজে কিছু বোরি নদীর উজান বেয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে উত্তরদিকে যেতে লাগল। যেতে যেতে তারা মিমেট (তিব্বত)-এ পৌঁছল। এখন যেমন মিঠুনকে অল্প নুন খাওয়ানো হয়, মিমেটের লোকেরা তেমন প্রথমে বোরিদের অল্প নুন দিল স্বাদ নেওয়ার জন্য। তারপর তারা দেখাল তাদের তৈরি পশম-তন্তু, নৌকা আর জামা। কিছু নুন তারা নিয়ে আসার জন্যও

দিল। সেই বোরিরা যখন গ্রামে ফিরে এল, তখন গ্রামের সবাই অবিবাহিত পুরুষদের যৌথঘরে সমবেত হল। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই তাদের আনা নুন খেয়ে দেখল। সবারই খুব ভাল লাগল। আরও নুন পেতে হবে বলে তারা ঠিক করল। সুতরাং তারা বাঁশের কঞ্চি, লতাপাতা সংগ্রহ করে মিমেট-এ নিয়ে গেল ও তার বিনিময়ে নুন সংগ্রহ করল। পরের বার মিমেট-এ যাওয়ার সময় তারা পশুর চামড়াও নিয়ে গেল এবং তার বিনিময়ে পশমের লম্বা জামাও নিয়ে এল। পরে তারা মিমেট-এ যাওয়ার সময় আরও পশুর চামড়া ও ধানও নিয়ে যেত। তখন তিন বোঝা ধানের বিনিময়ে এক বোঝা নুন পাওয়া যেত।

মিমেট থেকে পাওয়া বস্তু নিয়ে বোরিরা রিগা এবং কেরাঙ গ্রামের মিনইয়ঙদের কাছেও যেত। মিনইয়ঙরা নুন পেতে এতই আগ্রহী ছিল যে এক সময়ে তারা নুনের বিনিময়ে মিঠুনও দিত বোরিদের।

একবার গাসেঙ ও পায়ুঙ-এর লোকেরা যখন বিপুল পরিমাণ বস্তু নিয়ে মিমেট-এ গেল বিনিময়ের জন্য, তখন মিমেটের মানুষরা তাদের দুইজনকে হত্যা করে সব বস্তু চুরি করে নিল। বোরি যোদ্ধারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জোট বেঁধে মিমেট গেল। মিমেট-এর লোকেরা তখন তাদের কাজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করল আর বলল যে ঝগড়া টিকিয়ে না রেখে দুই পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া উচিত। বিনিময়ের হারও আরও ভাল করতে তারা রাজি হল। তারা বলল যে দুই বোঝা ধানের বিনিময়েই তারা একবোঝা নুন দেবে। বিনিময়ের এই হারই এখনও চলছে। পরে বোরিরা শুনতে পেল যে পাসিঘাট-এও নুন পাওয়া যায়। শুনে তারা নুন আনতে পাসিঘাটেও যেতে শুরু করল। কিন্তু প্রথম দিকে সমতল থেকে পাওয়া নুনের স্বাদ তাদের ভাল লাগত না, মিমেট থেকে পাওয়া নুনের স্বাদই সবচেয়ে ভাল বলে এখনও তারা মনে করে। ধীরে ধীরে অবশ্য পাসিঘাট থেকে পাওয়া নুনের জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল আর আজ বোরিরা তাদের নুনের বেশিরভাগ পায় কখনও আলোঙ থেকে, কখনও মিনইয়ঙ মধ্যবর্তীদের কাছ থেকে।

এই দুটো লোককথা থেকে আমরা কী ধারণা তৈরি করতে পারি দেখা যাক। বোরিদের পরম্পরাগত বাসস্থান সিয়াঙ জেলার উত্তর প্রান্ত বরাবার। এই উত্তর প্রান্ত তিব্বত (তাদের ভাষায় মিমেট) সংলগ্ন। ফলে আদি জনজাতিদের মধ্যে

বোরিদের সঙ্গেই সম্ভবত তিব্বতিদের আদানপ্রদান প্রথম নিয়মিত চেহারা নেয়। তিব্বতিদের কাছ থেকেই তারা প্রথম নুন পায় ও নুনের ব্যবহার শেখে। প্রথম লোককথাটিতে দেখা যাচ্ছে যে বোরিরা নুনের সঙ্গে তাদের এক সুদূর পূর্বপুরুষ টারো-র সম্প্রদায়-বহির্ভূত বউয়ের কবরস্থ দেহাশ্মের সম্পর্ক তৈরি করেছে। কৌতূহল জাগে যে এই সম্পর্ক তৈরির কারণ কী? নেহাতই তিব্বতিদের একটি বস্তু না হয়ে নুনকে নিজেদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে কোনো এক ভাবে সম্বন্ধিত হতে হবে কেন? যে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার পূর্বপুরুষদের দ্বারা স্থাপিত ও তৎপরবর্তীতে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বলে মনে করে বলেই কি অপরের কাছ থেকে পাওয়া নুনের ক্ষেত্রেও এমন এক লোককথার গঠন হল? আরো কৌতূহল জাগে যে টারোর বউয়ের চুল-নাক-দাঁত অমন অস্বাভাবিক হতে হল কেন? নিজস্ব গোষ্ঠীর বাইরে বিয়েকে অস্বাভাবিক হিসেবে দেখানোর জন্যেই কি? দ্বিতীয় লোককথাটি থেকে ইতিহাসের কথা তুলনায় অনেক প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় বলে মনে হয়। কীভাবে তিব্বতিদের সঙ্গে প্রথম বিনিময় হল, কী কী বিনিময় করা হতো, বিনিময়ের হারই বা কেমন ছিল, তিব্বতিদের কাছ থেকে আনা নুন কীভাবে অন্য আদি জনগোষ্ঠীদের সঙ্গেও বিনিময়ের বস্তু হয়ে উঠল—এইসবের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটা আদল পাওয়া যায় বলেই মনে হয়। পাসিঘাট-এর প্রসঙ্গটি খেয়াল করার মতো। পাসিঘাট হল সিয়াঙ দক্ষিণপূর্বে আসাম-সংলগ্ন একটি জায়গা, এখানে তাই বিনিময় অসমিয়াদের সঙ্গে হতো। ফলে বোঝা যায় যে তিব্বতিদের সঙ্গে বিনিময়ের বহু বছর পরে সিয়াঙ জেলার দক্ষিণের বাসিন্দাদের সঙ্গে অসমিয়াদের বিনিময় শুরু হয়, এবং তাও ওই নুনকে কেন্দ্র করে। দক্ষিণে অসমিয়াদের সঙ্গে এই বিনিময়ে বোরিরা মূল ভূমিকা নিত না, নিত মিনইয়ঙরা (সম্ভবত পদমরাও), যারা সিয়াঙ-এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থাকত। মিনইয়ঙদের কাছ থেকেই বোরিরা বা উত্তরের অন্য বাসিন্দারা আবার বিনিময়ের মাধ্যমে আসামের নুন বা অন্য বস্তু পেত। ক্রমশ উত্তর সীমান্তে বিনিময়ের তুলনায় দক্ষিণ সীমান্তে বিনিময়ের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এইভাবে আমরা ধারণা করতে পারি যে নুনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তিব্বতি ও পরে অসমিয়াদের সঙ্গে যেমন আদিদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তেমনই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় ও পরস্পর-নির্ভরতাও গড়ে উঠেছিল।

তাই আদি জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যেমন স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য ছিল, তেমনই পরস্পর-সম্পর্ক ও আদানপ্রদানও ছিল। তার ছাপ পড়েছে তাদের ভাষাতেও। আদি জনগোষ্ঠীদের মাতৃভাষাগুলোকে একটি আদি ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত হিসেবে ধরা যায়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনই সাযুজ্য ও পরস্পর-বোধ্যতাও আছে। এমন পাঁচটি ভাষা আমরা এখানে বিবেচনা করব। ভষাগুলি হল: বোকার, বোরি, কারকো, মিলাঙ ও তাঙ্গাম।

প্রথমে দেখা যাক ভাষাগুলোয় সর্বনাম ব্যবহার:

ভাষার নাম	সর্বনাম					
	আমি	তুমি	সে	আমরা	তোমরা	তারা
বোকার	গোঁ	লানয়ি	লাকুম	গোঁনয়ি (২জন) গোঁলু (২-এর বেশি)	মানয়ি (২জন) মালু (২-এর বেশি	মেনয়ি (২জন) মালু (২-এর বেশি)
বোরি	গোঁ	নো	বি	গোঁলু	নোলু	বুলু
কারকো	গোঁ	নো	বিই	গোঁনয়ি (২জন) গোঁলু (২-এর বেশি)	নোনয়ি (২জন) নোলু (২-এর বেশি	বিনয়ি (২জন) বুলু (২-এর বেশি)
মিলাঙ	গাঁ	গিঁ	জি	গাঁজি	ন্যা	জাজি
তাঙ্গাম	গোঁ	নো	নোডি	গোঁরু	নোরু	ডাটাঙ-মেরু

খেয়াল করা যায় যে ‘আমি’ সর্বনাম প্রায় সবক্ষেত্রেই একরকম, অন্যগুলোর ক্ষেত্রে পার্থক্য চলে আসছে। বহুবচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো যে কিছু ভষায় ২ জন ও ২-এর বেশি জন বোঝাতে আলাদা শব্দ ব্যবহারের চল আছে। এবার দেখা যাক গণনার ক্ষেত্রে রীতি কী রকম।

সংখ্যা	ভাষার নাম				
	বোকার	বোরি	কারকো	মিলাঙ	তাঙ্গাম
এক	আকেন	আকোন	আতের	আকান	য়োকোন
দুই	আনয়ি	আনয়ি	আনয়ি	নে	য়োঙ্গি
তিন	অউম	আওন	আরুম	হাম	য়োদেন
চার	আপ্পি	আপ্পি	আপ্পি	পে	য়োপি
পাঁচ	ওঙ্গো	এঙ্গো	পির্নগো	পাঙ্গু	য়োঙ্গো
ছয়	আক্কি	আক্কে	পির্কয়াঙ	সাপ	য়োঙ্গকুঙ
সাত	কিনি	কিনিট	কিনিট	রাঙ্গাল	কেনে
আট	পিনয়ি	পিনয়ি	পিনয়ি	রায়েঙ	পিনয়ি
নয়	নোনোঙ	কোনাঙ	কোনাঙ	কান্যেম	কোনাঙ
দশ	ঈয়িঙ	ঈয়িঙ	ঈয়িঙ	হাঙটাক	আইঙ
এগার	ঈয়িঙ	আকোন	ঈয়িঙ	হাঙটাক	আইঙ্গেটলা
	গোলা	কু	কোলাঙ	কালো	য়োকেন
	আকেন		আতের	আকান	

দশ এবং এক-কে ব্যবহার করে যেভাবে এগার করা হয়েছে, সেভাবেই বারো এবং তার পরের সংখ্যার গুনতি চলে উনিশ অবধি, তারপর কুড়ি-র জন্য একটি শব্দ, তারপর কুড়ি এবং এক, কুড়ি এবং দুই করে গুনতি চলতে থাকে। দেখা যায় যে গুনতির এই রীতিতে সব ভাষার মধ্যেই সাযুজ্য আছে, কিছু কিছু সংখ্যার নামও একইরকম, কিন্তু আবার ভাষায় ভাষায় ভেদও আছে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যেই গণনার মৌলিক কাঠামোটি স্বকীয় চেহারায় হাজির।

এই ভাষাগুলোর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য খেয়াল করা যেতে পারে। যেমন, তাঙ্গাম ভাষায়, বিশেষ্য অনুযায়ী বিশেষণের রূপ পাল্টে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কালো কুকুর হল আকে কেকা, কলো গরু হল রুনে রুকা, কালো পোষাক হল চিমান-নে আগিয়া। এখানে, আকে মানে কুকুর, রুনে মানে গরু, আগিয়া মানে পোষাক। দেখা যাচ্ছে কালো বিশেষণটি কুকুরের ক্ষেত্রে কেকা, গরুর ক্ষেত্রে রুকা আর পোষাকের ক্ষেত্রে চিমান-নে। বিশেষণের রূপ কেবল পাল্টে যাচ্ছে না,

বিশেষ্যর সাপেক্ষে তার অবস্থানও পাল্টে যাচ্ছে—যেমন, কুকুর ও গরুর ক্ষেত্রে তা বিশেষ্যর পরে বসছে, আর পোষাক-এর ক্ষেত্রে তা বিশেষ্যর আগে বসছে।

বিশেষণ ব্যবহারের আর একটি বিশেষত্বের উদাহরণ দেওয়া যায় বোরি ভাষা থেকে, যেখানে বিশেষ্য বস্তুটির আকৃতির উপর নির্ভর করে বিশেষণ বদলে যায়, যেমন, একটি দড়ি বোঝাতে সোকি আয়োঙ, আর একটি থালা বোঝাতে তালি বোরকেন। অর্থাৎ, লম্বা আকৃতির বস্তু হলে একটি বোঝাতে আয়োঙ ব্যবহৃত হয়, চ্যাপ্টা-গোল আকারের বস্তু হলে একটি বোঝাতে বোরকেন ব্যবহৃত হয়।

বোরি ভাষায় বাঁশ-এর জন্য অনেকগুলো শব্দ আছে, যেমন—ডিবাঙ, হেগু, হেপ, হেসো। এরা কিন্তু সমার্থক নয়, এরা বিভিন্ন ধরনের বাঁশের আলাদা আলাদা নাম। আমরা হয়তো সেইসব বাঁশের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারব না, কিন্তু বোরিদের মধ্যে পরম্পরাগতভাবেই গুণাবলী অনুযায়ী এইভাবে বাঁশের মধ্যে পার্থক্য করা ও সেই অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে তাদের কাজে লাগানোর জ্ঞান আছে।

মিলাঙদের মধ্যে আবার মিলাঙ ভাষা ছাড়াও একটি সাংকেতিক ভাষার চল আছে, যা গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রয়োজন হলে কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যেই তারা ব্যবহার করে।

লিঙ্গ পার্থক্য বোঝাতে এইসব ভাষাতে দুইরকম রীতিই আছে—পৃথক লিঙ্গের জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহার করা, অথবা মূল বিশেষ্যর সঙ্গে উপসর্গ বা অনুসর্গ জুড়ে লিঙ্গ বোঝানো। প্রতিটি ভাষাতেই মূলত কর্তা-কর্মপদ-ক্রিয়াপদ এই বিন্যাসে বাক্য গঠন করা হয়।

আদি ভাষাগোষ্ঠীর এই ভাষাগুলি লিপিহীন বা লিখনরীতিহীন কথ্যভাষা। গ্রামে গ্রামে মানুষের মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে বয়স্কজনেদের স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়ে আছে কাহিনি, ইতিকথা, রূপকথা, ছড়া, গান, প্রবাদ-প্রবচনের বিপুল ভাণ্ডার। আভাঙ হল আদিদের পৌরাণিক কাহিনি। এই অঞ্চলের ইতিহাসের আকরিক রূপ এই আভাঙগুলোই।

এতক্ষণ অবধি আমরা দেখলাম যে আদি জনজাতির মানুষরা স্বকীয় সমাজ-সংগঠনের আধারে স্বাধীন জীবনাচরণের একটা পরম্পরা নির্মাণ করেছিল।

কিন্তু যে ছবি চারটি থেকে আমরা আদিদের সঙ্গে পরিচয় শুরু করেছিলাম, তার তৃতীয় ও চতুর্থ ছবিটি যে ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে তা কী ভাবে ঘটল তা আমরা এখনও আলোচনা করি নি। কোন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে ইংরেজদের 'আবোর এক্সপিডিশন'-এ আদিদের গ্রাম পুড়ে ছাই হল, দলে দলে আদিদের বন্দী হতে হল ইংরেজদের বন্দিশিবিরে, আর তারপর কী হল, এখন সেই আলোচনায় আসা যাক।

১৮২০-র দশক থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা আসামের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে। ক্রমশ আদিবাসী এলাকার জমি দখল করে চা-বাগান বসানোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ প্রশাসন। তখনই সংঘর্ষকে বড় রূপ দিতে না চাওয়া ব্রিটিশ প্রাশাসন ১৮৭০-এর দশকে আদিবাসীদের এলাকা ও ব্রিটিশ- প্রশাসনাধীন এলাকা ভাগ করে একটি 'ইনার লাইন' ঘোষণা করে। বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ মূলত ছিল এই ইনার লাইন দিয়ে চিহ্নিত আদিবাসীদের এলাকার মধ্যে। কিন্তু অচিরেই ইংরেজ প্রশাসন চেষ্টা করতে থাকে আদিবাসীদের এলাকার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটাতে ও সেই অঞ্চল দিয়ে চিন অবধি কোনো বাণিজ্যপথ তৈরি করা যায় কি না তার চেষ্টা করতে। ব্রিটিশ প্রশাসনের এই চেষ্টার একজন প্রধান হোতা ছিলেন নোয়েল উইলিয়ামসন, যিনি ১৯০৫ সালে অ্যাসিস্ট্যান্ট পলিটিকাল অফিসার হয়ে আসামে এসেছিলেন। তার পর থেকে এই উইলিয়ামসন সাহেব লোক-লস্কর নিয়ে একের পর এক 'অভিযান' চালাতে শুরু করেন ইনার লাইনের ওপারে আদিবাসীদের এলাকার মধ্যে। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বহু যুগ ধরে চলে আসা তিব্বতীদের সঙ্গে আদিবাসীদের বিনিময় বন্ধ করে তার পরিবর্তে ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যে আদিবাসীদের আসতে বাধ্য করা। এছাড়াও ব্রিটিশদের বশংবদ একটা অংশ তৈরি করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করার বাসনাও ছিল। উইলিয়ামসন সাহেবের অস্ত্র ছিল দুইরকম—ভোগের বস্তু, বিশেষ করে আফিমের মতো নেশাদ্রব্য দেদার বিলিয়ে আদিবাসীদের একটা অংশের মধ্যে লোভ-লালসা জাগিয়ে তুলে আদিবাসী সমাজের পরম্পরাগত অনুশাসনের থেকে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা ও তাদের ব্রিটিশ-অনুগামী করে তোলা, আর অন্য

অস্ত্র ছিল হুমকি-হামলা ও পাশবিক শক্তি-প্রদর্শনের অস্ত্র। সিয়াঙ, সুবানসিরি, লোহিত নদীর অববাহিকা ধরে তিনি তাঁর লোকলস্করের পল্টন নিয়ে মিশমি ও নাগাদের বসবাসের গ্রামগুলোয় বেশ কয়েকবার হানা দিয়েছিল। যেখানে ভোগের বস্তু ও আফিম বিলিয়ে আনুগত্য তৈরি করতে পারেনি, সেখানে আদিবাসীদের একাধিক গ্রাম আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বহু গ্রামে আদিবাসীদের পালিত পশুদের ধরে এনে মেরে লাশের স্তূপ বানিয়েছিল। ১৯১১ সালে আবার তিনি উত্তর সিয়াঙ-এ এসে হাজির হন দলবল সমেত। এর দুই বছর আগে, ১৯০৯ সালে এই এলাকায় এসে উইলিয়ামসন খুব সুবিধা করতে পারেন নি। কেবাঙ গ্রামে পৌঁছনোর পর তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল কারণ সেই গ্রামের গ্রামপরিষদ নিজেদের সভা করে তাঁকে জানায় যে আদি গোষ্ঠীদের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন, তাই ফিরে না গেলে তিনি বিপদে পড়বেন। ১৯১১ সালে উইলিয়ামসন তাই বেশ তৈরি হয়েই এসেছিলেন বড় দলবল নিয়ে। কিন্তু এইবার কেবাঙ অবধি পৌঁছনোর আগেই আদিরা তাঁকে আটকে দিল। কেবাঙ তখনও এক দিনের রাস্তা, উইলিয়ামসনের তাঁবু থেকে খাদ্যসামগ্রী ও রসদ চুরি হয়ে যায়। ক্ষিপ্ত উইলিয়ামসন নিকটবর্তী আদিদের গ্রাম কেবাঙ ও রোটাঙ-এর উপর বদলা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে উইলিয়ামসনের মালবাহকদের কাছ থেকে গ্রামবাসীরা জানতে পারে। এর কয়েক দিনের মধ্যেই আদি যোদ্ধারা হানা দেয় উইলিয়ামসনের দলের উপর। উইলিয়ামসন, আর এক ব্রিটিশ আধিকারিক গ্রেগরসন ও তাঁদের ৪৫ জন মালবাহককে তারা মেরে ফেলে।

এর জবাব হিসেবেই ব্রিটিশ প্রশাসন ‘আবোর এক্সপিডিশন’-এর পরিকল্পনা করে। ব্রিটিশ সেনার মধ্যে নৃশংসতার জন্য বিখ্যাত গুরখা রাইফেলস-এর পল্টনকে পাঠিয়ে নৃশংস হানাদারি চালিয়ে কেবাঙ গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ও বিস্তীর্ণ এলাকায় হামলা চালিয়ে বহু আদি মানুষজনকে বন্দী করে এনে পশুর মতো বন্দী করে রাখা হয় রিগা-র বন্দীশিবিরে।

এই হামলা থেকে বাঁচতে একাধিক আদিদের গ্রামের গ্রামপ্রধান এসে ব্রিটিশ সেনা-অফিসারদের কাছে তাদের গ্রামের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এর মধ্য দিয়েই ব্রিটিশরা প্রথম আদি জনজাতির এলাকায় তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের শিকড় প্রোথিত করে। এর পর পরই ইনার লাইনের এদিকে আদিবাসী

অঞ্চলের মধ্যে পাসিঘাট ও আলোঙ-এ ব্রিটিশ প্রশাসনিক দফতর স্থাপন করা হয়, ব্রিটিশ প্রশাসক ও সেনা মোতায়েন করা হয় এবং ব্রিটিশ-কর্তৃত্বাধীন বাণিজ্যশৃঙ্খলে আদিবাসীদের বাঁধার প্রক্রিয়া নির্ধারক চেহারা গ্রহণ করে।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণকে ব্রিটিশ প্রশাসক ও তার অনুগামীরা হাজির করেছে বন্য অসভ্য আবোরদের অরাজকতা শেষ করে সভ্যতার প্রথম পা ফেলা হিসেবে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি উইলিয়ামসনকে উপস্থিত করে লোকপ্রিয় এক প্রশাসক হিসেবে, বর্বর আবোররা যাকে খুন করেছিল। উল্টোদিকে, আদি মানুষরা এখনও এই ঘটনাকে মনে রেখেছে ব্রিটিশ হামলার বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার গৌরবময় লড়াই হিসেবে। উইলিয়ামসনদের মারার জন্য যাদের প্রাণদন্ড হয়েছিল, আদিদের লোকস্মৃতিতে তাঁরা আজও জাতীয় বীর হিসেবে বেঁচে আছেন। চিত্র ৫-এর নিদর্শন। ছবিটি ২০০৫ সালে সরিৎ কুমার

চিত্র-৫: ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ

চৌধুরী তুলেছেন আদিদের গ্রাম ইয়াগরুন-এ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাতমুর জামোহ্-কে, যিনি মানমুর জামোহ্-র নাতি। এই মানমুর জামোহ্-কে ১৯১১ সালে ব্রিটিশরা গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল উইলিয়ামসনকে হত্যার শাস্তি হিসেবে। মাতমুর তাঁর দাদুর সেই অস্ত্রকে সগর্বে প্রদর্শন করছেন যা দিয়ে ১৯১১ সালে উইলিয়ামসন-হত্যা সংঘটিত হয়েছিল। এই অস্ত্রটি আজ আদিদের একটি ঐতহাসিক স্মারকে পরিণত হয়েছে।

১৯১১ সালে আদি অঞ্চলে ব্রিটিশ আধিপত্য সূচিত হলেও ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন অবধি আদিদের প্রতিরোধের চেষ্টা, এমনকি সশস্ত্র সংঘাত অবধি, বজায় থেকেছে। ১৯৪৭-এর পর 'স্বাধীন' ভারত সরকার এই অঞ্চলকে নেফা (নর্থ-ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি)-র অন্তর্গত করে ও ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রশাসনিক সম্পর্ক কী হবে তা নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শুরু হয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে ভেরিয়ার এলউইন এমন বেশ কিছু ভাবনা ও দিকনির্দেশ হাজির করেছিলেন যার মধ্যে আদিবাসী জনজাতিদের পরম্পরাগত সামজরূপ ও জীবনশৈলীকে সম্মান জানিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরির অভিপ্রায় ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ষাটের দশকে ভারত-চিন যুদ্ধের পরে সেই সবই পরিত্যক্ত হয়। চিন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পর ভারতের দক্ষিণ-পূর্বের এই সীমান্ত-অঞ্চলে নিশ্ছিদ্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ভারত জুড়ে ফেনিয়ে ওঠা জাতীয়-সমসত্ত্বতাবাদী জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভেসে যায় 'নেফা-র জন্য দর্শন'-এর জনজাতিদের স্বাধীন বিকাশের পরিসর তৈরির চিন্তা। দিল্লীর সংসদে সাংসদরা তখন হল্লা করে দাবি তুলেছিল যে ৫০ হাজার পাঞ্জাবি কৃষককে অরুণাচল প্রদেশে (নেফা-য়) নিয়ে গিয়ে জমি-বাড়ি-সরকারি সাহায্য দিয়ে সেখানে স্থিতু করিয়ে দেওয়া হোক। এর মধ্যে দিয়ে নাকি সেখানকার জনতার 'দেশপ্রেমের ঘাটতি' পূরণ করা যাবে, আবার 'অলস' জনজাতিদের পরিবর্তে এই কর্মঠ মানুষরা দ্রুত অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকেও নিশ্চিত করবে! শেষপর্যন্ত এই মানুষের গণ- প্রতিস্থাপন বাস্তবায়িত না হলেও, এরপর থেকে প্রশ্নাতীত হয়ে যায় অরুণাচল প্রদেশে দ্রুত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সর্বাত্মক করে তোলার নীতি। সেনাবাহিনীকে ছড়িয়ে দিতে দ্রুত সড়কপথ তৈরি, পুঁজি-পণ্য-বাণিজ্যের বন্ধনে স্থানীয় একটা অংশকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঁধা—এর মধ্য দিয়ে জনজাতির

মানুষদের 'মূলধারায়' টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসাই অবিসংবাদী লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই প্রক্রিয়া এখনও চলমান।

আদি জনজাতির উপর এর কী প্রভাব পড়ল দেখা যাক। আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে কোনো আদি জনজাতিগোষ্ঠীর লোকজীবনের কেন্দ্রে অবস্থিত আছে কেবাঙ, যে কেবাঙ হল তাদের স্বায়ত্তশাসনের গণ-রাজনৈতিক পরিসর। এই কেন্দ্রটির ক্ষয় তাদের পরম্পরাগত যৌথজীবনের ক্ষয়কে যেমন ত্বরান্বিত করবে, তেমনই আবার তা প্রতিফলিতও করবে। তাই নজর দেওয়া যাক এই কেন্দ্রটি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার দিকে।

পরম্পরাগতভাবে আদিদের গ্রামের কেবাঙে গুরুত্ব পেতেন শামান ও বয়স্কজনেরা কারণ তাঁরাই লোকশ্রুতি -বাহিত পরম্পরাগত জ্ঞানের ভাণ্ডারী হিসেবে কাজ করতেন। এই প্রথার কিছুটা বদল ঘটে ব্রিটিশ আধিপত্যের আমলে। কীভাবে এই বদল ঘটল দেখা যাক। ব্রিটিশরা তাদের আধিপত্যকে চিহ্নিত করতে প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি কৌমের একজনকে 'সরকারি গম' (আদি ভাষায় গম মানে গ্রামপ্রধান) হিসেবে নিয়োগ করতে থাকে। এই সরকারি গম-রা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনো মাইনে পেত না, পেত কেবল একটি লাল কোট। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে জনজাতির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এই সরকারি গমদের গুরুত্ব গ্রামের কেবাঙ-এ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বলা বাহুল্য যে এই সরকারি গমদের নির্বাচনে পরম্পরাগত লোকজ্ঞানের উপর তার দখল বিবেচিত হতো না, বিবেচিত হতো কেবল ব্রিটিশদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা। আর এই সরকারি গমদের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকারও দরকার মতো গ্রামের কেবাঙ-এর সভায় তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব হাজির করার সুযোগ করে নেয়। ফলে একদিক থেকে কেবাঙ-এ পরম্পরাগত লোকজ্ঞানের ভাণ্ডারী শামান ও বয়স্কদের গুরুত্ব যেমন কমতে থাকে, অন্যদিকে তেমন কেবাঙ-এর স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রটিও কিছুটা খর্বিত হয়।

এরপর ব্রিটিশরা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরও বাড়াতে 'বাঙ্গো' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তার অনুগত সরকারি গমদের নিয়ে। এই বাঙ্গো অনেকগুলো গ্রামের মিলিত পরিষদ। সেখানে গ্রামগুলোর সরকারি গম-দের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, অন্য আর কেউ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

সরকারি গমদের মধ্যে একজনকে ‘সেক্রেটারি’ করা হবে (পদের ইংরেজি নামই বলে দেয় যে কাঠামোটি ব্রিটিশদের মস্তিষ্কপ্রসূত) এবং তার ব্যবস্থাপনায় একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ‘ফান্ড’ চালানো হবে। অনেকগুলি গ্রামের বিষয় ও তাদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ এই বাঙ্গো-র বিষয় বলে চিহ্নিত করা হলেও এর মধ্য দিয়ে আসলে কেবাঙ-এর উপরে এমন একটি সিদ্ধান্তগ্রহণের পরিসর তৈরি করা হল, যেখানে সব গ্রামের সব মানুষ কখনোই অংশ নিতে পারবে না (যা কেবাঙ-এ পারত)। দূরবর্তী এক কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় প্রতিনিধিদের কেবলমাত্র নিজেরা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের এই পরিসরকে পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থসাহায্য দিয়ে ব্রিটিশরা গড়ে তুলল। এভাবে কেবাঙ-এর গণ-পরিসরের সমান্তরাল ভাবে নির্মিত হল অভিজাত মুষ্টিমেয়র রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিসর।

‘স্বাধীন’ ভারতের রাষ্ট্র এই সরকারি গম বা বাঙ্গো-র নীতিকে ব্রিটিশদের যোগ্য-উত্তরসূরীর মতো চালিয়ে নিয়ে গেছে।শুধু চালিয়েই নিয়ে যায়নি, বিস্তৃতও করেছে। বাঙ্গোকে আরও সম্প্রসারিত করে গোটা সিয়াঙ অঞ্চলের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ‘বোগাম বোকাঙ’ গঠন করেছে সিয়াঙ অঞ্চলের সমস্ত আদিগোষ্ঠীদের মধ্য থেকে প্রধানজনেদের মিলিত হওয়ার জন্য। এ কেবল গ্রামে গ্রামে দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসার জন্য নয়, এর মূল কাজ সরকারি ‘উন্নয়ন’-এর কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা করা। শহুরে পেশাদারি আবহাওয়ায় ইংরেজি-তে রক্ষিত হিসাব-নিকাশ-দলিল-দস্তাবেজের মাঝে এইসব ‘বোগাম বোকাঙ’-এ বিরাজ করেন অভিজাত, স্বার্থান্বেষী ও আমলা-মনস্করা। কেবাঙ-এর গণ পরিসর থেকে তা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে।

তবু কেবাঙ-এর গণ-পরিসর এখনও ধবংস হয়নি। গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তা এখনও জনজাতির পরম্পরাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল কিছু প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। এই প্রকাশগুলো এখনও জনজাতিদের ভাষা-সংস্কৃতি ধবংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের স্ফূরণ ঘটায়, ভোগবাদী পণ্য-অর্থনীতির মুহ্যমানতার বিরুদ্ধে যৌথজীবনের আনন্দকে সামনে নিয়ে আসে। এইরকমই একটি ঘটনা দিয়ে আপাতত আদিদের আখ্যান শেষ করি।

২০০২-এর বসন্তে সিমঙ গ্রামের আদিরা ঠিক করে যে পুরানো একটা লেগো (আদি শব্দ, যার অর্থ হল গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি সেতু) নতুন দিয়ে

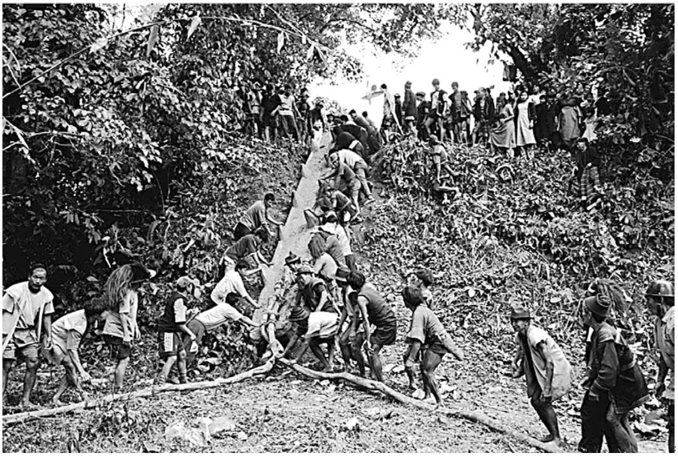

২০০২ সালে সিমঙ-এ সেতু তৈরি—আদি গ্রামবাসীরা গাছের গুঁড়ি টেনে আনছে।
চিত্রগ্রাহক—মাইকেল আরম টার

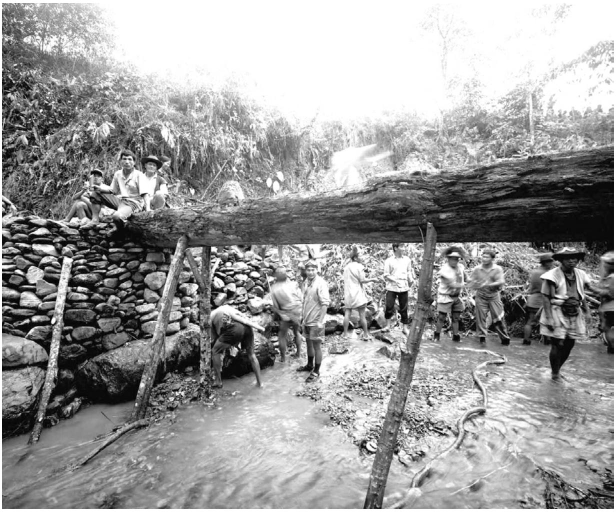

২০০২ সালে সিমঙ-এ সেতু তৈরি—আদি গ্রামবাসীরা সার বেঁধে পাথর বসাচ্ছে।
চিত্রগ্রাহক—মাইকেল আরম টার

সিমঙ—২০০২ সালে তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেতু। চিত্রগ্রাহক—মাইকেল আরম টার

প্রতিস্থাপন করতে হবে। গ্রামের কেবাঙ-এ ঠিক হল যে এর জন্য তারা কোনো কাঁচামাল-মজদুর-ইঞ্জিনিয়ার বাজার থেকে কিনবে না, তারা সেতুটা করবে পরম্পরাগত প্রথায়। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের সবাই সেতু তৈরির কাজে সামিল হল এক উৎসবপালনের মেজাজে। প্রথমে একদল বের হল এমন এক গাছের খোঁজে যার গুঁড়ি লম্বা-বরাবর কাটলে নদীর এপার থেকে ওপারে পৌঁছনোর মতো যথেষ্ট লম্বা হয় এবং মানুষ ও মোটরসাইকেল যাওয়ার মতো যথেষ্ট চওড়া হয়। উপযুক্ত গাছের খোঁজ পাওয়ার পর ছোট ছোট কুঠার দিয়ে সেই গাছ কাটা হল। পরের দিন সবাই মিলে গাছের বিশাল গুঁড়ি নদীপারে টেনে নিয়ে যাওয়ার পালা। একসঙ্গে বহুজন মিলে গুঁড়ি টানতে লাগল আর সবাই মিলে গাইতে লাগল একটি প্রচলিত গান। গানটার নাম 'পিঁপড়েদের গান'—পিঁপড়েরা নাকি খাদ্য টেনে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এই গানই গায়। পালা করে যারা টানছে, তাদের জল-খাদ্য জোটানোর জন্যও এলাহি আয়োজন। অনেকে আবার পরম্পরাগত পোশাক পরে সেদিন কাজে নেমেছে। নদীর আগের শেষ খাড়াইটা

দিয়ে নামিয়ে অবশেষে গাছের গুঁড়ি পৌঁছল নদীর ধারে। গ্রামের লোকেরা তখন এক সারে দাঁড়িয়ে নদীর গর্ভ থেকে পাথর তুলে এনে দুই ধার উঁচু করল। তারপর ধরাধরি করে সেই গুঁড়ি উঁচু করা পাথরের উপর বসিয়ে দেওয়ার পরই সেতু তৈরি ব্যবহারের জন্য।

আনন্দময় যৌথশ্রমের মধ্য দিয়ে যৌথসম্পদ-সৃষ্টির এমন উপায় পুঁজি-প্রযুক্তির জানা নেই, সে পুঁজি-প্রযুক্তি যতই অসম্ভবকে সম্ভব করার বড়াই করুক না কেন।

দ্বিতীয় পর্ব: আপাতনি জনজাতির কথা

আপাতনি জনজাতি অরুণাচল প্রদেশের সমস্ত জনজাতিদের মধ্যে স্বতন্ত্র বেশ কিছু কারণে। প্রথমত, তারা দীর্ঘদিন ধরে অরুণাচল প্রদেশের একটি ২০ বর্গ মাইল এলাকা উপত্যকার সাতটি গ্রামের মধ্যেই বাস করে আসছে, যেখানে অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠীগুলো অনেক ছড়ানো ছিটানো অঞ্চলে বাস করে। দ্বিতীয়ত, আপাতনিরা দীর্ঘদিন ধরে কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থা করে স্থিতু চাষ করে আসছে, যেখানে অন্য জনজাতিরা জঙ্গল কেটে তৈরি অস্থায়ী কৃষিজমিতে ঝুম চাষ করতেই অভ্যস্ত। এর ফলে জমির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অন্য জানজাতিদের তুলনায় তাদের স্বাতন্ত্র্য জন্ম নিয়েছে। অন্য জনজাতিদের মধ্যে কৃষিজমির উপর ব্যক্তি-মালিকানা দেখা যায় না, কৃষিজমি সেখানে গোষ্ঠী-মালিকানাধীন। আপাতনিদের মধ্যে কৃষিজমির উপর ব্যক্তি মালিকানা দেখা যায়।

অস্ট্রিয়ান নৃতাত্ত্বিক সি ভন ফুরের হাইমেনডর্ফ (আপাতনি জনজাতির সাম্প্রতিক ইতিহাসের সঙ্গে এই নৃতাত্ত্বিক বহুভাবে জড়িত, আলোচনা এগোতে এগোতে তা আমরা ক্রমশ দেখব)-এর ১৯৪৪ সালে লেখা বিবরণী থেকে আমরা আপাতনি উপত্যকার তৎকালীন জমি-ব্যবস্থার একটা ছবি পাই। হাইমেনডর্ফ-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আপাতনি সমাজে একজনের প্রভাব বা সামাজিক অবস্থান নির্ভর করে তার ভূ-সম্পত্তির পরিমাণের উপর। তিনি আপাতনিদের মধ্যে তিন ধরনের জমি-মালিকানা চিহ্নিত করেছেন। প্রথম ধরন হল ব্যক্তি-মালিকানা। সমস্ত কৃষিজমি, সেচপ্রাপ্ত ধানচাষের জমি, শুকনো চাষের জমি,

ভুট্টা-জনারের জন্য বাগান, শাক-সবজি-ফল চাষের বাগান, বাঁশঝাড়, পাইন ও অন্যান্য দরকারি গাছের চাষের জমি, বাস্তুভিটে—এই সব ব্যক্তি মালিকানাধীনে পড়ে। ব্যক্তি-মালিকানাধীন এই কৃষিজমির আপাতনিদের নিজেদের মধ্যেই কেবল মালিকানা-বদল হতে পারে মিথুন বা অন্য কোনো গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে, টাকায় তা কেনাবেচা করা সম্ভব নয়।

মালিকানার দ্বিতীয় ধরন হল কৌম-মালিকানা। পশুর চারণভূমি, মৃতকে কবর দেওয়ার জায়গা (আপাতনিরা মৃত মানুষকে কবরস্থ করে) ও গ্রামের কাছে জঙ্গলের নির্দিষ্ট অঞ্চল কৌম-মালিকানাভুক্ত। সেখানে কেবল ওই বিশেষ কৌমের আপাতনিরাই পশু চরানোর, কবর দেওয়ার, শিকার করার বা জঙ্গলের সম্পদ সংগ্রহ করার অধিকারী।

মালিকানার তৃতীয় ধরন হল সাধারণ যৌথ মালিকানা। গ্রামের মধ্যের সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য মাঠ, পশুর চারণক্ষেত্র ও আপাতনি-উপত্যকার আশপাশের জঙ্গলের নির্দিষ্ট অঞ্চল এর মধ্যে পড়ে।

ভূসম্পদের উপর অধিকারের এই ত্রিস্তরীয় কাঠামোর উপর ভিত্তি করে আপাতনিরা এক সহযোগিতামূলক সমাজ গড়ে তুলেছে। কৃষিকাজ, কাপড় বোনা ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নানারকমের ঝুড়ি ও পাত্র বানানোয় কুশলতা অর্জন করেছে। আশেপাশের অন্যান্য জনজাতির মানুষরা, যেমন নিশি ও পার্বত্য মিরি জনজাতির মানুষরা তাদের খাদ্যশস্যের জন্য বহুলাংশেই আপাতনিদের সঙ্গে বিনিময়ের উপর নির্ভর করে।

নিশি, পার্বত্য মিরি-র মতো তাদের নিকট-পড়শি জনজাতিদের সঙ্গে ছাড়া বাকি জগতের সঙ্গে সংস্পর্শহীন অবস্থায় আপাতনিরা এইভাবে তাদের উপত্যকায় মানবসভ্যতার এক বিশিষ্ট রূপ গড়ে তুলেছে শতকের পর শতক জুড়ে। উনিশ শতকে তারা ব্রিটিশ, অসমিয়া ও অন্যান্য ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসতে শুরু করে। সেই সংস্পর্শের ফল কী হয়েছে তা আমরা ক্রমশ দেখার চেষ্টা করব, কিন্তু প্রথমে শুরু করা যাক আপাতনিদের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে।

আপাতনিদের নিজস্ব ভাষা আছে, আপাতনি ভাষা নামেই তা পরিচিত। এই ভাষা মূলত মুখের ভাষা, লেখার চল হয়নি, মান্য লিপিও গড়ে ওঠেনি।

শ্রুতির ভিত্তিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাহিত হয়ে এই ভাষার ভাণ্ডারে জমে আছে লোককথার বিপুল ঐশ্বর্য, যা আপাতনিদের পুরাণ, ইতিহাস, প্রকৃতি-বিবরণ, লোকপ্রজ্ঞার বহুবর্ণ জগতকে ধরে রেখেছে। সেই লোককথার মধ্যে দিয়েই আপাতনিদের জগতের সঙ্গে পরিচয় করা যাক।

সৃষ্টিতত্ত্ব

> একদম প্রথমে ছিল না কিছুই, ছিল কেবল কোলইয়ুঙ কোলো, অর্থাৎ, নিরাকার। সে ছিল কামি-কামো, অর্থাৎ, তমসার সময়। পিনি সিয়ো নামের এক আত্মা থেকে উদ্ভূত হল নারী প্রজনন-শক্তি, যার নাম ঙ্গুনটি আনি। ঙ্গুনটি আনি জন্ম দিল আকাশ-পৃথিবী-র, এক নিরাকার আকাশের ও এক নিরাকার পৃথিবীর।

বহু আত্মার আবির্ভাব হল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আনি, অর্থাৎ, বদ বা বিপজ্জনক, যারা আকাশ-পৃথিবী-র বিরুদ্ধে দাঁড়াল। বদ আত্মারা আকাশ ও পৃথিবী-র মধ্যে রোগ সঞ্চারিত করত। যেহেতু পৃথিবী ও আকাশ তখনও পূর্ণবিকশিত নয়, এইসব বদ আত্মাদের বিপদ বড় হয়ে উঠেছিল। আকাশ-পৃথিবী-র জন্ম ও বেড়ে ওঠায় ব্যাঘাত তৈরি করত হিরি। গিরি ও গ্যোপু আকাশ-পৃথিবীর মাঝে দুর্বলতা ও একাকীত্বের জন্ম দিত। উই তাদের অন্ত্রে ঘা তৈরি করত। ইয়াচু জন্ম দিত মানসিক সমস্যার। মিলয়া ও ডোপুঙ তৈরি করত মাথার যন্ত্রণা। আর তাইসিমে দিত রতিজ ব্যাধি। এই নবজাত আকাশ-পৃথিবী ছিল খুঁতে ভরা, যথাযথ আকার ছাড়াই যেহেতু তাদের জন্ম হয়েছিল।

তারপর আকাশ-পৃথিবীর বোন হিসেবে জন্ম নিল আমি দিনচি বানয়ি। সে চেষ্টা করল আকাশ-পৃথিবী-কে রোগমুক্ত করতে, কিন্তু তাইসিমে তাকেই রতিজ ব্যাধিতে আক্রান্ত করে দিল। সে বিয়ে করল কোট বুটাঙ-কোর্দা হোরমিঙ-কে যে কি না ইঁদুর ও কাঠবিড়ালির উৎস। তার সেই স্বামীর দেহেও পা দিয়ে ব্যাধির সংক্রমণ ঘটল।

এরপর জন্ম নিল কোলয়ুঙ বুময়া ন্যিকাঙ নামে এক পুরোহিত আকাশ-পৃথিবী ও বদ আত্মাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য। আরও জন্ম নিল পোপি, উপদেশ দেওয়ার জন্য। পোপি পুরোহিতকে উপদেশ দিল আকাশ-পৃথিবীকে

সারিয়ে তোলার জন্য বদ আত্মাদের উদ্দেশ্যে বলি দিতে। হিরি-র উদ্দেশ্যে একটা শুয়োর বলি দেওয়া হল, আরও বলি দেওয়া হল গিরি-র জন্য একটা কুকুর, ইয়াচু-র জন্য একটা মুরগি আর মিলয়া ও ডোপঙ-কে উৎসর্গ করা হল এক টুকরো বাঁশ, উই-কে উৎসর্গ করা হল সুতো, গ্যোপু-কে উৎসর্গ করা হল বাঁশের চেঁচাড়ি, তাইসিমে-কে উৎসর্গ করা হল একটা তেঁতো পাতা। এর ফল ফলল। আকাশ-পৃথিবী রোগমুক্ত হল। আকাশ-পৃথিবী পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে সমর্থ হল। কিন্তু তাদের ভার বহন করার মতো স্তম্ভগুলো তো তখনও তৈরি হয়নি, সেগুলো তারপর তৈরি হল।

ধরা তৈরি হল নিকুন-এর থেকে। নিকুন-এর চুল পাখিদের বাসা হল, তার পাছা হল সমুদ্রগর্ভ। তার চোখ থেকে হল স্বচ্ছ হ্রদ, তার কাঁধ বিস্তৃত দিগন্তের রূপ নিল। তার বুক হয়ে উঠল জগতের ছাদ, তার হৃদয় হয়ে উঠল পাথর ও পাহাড়-পর্বত। তার বুকের হাড় হয়ে উঠল অরণ্য আর তার উদর পরিণত হল ঝোপ-ঝাড়-ঘাস-এ।

কোলয়ুঙ পিনি নামের আর এক আত্মার থেকে জন্ম নিল সূর্য, চাঁদ ও তারারা। আর এক আত্মা, ছাহা, গাছপালা- শাক-সবজি নিয়ে এল।

সর্বশেষে আকাশ-পৃথিবী-র থেকে জন্ম নিল এক নারীশক্তি, যার নাম ছানটুঙ। এই ছানটুঙ-ই মানুষকে ও মানুষের আত্মাকে রক্ষা করে। এই ছানটুঙ-এর থেকেই তানি মানুষদের উদ্ভব। ছানটুঙ-এর বহু সন্তান, যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হল নেহা তানি। এই নেহা তানি-ই হল প্রথম মানুষ। তাকে অনেকে আবো তানি-ও বলে। আমরা আপাতনিরা এই আবো তানি-র বংশধর।

(কথক-হরি গ্রামের হাগে হীবা ও হাগে তাপা, রেরু (বুলা) গ্রামের পাদি তাসান ও মুদান তাগে গ্রামের মুদান দোন্যি। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন আপাতনি উপত্যকায় তাঁদের কাছ থেকে এই কথনগুলি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১০৯-১১০ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল।)

প্রত্যুষে দূর পর্বতচূড়া যেমন কুয়াশার মেঘ মেখে থাকে, আদি ইতিহাসও এখানে তেমন অতিকথার কুয়াশা মেখে আছে। এখানে বর্ণিত বিভিন্ন

আত্মা মানুষের জগতের পাশাপাশি আর একটি জগতে আস্তিত্ববান বলে আপাতনিদের বিশ্বাস। এই দুই জগতের মধ্যে যোগাযোগরক্ষা ও তার মধ্য দিয়ে মানবসমাজের সাধারণ মঙ্গলের পথ উপলব্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত ক্রিয়াকর্মই আপাতনিদের ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠানের জগৎ তৈরি করেছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আবো তানি—প্রথম মানুষ—যার উত্তরপুরুষ রূপেই আপাতনিরা তাদের স্ব-পরিচয় নির্মাণ করে।

পরিব্রজন

> আমরা আপাতনিরা এসেছি পর্বতমালার ওপারের দূর দেশ থেকে। কেউ কেউ বলে যে আমরা এসেছি মঙ্গোলিয়া থেকে, কিন্তু সঠিক কী তা আমাদের জানা নেই। একদম শুরুতে, আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষরা কোলয়ুঙ কোলো-র সময়ে বাস করত। সে মানুষের জন্মের আগের কথা, জানি না কোন্ দেশে তখন বাস ছিল, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনাচার সেই উৎস থেকেই প্রবাহিত। সে ছিল ঙ্গুনটি আনি-র দেশ ও সময়।

সেখান থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা পরিব্রজন করে এসেছিল উই সুপুঙ-এ ও তারপর ঈপিয়ো সুপুঙ-এ। এই ঈপিয়ো সুপুঙ-এই আতো তাজুঙ বাসা বেঁধেছিল। সে ছিল সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং আমাদের আরও বহু পূর্বপুরুষ তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সেখানে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ-মনোমালিন্য দেখা দিল। সুতরাং তারা একটা তুরি তুনী (ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য যৌথ আচার অনুষ্ঠান) সংগঠিত করল। তার মধ্যে দিয়ে পরিব্রজনের পথ নির্ধারণ করে তারা সেই পথে পাড়ি দিল। কিন্তু ঈপিয়ো সুপুঙ থেকে কিছুটা এগোনোর পরই তারা দেখল যে সে পথ অবরুদ্ধ। তখন লানচো সিবো নামে এক পুরুষ ও লানডু মানু নামে এক নারী একসঙ্গে শিঙা ফুঁকল এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই বাধা অতিক্রম করতে সফল হল। বাধা ডিঙিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

তারা চলল ঈপিয়ো চীলয়াঙ ও ঈপো কীপু-র পথ ধরে, কিন্তু আবার তাদের পথে বাধা পড়ল। তাদের পথে মাথা তুলে দাঁড়াল এক বিশাল পাহাড়, কালো ঘন ধোঁয়ার মতো কুয়াশার চাদরে মোড়া। চোখের দৃষ্টিতে কিছুই সেখানে

ঠাউর করা যাচ্ছিল না। তখন আমাদের দুই পূর্বপুরুষ, চীলইয়াঙ তাগইয়াঙ ও কীপু তাপিন মিথুন বলি দিয়ে দাপো আচার পালন করল এবং তার মধ্য দিয়ে ঈপিয়ো চীলয়াঙ ও ঈপো কীপু-কে বশে আনল। তার মধ্যে দিয়ে সামনে এগোনোর পথ আবার খুলে গেল। পাহাড়চূড়ায় আনন্দভোজ সেরে আমাদের পূর্বপুরুষরা পাহাড় পেরিয়ে গেল।

যেতে যেতে আবার এক উঁচু পাহাড় পথ আটকে দাঁড়াল,পূর্বপুরুষরা তাকেও টপকে যেতে পারল। তারপর তারা পৌঁছল কর লেম্বা বলে এক জায়গায়, যেখানে তাদের বহুজন ফাঁদে পড়ে মারা গেল। বাকিরা এগিয়ে চলল। তাদের পথে আবার বাধা পড়ল, তারা ঘুরপথে সে বাধা কাটিয়ে এগিয়ে চলল।

এভাবে তারা এসে পৌঁছল ন্যিমে-তে, যেখানে বহু পূর্বপুরুষ সেই অঞ্চলের লোকজীবনের মধ্যে মিশে গেল। ন্যিমে-র নারীরা নদীর ঘাস থেকে তৈরি গয়না ও পুঁতি পড়ত, তাদের কাছ থেকে তা শিখেছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা। ন্যিমে-র মানুষদের মধ্যে ছিল দুটি গোষ্ঠী—সেখানকার আদি বাসিন্দারা হল নিকুন ন্যিমে আর বাকিরা হল নেচো ন্যিমে, নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই তারা বিয়ে করত। নিকুন-রা এসেছিল তুপে থেকে আর নেচো-রা এসেছিল হিকুন থেকে।

ন্যিমে-র রাজা ছিল পায়ান রাদে ন্যিমে, সে বিয়ে করেছিল পুকুন পুরি-কে। তাদের ছিল ছয় মেয়ে। সেই ছয় মেয়ের মধ্যে তিনজনের সন্তান-সন্ততি থেকেই আমরা আপাতনিরা এসেছি। আমদের হাও গ্রামসমষ্টির (তাজাঙ, রেরু ও কালুঙ—এই তিন মূল গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমানের বুলা গ্রাম এই বুলা গ্রাম ও হরি গ্রাম মিলে হাও গ্রামসমষ্টি) মানুষজন পুকুন-কন্যা আনে হায়া-র সঙ্গে আবা তাবু-র বিয়ের ফলে গড়ে ওঠা পরিবার থেকে এসেছে। দীবো গ্রামসমষ্টির (দুত্তা, মুদান তাগে ও মিচি বামিন গ্রামের সমষ্টিবদ্ধ নাম দীবো গ্রামসমষ্টি) মানুষজন এসেছে পুকুন-কন্যা আনে বেন্দি-র সঙ্গে তাসো দারবো-র বিবাহজাত পরিবার থেকে আর হঙ গ্রামের মানুষজন এসেছে পুকুন -কন্যা লোলি ইয়ারি-র সঙ্গে পাবিন হীপা-র বিবাহজাত পরিবার থেকে।

ন্যিমে ছেড়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা চলতে চলতে চীলইয়াঙ পাহাড় ও মুদো পাহাড় পেরিয়ে ডুডিং লেম্বা-য় পৌঁছে দেখল যে একটা ঈগল পাখি আর একটা বানর তাদের রাস্তা আটকে রেখেছে। আমাদের বহু পূর্বপুরুষ সেখানে প্রাণ

হারাল। শেষপর্যন্ত এক নারী তার বুকের দুধে বিষ দিয়ে তা জলে মিশিয়ে তা দিয়ে সেই ঈগল ও বানরকে হত্যা করল। পশু ও মানুষের মধ্যে সংঘাত সেই থেকেই শুরু হল, কিন্তু তা আমাদের পূর্বপুরুষদের আরও এগোনোর পথ খুলে দিল।

এরপর আমাদের পূর্বপুরুষরা এসে পৌঁছল সাঙপো উপত্যকার মুদো সুপুঙ নামের এক জায়গায়। আমরা আজ আর জানি না মুদো সুপুঙ ঠিক কোন্ জায়গাটা, কিন্তু সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। একদিন দুজন মেয়ে ধানক্ষেতে গিয়েছিল তাসিন পোকা সংগ্রহ করার জন্য। সেই সময়ে ড্রী উৎসব পালন করা হচ্ছিল, তাই ওই পোকা ধরা তখন নিষেধ ছিল। তা সত্ত্বেও তারা ওই পোকা সংগ্রহ করল। এর ফলে ধানক্ষেতের সব ফসল ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর আতো দিউ তার নিজের বাড়িতে দ্বিতীয়বার আবার ড্রী উৎসব পালন করল। আতো নিবো সেখানে জিলঙ চাদর (পুরোহিতরা ও গ্রামসভা বুলইয়াঙ-এর সদস্যরা এই বিশেষ নকশার চাদর সম্মানসূচক হিসেবে পরে থাকে) গায়ে দিয়ে আতো দিউ-এর এর বাড়িতে এসে পুরোহিতের কাজ সমাপন করে।

আমাদের প্রধান উৎসবগুলো মুদো সুপুঙ-য়েই প্রথম পালিত হয়েছিল। মিয়োকো (মার্চ-এপ্রিলে পালিত হয়) প্রথম উদযাপন করেছিল আতো দিউ, প্রথম মুরুঙ (ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে পালিত হয়) করেছিল আতো হাপে, প্রথম সুবু (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারিতে ও মিয়োকোর সময় পালিত মুরুঙ-এর একটি সংস্করণ) করেছিল আতো মিপু, আর আতো পীসান করেছিল প্রথম ইমো হুনীন (পোকা, শিলাবৃষ্টি ও খরার হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে জুলাই-আগস্টে করা হয়)।

মুদো সুপুঙ-য়ে বহু প্রজন্ম ধরে আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও কিছুজন ঠিক করল যে নতুন জায়গায় নতুন করে জীবন পাততে তারা আবার বের হবে। তাই তারা আবার তুরি তুনী সংগঠিত করে যাত্রার দিকনির্ণয় করে পাড়ি দিল। সবাই এক রাস্তাতে গেল না। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলদা আলাদা রাস্তা ধরল। এই সময় আবো তানি তার এই উত্তরপুরুষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত বস্তু ভাগ করে দিয়েছিল। ন্যিমে (তিব্বত)-র মানুষরা পেয়েছিল তেঁতো পাতা আর বন্য জীবজন্তু, সুলুঙ-রা পেয়েছিল সাগো গাছ, মিসান (নিশি ও পার্বত্য মিরি)-রা পেয়েছিল মকাই আর বুনো বাঁশ, হালইয়াঙ (অসমিয়া, অনাদিবাসী, সমতলের

বাসিন্দা, ভারতীয় বা বহির্জগতের মানুষ)-রা পেয়েছিল সুপুরি, নুন, পিতলের বাসনকোসন ও বিশেষ ধরনের বস্ত্র। আমরা আপাতনিরা পেয়েছিলাম ধান, দেবদারু গাছ ও বাঁশের চাষ।

হালইয়াঙ-রা যখন জঙ্গল ছেড়ে পাহাড় থেকে নেমে সমতলের দিকে চলে গেল, তখন তারা মিসান ও আপাতনিদের পথ আটকাতে গাছ কেটে সেই গুঁড়ি দিয়ে রাস্তা আটকে দিয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা পাহাড়েই থাকি। সে অবশ্য পরের কথা, তার আগের কথা আগে বলা যাক।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাত্রা শুরু করার আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই একসাথে একটা বড় ভোজের আসরে মিলিত হয়েছিল। প্রথমে তারা একটা গাছ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিল যাতে সকলের মঙ্গল হয়, তারপর তারা মিথুন বলি দিয়েছিল। মিথুন বলি দেওয়ার সময় নিশিদের গা-হাত -পা বাজে ভাবে কেটে গিয়েছিল, আপাতনিদেরও আঙুল কেটে গিয়েছিল। সম্পন্নজনেরা বেশি মিথুন বলি দিয়ে বেশি ডিঙ্গিয়া ও গিয়োতি উপহার বিলি করেছিল। উপহার আদানপ্রদান অবশ্য হয়েছিল সবার মধ্যেই। সবে তখন ভোর হয়েছে, সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই একসঙ্গে বসে ভোজ সেরেছিল। তখন থেকেই আমাদের মধ্যে উপহার আদানপ্রদানের আচার চালু হয়েছে। (এই উপহার, মূলত বলি দেওয়া মিথুনের বিভিন্ন দেহাংশ ও মাংস, আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে আপাতনিদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব-সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয় বা অতীতে তৈরি সম্পর্ক জোরদার হয়। ডিঙ্গিয়া উপহার বিলি করতে হয় নিজের কৌমের বাইরে অন্যান্য কৌমের একজন করে মোট তিন-চারজনকে। এর মধ্য দিয়ে আদানপ্রদানকারীরা ডিঙ্গিয়া-বন্ধু বা বুনীন-বন্ধু-তে পরিণত হয়, একে অপরের যে কোনো সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকটে বা বিপদে-আপদে বুনীন-বন্ধুদের একে অপরকে সাহায্য করা বাধ্যতামূলক। বুনীন-বন্ধুত্ব কেউ নতুন করে কারো সঙ্গে পাততে পারে, কিন্তু বুনীন বন্ধুত্ব কেউ ভেঙে দিতে পারে না। গিয়োতি আদানপ্রদানের মধ্য দিয়েও অপরাপরের মধ্যে এমন সহযোগিতা-সহমর্মীতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইরকম সামাজিক সম্পর্কবন্ধন আরও নানা রকমের আছে, যেমন-পিনইয়াঙ, আলী কুটিন।)

যৌথভোজ সমাপন হলে দলগুলো তাদের আলাদা আলাদা পথ ধরল।

মুদো সুপুঙ থেকে মুদো দোকান যাওয়ার পথে আপাতনি ও নিশি-দের মধ্যে নানা বিষয়ে, বিশেষ করে রতিক্রিয়া ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিল। যেমন, একজন একটা পিতলের থালা চুরি করল—আমাদের ইতিহাসে চুরির ঘটনা সেই প্রথম। একজন পুরোহিত তখন সিদ্ধান্ত নিল যে তাকে জরিমানা দিয়ে প্রয়শ্চিত্ত করতে হবে।

মুদো দোকান-এ পৌঁছে গড়ে তোলা হয়েছিল সবচেয়ে বিখ্যাত লাপাঙ-টি। (আপাতনিদের প্রতিটি গ্রামে কাঠের তক্তা দিয়ে একটা উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়, যেখানে যৌথ আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালিত হয়। একেই বলে লাপাঙ। সাম্প্রতিককালে, কাঠের তক্তার বদলে বহুক্ষেত্রে কংক্রিটের লাপাঙ তৈরি হচ্ছে।) সেখানে একটি প্রতিযোগিতাও হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় তাবিয়া তাগে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে এনেছিল, হাও নিয়ে এসেছিল ভালুকের মতো এক অদ্ভুত জন্তু, হঙ নিয়ে এসেছিল একটা বাঘ। মিচি বামিন, মুদান তাগে, দুত্তা ও হিজা নিয়ে এসেছিল বিভিন্ন পাখি আর শুয়োর। হরি আর হিজা-র দুসু ও তানইয়াঙ কৌমের লোকেরা একটা মানুষের মাথা শিকার করে নিয়ে এসেছিল।

আপাতনি উপত্যকার একটি গ্রামের লাপাঙ। লাপাঙ-এর উপর আপাতনি পুরোহিতরা কোনো আচার পালন করছেন। চারদিকে সমবেত গ্রামবাসীরা। ১৯৪৪/১৯৪৫ সালে ফুরের হাইমেনডার্ফের তোলা আলোকচিত্র।

মুদো দোকান-এ বসবাসকালে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বীটু আর তানইয়ো-র লোকজনের সংঘাত তৈরি হয়েছিল। তখন আবো পিবো মিথুনের মাথার খুলি দিয়ে সেই শত্রুদের এমন ভয় দেখিয়েছিল যে শত্রুরা সব সেই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছিল। এর কিছুদিন পরে মিথুন চুরির প্রথম ঘটনাটি ঘটল। বীড়ী দোন্যি-র মিথুন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দেখা গেল যে লালি দোন্যি ও সিলি দোন্যি সেই মিথুন চুরি করেছে। কিন্তু শেষাবধি, মুদো দোকান-এ মানুষে মানুষে সহযোগিতার সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আরো শক্তপোক্ত করা হয়েছিল। উপহার হিসেবে আদানপ্রদান করা জিনিষগুলো আরো ভালো করা হয়েছিল, যেমন, শুয়োরের চামড়া, হর্ণবিল পাখি, কাঠবিড়ালি, ইঁদুর ও অন্য বন্যজন্তু উপহার দেওয়া চালু হয়েছিল, ফলে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছিল।

তারপর আবার একদিন ভবিষ্যনির্ধারণের আচার পালন করা হল যাত্রার পরবর্তী পথ নির্ধারণ করার জন্য। নির্ধারিত পথে আবার যাত্রা শুরু হল। সেই পথ ধরে পূর্বপুরুষরা পৌঁছল কুরু-কিমে নদীর ধারে। সেই নদীর গভীর স্রোত অনবরত গর্জন করতে করতে বয়ে চলে। সেখানে নানা ক্ষতিকারক পোকামাকড়ও ছিল। পূর্বপুরুষরা সেই নদী পার হতে পারল না, নদীর ধারেই থিতু হয়ে বসল। কুড়ি প্রজন্ম ধরে তারা সেখানেই বাস করল। তারপর নিবো রুচি নামে এক সাঁতারে ওস্তাদ ছোট্ট ছেলে একটা নৌকা ব্যবহার করে সবাইকে নদী পার হতে সাহায্য করল।

নদী পার হওয়ার পর হাঁটতে হাঁটতে তারা আবার এক উঁচু কুয়াশা-ঘেরা পাহাড়ের সামনে এসে পড়ল। সেই পাহাড়কে বেড়ি দিয়ে উৎরাইয়ে নেমে তারা দেখল যে তাদের সামনে আবার কুরু-কিমে নদী, দ্বিতীয়বার তাকে পার হতে হবে। এবার অবশ্য মিথুন বলি দেওয়ার পর তারা সহজেই নদী পার হয়ে যেতে পারল।

সবাই পার হওয়ার পর হালইয়াঙ-রা বাকিদের ছেড়ে এগিয়ে গেল এবং পানিয়োর নদীর ধারে এসে পৌঁছল। ভাটির দিকে যাওয়ার পথে তারা সানজি মীরি গাছের গায়ে কাটা-চিহ্ন রাখতে রাখতে গেল। কিন্তু সে গাছ কাটার পর খুব তাড়াতাড়িই আবার আগের রঙ ফিরে আসে। এইভাবে হালইয়াঙ-রা তাদের যাওয়ার পথের কোনো চিহ্ন রেখে গেল না। আপাতনি-রা যখন সেখানে পৌঁছে

কোনো চিহ্ন দেখতে পেল না, তারা ভাবল যে হালইয়াঙ-রা বুঝি অনেকদিন আগেই সেখান ছেড়ে গেছে, এখন বুঝি বহু দূরে চলে গেছে। তাই আপাতনিরা আবার ঘুরে পিছিয়ে গিয়ে জিরো-তে এল। পানিওর নদী বরাবর নেমে সেই প্রায় নীপকো অবধি (নীপকো অবধি—নীপকো মানে NEEPCO, অর্থাৎ, নর্থইস্ট ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন কোম্পানি। এই কোম্পানি ২০০৩ সালে পানিয়োর নদীর ওপর একটি বাঁধ বানিয়েছিল। 'নীপকো অবধি' বলতে ওই বাঁধটি এখন যেখানে সেই স্থান অবধি বোঝানো হয়েছে।) গিয়ে তারা হাগে বোরো বলে একটা জায়গায় পৌঁছল।

হাগে বোরো-য় আমাদের পূর্বপুরুষরা আবার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা পথ ধরে চলল, যে পথ শেষ অবধি তাদের পৌঁছে দিয়েছিল আপাতনি উপত্যকার তাদের গ্রামগুলোয়। আমাদের হাও গ্রামেদের পূর্বপুরুষরা নদীর ধার থেকে সিলো-পথ ধরে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠেছিল, তারপর প্যিউতু-পথ ধরে এগিয়েছিল। হঙ গ্রামের পূর্বপুরুষরা উপরে না উঠে নদী বরাবর সীকে-পথ ধরে এগিয়ে তারপর সিপয়ু গিয়ায়ু-পথ ধরেছিল। দীবো-র লোকেরা নদী পার হয়ে চীলইয়াঙ-পথ ধরেছিল। হরি গ্রামের পূর্বপুরুষরা প্যিউতু-পথ ধরে আসার সময় তাবইয়াঙ-তালইয়াঙ-এর মানুষদের প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল, কিন্তু তারা প্রতিরোধকারীদের পরাজিত করেছিল।

(কথক-হরি গ্রামের ৬৫ বছর বয়স্ক হাগে তাপা। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১১১-১১৬ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল। কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

মঙ্গোলিয়া-র কাছাকাছি কোনো অঞ্চল থেকে দীর্ঘ পরিব্রজন, নানা ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়া-র এক বহু শতক ব্যাপী ইতিহাস এখানে বলা হচ্ছে। একটা বিষয় একটু খেয়াল করা যাক। বিষয়টা হল হালইয়াঙ-দের প্রসঙ্গ। আপাতনিরা মনে করে যে হালইয়াঙ-রাও ইতিহাসের দূরতম কোনো সময়ে

পাহাড়ি জনজাতিগুলোর সঙ্গে একইসাথে ছিল। কোনো এক সন্ধিক্ষণে তারা পৃথক হয়ে সমতলভূমিতে নেমে যায়, বাকিরা যায়নি। কেন বাকিরা যায়নি বা যেতে পারে নি তা নিয়ে দুটি বৃত্তান্ত এই কথনে উপস্থিত। একটা বৃত্তান্তে বলা হচ্ছে যে হালইয়াঙরা নেমে যাওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে বাকিদের রাস্তা আটকে দিয়ে গিয়েছিল গাছ-পাথর ফেলে। অর্থাৎ, হালইয়াঙদের বিরুদ্ধে অন্যদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার একটা অভিযোগ আনা হচ্ছে। দ্বিতীয় বৃত্তান্তে তাদের রেখে যাওয়া পথচিহ্ন উবে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, এখানে হালইয়াঙদের উপর দোষারোপের সুর তেমন নেই। সুতরাং, হালইয়াঙদের প্রতি দুরকম মনোভাব আমরা এখানে দেখছি—একটা মনোভাবে সন্দেহ ও অবিশ্বাস, অন্য মনোভাব সহজ ও স্বাভাবিক। এই দুইরকম মনোভাব একই কথনে আসা কিছু তাৎপর্য বহন করে কি? যেমন, এভাবে একটা তাৎপর্য ভাবা যেতে পারে। কথন শ্রুতির মধ্য দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাহিত হয়। সেই পথে তার মধ্যে যোগ-বিয়োগও ঘটতে থাকে, যা এক এক প্রজন্মের বৈশিষ্ট্যমূলক ছাপ বহন করে। এভাবে হালইয়াঙদের সম্পর্কে দুটো মনোভাব কি আলাদা দুটো প্রজন্মের ছাপ? হালইয়াঙদের সম্পর্কে আপাতনিদের মনোভাবে পরিবর্তন হয়েছে, যার ছাপ এইভাবে ধরা পড়েছে? পরবর্তীকালে হালইয়াঙদের সঙ্গে আপাতনিদের পুনর্বার সংস্পর্শে আসার ফলাফল থেকে তৈরি ছাপও হয়ত এর মধ্যে বিধৃত। আলোচনা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে তা দেখা যাবে।

আপাতনি উপত্যকায় বাস-পত্তন

> পাহাড় পার হওয়ার পর আমাদের পূর্বপুরুষরা একটা মিথুন বলি দিল। তারা এসে পৌঁছল সিলো সুপুঙ (জিরো) আর সিপ্যু সুপুঙ (পুরানো জিরো-র কাছে)-য়ে। এইখানে বাসা বেঁধে আমাদের পূর্বপুরুষরা সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল।

সিলো সুপুঙ-এর মাঝে বীড়ী নামে এক বসতি ছিল, যার প্রাধান ছিল আতো দিয়ু। সে সেখানে প্রথম মিয়োকো উৎসব পালন করেছিল বিয়ু তাড়ু, বিমা তামা আর বিহি তাই-য়ের সঙ্গে। তার বংশের বিমা তাম্যা আর এক বিখ্যাত জন।

সে প্রথম সেচ-খাল খনন করেছিল। সে খুব সম্পন্ন ছিল, অনেক শুয়োর সে পালন করত, কিন্তু তার কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, কেবল দশজন কন্যাসন্তান ছিল। সে তার ছয় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল হীচি (উপত্যকার পশ্চিমদিকের গ্রামসমূহ) গ্রামগুলোর প্রধানদের সঙ্গে আর বাকি চারজনকে বিয়ে দিয়েছিল হীটী (উপত্যকার পূর্বদিকের গ্রামসমূহ) গ্রামগুলোর প্রধানদের সঙ্গে। এইভাবে আতো দিয়ু-র বংশধররা গোটা উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

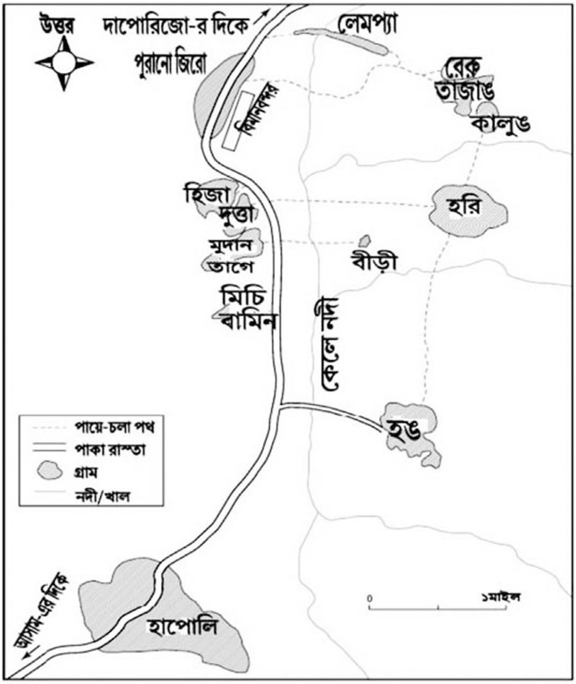

আপাতনি উপত্যকার মানচিত্র

বহু বহু দিন আগে আপাতনিরা যখন এখানে প্রথম এল, তখন এই আপাতনি উপত্যকা ছিল এক বিশাল জলাজমি, আর এখানকার জলায় বাস করত বুরা নামের এক অদ্ভূত পশু। বুরা যে ঠিক কেমন ছিল, আজ আমরা আর তা বলতে পারব না, সম্ভবত বড়সড় কুমিরের মতো (কেউ আবার বলে অতিকায়

শুয়োরের মতো) কোনো জন্তু ছিল তা। যাই হোক না কেন, তখন কোনো নদী বা মাঠ ছিল না, ছিল কেবল জলা আর এই বুরা। একদিন আপাতনিরা দেখল যে জলার মাঝে বুরা এক গভীর গর্ত খুঁড়ছে যাতে জলের নীচে সে লুকিয়ে থাকতে পারে। তারা ভাবল যে বুরা বুঝি তাদের আক্রমণ করবে। এই ভেবে ভয় পেয়ে তারা পালাল। তারপর দুটো ম্যাম্যা (বিশেষ শক্তিধর দুটো তামার থালা, একটি পুরুষ, অন্যটি নারী) ঘর ছেড়ে বের হল বুরা-র সঙ্গে লড়াই করতে। বুরা-র

২০০২ সাল। কালুঙ গ্রামের লোড তালইয়াঙ-এর পুত্রবধূ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ম্যাম্যা থালা বাজাচ্ছে। ম্যাম্যা-র নষ্ট হয়ে যাওয়া চোখের চিহ্ন থালাটির ভাঙা অংশ। চিত্রগ্রাহক স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন।

সঙ্গে সেই ভীষণ যুদ্ধে নারী ম্যাম্যা-র প্রাণ গেল, কিন্তু পুরুষ ম্যাম্যা এক কোপে বুরা-র মাথা কেটে তাকে হত্যা করল। যুদ্ধশেষে ম্যাম্যা যখন ঘরে ফিরল, ঘরের পুরুষটি ছিল বাইরে। যুদ্ধোন্মাদনায় ম্যাম্যা তখন এতই উন্মত্ত যে সে ঘরের ছেলেটির মাথাও এক কোপে কেটে ফেলল। ঘরের পুরুষ ঘরে ফিরে যখন তার পুত্রের শব দেখল, তখন এক মুষল নিয়ে সে ম্যাম্যা-র দিকে তেড়ে গেল। ম্যাম্যা পালিয়ে গিয়ে বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রইল। সেই বাঁশের ঝাড়ে এক কাটা বাঁশের ধারালো গোড়ার খোঁচায় তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল। আজ অবধি তামার থালার এক চোখ নষ্ট হয়ে আছে। কখনও কখনও এই ম্যাম্যা-কে ব্যবহার করা হয় চর্মরোগ নিরাময়ের জন্য। আমরা ম্যাম্যা-র ওপর চালের গুঁড়ো ঘষে তাকে তৈরি করি, তারপর পুরোহিত নির্দিষ্ট আচার পালন করেন।

(কথক-কালুঙ গ্রামের ৪০ বছর বয়স্ক কালুঙ লেন্টো। ২০০১ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১১৮ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল। কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

লোককথায় অনেক জড়বস্তু ও প্রাকৃতিক শক্তির মানুষীকরণ হয়, এখানে একজন মানুষের জড়বস্তুকরণ হয়েছে। মানুষ ম্যাম্যা রূপান্তরিত হয়েছে ধাতুর থালায়।

বস্ত্রবয়ন

> প্রথমে আমাদের পূর্বপুরুষরা নানা উপায়ে কাপড় বোনার চেষ্টা করেছিল। একটা বানরের গা থেকে লোম তুলে তা দিয়ে বোনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা কাজে দিল না। তারপর তারা উড়ুক্কু কাঠবিড়ালীর গায়ের পশম ব্যবহার করার চেষ্টা করল, কিন্তু তা এত সহজেই ছিঁড়ে যায় যে তাও কাজে এল না। কান্টু ইঁদুরের লোম ব্যবহারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হয়েছিল। ডিকা পাখির পালক ব্যবহারের চেষ্টাও কাজে আসেনি।

শেষ অবধি তারা ভেড়ার গায়ের পশমী লোম ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু সেই লোম থেকে তৈরি সুতোও যথেষ্ট মিহি হতো না। তাই হিন্টী আনী তার নিজের চুল থেকে মিহি সুতো তৈরি করল। হিন্টী আনী কালো চুল, নীল চুল ও সাদা চুল তৈরি করেছিল। মেয়েরা সেই চুল সংগ্রহ করে আনত আর তার থেকে সুতো বুনত। হিন্টী আনীর চুল দিয়ে মেয়েরা দারুণ শাল বুনতে পারত। হিন্টী আনী-র নিজের মাথার খুলি পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো কুরু নদীর ধারের মোব্যু গাছের পাতা থেকে রঙ তৈরির জন্য। আর কিমে নদীর ধারের পায়্যে গাছের পাতা থেঁতো করে রঙ তৈরি করার জন্য থেঁতন-শিলা হিসেবে ব্যবহার করা হতো হিন্টী আনী-র কোমরের নিম্নভাগকে। এইভাবেই আমাদের শাল বোনার রঙ তৈরি হয়েছিল।

আমরা, আপাতনিরা, তুলো চাষ করতাম না। তুলো চাষ করত নিশি-রা। নিশি-দের কাছ থেকেই আমরা তুলো পেতাম। আমরা নিশি-দের দিতাম চাল আর খাদ্যোপযোগী পোকামাকড়, তার বদলে নিশি-রা আমাদের দিত তুলো আর শুয়োর। তুলো পাওয়ার পর আমরা গোটা রাত ধরে একটা কাঠের লাঠি দিয়ে বেলে তাকে বিছাতাম। তারপর একটা কাঠের কাঠামো ব্যবহার করে সুতো কাটা হতো আর বাঁশের ফালির উপর জড়িয়ে রাখা হতো। তারপর সাবধানে সেই জড়িয়ে রাখা সুতোর পাক খুলে এক পাত্র জলের মধ্যে ধানভাঙা চালের সঙ্গে সব সুতো চোবানো হতো। তারপর সেই পাত্র আগুনের ওপর দিয়ে ফোটানো হতো যতক্ষণ না চালগুলো আধ-সেদ্ধ হচ্ছে। তারপর আগুন থেকে পাত্র নামিয়ে, সুতোগুলো বের করে তাদের রোদে শুকোতে দেওয়া হতো। এরপর সেই সুতো দিয়ে কাপড় বোনা হতো। সেই আগেকার দিনে কমলা রঙ তৈরির জন্য আমরা জঙ্গলে সাঙ্কে গাছ খুঁজতে যেতাম। সাঙ্কে গাছের বাকল তুলে সরু সরু টুকরোয় কেটে নিয়ে আসা হতো। সেই টুকরোগুলো একটা পাত্রের মধ্যে সুতো, চাল আর জলের সঙ্গে দিয়ে সারারাত ফোটানো হতো। এই ভাবেই তৈরি হতো কমলা সুতো যা দিয়ে বিখ্যাত ‘চোখ-মুখ’ নকশা কাপড়ে বোনা হতো।

লাল রঙ তৈরির জন্য জঙ্গল থেকে একপ্রকার লতানে গাছ সংগ্রহ করা হতো ও একইভাবে সারারাত ফোটানো হতো।

সুতোকে ধানচারা-বোনা ক্ষেতের জলের নীচে একমাস চুবিয়ে রাখলে কালো রঙের সুতো পাওয়া যেত।

নীল রঙের সুতো তৈরি করত নিশি-দের তারু ও লাজি কৌমের মানুষেরা। আমাদের মায়েরা ওই নিশিদের লম্বা লম্বা যৌথঘরগুলোয় গিয়ে ওই নীল সুতো নিয়ে আসত।

ভেড়ার পশম আসত নিশি-দের বসত ছাড়িয়ে আরও দূর দেশ থেকে, যেখানে ভেড়া পাওয়া যেত। পশমে বোনা কম্বল আমাদের এখানে আসত। সেই কম্বল খুলে পশম দিয়ে আমরা আবার শাল বুনতাম নিজেরা।

জামা ও ঘাগরা বোনার জন্য নিশি-দের কাছ থেকে পাওয়া তুলো ব্যবহার করা হতো। জামা মোটা সুতো দিয়েই বোনা হতো, কিন্তু ঘাগরার জন্য লাগত মিহি সুতো।

বিভিন্ন ধরনের শাল বোনা হতো, যেমন—জিলাঙ (পুরোহিত ও গ্রামসভার সদস্যদের জন্য), প্যামিন (কমলা রঙের শাল), মিসান (নিশি ও পার্বত্য মিরি-দের জন্য) এবং ল্যাপু (সাধারণ ব্যবহারের জন্য)।

আজকাল হালইয়াঙ-দের কাছ থেকে যে সুতো আমরা পাই তা খুবই সমঞ্জস ও মিহি। এছাড়া বয়নের উপকরণ আমাদের খুব একটা বদলায়নি, কেবল হস্তকলার নৈপুণ্যে অনেক নতুন নতুন নকশা আমরা তৈরি করেছি।

(কথক-হরি গ্রামের ৬০ বছর বয়স্ক হাগে ইয়াব ইয়ুঙ। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল। কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

বহির্দৃষ্টিতে আপাতনিরা: প্রথম আখ্যান

১৮৯০-এর দশকের শেষদিকে এইচ এম ক্রো নামের এক ইউরোপিয় চা-বাগিচা-মালিক আপাতনি উপত্যকায় আসেন। যতদূর জানা যায়, এই উপত্যকায় পা ফেলা তিনিই প্রথম 'বাইরের লোক'। ক্রো-র অভিযান করার শখ ছিল, তাই

বড়দিনের ছুটিতে কিছু ডাফলা (নিশি-দের সমতলের লোকরা তুচ্ছার্থে ডাফলা বলে ডাকত) মালবাহককে নিয়ে 'অজানা' আপাতনি উপত্যকায় পৌঁছনোর জন্য বেরিয়ে পড়েন। উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্য তিনি সঙ্গে কিছু পুঁতি, নুন ও রেশম বস্ত্র নিয়েছিলেন। আপাতনি উপত্যকায় পৌঁছে তিনি আপাতনিদের সমাজ দেখে আবাক ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া বর্ণনা ভেরিয়ের এলউইন 'ফিলজফি ফর নেফা' বইতে (দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা: ১৩-১৪) উদ্ধৃত করেছেন। সেখান থেকে জানা যায় যে ক্রো দেখেছিলেন যে এই দুর্গম উপত্যকায় বাস করছে একটি অত্যন্ত সংঘবদ্ধ ও পরিশ্রমী জাতি। তারা সেচের বিস্তৃত ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যার ফলে তাদের কৃষিজমিগুলা উচ্চফলনদায়ক। লাঙ্গলের ব্যবহার তারা জানে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের লম্বা বাঁটযুক্ত কোদাল ব্যবহার করেই নিজেদের ও তাদের পড়শী জাতিদের প্রয়োজন মেটানোর মত্যে যথেষ্ট ফসল উৎপাদন করে। ডাফলাদের বাধার ফলে তারা সমতলে লেনদেন করতে যায় না। তা সত্ত্বেও তাদের জীবন মোটের উপর সম্পদশালী ও আনন্দময়।

উপনিবেশ-শাসকদের সঙ্গে প্রথম মোলাকাত

> আমার দাদুর কাছ থেকে শুনেছি যে ওই সময় (১৮৯৭ সাল)-এর আগে কয়েকজন আপাতনি সমতলে গিয়েছিল বিনিময় করতে, প্রধানত নুনের জন্য। কেউ কেউ চা-বাগানে কাজ করতেও গিয়েছিল। বিভিন্ন কারণে তাদের বহুজন সেখানে মারা যায়।

সমতলের সেনারা আমাদের উপত্যকায় আসার কয়েক মাস আগে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। নিশি-দের গ্রাম লিনিয়া-য় একটা খুনের ঘটনা ঘটেছিল। যে নিশি খুন করেছিল, হরি গ্রামের এক আপাতনির সঙ্গে ছিল তার মানইয়াঙ-সম্পর্ক (উপহার-বিনিময়ের আচারপালনের মধ্য দিয়ে একজন আপাতনি ও একজন নিশি-র মধ্যে বন্ধুত্ব-সহযোগিতার সম্পর্ক)। খুনের পর সেই নিশি পালিয়ে এসে হরি গ্রামের সেই আপাতনির বাড়িতে আত্মগোপন করে। আপাতনিটি তাকে কিছুদিন নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রাখার পর নিরাপত্তার জন্য সমতলের কাছে একটা গ্রামে তার পরিচিতজনের বাড়িতে তাকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সেই গ্রামের

একজন লিনিয়া গ্রামের লোকজনদের কাছে এ খবর ফাঁস করে দেয়। লিনিয়া গ্রামের খুন হওয়া ব্যক্তির কৌমের লোকেরা একটা দল তৈরি করে সেই গ্রামে হানা দেয় ও খুনী ব্যক্তিকে আটক করে লিনিয়া-য় ফেরত নিয়ে যায়। লিনিয়া-য় প্রত্যাবর্তনের পথে আপাতনি উপত্যকা দিয়ে যাওয়ার সময় তারা হরি গ্রামের সেই আপাতনির বাড়িতে হাজির হয় আর ধরা পড়া ব্যক্তি আপাতনিটির উপর বিশ্বাসঘাতকতার দোষ আরোপ করে। আপাতনিটিকে 'মামা' বলে সম্বোধন করে ধরা পড়া ব্যক্তিটি অভিশাপ দেয় যে খুনের শাস্তিতে তাকে যদি মরতে হয়, তাহলে তার বিশ্বাসভঙ্গকারীরও মৃত্যু হবে।

পরের দিন লিনিয়া-য় খুনের বিচার করে নিশি-রা তাকে মেরে ফেলে। এই খবর হরি গ্রামে পৌঁছনোর পর আপাতনিটির মনে হয় যে মৃত ব্যক্তির আত্মা যদি তাকে বিশ্বাসভঙ্গকারী রূপে ঠাউরে থাকে তাহলে সেই আত্মা নিশ্চিতভাবেই তার উপর প্রতিশোধ নেবে। এই মিথ্যা দোষারোপ থেকে মুক্তি পেতে সমতল-নিকটস্থ গ্রামের মানুষদের প্রতি রাগে সে আপাতনিদের একটা ছোট দল তৈরি করে সেই গ্রামের উপর হামলা চালায়।

ঠিক কী হয়েছিল সেই হামলায় জানি না, তবে বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছিল। তখন সেই গ্রামের মিসান (পার্বত্য মিরি)-রা সমতলের শাসক ব্রিটিশ-দের কাছে সহায়তা প্রার্থনা করে আপাতনিদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য। ব্রিটিশ-রা তখন হালইয়াঙ ও মিসান (নিশি পার্বত্য মিরি)-দের নিয়ে ও সেনা নিয়ে এই উপত্যকায় আসে ও আপাতনিদের সঙ্গে মিসান, হালইয়াঙ-দের বোঝাপাড়ায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে হরি ও হঙ-এর মাঝে বীড়ী-র পাহাড়ের উপর এক সভা ডাকে। ব্রিটিশদের সঙ্গে আসা হালইয়াঙ-রা গ্রামের ঘর-ঘর থেকে ডিম, শুয়োর, মুরগি চুরি করছিল, তাই বহু আপাতনি সেই সভায় যায়নি। আপাতনিদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিল হাগে দোলইয়াঙ, তাস্সো গ্যায়ু, হাগে ইপো ও তাস্সো কানো, আর আপাতনিদের মুখপাত্র ছিল তাস্সো মুর্চি, যে পুরোহিতদের বিশেষ শাল ও তামার বালা পরে গিয়েছিল। নিশি বা পার্বত্য মিরি-দের হাতে কত আপাতনি মারা গেছে বা প্রবঞ্চিত হয়েছে তা সেখানে তাস্সো মুর্চি কোট্টির (ছোট ছোট বাঁশের কাঠি যা গণনার জন্য ব্যবহার করা হয়) ব্যবহার করে একটা মিথুন জরিমানা করা হয়েছিল, সেই

মিথুন ব্রিটিশদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মিথুন নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে ব্রিটিশরা তা ফেরত দিয়ে গিয়েছিল।

(কথক: হরি গ্রামের ৭০ বছর বয়স্ক হাগে হীবা ও ৬৫ বছর বয়স্ক হাগে তাপা। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্রাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১৩২-১৩৩ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল। কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

দেখা যাক ব্রিটিশরাষ্ট্রের দলিল-দস্তাবেজে এই ঘটনাকে কীভাবে দেখা হয়েছে।

১৮৯৬ সালের শেষদিকে উত্তর লখিমপুর-এর ব্রিটিশ প্রশাসকদের কাছে একটা হত্যাকাণ্ডের খবর আসে, সে খবর তারা শিলং-য়ে তাদের উচ্চপদস্থদের কাছে পাঠায়। খবর অনুযায়ী, এক দল আপাতনী পাহাড় থেকে নেমে পোড়ু নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা চালিয়েছে। পোড়ু পার্বত্য মিরি জনজাতির লোক, যে ইনার লাইনের কাছের এক চা বাগানে শ্রমিক-যোগনদার বা লেবার-কনট্রাক্টর হিসেবে কাজ করত। দুজন পার্বত্য মিরি এই হানায় প্রাণ হারিয়েছে, আর চারজনকে আপাতনিরা তাদের সঙ্গে ধরে নিয়ে গেছে, যাদের মধ্যে একজন আবার পথেই মারা গেছে।

১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আসাম রাইফেলস-এর ৩০০ সেনা ও তাদের অফিসাররা পাহাড়ে উঠতে শুরু করে। তাদের সঙ্গে ছিল ৪০০ জন মালবাহক ও ভৃত্যের এক বিশাল বাহিনী। পাহাড়ে উঠতে উঠতে বিভিন্ন জায়গায় সাময়িক ঘাঁটি তৈরি করে কিছু কিছু সেনা মোতায়েন করে যাওয়া হয়েছিল। আপাতনি উপত্যকায় পৌঁছেছিল ১২০ জন সেনা। অভিযানের কম্যান্ডিং অফিসার ছিল আর.বি.ম্যাককাবে। হঙ গ্রামে ঢোকার মুখে লম্বা বর্শা হাতে একদল আপাতনি ক্রুদ্ধভাবে তাদের গ্রামে ঢুকতে মানা করে বলেছিল যে তারা তাদের গ্রামপ্রধানকে সেখানে ডেকে আনছে, সেখানেই যা কথা বলার আছে তারা বলুক। কিন্তু ম্যাককাবে তাদের নিষেধ অমান্য করে এগিয়ে গেলে তারা কোনো বাধা দেয়নি।

পরের দিন সকালে আলোচনা (ব্রিটিশদের ভাষায়, 'প্যালাভার') শুরু হয়, চলে টানা দুই দিন ধরে। এই আলোচনার একটি আলোকচিত্রও ব্রিটিশ দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে পাওয়া যায়। আলোকচিত্রটি এইরকম—

আলোকচিত্রটি ইংরেজ সার্জেন-লেফটেন্যান্ট লেভেনটন-এর তোলা। এখানে আপাতনিদের সঙ্গে ইংরেজ অফিসারদের আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে। নিশি ও পার্বত্য মিরিদের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত। ছবির আশেপাশের হাতে-লেখা চিহ্নগুলি খেয়াল করলে আরও কিছু সনাক্তকরণ করা যায়। ইংরেজ পলটিকাল অফিসার ম্যাককাবে বসে আছেন, যেন বা কিছু লিখছেন। 'নোরি' ও 'রো' আরও দুই ইংরেজ অফিসার। 'সিঙ' ইংরেজ বাহিনীর কোনো হালইয়াঙ কর্মচারী। 'টেগু' নিশি বা মিরি-দের কেউ বোধহয়।

ব্রিটিশ দলিল-দস্তাবেজে দেখা যায় যে ম্যাককাবে বলছেন যে প্রশাসনিক পদে উত্তর-পূর্বে এর আগে ২০ বছরের অভিজ্ঞতায় এত ধৈর্যের পরীক্ষা আর কখনো তাঁকে দিতে হয়নি। আপাতনিদের প্রধান মুখপাত্র সমতলবর্তী মিরিদের গ্রামে তাঁদের হানা চালানোর ঘটনা স্বীকার করে নেন, তারপর তিনি বিস্তৃতভাবে

মিরিদের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ ও অভিযোগের তালিকা পেশ করতে থাকেন। সেই অভিযোগের ক্রমাঙ্ক চিহ্নিত করার জন্য মাটির উপর রাখা একটা লম্বা লাঠির উপর এক এক করে বাঁশের টুকরো বা কোট্টির রাখতে থাকেন। এক একটি কোট্টির এক একটি অভিযোগের জন্য, অভিযোগও বিবিধ—মিথুন চুরি, ধার নিয়ে শোধ না করা, আপাতনি মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া। এরপর আপাতনি মুখপাত্র অভিযোগ করেন যে আপাতনিদের হানায় পোড়ু নামে যে মিরি মারা গেছে সে বহুদিন ধরে অনেক আপাতনিদের ঠকিয়ে আসছে। বহু আপাতনিকে সে চা বাগানে কাজ করে রোজগারের কথা বলে সমতলে নিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে অনেক আপাতনির সেখানে দুর্ভোগে মৃত্যু ঘটেছে, অনেক আপাতনি হাড়-ভাঙা খেটেও কোনো পারিশ্রমিক না পেয়েই ফিরে এসেছে। এই বিস্তৃত অভিযোগ-পেশ-এর পর আপাতনি মুখপাত্র সমতলবর্তী গ্রামে হানায় বন্দি করে আনা ৩ জনকে এবং পোড়ুর ঘর থেকে লুট করে আনা একটা বন্দুক ইংরেজ বাহিনীর কাছে ফেরত দেয়।

ম্যাককাবে বন্দি করে আনা আরও ১০ জনকেও দাবি করেন এবং অন্য এক হানায় লুট করা আর একটি বন্দুকও ফেরত চান। আপাতনিরা সেই ১০ জনের মধ্যে ৬ জনকে মুক্ত করতে রাজি হয় ও ক্ষতিপূরণ বাবদ তিনটে মিথুন ও একটি মূল্যবান তিব্বতি ঘন্টা দিতেও রাজি হয়। তারপর আপাতনিরা আগন্তুক বাহিনীর সবার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করে। ম্যাককাবে চিন্তা করেন যে আপাতনিদের দেওয়া মিথুনগুলো তাঁদের কোনো কাজে আসবে না, তা শেষ অবধি তাঁদের সঙ্গে আসা নিশি মালবাহকদের ভোগে যাবে এবং নিশি মালবাহকদের উপর তিনি বিরক্তও ছিলেন, তাই তিনি মিথুনগুলো আপাতনিদের আবার ফেরত দিয়ে দেন। তারপর ইংরেজ বাহিনী ফিরে আসে। ব্রিটিশ দলিলে এই ঘটনাকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে শৃঙ্খলারক্ষা ও ন্যায়বিচারপ্রতিষ্ঠার একটি সফল কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আপাতনি সমাজের রাজনৈতিক পরিসর: বুলিয়াঙ

১৮৯০-এর শেষভাগে প্রথম বাইরে থেকে যাওয়া পর্যবেক্ষক ক্রো-র দৃষ্টিতে আপাতনিদের সমাজকে যে অত্যন্ত ‘সংঘবদ্ধ’ মনে হয়েছিল, তা বোধহয়

আপাতনি সমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি হল বুলিয়াঙ, যা এক বিশেষ ধরনের গ্রামপরিষদ। 'এ ফিলজফি ফর নেফা' বইতে (পূর্বোক্ত সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১৫৪-১৫৫) ভেরিয়ার এলউইন-ও বলেছেন যে আপাতনিরা অরুণাচল প্রদেশের (তৎকালীন নেফা-র) অন্যান্য জনজাতিদের তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত চরিত্রের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছে তাদের ঘন বুননের সহযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থা ও গ্রামগুলোর পরস্পর-নিকটবর্তী অবস্থানের জন্য। ১৯৪৪ সলে সি ভন ফুরের-হাইমেনডর্ফ সরেজমিন দেখে আপাতনিদের বুলিয়াঙ সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, এলউইন তাও বিশদে উদ্ধৃত করেছেন। এই বর্ণনা থেকে বুলিয়াঙ সম্পর্কে কী ধারণা পাওয়া যায় দেখা যাক।

হাইমেনডর্ফ বলেছিলেন, আপাতনিদের বিভিন্ন কৌমের প্রতিনিধি, সমষ্টিগতভাবে যারা গ্রামীন প্রশাসন হিসেবে কাজ করে, তা হল বুলিয়াঙ। এই প্রতিনিধিদের বাছা হয় কী ভাবে? ভূসম্পত্তি বেশি এমন কুলীন পরিবার থেকে এক বা দুজন সবসময় নির্বাচন করা হয়, কিন্তু তা ছাড়াও ব্যক্তিগত গুণ ও যোগ্যতার নিরিখে প্রভাবশালীদেরও নির্বাচন করা হয়। বুলিয়াঙ তিন ধরনের—আখা বুলিয়াঙ, ইয়াপা বুলিয়াঙ ও আজাঙ বুলিয়াঙ। আখা বুলিয়াঙ হলেন বৃদ্ধজনেরা, বয়সভারে যাঁদের পক্ষে প্রশাসনিক কাজকর্মে গায়েগতরে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে তাঁদের কথাই শেষ কথা কারণ পরম্পরাগত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁদের স্মৃতিতেই রক্ষিত। ইয়াপা বুলিয়াঙ হল মধ্যবয়স্করা, যারা গ্রামপরিষদের সভায় নিয়মিত অংশ নেয়, যে কোনো বোঝাপড়া বা সিদ্ধান্তপ্রয়োগে নেতৃত্ব দেয় এবং সব বিষয় আখা বুলিয়াঙদের অবগতিতে আনা ও পরামর্শ নেওয়ার কাজ করে। আজাঙ বুলিয়াঙ হল তরুণরা, যাদের কাজ ইয়াপা বুলিয়াঙদের সহকারী হিসেবে কাজ করা, খবরাখবর বহন করা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়া। প্রত্যেক বুলিয়াঙ তার কৌম বা কৌম-সংঘের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে দায়বদ্ধ হলেও তারা সামগ্রিকভাবে পরম্পরাগত আইন ও ন্যায়পরতার আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। কারো কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপ করা দস্তুর নয়, কেবলমাত্র যখন কোনো সংঘাত, বিবাদ বা কলহ বারোয়ারি

পরিসরের বিষয় হয়ে উঠেছে, সমষ্টিগতভাবে যার বিধান করা উচিত, তখনই তারা হস্তক্ষেপ করে এবং আলোচনার মাধ্যমে বা প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করে। সমষ্টির স্বার্থে এই ভূমিকা পালনের পারিশ্রমিক রূপে প্রতিটি সমাজিক উৎসবের সময় তাদের বিভিন্ন উপহার, বিশেষ করে নিজেদের তৈরি সুরা ও মাংস, দেওয়া হয়।

হাইমেনডর্ফ মন্তব্য করেছিলেন যে এই ব্যবস্থা আদিবাসীদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করছে এবং তৎকালীন ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার (ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার)-এর কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন যে এই ব্যবস্থার প্রভাব বা প্রাধিকারকে খর্ব করে এমন কোনো পদক্ষেপ যেন না নেওয়া হয় কারণ তা আদিবাসীদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে।

হালইয়াঙদের আধিপত্য বিস্তার: ১৯৪৮ ও তারপর

> বুলিয়াঙ-এর মাধ্যমে স্ব-প্রশাসন-ব্যবস্থার প্রভাব ও প্রাধিকার রক্ষা করার এই যে পরামর্শ হাইমেনডর্ফ তাঁর লেখায় দিয়েছিলেন, বাস্তব কর্মে কিন্তু তিনি নিজেই তার বিপরীত প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটিয়েছিলেন। একজন আপাতনির স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরান যাক।
>
> লালিঙ আর ইয়ালু (ফুরের-হাইমেনডর্ফ-কে এলাকার আদিবাসীরা লালিঙ বলত, আর তার স্ত্রী বেটি-কে ইয়ালু বলত) আমাদের উপত্যকায় আসার (১৯৪৪) পর থেকে হালইয়াঙরা আমাদের মধ্যের ঝগড়া-বিবাদে হস্তক্ষেপ করে বিচার করতে থাকে। তেমনই এক ঘটনায় হঙ গ্রামের বুলো কৌমের লোকেরা রেগে গিয়েছিল হালইয়াঙদের করা বিচারে হেরে গিয়ে। তারপর থেকে হঙ গ্রামের মানুষরা চাইত না যে হালইয়াঙরা তাদের ব্যাপারে নাক গলাক।

লালিঙ আর ইয়ালু প্রথমে থাকত হিজা-য়, তারপর ল্যিঙ পীসা-য়, আর তারপর পাপী-তে। যখন তারা পীসা-য় থাকতে লাগল, তখন তারা আমাদের বাধ্য করত তাদের মালপত্র বহন করার জন্য। এমনকি তাদের মাল বইতে অস্বীকার করেছে বলে আমাদের দুজন লোকের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ খাড়া করেছিল।

সেই দুইজন হল তাস্সো তাসের আর হাগে তাতিঙ। সমতলের কিমিন থেকে জোরাম ও লাজি মাই হয়ে জিরো অবধি মাল বহন করতে হতো।

প্রথমে হালইয়াঙরা আমাদের মাল বইতে বাধ্য করল, তারপর হালইয়াঙরা আমাদের বিবাদের মীমাংসা করতে লাগল। তারা আসার আগে আমরা নিজেরাই নিজেদের বিবাদের মীমাংসা করতাম। লালিঙ (হাইমেনডর্ফ) আসার পর কেউ কেউ তাদের বিবাদে মধ্যস্থতা করার জন্য লালিঙ (হাইমেনডর্ফ), মেনজি বড়ুয়া (ভারত সরকারের অফিসার) বা হাজারিকা সাব(ভারত সরকারের অসমিয়া অফিসার)-এর কাছে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল যে আলাপ-আলোচনায় বিবাদ মেটাতে তারা সাহায্য পাবে। কিন্তু এই হালইয়াঙরা নিজেদের জোর খাটাতে শুরু করে আর আমাদের মধ্য থেকে লোকজনকে ধরে জেলে পাঠাতে থাকে। আমরা তাদের এই বিচারের নিয়মকানুন মানতে রাজি ছিলাম না, আমরা জেলে পাঠানোর রীতি চাইছিলাম না, আমরা আমাদের রীতি অনুযায়ীই চলতে চাইছিলাম। কিন্তু হালইয়াঙরা তাদের রীতি না মানার জন্য কিছু বুলইয়াঙদের অবধি জেলে পাঠাতে শুরু করে। আমাদের বাবা ও দাদু-রা বলতে থাকে যে আমাদের বুলইয়াঙদের মাধ্যমেই আমাদের বিবাদ মেটানো উচিত। এরপর একটা মিথুন আর এক তরুণীর সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক সংক্রান্ত বিবাদে বুলইয়াঙদের বিচার নাকচ করার জন্য হালইয়াঙরা হস্তক্ষেপ করে। এসব দেখে কিছুজন বলতে শুরু করল, ‘এ ভালো হচ্ছে না। এইসব হালইয়াঙদের এখানে আসতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের উচিত এইসব বাইরের লোকদের তাড়িয়ে দেওয়া।’ প্রথমে যারা এমন বলতে শুরু করেছিল তারা হল হঙ-এর তাপি কোজিঙ, কালুঙ-এর নাকো গ্যাতি ও সুবু খোড়া এবং হরি-র তাস্সো তালু। কিছুদিনের মধ্যে গোটা উপত্যকার লোকজনই বলতে শুরু করল, ‘এইসব হালইয়াঙদের এখানে আসা উচিত নয়। আমাদের নিজেদের বিবাদের বিষয় আমরা আর ওদের সঙ্গে আলোচনা করব না, নিজেদের বিবাদ আমরা নিজেরাই মেটাব। আর আমরা ওদের আক্রমণ করব।’

হালইয়াঙ-রা পাপী-তে একটা ছাউনি তৈরি করেছিল তাদের মালপত্র মজুদ করার জন্য। আপাতনিরা কুরে-তে হালইয়াঙদের সরকারের আউটপোস্ট আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই পাপী-র হালইয়াঙদের ছাউনিও জ্বালিয়ে দেয়। কুরে-র আউটপোস্টের উপর আক্রমণ করতে গেলে হাজারিকা সাব এবং তার

সেপাইরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তিনজন আপাতনি—তাস্সো পিলইয়াঙ, ডুয়ু কোলইয়াঙ আর তাস্সো কোজিঙ—গুলিবিদ্ধ হয়। তারা মারা যায়। আমরা প্রায় কিছুই করতে পারি নি। কেবল দুসু রিকু হাজারিকা সাবের গায়ে এক বর্শার ঘা লাগাতে পেরেছিল। তিনজন গুলিতে মারা যাওয়ার পর সবাই ছুটতে ছুটতে গ্রামে পালিয়ে এসেছিল।

কুরের উপর আক্রমণের চারদিন পর মেনজি বড়ুয়া আটজন সশস্ত্র সেপাইয়ের দল নিয়ে হরি গ্রামে এল। তারা হাওয়ায় দুম দুম করে গুলি ছুঁড়ল, তারপর হাঁক দিয়ে 'পি আই'-দের (পি আই হল পলিটিকাল ইন্টারপ্রেটর-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আদিবাসীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ভারত সরকার ১৯৪৫-এর পর এইভাবে চিহ্নিত করতে থাকে সরকারেরর সঙ্গে অদিবাসীদের সম্পর্ক গড়ে তোলার সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।) বেরিয়ে আসতে বলে। সেই সময় হরি-র পি আই ছিল দুসু তাইয়ু আর হাগে ডোলে। তারা বেরিয়ে এল। হাগে ডোলে-কে তার ফসলের ঘরের পাশেই গুলি করে খুন করল সেপাইরা। আর দুসু তাইয়ু-কে সঙ্গে সঙ্গে বন্দি করল তাদের সঙ্গে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মেনজি বড়ুয়া বন্দিকে নিয়ে পুরানো জিরো-য় ভারত সরকারের ক্যাম্পে চলে গেল। সেইখান থেকে সে হুকুম দিল হরি গ্রামকে আগুনে পুড়িয়ে পুরোপুরি ধবংস করে দেওয়া হবে। মেনজি বড়ুয়ার সেপাইরা হরি গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিল আর এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগল। হাগে জারবো ছুটে পালাচ্ছিল, গুলি তখন তার পিঠে লাগে আর পেট ফুঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। গ্রামের পিছনে বাঁশঝাড়ে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় লাণ্ডি হালে গুলিবিদ্ধ হয়। হাগে খোদা-কে গুলি করে মারা হয়। (এই সময় প্রায় ৪,০০০ আপাতনি হালইয়াঙদের সন্ত্রাস থেকে প্রাণ বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, তারপরও বহুদিন নিজেদের গ্রামে না ফিরে অন্যান্য আদিবাসী জনজাতিদের গ্রামে আত্মগোপন করে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়।)

এরপর আমরা ভারত সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করি, ভারত সরকারের সব নির্দেশ পালন করতে থাকি—মাল বহন করা থেকে সমস্ত কিছু। কুরে-তে মেনজি বড়ুয়া ভারত সরকারের অফিস বসাল রায় সাব, গেণ্ডা সাব আর কয়েকজন নিশি 'পি আই'-কে নিয়ে। এই নিশি পি আই-রা ছিল

কুপ তানিয়া (বা কোপ তেমি, যে হাইমেনডর্ফের অধীনে কাজ করতে শুরু করেছিল, তারপর ভারত সরকারের বিশ্বস্তজন হয়ে ওঠে), নিক কোপে আর টাবা টাটু। ভারত সরকারের সাব (সাহেব)-রা আপাতনিদের গাঁয়ে গাঁয়ে তাদের পছন্দমতো 'গাঁওবুড়ো' ঠিক করে দিতে থাকে, যেমন হাগে ডোলইয়াঙ, গ্যাতি টাডু, মুদান টাকের, পাদি লালইয়াঙ আর টাকে টাগু। এই ঠিক করে দেওয়া গাঁওবুড়োরা সব সরকারের সঙ্গে 'সহযোগিতা' করার কথা দিল, এমনকি তারা কুরের উপর আক্রমণের জন্য ক্ষমাভিক্ষাও করল। তারা এসব করেছিল কারণ তারা চায়নি যে আপাতনিদের উপর আরও আক্রমণ নেমে আসুক আর আরও আপাতনিকে প্রাণ দিতে হোক। সরকারের সঙ্গে সহায়তা করার প্রতিজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ তারা সরকারকে ভেট দিয়েছিল একটা বহুমূল্য ধাতুর ঘন্টা, একটা পিতলের থালা, কিছু মিথুন আর গরু।

এর পর পরই পুরানো জিরো-র কাছে পাহাড়ের উপর ভারত সরকারের নতুন বাড়ি তৈরি হল। আমাদেরকেই খাটতে হল সেই ইমারত তৈরির কাজে মালপত্র বওয়া ও জোগান দেওয়ার কাজে। আমরা যখন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতাম, বন্দুকধারী সেনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অপমান করে বলত, 'ফালতু অকর্মা লোকজন! কোনো কাজই করতে পারে না!' কত বোঝা যে আমাদের বইতে হতো! যদি আমাদের কেউ তা করতে অস্বীকার করত তবে তাকে জেলে পাঠান হতো। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে, নীচ থেকে উপরে আমাদের ভারী ভোঝা বইতে হতো—এখান থেকে কিমিন, কিমিন থেকে এখানে, এখান থেকে পারসিং, তামেন-এর কাছে খেমিও হয়ে দাপোরিজো অবধি। না করলেই জেল! আমাদের ১০ থেকে ২০ জনকে না করার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল।

(কথক: হরি গ্রামের হাগে হীবা। ১৯৪৮-এ তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। ২০০৮ সালে স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন তাঁর কাছ থেকে এই কথনটি আপাতনি ভাষায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রে ধরেন। এর ইংরেজি লেখ্যরূপ স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের 'হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি' গ্রন্থে ১৩৪-১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে। বর্তমান লেখক কৃত তার বাংলা রূপান্তর এখানে ব্যবহৃত হল। কথনের মধ্যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা ব্যাখ্যা বা মন্তব্য বর্তমান লেখকের।)

১৯৪৮ এখনও আপাতনিদের কাছে সেই সময় রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে যখন হালইয়াঙ-রা আপাতনি উপত্যকা দখল করল, বা যখন আপাতনিরা তাদের স্বাধীনতা খোয়াল হালইয়াঙদের কাছে। ভারত যখন কয়েক শতক ধরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পদানত ছিল, আপাতনিরা তখন ছিল স্বাধীন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে ১৮৯৭ সালে প্রথম মোলাকাত হলেও, তখন তাদের স্বাধীনতা হারাতে হয়নি, সমতলের সরকার তাদের উপত্যকায় আধিপত্য কায়েম করায় তেমন মনোযোগ দেয়নি। ১৯৪০-এর দশকে সমতলের সরকার সেই মনোযোগ দিতে শুরু করে, তাদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব এই উপত্যকায় বিস্তৃত করতে তাদের প্রতিনিধি (যার মধ্যে হাইমেনডর্ফের মতো নৃতাত্ত্বিকও পড়েন) পাঠায়, সশস্ত্র বাহিনীর (আসাম রাইফেলস-এর) ঘাঁটি তৈরি করা ও পি আই বা পলিটিকাল ইন্টারপ্রেটর-এর নামে আদিবাসীদের মধ্য থেকে একটা বশংবদ অংশ তৈরি করার চেষ্টা শুরু হয়। আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বশাসনের ব্যবস্থাকে দুর্বল করে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তদনুসারী আইন ও দণ্ডব্যবস্থা লাগু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। হাইমেনডর্ফ ও সরকারি অফিসারদের দ্বারা আপাতনিদের বুলিয়াঙগুলোর প্রভাব ও প্রাধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা এই প্রক্রিয়ারই অংশ। আর এই প্রক্রিয়ারই একটি বিস্ফোরক মুহূর্ত ১৯৪৮ সাল, যখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বল্গামুক্ত করে দিয়ে আপাতনিদের স্বাধীনতা হরণ করা হল। ভারত রাষ্ট্রে তখন ঔপনিবেশিক সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে স্বাধীন ভারতের সরকারের হাতে আর সেই রাষ্ট্রই গিলে নিল আপাতনিদের স্বাধীনতা।

১৯৫৪ সালে পার্বত্য অরুণাচলের প্রশাসন চালাতে ভারত সরকার যখন নেফা (নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি) গঠন করল, তখন তার সুবানসিরি অঞ্চলের ‘পলিটিকাল অফিসার’-এর প্রাধন দপ্তর বসানো হল আপাতনি উপত্যকার উত্তর প্রান্তে পুরানো জিরোর এক পাহাড়ের মাথায়। মালপত্র বহনের সমস্যা সমাধান করতে ১৯৫০ সালেই জিরোতে তৈরি করা হয়েছিল বিমানবন্দর। পলিটিকাল অফিসার তাঁর আমলাবর্গ ও আসাম রাইফেলস-এর সশস্ত্র জওয়ানের দল নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। পাহাড়ের পাদদেশে বাজার ও নতুন লোকবসতি গড়ে উঠল। সরকারি (অর্থাৎ সরকারের বেছে দেওয়া) গাঁওবুড়ো (তাদের পোষাকও

সরকারের ঠিক করে দেওয়া এক ধরনের লাল 'ইউনিফর্ম', বুলইয়াঙ-দের পরম্পরাগত পোশাক নয়) গ্রামপরিষদগুলোর মাথায় বসিয়ে গ্রাম- পরিষদগুলোর চরিত্রই বদলে দেওয়া হল। ব্যবস্থা করা হল যাতে গ্রাম-পরিষদের আলোচনা ও বিচারে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য অগ্রাধিকার পায়, আদিবাসীদের নিজস্ব পরম্পরা-রীতি ন্যায়পরতা নয়।

হালইয়াঙদের আধিপত্য বিস্তার আরও তেজি হল ১৯৬২-র পর। ১৯৬২-র ভারত-চিন যুদ্ধের পর 'চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার' আবেগ-প্লাবনের মাথায় চড়ে নেফার পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে ভারতরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে বিপুল পরিমাণে মোতায়েন করা শুরু হল। আপাতনি উপত্যকাতেও সেনার 'ক্যাম্প' তৈরি হল। এক দশকের মধ্যে সেনা ও তাদের ঘিরে বাইরে থেকে আসা আমলা, প্রশাসক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বৃত্তিজীবী (যাদের সঙ্গে আপাতনিদের জীবনরীতি, সংস্কৃতি বা অর্থনীতি-র কোনো যোগ নেই, পরিচিতিও নেই) -দের কেন্দ্র করে আপাতনি উপত্যকার দক্ষিণে জঙ্গল কেটে নতুন গঞ্জ বা ছোট শহর গজিয়ে উঠল। তার নাম হাপোলি। কয়েক বছরের মধ্যে হাপোলি-র সঙ্গে আসাম-এর সড়ক যোগাযোগ তৈরি হল, ভারতরাষ্ট্রের সবরকমের প্রশাসনিক দপ্তরের শাখাদপ্তর হাপোলিতে খোলা হল। ব্যাঙ্ক, বাজার তৈরি হল। গোটা উপত্যকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রামগুলো থেকে সরে এসে হাপোলিতে কেন্দ্রীভূত হল। আপাতনিদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিসর বুলইয়াঙ প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে স্বশাসিত গ্রামপরিষদ-এর মৃত্যু এর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হল। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রূপে অঞ্চলের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে শেষ কথা বলার অধিকারী এখন সরকার-নিযুক্ত আমলা ডি সি (ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার), লোকপ্রজ্ঞার ভাণ্ডারী গ্রামের বৃদ্ধদের এখন আর এ বিষয়ে কোনো অধিকার নেই, অন্যান্য গ্রামবাসীদেরও নেই। এরপর ১৯৮৭ সালে নেফা তুলে দিয়ে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য গঠনের পর রাজ্য জুড়ে যে পার্টি-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার আরও একচেটিয়াভাবে কেন্দ্রীভূত ভারতরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে গচ্ছিত হয়েছে। এই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামোর প্রশ্রয়ে রাজ্য জুড়ে

গড়ে উঠেছে এক মুষ্টিমেয় আভিজাতবর্গ, কেন্দ্রীভূত শাসন বাস্তবায়িত করায় সহযোগিতার বিনিময়ে রাষ্ট্রক্ষমতার দর্পের প্রতিফলিত ছায়া গায়ে মেখে যারা ক্ষমতাদর্পী, আদিবাসীদের সহযোগিতামূলক জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা ব্যক্তিগত সম্পদ ও প্রভাব বৃদ্ধিতে মনোযোগী।

এর ফল কী হল দেখা যাক।

ভাষা ও সংস্কৃতি: পাড় ভাঙার শব্দ

সেনাবাহিনীর বড়সড় উপস্থিতির হাত ধরে আপাতনি উপত্যকায় জায়গা করে নিতে শুরু করে হিন্দি ভাষা। ২০০০-২০০৮ সময়পর্যায়ে আপাতনিদের মুখের গল্প সংগ্রহরত স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নকে অনেক আপাতনি বলেছিলেন যে ১৯৬০-এর দশকে সেনাদের কাছ থেকেই তাঁদের হিন্দি শেখার শুরু। এছাড়াও হালইয়াঙদের আধিপত্য সূচনার সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়েছিল স্কুল। প্রথম স্কুল চালু হয় ১৯৪৮ সালেই। তারপর প্রতিটা গ্রামেই একটা করে স্কুল খোলা হয়। হাপোলি গড়ে ওঠার পর সেখানে গড়ে ওঠে একট হায়ার-সেকেন্ডারি ও একটি হাইস্কুল। এরপর সরকারি স্কুল ছাড়াও ২১টি বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছে খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন ও অন্যান্য অ-সরকারি সংগঠনের উদ্যোগে। ২০০৪ সালে একটি খ্রিস্টান কলেজও চালু হয়। এই সমস্ত স্কুলের কোনোটাতেই আপাতনি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নেওয়া হয়নি। নেফার পর্যায়ে (১৯৫৪-১৯৭২) সমস্ত স্তরেই অসমিয়া ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছিল, সেকেন্ডারি স্তর থেকে ইংরেজি শেখানো হতো। ১৯৭২-এর পর থেকে শিক্ষামাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকেই প্রাধান্য দেওয়ার নীতি সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে, যদিও পাশাপাশি হিন্দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নেফার আমলে উপজাতিদের ভাষায় কিছু পাঠ্যবই লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নেফা-প্রশাসনের পক্ষ থেকে, কিছু পাঠ্যবই লেখাও হয়েছিল, কিন্তু সে সময়েও স্কুলে তা খুব চালু হয়নি, আর আজ তো তাদের আর দেখাই মেলে না।

আপাতনি ভাষা কথ্য ভাষা, এর লেখ্য রূপ ছিল না। ১৯৭০-এর দশক অবধি আপাতনিদের সমাজে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—জাতির ইতিহাস, ন্যায়পরতার আদর্শ ও বিধি, জমি-মালিকানার বিবরণী, কৌম সম্পর্কের

বিবরণী, কৃষিকাজ বা বস্ত্রবয়নের প্রকৌশল, নদী-গাছ-জঙ্গল সম্পর্কে খুঁটিনাটি, ঋণ ও আদান প্রদান, হানা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ, পড়শি উপজাতিদের সঙ্গে সম্পর্ক— আপাতনি ভাষায় শ্রুতি হিসেবে বয়স্কদের স্মৃতিতে জমা থাকত আর সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-প্রাত্যহিকতার মধ্য দিয়ে কমবয়সীদের মধ্যে বাহিত হতো। সংখ্যা গোনার জন্য অঙ্ক চালু ছিল, দৃশ্যত তা প্রকাশ করার জন্য ছোট ছোট বাঁশের ফালি (কোট্টির) ব্যবহার করা হতো। এটাই ছিল লোকশিক্ষার পরিসর।

হালইয়াঙদের চালু করা স্কুল-ব্যবস্থা কেবল যে আপাতনি ভাষাকেই তুচ্ছার্থে এড়িয়ে গেল তা নয়, তা এই গোটা লোকশিক্ষার পরিসরটাকেই মূল্যহীন বা ফালতু বলে ঘোষণা করল। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-নিয়ন্ত্রক সংস্থা নির্দেশিত পাঠক্রম ও পাঠ্যবস্তু গলাধঃকরণ করাই শিক্ষার একমাত্র সংজ্ঞা হিসেবে উপস্থাপিত হল। হরি গ্রামের হাগে হীবা-র কথনে আমরা আগে দেখেছি কীভাবে সেনারা আপাতনিদের 'অকর্মা ফালতু' লোক হিসেবে গালিগালাজ করত, এখন হালইয়াঙদের স্কুলগুলো আপাতনিদের গোটা ভাষা-সংস্কৃতির পরিসরটাকেই 'অসভ্য লোকেদের অন্ধ বিশ্বাস' হিসেবে ফালতু বলে ঘোষণা করল।

১৯৪৮-এ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রবল দাবদাহে ঝলসে গিয়ে আপাতনিরা আপাতত আত্মরক্ষার্থে প্রবলপরাক্রমী রাষ্ট্রের কথা মেনে চলতে মনস্থ করেছিল, তাই রাষ্ট্র যখন স্কুল খুলে শিশুদের ডেকে পাঠাল, তখন সে স্কুলের আঙিনায় আপাতনি শিশুরা হাজির হল। নিজেদের পোষাক থেকে শুরু করে নিজেদের ভাষা ও বাচনভঙ্গি অবধি সমস্ত কিছু নিয়েই তাদের কুঁকড়ে থাকতে হয়, বুঝে নিতে হয় যে হালইয়াঙদের অনুকরণ করে হালইয়াঙদের নিয়ে আসা ভাষা-সংস্কৃতি রপ্ত করতে না পারলে শিক্ষিত হওয়া যাবে না।

ওদিকে হাপোলি-র পত্তন হয়ে সেখানে হালইয়াঙদের প্রশাসন ও পণ্য-পুঁজি-র কারবার গেঁড়ে বসেছে। লিখিত আবেদন-নিবেদন দলিল-দস্তাবেজের সেই নতুন ব্যবস্থা উপত্যকার উপর তার কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। তার সামনে খাড়া হতে গেলেও হিন্দি/ইংরেজি ভাষায় কথা বলা ও হালইয়াঙদের আদবকায়দা রপ্ত করা বাধ্যতামূলক। হালইয়াঙদের স্কুল ছাড়া তা হবে কোথায়?

হালইয়াঙদের স্কুল থেকে তাই ইংরেজি ও হিন্দি জানা হালইয়াঙদের আদবকায়দায় রপ্ত আপাতনি বেরতে লাগল যারা আপাতনি ভাষা, লোকশিক্ষা

ও লোকসংস্কৃতির পরিসর থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিচ্ছিন্ন। ২০০১ সালের ভারত-সরকারের আদমশুমারি দেখাচ্ছে যে আপাতনিদের মধ্যে ৭% সাক্ষর, অর্থাৎ হিন্দি বা ইংরেজি লিখতে-পড়তে জানে। স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন আপাতনি মুখের গল্প সংগ্রহ করার সময় তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে ২০০৮ সালে ৩০ বছরের নীচে প্রায় সমস্ত আপাতনিই সাক্ষর, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ হিন্দি বলা-লেখায় সাবলীল, অনেকে ইংরেজিতেও, ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্রও কিছুজন পড়ে, ই-মেল করে ইংরেজিতে, একজন ইংরেজিতে ব্লগ লেখাও শুরু করেছে।

আপাতনি ভাষা আপাতনি উপত্যকার গ্রামগুলোয় গ্রামবাসীদের মধ্যে ঘরের মধ্যের ভাষা, লাপাঙ-এ আচার অনুষ্ঠানের ভাষা ও পথে-ঘাটে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের ভাষা হিসেবে চালু আছে। কিন্তু আপাতনি ভাষার শ্রুতি (আপাতনি ভাষায় যাকে বলে মিজি-মিগুঙ) তরুণ প্রজন্ম আর শিখছে না, বৃদ্ধদের স্মৃতি থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা আর বাহিত হচ্ছে না।

রোমান হরফে আপাতনি লেখার চল হয়েছে আপাতনিদের বাৎসরিক উৎসবগুলোর সময় হিসাবপত্র লেখার কাজে। কিন্তু আপাতনি ভাষার সুসংবদ্ধ একটা লেখ্য রূপ গড়ে তোলার চেষ্টা কোনোপক্ষেই নেই। কিছু বছর আগে কয়েকজন উৎসাহী ভাষাপ্রেমী ‘তানি’ নামে আপাতনি ভাষার একটি নিজস্ব লিপি তৈরি করে প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সরকার-প্রশাসন বা ‘শিক্ষিতজন’ কারো কাছ থেকেই কোনো সাহায়তা পাননি, ফলে সেই চেষ্টা দানা বাঁধতে পারেনি।

আপাতনিদের ‘ভারতীয়করণ’ (বা ‘হালইয়াঙ-করণ’)-এর আর একটা প্রবল প্রবাহ বইছে ধর্মান্তরকরণের মধ্য দিয়ে। সেই দিকটা এবার দেখা যাক।

বস্তুজগতের উৎপত্তি, প্রাণের উৎপত্তি ও মানুষের উৎপত্তির অতিকথা অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বের অতিকথার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আত্মা ও আদি পূর্বপুরুষদের নিয়ে গঠিত ‘আত্মার জগৎ’-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সামূহিক মঙ্গলের উপায় সেই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান আপাতনিদের মধ্যে পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। গ্রামের লাপাঙে শ্রুতি-বাহিত মিজি কথনের সঙ্গে সঙ্গে উপহার আদান-প্রদান ও ত্যাগস্বীকারের নানা উপাচারের মধ্যে এর মূর্ত রূপ। সহযোগিতামূলক যৌথজীবনের বাঁধুনি

হিসেবে কাজ করা এই লোকাচারের বুননই আপাতনিদের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসের জগৎ। এই বিশ্বাসের জগতের উপর আক্রমণ হানল হালইয়াঙ ধর্মপ্রচারকরা।

১৯৮০-র দশকে আপাতনি উপত্যকায় প্রথম খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক (ন্যাগাল্যান্ডে ঘাঁটি গাড়া ইভানজেলিকাল ব্যাপটিস্ট-দের মধ্য থেকে) এলেও ১৯৯০-এর দশকেই খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার তাৎপর্যপূর্ণ চেহারা নিতে থাকে আসাম থেকে আসা রোমান ক্যাথলিক প্রচারকদের হাত ধরে। হাপোলি ও পুরানো জিরো-য় বড়সড় গির্জা বাড়ি গড়ে ওঠে, মিশনারি স্কুল গড়ে ওঠে—'আধুনিক' ইংরেজি শিক্ষা ও সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করার আকর্ষণে আপাতনিদের খ্রিস্টান ধর্মের দিকে টানার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আপাতনিদের গ্রামগুলোর কাছেও বাঁশ দিয়ে তৈরি প্রর্থনাকক্ষ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়, যদিও ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা একাধিকবার তা ভেঙে দেয়। ২০০৩ সালে শেষ অবধি দুটো ছোট কাঠের গির্জাগৃহ দুটি গ্রামের প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয় আর তার পরের বছর ২০০৪ সালে একটি গ্রামের কাছে খ্রিস্টান কলেজ চালু হয়। এই ২০০৪ সালেই গির্জাগুলো থেকে গোটা উপত্যকা জুড়ে কয়েক হাজার ঝকঝকে দামি কাগজে ছাপা রোমান হরফে আপাতনি ভাষায় লেখা একটা প্রচারপুস্তিকা বিনামূল্যে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়, পুস্তিকাটিতে তীব্রভাষায় আপাতনি ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচারকে 'অন্ধ-কুসংস্কারগ্রস্ত তন্ত্র মন্ত্র' হিসেবে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করা হয় ও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। এই নিয়ে আপাতনিদের মধ্যে ক্ষোভ ফেটে পড়ে, বেশ কিছু জায়গায় ওই প্রচারপুস্তিকা পোড়ানো হয়।

কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম ইতিমধ্যেই উপত্যকায় তার অবস্থান পাকা করে নিয়েছে। ১৯৭৮ সালে যেখানে হাইমেনডর্ফের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী উপত্যকায় খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মের কোনো প্রসার ছিল না, সেখানে ২০০৮ সালে ৩০,০০০ আপাতনির মধ্যে অন্তত ৪,০০০, অর্থাৎ ১% খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে, এবং সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান। এই খ্রিস্টান আপাতনিদের বেশিরভাগ আপাতনি সমাজের সামাজিক উৎসবগুলোয় অংশ নেয় না, উপহার-বিনিময়ের আচারে অংশ নেয় না, বাকি আপাতনিদের 'অশিক্ষিত/ অল্পশিক্ষিত পশ্চাৎপদ' হিসেবে নিচু চোখে দেখে। আপাতনিদের পরম্পরাগত সহযোগিতামূলক সমাজবন্ধন ছিঁড়ে তারা বিচ্ছিন্ন আত্মউন্নতির পথে ছুটেছে।

ইতিমধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রচারকরাও তাদের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। ১৯৬২-তে হাপোলির সেনা শিবির-এর মধ্যে প্রথম হিন্দু মন্দির স্থাপন হয়েছিল, আপাতনিদের সঙ্গে তার কোনো যোগ তখন তৈরি হয়নি। হিন্দুত্ব-প্রসারকদের কাজকর্ম নির্ধারক মাত্রা ধারণ করেছে ১৯৮০-র দশকের শেষভাগ থেকে। ১৯৮৮-তে উপত্যকার প্রথম বারোয়ারি হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা, ক্রমশ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তির সংখ্যা বাড়ানো, ২০০১-এ আরো দুটি মন্দির তৈরি ও হিন্দু সংগঠন (যেমন, বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন) পরিচালিত স্কুল চালু হওয়া—এর মধ্য দিয়ে হিন্দুত্বচর্চা ক্রমশঃ তাৎপর্যপূর্ণ আকার নিতে থাকে। এর কয়েক বছর পরে আপাতনি উপত্যকার সংলগ্ন বনাঞ্চলে একটা পুরানো বড় পাথরের মধ্যে 'শিবলিঙ্গ আবিষ্কার' করে হিন্দুত্ব-প্রসারকরা এবং অচিরেই সেই জায়গাটিকে হিন্দুদের একটা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করে। আসাম থেকে আসা তীর্থযাত্রীর ঢলের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশতে থাকে আপাতনিরাও। এর পাশাপাশি খ্রিস্টান ধর্মপ্রসারকদের বিরুদ্ধে আপাতনিদের দানা বাঁধতে থাকা ক্ষোভের সঙ্গে সহমর্মীতা দেখিয়ে হিন্দুত্ব-প্রসারকরা দাবি করতে থাকে যে আপাতনিদের ধর্ম আসলে হিন্দু ধর্মেরই অংশ। তাদের দাবি যে বৈদিক আমলের নানা আচারের মধ্যেই আপাতনিদের আচারের উৎপত্তি বলে আপাতনিরা হিন্দুদেরই একটি ভাগ, যদিও হিন্দুদের অগ্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তারা পেছিয়ে-পড়া অবস্থায় রয়ে গেছে; আপাতনিদের বাকি হিন্দুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাই হিন্দি-হিন্দু জাতীয়তাবাদের মান্য ধাঁচা অনুসরণ করে আধুনিক হয়ে উঠতে হবে। এই হিন্দুত্ব-প্রসারকদের পিছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণা আজ বিপুল। তাই আপাতনি ধর্মবিশ্বাসের জগতকে গলিয়ে হিন্দুত্বের মান্য ছাঁচে ঢালাই কারার কাজ এখন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে।

পরম্পরাগত ধর্মীয় বিশ্বাসের জগতের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিরোধের একটা প্রচেষ্টা হিসেবে আপাতনিদের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে একটা নতুন ধর্মাচার, যার নাম দোন্যি-পোলো। দোন্যি-পোলো ধর্মকে সামাজিক যৌথতার পরিসরে আচরণীয় জীবনাচার থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তি-পরিসরে আচরণীয় আচারে পরিণত করছে, পরম্পরাগত ধর্মের কিছু চিহ্নকে বজায় রেখে। দোন্যি মানে সূর্য আর পোলো মানে চাঁদ। গির্জা বা মন্দিরে

আদলে একটা উপাসনাঘর তৈরি করে, সেখানে সূর্য-চাঁদের ছবি রাখা হয়, সঙ্গে মিথুনের হাড় বা খুলির মতো কিছু পুরানো ঐতিহ্যের চিহ্ন রাখা হয় এবং উপাসকরা সেখানে জড়ো হয়ে বৃন্দগানের আদলে সূর্য-চাঁদ ও অন্যান্য আত্মার জগতের শক্তির কাছে প্রার্থনা করে। হিন্দু মন্দিরে পুজো দেওয়া ও খ্রিস্টান গির্জার বৃন্দগানের প্রভাব এখানে দেখা যায়। ২০০৪ সালে আপাতনি উপত্যকার গ্রামে প্রথম দোন্যি-পোলো ঘর শুরু হয়, ২০০৭ সালে আরও তিনটি গ্রামে তেমন ঘর তৈরি হয়। দোন্যি-পোলো ক্রমশ জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুত্ব-প্রসারকরাও দোন্যি-পোলোকে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। হিন্দু গায়ত্রীমন্ত্র স্তবের সঙ্গে দোন্যি-পোলো উপাসনা সমার্থক দাবি করে তারা দোন্যি পোলো-কে হিন্দু ধর্মে প্রবেশিকা হিসেবে হাজির করতে চাইছে।

আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতি বিলুপ্ত করে ভারতীয়ত্বের এক মান্য সমরূপতায় ঢালাই করার এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অরুণাচল প্রদেশ জুড়ে আদিবাসীদের একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে, যার নাম ‘ইনডিজেনাস ফেথ অ্যান্ড কালচার সোসাইটি’, আপাতনি উপত্যকাতেও তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। ২০০১ সালে পুরানো জিরো-তে তাদের মারা দুটো পোস্টার এইরকম:

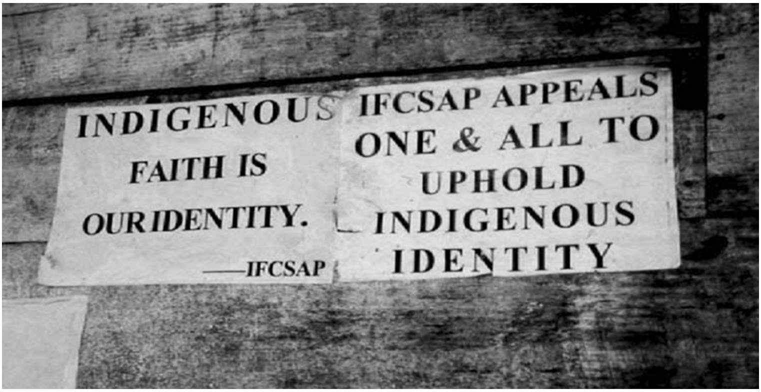

চিত্রগ্রাহক স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন।

সংগঠনটির নাম ইংরেজি ভাষায়, তার পোস্টারের ভাষাও ইংরেজি, অথচ এই ইংরেজি ভাষাই তো আদিবাসী ভাষাদের সাপেক্ষে ঘাতক ভাষা হিসেবে

কাজ করছে—আদিবাসীদের ভাষাগুলো থেকে নতুন প্রজন্মের বাচকদের সরণ ঘটছে তো প্রধানত এই ইংরেজি ভাষাতেই!

অভিধান-পোড়ানোর এক ঘটনা ও সমাজদেহের ফাটল

'আপাতনি কালচার অ্যান্ড লিটারারি সোসাইটি', নামে হাপোলির একটি সংস্থা একটি আপাতনি-ইংরেজি অভিধান (রোমান লিপিতে) প্রকাশিত করে ২০০১-এর জুলাই মাসে। তা আপাতনি উপত্যকার বিভিন্ন স্কুলে ও কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই অভিধান ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। হাপোলির সমাধিক্ষেত্রের কাছে এই অভিধানের মুদ্রিত সংস্করণের বেশিরভাগ জড়ো করে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিধানের প্রস্তুতকারকরা এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার হুমকি দেয়। বিক্ষোভকারীরা পাল্টা দাবি করে যে অভিধান-প্রস্তুতকারকদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এবং অভিধান ফিরিয়ে নিতে হবে।

কী নিয়ে এত বিরোধ? বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে দুটি শব্দের অভিধান-প্রদত্ত অর্থ। শব্দদুটি হল গ্যুতী ও গ্যুচি—আপাতনি সমাজে দুটি কৌমের নাম। কোজিঙ নামের এক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত কৌম হল গ্যুতী, আর পুসাঙ নামের এর পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত কৌম হল গ্যুচি। অভিধানে এই দুটি শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে এইরকম:

গ্যুচি—পিপল অফ লোয়ার কাস্ট

গ্যুতী—পিপল অফ আপার কাস্ট

অর্থাৎ, হিন্দুসমাজের জাতপাতের ভাগাভাগিকে আপাতনি সমাজের কৌমব্যবস্থার উপর আরোপ করে গ্যুচি কৌমকে নিচুজাত ও গ্যুতী কৌমকে উঁচুজাত বলে হাজির করা হয়েছে। অভিধানের রচয়িতারা গ্যুতী কৌমের ও বিক্ষোভকারীরা গ্যুচি কৌমের। অভিধান ঘিরে আরও কিছু অভিযোগ (যেমন, তাতে আপাতনিদের ধর্মীয় আচারের বহু শব্দ ঠাঁই পায়নি, গ্রামের মানুষদের ভাষা ঠাঁই পায়নি) উঠলেও, গ্যুচি-গ্যুতী প্রশ্নেই ঝড় ওঠে। আড়াআড়ি দুই পক্ষে বিভাজন তৈরি হয়, দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থান থেকে অপরপক্ষকে আক্রমণ

করে, সভা-সমিতি করে নিজেদের পক্ষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা জোগাড় করার চেষ্টা চালাতে থাকে। সরকারি প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিকবার সমঝোতার বৈঠক ডাকা হয়। এ সবের মধ্যে ২০০৪ সালের গ্রীষ্মে একদল গ্যুতী (পূর্বের অভিধান-রচয়িতাদের থেকে এঁরা আলাদা) একটি দ্বিতীয় আপাতনি-ইংরেজি আভিধান প্রকাশ করে। সেই অভিধানে উঁচু-নিচু বিভাজনকে আরও প্রকট করে নিয়ে আসা হয়, সেখানে লেখা হয়:

গ্যুচি—অরিজিনাল, স্লেভ, ইমিগ্রান্ট স্লেভ
গ্যুতী—প্যাট্রিসিয়ান ক্লাস...অ্যারিস্টোক্র্যাটস

এর ফলে বিতর্ক আরও ফেনিয়ে উঠল। সমাজসংস্পর্শের প্রশ্ন থেকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী বাছা অবধি সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে বিরোধ, সংঘাত ও বিভাজন নিত্যনতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

অভিধান নিয়ে এই বিরোধের মধ্য দিয়ে কী প্রকাশিত হচ্ছে? পরম্পরা-বাহিত আপাতনি ভাষার শ্রুতিতে গ্যুচি ও গ্যুতী-র উদ্ভব যে দুই পূর্বপুরুষ থেকে, তারা একে অপরের সহোদর ভাই। নানা ঘটনাচক্রে তাদের মধ্যে ও সেই সূত্রে তাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে নানা পার্থক্য তৈরি হওয়ার আখ্যান আছে, কিন্তু সহযোগিতার ভিত্তির উপর দাঁড়ানো পরম্পরাগত আপাতনি সমাজে তারা সম-অধিকারভুক্ত ছিল। আপাতনিদের পরম্পরাগত ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজকাঠামোর ক্ষয়ের উপর দাঁড়িয়ে গ্যুচি-গ্যুতী-সম্পর্ক আজ নতুনভাবে সংজ্ঞাত হওয়ার পথে। সহযোগিতামূলক গ্রামসমাজ ভেঙে গিয়ে মাথা তুলেছে হাপোলি-কেন্দ্রীক অর্থাৎ শহর-কেন্দ্রীক সুযোগ-সুবিধা অধিকারের অসম বিভিন্ন স্তরে ভাঙা একটা উচ্চাবচ ধাপবন্দী কাঠামো। পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-নির্ভরতা-সহযোগিতার প্রত্যক্ষ সম্পর্কগুলো ভেঙে গিয়ে গড়ে উঠছে পণ্য-পুঁজি-নির্ভর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার অধীন অসম সম্পর্ক। সবকিছু পণ্যে পরিণত হচ্ছে, জমিও টাকায় কেনাবেচা শুরু হচ্ছে, যৌথ-অধিকারে থাকা চারণভূমি বা জঙ্গল ব্যক্তি-অধিকারে বা রাষ্ট্রের দখলদারিতে চলে যাচ্ছে। ফলে এক বড় অংশ মানুষ জীবনযাপনের উপায়ের উপর অধিকার হারিয়ে অস্তিত্বের অভূতপূর্ব অনিশ্চয়তা ও বিপন্নতায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আর এক দল মানুষ সুযোগ-

সুবিধা করায়ত্ত করে অ্যারিস্টোক্র্যাট বা আপার কাস্ট হিসেবে স্ব-পরিচিতি গঠন করতে চাইছে। সমাজদেহের এই ফাটল চওড়া হচ্ছে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০১৮

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে ২০১৫

সহায়ক গ্রন্থ

১. ভেরিয়ার এলউইন-এর লেখা 'এ ফিলজফি ফর নেফা'। বইটির প্রকাশক ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটির প্রথম সংস্করণ হয় ১৯৫৭ সালে। এখানে ২০১২-তে প্রকাশিত বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ভেরিয়ার এলউইন-এর লেখা 'মিথস অফ দি নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া।' বইটির প্রকাশক ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটির প্রথম সংস্করণ হয় ১৯৫৮ সালে। এখানে ২০১২-তে প্রকাশিত বইটির তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. আরক মেগু-র লেখা 'দি কারকোস অ্যান্ড দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ'। বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত।

৪. আরক মেগু-র লেখা 'বোকার ল্যাঙ্গুয়েজ গাইড, বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ১৯৯০ সালে প্রকাশিত।

৫. আদুক তায়েঙ-র লেখা 'মিলাঙ ফ্রেজ বুক'। বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত।

৬. তপোলি বরু-র লেখা 'তাঙ্গাম ল্যাঙ্গুয়েজ গাইড'। বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ২০০৪ সালে প্রকাশিত।

৭. এ মেগু-র লেখা 'বোরি ফেজ বুক'। বইটির প্রকাশক ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটি ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত।

৮. ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, ইটানগর, অরুণাচল প্রদেশ-এর জার্নাল 'রেসারান'-এর ২০১৬ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ :

- আর এন কোলে-র লেখা 'লিঙ্গুয়িস্টিক রিসার্চ ইন অরুণাচল প্রদেশ'।
- তাপাঙ তাপাক-এর লেখা 'ঝুম সাইকেল : এগ্রিকালচারাল প্যাটার্ন অফ দি আদি'।
- গিন্ডু বোরাঙ-এর লেখা 'ট্রেড প্র্যাকটিসেস অফ দি আদি- পদমস'।

৯. দীপক কে সিঙ-এর লেখা ‘স্টেটলেস ইন সাউথ এশিয়া’। বইটি সেজ পাবলিকেশনস থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত।

১০. মাইকেল আরম টার ও স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ন-এর ‘থ্রু দি আই অফ টাইম: ফটোগ্রাফস অফ অরুণাচল প্রদেশ, ১৮৫৯-২০০৬’, ব্রিল থেকে ২০০৮-এ প্রকাশিত। লেখায় ব্যবহৃত ছবিগুলি এই বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

১১. স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্নের লেখা ‘হিমালয়ান ট্রাইবাল টেলস: ওরাল ট্র্যাডিশন অ্যান্ড কালচার ইন দি আপাতনি ভ্যালি’। বইটির প্রকাশক ব্রিল প্রকাশনা সংস্থা। বইটি ২০০৮ সালে প্রকাশিত।

১২. ভেরিয়ার এলউইন-এর লেখা ‘মিথস অফ দি নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া’। বইটির প্রকাশক ডিপার্টমেন্ট অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, ডিরেক্টোরেট অফ রিসার্চ, গভর্নমেন্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ, ইটানগর। বইটির প্রথম সংস্করণ হয় ১৯৫৮ সালে। এখানে ২০১২-তে প্রকাশিত বইটির তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ ব্যবহৃত হয়েছে।

মণিপুরের পাবর্ত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতি মানুষদের অভিজ্ঞতার আলোকে স্বশাসন, বিকাশ ও ভাষা প্রশ্ন

বিপ্লব নায়ক

অবতরণিকা

মণিপুর রাজ্যের মোট অঞ্চলের প্রায় ৯০ শতাংশ জুড়ে আছে ৫টি পার্বত্য জেলা। এই জেলাগুলিতে বাস বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের—এঁদের মধ্যে ২৯টি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম সরকারি 'সিডিউলড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইবস লিস্ট'-এ পঞ্জীকৃত, বাকি আরও বহু গোষ্ঠীর নাম এখনও পঞ্জীকৃত নয়। অন্যান্যদের সঙ্গে এখানে নাগা গোষ্ঠীর ১৮টি উপজাতি আছে, কুকি-চিন-জোমি গোষ্ঠীর ১৭টি উপজাতি আছে।' এই পাঁচটি পার্বত্য জেলার মোট জনসংখ্যার ৯২ শতাংশ এঁদের নিয়েই গঠিত, গোটা মণিপুরের জনসংখ্যার নিরিখে এঁরা ৩৪ শতাংশ (২০০১ এর জনগণনার হিসাব অনুযায়ী)। এই আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের জীবনাচরণ ও সমাজ-সংগঠনে তাঁদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহিত প্রথাগত ধারা এখনও বহন করে চলেছেন। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এখনও এখানে স্বাভাবিক নয়। কৃষিজমি, বসতজমি, পশুচারণের জমি সমস্তই গোষ্ঠীর মালিকানাধীনে এবং গোষ্ঠীগত পরিকল্পনা অনুযায়ী গোষ্ঠীর প্রত্যেকের ব্যবহারের জন্য চিহ্নিত। থাংজিং, লাইমাটন, নঙমাইজিং-এর মতো পর্বতশ্রেণি

এবং তার থেকে নেমে আসা নদীরা তাদের পূর্ব ইতিহাস, উৎপত্তির লোকগাথার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, দেবতা হিসেবেও পূজিত—সুতরাং উন্নয়নের নেশায় ভাগ্যান্বেষী হয়ে খনিজ উত্তোলনের জন্য পাহাড় ধ্বংস করার কথা তারা ভাবতে পারে না। তাদের কৃষিকাজও মূলত ঝুম পদ্ধতিতে পরিচালিত যা স্থায়ী কৃষিক্ষেত্র গড়ার জন্য জঙ্গল কেটে নিশ্চিহ্ন করার পথে না গিয়ে অস্থায়ী কৃষিক্ষেত্র তৈরি করা ও জঙ্গলকে আবার বেড়ে উঠতে দেওয়ার প্রথা মেনে চলে।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে উপনিবেশ শাসক ইংরেজ প্রভুদের দেওয়া পাঠ আত্মস্থ করে আমরা এই ধরনের জীবনাচরণ ও সমাজ-সংগঠনকে ‘পশ্চাৎপদ, অবিকশিত’ (backward, underdeveloped) বলে ভাবতে শিখেছি। ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে ও পরবর্তীতে উত্তর আমেরিকায় গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী সমাজের আদলকে আদর্শ ধরে নিয়ে দ্রুত পুঁজিবাদী উৎপাদন বৃদ্ধি, পুঁজিবাদী উৎপাদন- সম্পর্কের বিস্তার ও নগরায়নকে আমরা বিকাশের একমেবাদ্বিতীয়ম পথ হিসেবে মেনে নিয়েছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানব-সভ্যতার অগ্রগতির এক সময়-সারণিও তৈরি হয়েছে। সেই সময় সারণি অনুযায়ী ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলো অগ্রগতির সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে গেছে, আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানব সমাজ ও সভ্যতার বহুবিবিধ অন্য রূপগুলো নাকি সেই যাত্রাপথে বিভিন্ন জায়গায় আটকে আছে—কারো বা একশ বছরের পথ বাকি, কারো বা তিনশ বছরের! আর সেই জন্যই নাকি ইউরোপিয়রা ঔপনিবেশিক শাসক হিসেবে সাদা মানুষদের দায় (white man’s burden) কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন—সে দায় হল হাত ধরে বা হাতকড়া পড়িয়ে পেছিয়ে থাকা কালা, বাদামি, জংলি আদমিদের টেনে সভ্যতার বৈতরণী পার করিয়ে দেওয়ার। ঔপনিবেশিক শাসকদের দিন দীর্ঘদিন হল অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও, আজও গোটা বিশ্বজুড়ে তাঁদের এই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য বহুজাতিক সংস্থার (যেমন, বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয় বিকাশ ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রপুঞ্জ, বিভিন্ন অতিকায় এন.জি.ও) বিশেষজ্ঞরা নিরন্তর পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন। সুতরাং, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে তো মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের ক্ষমাহীনভাবে পিছিয়ে থাকা বলে মনে হবে—যারা ঝুম পদ্ধতিতে চাষ ছেড়ে রাসায়নিক সার-বীজ- কীটনাশকের ঘনঘটায় ঘেরা আধুনিক চাষকে গ্রহণ করে

না, জমিটাকেও এখনও যারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে চিনতে পারল না, পাহাড়পুজো করার জন্য যারা পাহাড় কেটে খনিজ-উত্তোলনে বাধা দেয়, তাদের থেকে পশ্চাৎপদ আর কে হতে পারে! ঔপনিবেশিক শাসকদের বিদায়ের পর স্বাধীন ভারতেও আধুনিক শিল্প স্থাপন, বড়ো বাঁধ তৈরি, অপরিমিত খনিজ উত্তোলন ও সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষির রাসায়নিকীকরণ-এর যে পথে উন্নয়নযজ্ঞ চলছে, তার সামনেও তো বাধা হয়ে আছে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের এই প্রথা- ঐতিহ্য-কে আঁকড়ে থাকা!

এইভাবে আমাদের সমাজের প্রচলিত সভ্যতা-অগ্রগতির ধারণার বিরুদ্ধে অন্যতর ধারণায় দাঁড়িয়ে আছেন যে মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীরা, স্বাধীনতার পর থেকে তাঁদের 'ঠিক' পথে নিয়ে আসার জন্য কি কম চেষ্টা হয়েছে? সেইটাই এখন দেখা যাক।

আদিবাসীদের স্বশাসন বিষয়ে সংবিধানের বিধান

ভারতের বিভিন্ন অংশে আদিবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠীদের সমাজে বৈচিত্র্যময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোষ্ঠীগত স্বশাসনের বিভিন্ন কাঠামো প্রথাগতভাবে বর্তমান। এই স্বশাসনের ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনকাঠামোর অন্তর্গত করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান নির্মাণের সময় তাতে দুইটি বিশেষ তফসিল—পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিল—যুক্ত করা হয়। পঞ্চম তফসিলে উপজাতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তফসিলভুক্ত এলাকাসমূহে শাসনকাঠামোর রূপরেখা তৈরির কথা বলা হয়। ষষ্ঠ তফসিলে আদিবাসী বা উপজাতিদের স্বশাসনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ষষ্ঠ তফসিলে বলা হয় যে আদিবাসী বা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে স্বশাসিত জেলাসমূহে ভাগ করা হবে। কোনো জেলাতে একাধিক আদিবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠীর অবস্থানহেতু তাকে আরও ভাগে ভাগ করার দরকার পড়লে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল তা বিবেচনা করবেন ও তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যকরী করবেন। প্রতিটি স্বশাসিত জেলা (autonomous district)-এ অনধিক ৩০ সদস্যের একটি জেলাসভা (dis trict council) গঠিত হবে, যার ৪ জন সদস্যকে রাজ্যপাল মনোনীত করবেন, আর বাকি অনধিক ২৬ জনকে

নির্বাচিত করবে সেই জেলার মানুষ। প্রতিটি স্বশাসিত প্রদেশে একটি প্রাদেশিক সভাও (regional council) একইভাবে গঠিত হবে। এই জেলা ও প্রাদেশিক সভাগুলোর স্বাধীনভাবে আইন তৈরির (legislative) ক্ষমতা থাকবে।[১] প্রাদেশিক সভাগুলোর হাতে যে যে বিষয়ে আইন তৈরির ক্ষমতা থাকবে, তা হল—জমির ব্যবহার (কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার দ্বারা জনস্বার্থে অধিগৃহীত জমি ছাড়া), জঙ্গল এলাকার ব্যবস্থাপন (সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়া), জলের ব্যবহার, ঝুম চাষের পরিচালনা, আইনরক্ষা, গোষ্ঠীপ্রধান (tribal chief)-এর পরম্পরাগত নিযুক্তি, এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের মতো সামাজিক প্রথা। বাকিসব বিষয়ে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব জেলাসভার। অবশ্য, প্রাদেশিক সভা ও জেলাসভা আইন প্রণয়নের পর রাজ্যের রাজ্যপাল তা দেখে অনুমোদন করলে তবেই তা আইনে পরিণত হবে। এছাড়াও, রাজ্যপালের সঙ্গে আলেচনাক্রমে নির্ধারিত হওয়া কাঠামোর মধ্যে আইন লাগু করার (executive) ক্ষমতা ও প্রাথমিক বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও প্রাদেশিক সভা ও জেলাসভার হাতে থাকবে। জেলাসভার হাতে আরও থাকবে তার এলাকায় জমিরাজস্ব সংগ্রহ ও তার ব্যবহার, মহাজনী সুদের কারবার ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন তৈরি ও তার প্রয়োগের অধিকার।[২]

এখানে একটা বিষয় খেয়াল করা দরকার। সংবিধানের এই দুটি তফসিলের মধ্য দিয়ে আদিবাসী/উপজাতিদের ক্ষমতায়ন (empowerment)-এর প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, এমন ভাবা বোধহয় যথার্থ হবে না, কারণ, নতুন কোনো ক্ষমতা তাদের দেওয়ার কথা হয়নি। আদিবাসী/উপজাতিরা দীর্ঘ ইতিহাসপর্যায় জুড়ে তাদের ঐতিহ্যবাহিত সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে স্বশাসন চর্চা করেই আসছিল। এখানে বরং তাদের স্বশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত রাজ্যপালের অনুমোদন সাপেক্ষ করার মধ্য দিয়ে তাদের স্বশাসনের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও এই দুই তফসিলকে অপছন্দ করার লোকের অভাব ছিল না। সংবিধানসভায় বিতর্কের সময় এমন মতামত শোনা গিয়েছিল যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতিদের স্বশাসন দেওয়া বিপজ্জনক কারণ তা হলে তারা ভারত ছেড়ে বর্মায় চলে যেতে পারে বা চীনের তিব্বতিদের মতো

বেয়াড়াপনা করতে পারে বা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ করতে পারে। শেষাবধি তফসিলদুটি গৃহীত হলেও আদিবাসী/উপজাতিদের সম্পর্কে এই অবিশ্বাস সন্দেহ কি থেকে যায়নি? তফসিলদুটির প্রয়োগের ইতিহাস থেকেই তা বোঝার চেষ্টা করা যাক। উত্তর পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য—আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা—এর প্রত্যেকটিতেই বড়োমাপের আদিবাসী/উপজাতি জনসংখ্যা বর্তমান। সুতরাং সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিল এই সব কয়টি রাজ্যেই প্রযুক্ত হওয়ার কথা। বাস্তবে এক একটি রাজ্যে এই তফসিলদ্বয়ের প্রয়োগভাগ্য এক এক রকম হয়েছে। যে রাজ্যের কথা দিয়ে আমরা এই আলোচনা শুরু করেছিলাম, সেই মণিপুরে কী ঘটেছে, তা দেখা যাক।

আদিবাসীদের স্বশাসন প্রশ্নে মণিপুরের অভিজ্ঞতা

মণিপুরে উপরোক্ত তফসিলদুটি আজ অবধি লাগু হয়নি। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতিদের, বিশেষ করে নাগা ও কুকি উপজাতিদের লাগাতার দাবি সত্ত্বেও লাগু হয়নি। কীভাবে এমনটা হল তা একটু ফিরে দেখা যাক।

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দুই বছর পর, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে, মণিপুরকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অর্ন্তভুক্ত করা হয়। ১৯৭২ অবধি তা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে থাকার পর ১৯৭২-এ একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়। এর কোনো পর্যায়েই মণিপুরের পাবর্ত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতিদের সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়নি। তা থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে একের পর এক আইন লাগু করার চেষ্টা হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের শাসনের বাঁধনে বাঁধার জন্য। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থাকাকালীন পাশ করা হয় মণিপুরের পার্বত্য মানুষদের (প্রশাসন) নিয়ন্ত্রণ আইন (The Manipur Hill People's (Administration) Regulation Act)। এই আইনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী/ উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত গ্রাম সংসদ (village authority) নির্বাচনের প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী প্রথাটিকে রদ করে নতুন প্রথা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আদিবাসী/ উপজাতিদের মধ্যে গ্রাম সংসদ নির্বাচনের নানা ঐতিহ্যবাহী প্রথা ছিল। যেমন,

তাংখুল নাগাদের প্রথা ছিল যে তাদের গোষ্ঠী (clan)-র সবার ভোটের মধ্য দিয়ে গ্রাম সংসদের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবে এবং তাদের মধ্যে কাউকে বদল বা পরির্তন করতে হলেও তা সবার ভোটের মধ্য দিয়েই হতে হবে, এমনকি গোষ্ঠীপ্রধানও তার একক ইচ্ছায় কাউকে নির্বাচন বা পরিবর্তন করতে পারবে না। অন্যদিকে কুকিদের প্রথা ছিল যে গোষ্ঠীপ্রধান তার পছন্দ অনুযায়ী গ্রাম সংসদের প্রতিনিধিদের নিযুক্ত করবে। ১৯৫৬-র প্রস্তাবিত আইন এই সমস্ত প্রথা বন্ধ করে নতুন প্রথা চালুর কথা বলল—সেই প্রথা হল এই যে গ্রামের রাজস্বপ্রদানকারী পরিবারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে গ্রাম সংসদের প্রতিনিধি সংখ্যা ঠিক করে দেওয়া হবে এবং তারপর তাদের নির্বাচন হবে।[৩] গ্রামীণ বিচারসভায় গোষ্ঠীপ্রধান যে প্রধান ভূমিকা নিত, এই আইনের মধ্য দিয়ে তাও রদ করার কথা বলা হল। এইভাবে ঐতিহ্যবাহী প্রথাকে ভেঙে গ্রামপ্রধানের ভূমিকাকে কমিয়ে আনা ও সরকারি রাজস্ব দেওয়ার সঙ্গে গ্রাম সংসদ গঠনের অধিকারকে যুক্ত করে দেওয়া আদিবাসী/উপজাতিরা গ্রহণ করতে পারল না। প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে তারা, বিশেষত কুকিরা, তীব্র বিক্ষোভ-প্রতিবাদ দেখায়। সেইসবকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে ১৯৫৭ সালে একতরফাভাবে আইনটি লাগু করা হয় ও সেই মোতাবেক পার্বত্য অঞ্চলের ৭টি উপবিভাগে ৭২৫টি গ্রাম সংসদ গঠনের নির্বাচন করা হয়। তা দিয়ে অবশ্য আদিবাসী/উপজাতিদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদকে প্রশমিত করা যায় নি। সে বিক্ষোভ-প্রতিরোধ চলতেই থাকে এবং অধিকাংশ গ্রাম সংসদ কার্যকরী হতে পারে না। এই বিক্ষোভ-প্রতিরোধের ধারাবাহিকতাতেই ১৯৬০ সালে কুকি জাতীয় পরিষদ (Kuki National Assembly) গঠিত হয় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে কুকিদের পৃথক রাজ্যের দাবিতে।[৪]

নিজেদের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী আদিবাসী/উপজাতিদের সংস্কৃত করার যে কেন্দ্রীয় প্রশাসকবর্গের চেষ্টা, তার পরবর্তী আইনি চেহারা দেখা যায় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে মণিপুর (পার্বত্য অঞ্চল) গোষ্ঠীপ্রধানদের অধিকার রদ আইন (The Manipur (Hill Areas) Acquisition of Chief's Rights Act) আনার মধ্য দিয়ে। এই আইনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী/উপজাতিদের সমাজে গোষ্ঠীপ্রধানের কাছ থেকে সমস্ত সামাজিক-প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কথা বলা

হয়। বলা হয় যে এর জন্য গোষ্ঠীপ্রধানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আরও বলা হয় যে মণিপুরের ভূমি রাজস্ব ও ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৬০ (Manipur Land Revenue and Land Reform Act, 1960) যা মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলে লাগু আছে, তা পার্বত্য অঞ্চলেও লাগু করা হবে। এই প্রস্তাবিত আইন মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতিদের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে। মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিধায়কসভা পার্বত্য অঞ্চল কমিটি নামে (Hill Areas Committee) কেন্দ্রীয় শাসকরা গড়েছিলেন। শাসকদের কাছাকাছি থাকা এই পার্বত্য অঞ্চল কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকেও এই প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা উঠেছিল। তা সত্ত্বেও এই আইনটিকে লাগু করার চেষ্টা করা হয়। কেন এমনটা হল তা আর একটু খুলে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

১৯৫৬-র আইনকে সমর্থনকারী একটি সরকারি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল যে,

> মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসনের গণতান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপ হিসেবে এই আইনটিকে ধরা যেতে পারে। গোষ্ঠীপ্রধানের ক্ষমতার উপর কিছু বিধিনিষেধ (restrictions) আরোপ করে এবং প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার চালু করে... (সেই প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে যা) সাধারণ গ্রামবাসীদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে।[৫]

এর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট যে সরকারি প্রশাসকদের চোখে আদিবাসী/উপজাতিদের সমাজে গোষ্ঠীপ্রধানদের ক্ষমতা ছিল গণতন্ত্রের বিরোধী, তাই সেই ক্ষমতাকে খর্ব করা ছিল গণতন্ত্রকে প্রসারিত করা। যেভাবে ১৯৬৭-র আইনে গোষ্ঠীপ্রধানদের সর্বক্ষমতা রদ করার সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার আইন লাগু করার কথা বলা হয়েছিল, তা বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরে। প্রথম যে বিষয়টি তুলে ধরে তা হল সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা সম্পন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারদের সিলিং-বহির্ভূত জমি ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে নেওয়ার একটি সমান্তরাল চিত্র। কিন্তু আদিবাসী/উপজাতিদের অঞ্চলে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা তখন নেই, গোষ্ঠীপ্রধানও গোষ্ঠীর

সমস্ত জমির ব্যক্তিগত মালিক নয়, বরং গোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত জমির উপর গোষ্ঠীর গোষ্ঠীগত মালিকানার রক্ষক। সুতরাং গোষ্ঠীপ্রধানের ক্ষমতা রদের মধ্য দিয়ে গোষ্ঠীপ্রধানের ব্যক্তিগত মালিকানা রদ হচ্ছে না, রদ হচ্ছে জমির উপর গোষ্ঠীর গোষ্ঠীগত মালিকানা। এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে গোষ্ঠীপ্রধানকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথার যৌক্তিকতা কোথায়? আর এর হাত ধরেই আসে দ্বিতীয় বিষয়টি। মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলে চালু ভূমিআইন পার্বত্য অঞ্চলে চালু করার তাৎপর্য কী? সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলের মানুষদের জীবনাচরণ ও সমাজগঠনের সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের পার্থক্য বিস্তর। ইম্ফলকে ঘিরে মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলের বাসিন্দারা মূলত মেইতেই উপজাতির। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই এই মেইতেই উপজাতির মানুষ হিন্দুধর্ম, বিশেষ করে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে তাদের উপজাতীয় ঐতিহ্য ও লোকাচারকে মূলত ছেড়ে এসেছে। স্থায়ী কৃষিকর্ম এবং কৃষিজমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা তাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে দীর্ঘদিন। উপত্যকার ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার আইন তাই জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা। সেই আইন পার্বত্য অঞ্চলে লাগু করার মানে কী? মানে একটাই। পার্বত্য অঞ্চলেও গোষ্ঠীগত মালিকানাকে উচ্ছেদ করে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম করা ও পাহাড়ের ঝুম চাষের প্রথার বদলে স্থায়ী চাষের দিকে ঠেলা। এই প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের পদক্ষেপ হিসেবে মেনে নেওয়ার আগে আরও কিছু প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। সেই প্রশ্নগুলোকে দেখা যাক।

প্রথম প্রশ্ন হল এই যে জমির উপর গোষ্ঠীগত মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানা, প্রাকৃতিক ঝুম চাষের বদলে রাসায়নিক সার-বীজ-কীটনাশকের ঘনঘটায় ছাওয়া স্থায়ী চাষ, আদিবাসী/উপজাতিদের সমাজ-সংগঠনের ভাঙন কি গণতন্ত্রের প্রসারের অবধারিত নিয়ামক? এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা পরে করার জন্য এখন একটু সরিয়ে রাখা যাক। তারপরও যে প্রশ্ন ওঠে তা হল এই যে কোনো জনগোষ্ঠী যদি গণতন্ত্রের প্রসারের এই ধারণাকে মেনে না নেয়, তাহলে জোর করে তার উপর এই ধারণা চাপিয়ে দেওয়া কি অগণতান্ত্রিক নয়? এমন অগণতান্ত্রিক উপায়ে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটানো যায় কি?

বাস্তবে তা ঘটানো যায়নি। ১৯৬৭-র এই আইন গায়ের জোরে আইনে পরিণত করেও তা পার্বত্য উপত্যকায় লাগু করা যায়নি আদিবাসী/উপজাতিদের লাগাতার প্রতিরোধের ফলে।

এর ফলে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় শাসকরা আবার একটি নতুন আইন প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হন। সেইটি হল মণিপুর (পার্বত্য অঞ্চল) জেলা সভা আইন [The Manipur hill Areas) District Councils Act]। এই আইনে আর কেবল গোষ্ঠীপ্রধানের ক্ষমতা খর্ব করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতিদের নির্বাচিত গ্রাম সংসদ, জেলাসভার স্বশাসনের অধিকারেই বেড়ি পরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই বেড়ি পরানোর উদ্যোগ করা হয় প্রতিটি পার্বত্য জেলার মাথায় একজন ডেপুটি কমিশনারের পদ তৈরি করে, যাকে নিযুক্ত করবেন প্রশাসক (administrator), সরাসরি বলা না থাকলেও যার মানে একমাত্র রাজ্যপালই হতে পারে। রাজ্যপাল দ্বারা নিযুক্ত এই ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা অনেক—তিনি যে কোনো সময় জেলাসভার নেওয়া যে কোনো সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিতে পারেন, জেলাসভা পরিচালিত যে কোনো কর্মসূচীকে বন্ধ করে বাতিল ঘোষণা করতে পারেন যদি তাঁর মনে হয় যে তা 'কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিগোষ্ঠী বা শ্রেণির অসন্তুষ্টি বা অশান্তি ঘটাতে পারে।' এছাড়াও জেলা সভার হাত থেকে সমস্ত আইনপ্রণয়নকারী (legislative) ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তা রাজ্যের বিধানসভার হাতে এবং বিচারবিভাগীয় (judicial) ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জেলা সদর কোর্টের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। জেলা সভাকে এইভাবে ক্ষমতাহীন করে দেওয়ার কথা উঠে এসেছে মানব বিকাশ প্রতিষ্ঠান (Institute for Human Development)-এর প্রতিবেদনেও :

> আইন গঠন (legistative), আইন লাগু (executive) ও বিচারবিভাগীয় (judicial) সমস্ত ব্যাপারে জেলাসভার উপর চরম নিয়ন্ত্রণ আছে জেলার প্রশাসকদের হাতে। জেলাসভায় গৃহীত সমস্ত কৃষিকাজের নিয়ম-কানুন ও পরিচালনা, বিকাশমূলক কাজ, আইন লাগু সংক্রান্ত ও বিচারবিভাগীয় বিষয়ে প্রস্তাব জেলা প্রশাসনের কাছে পেশ করতে হবে। সে সমস্তকে জেলা প্রশাসনের মঞ্জুরী পেতে হবে। সাধারণভাবে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন গঠন, আইন লাগু ও বিচারবিভাগীয় সংক্রান্ত ব্যাপার নির্বাহ করবে জেলা প্রশাসনই...জেলা সভার হাতে সেই আর্থিক, প্রশাসনিক

> বা কার্যকরী ক্ষমতা নেই যার জোরে সে আঞ্চলিক স্বশাসন কার্যকরী করতে পারে।...এইভাবে এই আইনে মণিপুর (পার্বত্য অঞ্চল) জেলা সভা আইন-এ জেলা সভাদের যে স্বশাসন মঞ্জুরী করা হয়েছে, তা ধরা-ছোঁয়ার অতীত (elusive)।[৬]

পাহাড়ী উপত্যকার আদিবাসী/উপজাতিদের নির্বাচিত জেলা সভাকে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয়ভাবে নিযুক্ত জেলা প্রশাসকদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার এই প্রচেষ্টা আদিবাসী/উপজাতি মানুষেরা মেনে নিতে পারেনি। একজন আদিবাসী পর্যবেক্ষক এই ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন :

> জেলাসভাগুলোকে সত্যিকারের স্বশাসিত সংস্থা থেকে মণিপুর সরকার তার জো-হুজুরে পরিণত করতে চেয়েছে।[৭]

পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে (যেমন নাগা ও কুকিদের মধ্যে, কুকি ও পাইতে-দের মধ্যে, কুকি ও যোমি-দের মধ্যে) অন্তর্বিরোধ থাকলেও ১৯৭১-এর নতুন আইন প্রবর্তনের চেষ্টার বিরুদ্ধে সবাই এককাট্টা হয়ে যায়। তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। তারা একযোগে দাবি তোলে যে প্রস্তাবিত আইনকে বদলে তাকে ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অনুগ করতে হবে। এই প্রতিরোধের সামনে কেন্দ্রীয় প্রশসকরা তাঁদের প্রস্তাবিত আইন পুরোপুরি লাগু করতে না পারলেও, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের দাবি বিবেচনা করার দিকে বিন্দুমাত্র না ঝুঁকে, প্রতিরোধ দমন করে অপরিবর্তিতভাবে আইন লাগু করার লক্ষ্যেই অবিচল থাকেন।

ইতিমধ্যে ১৯৭২ সালে মণিপুর একটি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা অর্জন করে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে থাকার দিন শেষ হয়, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যে বিধানসভা গঠিত হয়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের জন্য কোনো বদল এল না। তাদের অবিরাম বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সরকার ১৯৭১-এর আইন অনুযায়ী ১৯৭৩-এ ছয়টি জেলা সভা গঠন করে পার্বত্য অঞ্চলে। আদিবাসী/উপজাতিরা লাগাতার প্রতিরোধের পথ নেয়। ১৯৮৪-র বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জেলা সভার হাতে আরও ক্ষমতার দাবিতে তাদের আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। মণিপুর সরকারও আগের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে

আদিবাসী/উপজাতিদের দাবিতে কান না দিয়ে তাদের লাগাতার প্রতিরোধকে দমন করার পথই নেয়।

পাশাপাশি মণিপুর সরকার খোলাখুলি মাঠে নেমে পড়ে পার্বত্য অঞ্চলে জমির উপর আদিবাসী/উপজাতিদের গোষ্ঠীগত মালিকানা ভেঙে ব্যক্তিগত মালিকানা চালু করতে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে রাজ্যের ভূমি সংস্কার আইনে একটি সংশোধনী (ষষ্ঠ সংশোধনী) আনা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে এই ভূমিসংস্কার আইন মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এর আগে অবধি এই আইন কেবলমাত্র উপত্যকা অঞ্চলেই প্রযোজ্য ছিল, পার্বত্য অঞ্চলে ছিল না। ১৯৮৯-এর সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বলা হল যে সরকার এখন থেকে তার ইচ্ছামতো পার্বত্য অঞ্চলেও এই আইনের প্রয়োগ বিস্তৃত করতে পারে কেবলমাত্র সরকারি জেলা গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার মধ্য দিয়েই। অর্থাৎ, আদিবাসী/উপজাতিদের কোনো মতামত না নিয়েই সরকার আদিবাসী/উপজাতিদের গোষ্ঠীমালিকানাধীন জমিতে সরকারি জরিপকারী দল পাঠিয়ে তার পাট্টা ব্যক্তিমালিকের হাতে তুলে দিতে পারে। স্বভাবতই সরকারের এই সংশোধনী লাগু করার বিরুদ্ধে আদিবাসী/ উপজাতিদের প্রতিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে, যার ফলে এর ব্যাপক প্রয়োগ সরকার এখনও অবধি করতে পারেনি। কিন্তু প্রতিরোধের মুখেও সরকার এই সংশোধনীর প্রয়োগ তিনটে পার্বত্য জেলায় করেছে— চুরাচাঁদপুরের ৮৪টি গ্রামে, সেনাপতির ১৪টি গ্রামে এবং টামাঙলঙ-এর ১৪টি গ্রামে প্রয়োগ ঘটেছে—এবং এর ফলে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এই সমস্ত জায়গায় প্রবর্তিত হয়েছে।[৮]

পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতিদের স্বশাসনের দাবিতে আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়েছে। ১৯৮৯ থেকে তারা সমস্ত জেলা সভা নির্বাচন পুরোপুরি বয়কট করে আসছেন, ফলে পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামো প্রায় অকেজো। এই পরিস্থিতিতে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে ১৯৭১-এর আইনের একটি সংশোধনী আনা হয় পার্বত্য অঞ্চলের জেলা সভার হাতে স্বশাসনের কিছু অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু তা কিছুমাত্র কার্যকর হওয়ার আগেই ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চে আবার একটি দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয় আগের সংশোধনীকে কার্যত নাকচ করে দিয়ে। এরপর ১৯ মার্চ ২০০৮-এ

মণিপুর বিধানসভায় একটি তৃতীয় সংশোধনী হাজির করা হয় যার মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্ত জেলা সভার স্বশাসনের অধিকারকে নাকচ করে তাদের বিধানসভার নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতিরা আবারও এর বিরোধিতা করেন একযোগে এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী এর বদল দাবি করেন। ২০০৮-এর ১০ অক্টোবর মণিপুর বিধানসভায় এই তৃতীয় সংশোধনী পেশ করা হয় এবং কোনো বদল ছাড়াই পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতিদের বদলের দাবি বিবেচনা করা হবে বলে রাজ্যপাল আগে কথা দিলেও এখন আর সেই কথা রাখা হয় না। ২০১০-এ এই আইন অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের জেলাসভা নির্বাচন করতে রাজ্য সরকার স্থিরমনস্কতা ঘোষণা করলে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতিরা একযোগে তা বয়কট করে এবং অর্থনৈতিক ব্লকেড কর্মসূচি শুরু করে। সরকার তার মোকাবিলা করে সেনা-আধাসেনা-পুলিশ-এর দমনশক্তির জোরে।

ইদানিংকালে মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে এই মত জোরালো হয়ে উঠেছে যে পার্বত্য আদিবাসী/উপজাতিরা গোষ্ঠীগত মালিকানায় বিপুল জমি ধরে রেখে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে উঠেছে, সুতরাং গোটা মণিপুরে জমি সংক্রান্ত একটাই আইন চালু হওয়া উচিত, অর্থাৎ গোষ্ঠীমালিকানা উৎখাত করে ব্যক্তিমালিকানাই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অন্যদিকে, আদিবাসী/উপজাতিরা তাদের ঐতিহ্যবাহিত জীবনাচরণ ও সমাজসংগঠন স্বাধীনভাবে চর্চার অধিকারকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তার দাবিতে এককাট্টা।

ফলত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বানাম আদিবাসী/উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তাই বর্তমান আলোচনায় যে প্রশ্নটা আমরা আগে সরিয়ে রেখেছিলাম পরে বিবেচনার জন্য, সেই প্রশ্নটিতেই এখন আসা যাক।

উন্নয়ন প্রশ্ন

প্রশ্নটা আমরা আগে করেছিলাম এইভাবে যে গোষ্ঠীগত মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানা, প্রাকৃতিক ঝুম চাষের বদলে রাসায়নিক সার-বীজ-কীটনাশকের ঘনঘটায় স্থায়ী চাষ, আদিবাসী/উপজাতিদের সমাজ-সংগঠনের

ভাঙন কি গণতন্ত্রের প্রসারের অবধারিত নিয়ামক? যাঁদের কাছে উত্তরটা হল হ্যাঁ, তাঁরা এই গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও যুক্ত করবেন। কারণ, তাঁদের ভাবনায়, জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কৃষিক্ষেত্রে এমন এক খোলা বাজার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র খুলে দেবে, যা বাজারের জন্য ফসল উৎপাদন করে ব্যক্তি কৃষকদের নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানোর জন্য উৎসাহিত করবে; ফলে, রাসায়নিক সার-বীজ-কীটনাশক সহযোগে কৃষিপণ্যের উৎপাদন ক্রমশ বাড়বে; ফলে, অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটবে। এর জন্যই আদিবাসী/ উপজাতিদের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজসংগঠনকে ভেঙে প্রতিটি মানুষকে একক ব্যক্তি রূপে 'মুক্ত' করা দরকার যাতে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক মুনাফার লক্ষ্যে চালিত হতে পারেন। সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে আজ অবধি এই ভাবনা বেশ দাপট নিয়ে বিভিন্ন মহলে উন্নতি ও বিকাশের পথ হিসেবে রাজ করে আসছে। কিন্তু এর বিপরীতে কিছু প্রশ্নও ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে। যেমন ধরা যাক, এই পথে চলার যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত পাঞ্জাবে, সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে হয়েছে, তা বেশ কিছু অস্বস্তিকর ফলাফল সামনে এনে দিয়েছে। যেমন ধরা যাক, রাসায়নিক চাষের ফলস্বরূপ বিস্তীর্ণ কৃষিজমির উর্বরতা ক্রমশ কমছে, মাটির তলার জলস্তর বিপজ্জনক মাত্রায় নেমে যাচ্ছে, কৃষিতে ব্যবহৃত সার-কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ মাটি, জল, এমনকি উৎপাদিত খাদ্যশস্যকেও বিষিয়ে দিচ্ছে, আর সর্বশেষে কৃষির ক্রমবর্ধমান খরচ সামলাতে না পেরে আরও বেশি বেশি কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। তাই এই পথ ছেড়ে, অর্থাৎ বাজার-নির্ধারিত কৃষিপণ্যের রাসায়নিক চাষ ছেড়ে প্রাকৃতিক চাষে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনও ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে। সুতরাং জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে বাজারের দিকে তাকিয়ে ক্রমশ কৃষি-উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়ার পথ সম্পর্কে আজ আর নিঃসংশয় হওয়ার উপায় নেই— জল, কৃষিজমি ও কৃষক, এই তিনেরই যে ক্ষতি তা ঘটিয়েছে তা কেবল কৃষিপণ্য উৎপাদনের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হিসাব দিয়ে পূরণ হওয়ার নয়, বরং আগামীদিনের কৃষি উৎপাদনের ভিত্তিকে দুর্বল করে তা উন্নতির বদলে অধোগতি ঘটাচ্ছে কি না তাই-ই এখন জরুরি প্রশ্ন।

এই অবস্থায় বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী/ উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত ঝুম প্রথার প্রাকৃতিক চাষের প্রথাকে এক কথায় পরিত্যাজ্য বলে নাকচ করে দেওয়া যায় না। ঝুম প্রথার চাষ নিয়ে অবশ্য অনেক ভুল ধারণা চালু আছে না-জানা বা অর্ধ-জানার জায়গা থেকে। যেমন ধরা যাক, অনেকে মনে করেন যে ঝুম চাষের কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করার সময় আদিবাসী/ উপজাতিরা যে জঙ্গল পরিষ্কার ও পোড়ানো (slash and burn)-র পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তা জঙ্গলের ধ্বংস ঘটায়। দেখা যাক কেন এইটি একটি ভুল ধারণা।

ঝুম চাষের কৃষিক্ষেত্র তৈরির সময় আদিবাসী/উপজাতিরা জঙ্গলের একটি এলাকার গাছ ও ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে। কিন্তু কিছু গাছকে রেখে দেয়, মাটির নীচের শিকড়ও তুলে ফেলে না। আগুনে পোড়ানোর সময়েও তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এইবার সেই ক্ষেত্রে আঞ্চলিকভাবে জন্মায় এমন বিভিন্ন শস্য প্রাকৃতিকভাবে একইসঙ্গে চাষ করে। এইভাবে একবছর কি দুই বছর চাষ করার পর তারা এই জমিটি ৫ বছর থেকে ৫০ বছর আর চাষ না করে ফেলে রাখে যাতে আবার জঙ্গল ফিরে আসতে পারে। মিজোরামে ঝুম চাষ পর্যবেক্ষণ করা এক প্রতিবেদকের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ঝুম পদ্ধতিতে একটি জমিতে ধান চাষের পর দুই মাসের মধ্যে সেই জমি আবার জঙলি ঝোপঝাড়ে ভরে যায়, এক বছরের মধ্যে জঙ্গলের ঘনত্ব আবার আগের কাছাকাছি পৌঁছে যায়।[১০] এছাড়াও, আগুন লাগানোর সময়, আগুন যাতে নির্দিষ্ট জমির বাইরে জঙ্গলে বা গ্রামের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে না যায়, তার জন্যও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে আদিবাসী/উপজাতিরা, যৌথ নজরদারি দলও গড়ে তোলে, যা সম্ভবপর হয় একমাত্র তাদের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ-সংগঠনের জন্যই।[১১]

আদিবাসী/উপজাতিদের সমাজ সম্পর্কেও বহু ভুল ধারণা না-জানা-আধা-জানা-র প্রশ্রয়ে পুষ্টি লাভ করে। যেমন আমরা আগে দেখেছি যে আদিবাসী/ উপজাতিদের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজসংগঠনকে অনেকেই গোষ্ঠীপ্রধানের একনায়কত্বাধীন একটি অগণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে দেখতে বা দেখাতে চান। তাঁরা জানেন না, বা হয়ত জানতে চানও না যে আদিবাসী/ উপজাতিদের সামাজিক গঠনে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য নানারকম থাকলেও কোথাও-ই গোষ্ঠীপ্রধানের একনায়কত্ব চালানো তো দুরের কথা, এক-একা সিদ্ধান্ত

নেওয়ারও কোনো ক্ষমতা নেই। প্রতিটি আদিবাসী/উপজাতি সমাজে বিভিন্ন রকমের সভা-সমিতির প্রচলন আছে, যার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গ্রামের বয়স্কদের সাধারণ সভা থেকে শুরু করে গ্রামের সবার সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে। আদিবাসী/উপজাতি সমাজে প্রতিটি পরিবার যাতে জীবনধারণের জন্য জমি-জঙ্গল ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ পায় তা স্বাভাবিকভাবেই খেয়াল রেখে চাষের বা অন্য কাজের যৌথ পরিকল্পনা করা হয়। তাদের ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক বলা যায় কী করে? আর তাদের চেয়েও সমৃদ্ধতর গণতন্ত্রের কোনো ধারণার উপর না দাঁড়িয়ে, কেবলমাত্র খোলা বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতার পাশবতাকে তাদের উপর সভ্যতার নিয়ম বলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কি বন্ধ করা যায় না?

ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে মণিপুরের আদিবাসী/ উপজাতিদের অভিজ্ঞতাকে ধরে এই আলোচনাকে এখনকার মতো পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে বলা যায় যে ইউরোপিয়-মার্কিনী উন্নয়নের মডেলে খোলা বাজার অর্থনীতির পুঁজিবাদী বিকাশের পথকে সমাজ-পরিকল্পনার একমেবাদ্বিতীয়ম পথ ধরে নিয়ে আমরা আদিবাসী/উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহিত জীবনাচরণ ও সমাজগঠনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ যে অন্যতর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আছে তাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছি, তার সঙ্গে আদান-প্রদান, ভাবা ও ভাবানোর কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারিনি। কিন্তু আমাদের অনুসৃত পথের শেষে পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্যের সংকট, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও ক্রমবর্ধমান হিংসার সামাজিক সংকট আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো ভুল সংশোধন করে, আদিবাসী/উপজাতিদের অন্যতর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সম-সম্মান দিয়ে ভাবা ও ভাবানোর পথে নতুন পথ সন্ধান ছাড়া আজ অন্য কোনো উপায় নেই।

স্বশাসন, উন্নয়ন ও ভাষা প্রশ্ন

কোনো আদিবাসী/উপজাতি গোষ্ঠীর স্বশাসন নির্বাহ করার জন্য সামাজিক-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষার ব্যবহার অপরিহার্য কারণ আদিবাসী/উপজাতিদের প্রজন্মবাহিত প্রথাগত জ্ঞানের সঞ্চয় সেই সমস্ত ভাষার আকরিকেই ধারিত থাকে, সামাজিক-প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণে গোষ্ঠীর মানুষদের প্রকৃত অংশগ্রহণও কেবলমাত্র নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে হতে

পারে। মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী/উপজাতি গোষ্ঠীদের স্বশাসনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ত পদদলিত হওয়ার প্রক্রিয়া তাঁদের ভাষার উপর কীভাবে কাজ করেছে তা এবার আলোচনা করা যাক।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলির অধিকাংশ ভোট-চীনা পরিবারের অন্তর্গত। ভোটচীনা ভাষা-পরিবারের একটি শাখা হল ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠী। সেই ভোটবর্মী ভাষাগোষ্ঠীর একটি উপশাখা হল আসাম-বর্মী ভাষামণ্ডল। আসাম-বর্মী ভাষামণ্ডলের মধ্যে পড়ে বোড়ো, নাগা, কুকিচিন, কাচিন ও বর্মী ভাষাসমূহ। মণিপুর মূলত নাগা ও কুকিচিন ভাষাদের ক্ষেত্র।

পার্বত্য মণিপুরে বিভিন্ন নাগা ভাষা প্রচলিত। এখনও অবধি ভাষাতাত্ত্বিকরা মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চল ও নাগাল্যান্ড মিলিয়ে মোট ৪৭টি নাগা ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে চিহ্নিত করেছেন, যাদের মধ্যে প্রধানগুলো হল- আও, অঙ্গামী, সেমা, তঙ্গখুল, লোথা, রেঙ্গমা। এছাড়াও অবর্গীভূত নাগা ভাষা বহু আছে। পার্বত্য অঞ্চলে মানুষের মুখে এই বিভিন্ন নাগা ভাষার প্রচলন থাকার ফলে এক পাহাড় বা এক গ্রামের ভাষা হতে অপর পাহাড় বা গ্রামের ভাষার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই বিপুল ভাষাবৈচিত্র্য কিন্তু সবার মধ্যে জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, কারণ পারস্পরিক আদানপ্রদানের জন্য একটি মিশ্র ভাষা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে এবং বিস্তৃত অঞ্চল জুড়েই তা ব্যবহৃত হয়। সেই ভাষা হল নাগামিজ ভাষা।[১২]

অন্যদিকে, মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলের মূল ভাষা হল মণিপুরী (বা মেইতেই), যা কুকিচিন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলের মানুষদের জীবন ও সংস্কৃতির উপর সেই পৌরাণিক যুগ থেকে হিন্দুসংস্কৃতির প্রভাব ভাষার উপরেও পড়েছে। খ্রিস্টাব্দ অষ্টাদশ শতক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অনুপ্রেরণায় মণিপুরের উপত্যকা অংশে বৈষ্ণবধর্মের প্লাবন দেখা যায়। তার সরাসরি প্রভাব ভাষার উপর পড়ে। মণিপুরী ভাষার একটি নিজস্ব লিপি ছিল, যা ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু ১৮শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে মণিপুরী বাংলা লিপিতে লেখা হতে থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া বা বিষ্ণুপুরিয়া বলে একটি পৃথক ভাষারও উদ্ভব হয়, যে ভাষা ইন্দো-আর্য পরিবারের বাংলা ভাষার খুবই ঘনিষ্ঠ।

খ্রিস্টাব্দ অষ্টাদশ শতাব্দের শেষদিক থেকে ইউরোপিয় উপনিবেশ-

স্থাপক ও ধর্মপ্রচারকরা এই সমস্ত অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। সভ্যতার আলোকবর্তিকার উপর তাঁদেরই একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত বলে আত্মশ্লাঘায় মগ্ন এই ইউরোপিয়রা আদিবাসী/উপজাতিদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে অত্যন্ত হীনচোখে দেখত। নাগামিজ ভাষাকে তারা ব্যঙ্গ করে নাম দেন ডগ-আসামিজ, অর্থাৎ কুকুর-অসমীয়া। অন্ধ ঔদ্ধত্যে তাঁরা আদিবাসী/উপজাতিদের প্রজন্মবাহিত জ্ঞানের ভাণ্ডারকে কোনো মুল্য না দিয়ে ইউরোপিয় শিক্ষা ও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ- অনুকরণকে ‘সভ্যতার দিকে অগ্রগতির’ একমাত্র পথ বলে নিদান হাঁকেন, আর সেই পথের পাথেয় হয়ে ওঠে ইংরেজি ভাষা। অস্ত্রশক্তি ও ক্রমশ ঘনায়মান রাষ্ট্রশক্তির জোরে তাঁদের এই ইংরেজিকরণ শিকড় গেড়ে বসে। আদিবাসী/উপজাতিদের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষিত এবং/অথবা খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত এক অংশ গড়ে ওঠে যারা ইউরোপিয়দের দৃষ্টিভঙ্গি অনুকরণ করে একদিকে প্রজন্মবাহিত জ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারা থেকে দূরে সরে আসে, আর অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর দেশি তল্পিবাহক হিসেবে প্রভাব-প্রতিপত্তির ছিটান্ন লাভ করে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ধারাবাহিকতা বর্তমানেও এইভাবে রয়ে গেছে যে এখনও নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলে (নাগাল্যান্ড ও পার্বত্য মণিপুরে শিক্ষা ও প্রশাসনের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহৃত হয়, যদিও পার্বত্য গ্রামগুলির ব্যাপক মানুষদের সাধারণ ভাষা নাগামিজ।[১৩]

মণিপুরী ভাষার অবস্থা কিছুটা হলেও আলাদা। মণিপুর আলাদা রাজ্য রূপে স্বীকৃতি পাওয়ার পর মণিপুরী ভাষা রাজ্যভাষার স্বীকৃতি পায়, যদিও বর্তমানে মণিপুরী ভাষাভাষীদের অঞ্চল মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলেই পুঁজিবাদী উন্নয়নের পিছু ধাওয়া করার জন্য উপযোগী বলে ইংরেজি ভাষার হয়ে ওকালতি বেড়েই চলেছে। শিক্ষা ও প্রশাসনের প্রধান ভাষা হিসেবে ইংরেজি তার জায়গাকে পাকাপোক্ত করেই রেখেছে।

নাগা, কুকি, মণিপুরীর মতো দেশীয় ভাষাগুলো তখনই শিক্ষা ও প্রশাসনের ভাষা হিসেবে গুরুত্ব পেতে পারে যখন শিক্ষা ও প্রশাসন সম্পর্কে অধুনা প্রচলিত ধারণার বদল ঘটানো যাচ্ছে।

ব্যাপ্ত লোকসমাজে প্রজন্মবাহিতভাবে সঞ্চিত জ্ঞানকে যদি আমরা শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে ধরি, তাহলেই প্রতিটি লোকভাষা জ্ঞানের ধারক ও বাহক

হিসেবে সমান গুরুত্ব পেতে পারে। বিপ্রতীপে, বর্তমানে যেমন, তেমনভাবে আমরা যদি ইউরোপিয় দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজচর্চা গ্রহণ-অনুকরণ করাকেই শিক্ষা বলে মনে করি, তাহলে সে শিক্ষার বাহন হিসেবে ইউরোপিয় ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষাই প্রভুত্ব করবে, দেশীয় ভাষাগুলি নতমস্তকে হীনতা-আক্রান্ত স্তাবকের মতো আত্মবলিদান দেবে।

সমাজ প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমরা যদি এমন এক সমাজ প্রশাসনকে বিধেয় করি যে সমাজ-প্রশাসন গড়ে উঠবে অঞ্চলের সমস্ত মানুষের অংশগ্রহণের উপর, লোকপ্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করে, তাহলে আঞ্চলিক স্বশাসনকে প্রকৃত অর্থে রূপ দেওয়া গুরুত্ব পাবে, লোকভাষাও প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে গুরুত্ব পাবে। কিন্তু এই ধরনের প্রশাসন আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করার উপর দাঁড়িয়ে সহাবস্থান-আদানপ্রদানের কথা ভাবতে পারে। উল্টোদিকে, বর্তমানে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকেন্দ্রের অধীনে সোপানতান্ত্রিকতায় বিন্যস্ত, যেখানে সমস্ত বৈচিত্র্যকে আধিপত্যের শৃঙ্খলে বেঁধে পুঁজিবাদী উন্নয়নের জয়রথের পিছনে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়াই বিধেয়। এই ক্রমকেন্দ্রীভূত সোপানতান্ত্রিক প্রশাসন তার আধিপত্যবাদী মর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবেও একটি আধিপত্যকারী ভাষাকে চাপিয়ে দিতে চায়।

প্রকৃত স্বশাসন, নিজসমাজের লোকপ্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করে বিকাশের পথ নির্ধারণ— এই দুইয়ের সঙ্গে লোকভাষাগুলির বিকাশের পথ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০১৬

সূত্র নির্দেশ

১. সিডিউলড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইবস্ লিস্টস (মডিফিকেশন) অর্ডারস্ ১৯৫৬, পার্ট টেন, মণিপুর।

২. হানসারিয়া, বি. এল (বিজয় হানসারিয়া দ্বারা পুনঃপরীক্ষিত) (২০০৫): সিকস্থ সিডিউল টু দি কনস্টিটিশন, দ্বিতীয় সংস্করণ (দিল্লি : ইউনিভার্সাল ল পাবলিশিং কোম্পানি)

৩. ২-এর অনুরূপ।

৪. ভাটিয়া, বেলা : জাস্টিস ডিনায়েড টু ট্রাইবালস ইন দি হিল ডিস্ট্রিক্টস অফ মণিপুর, ইকনমিক অ্যন্ড পলিটিকাল উইকলি, জুলাই ৩১, ২০১০, ভল্যুম-XLV নং- ৩১ পৃ. ৩৮–৪৬।

৫. ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (২০০০): মণিপুর। স্টেট ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, স্পনসরড বাই দি প্ল্যানিং কমিশন, ড্রাফট রিপোট, ভারত সরকার, দিল্লি।

৬. ৫-এর অনুরূপ, পৃ. ২৪২।

৭. চাকমা (২০১০): হোয়াই দি রোড ব্লকস রিয়েলি স্টার্টেড, হিন্দুস্থান টাইমস্, ২৩ মে।

৮. ৪-এর অনুরূপ।

৯. এই বিষয়ে বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য—মানসাতা, ভারত (২০১০): দি ভিশন অফ ন্যাচারাল ফার্মিং, আর্থকেয়ার বুকস, কলকাতা।

১০. সিং, দামান (১৯৯৬): দি লাস্ট ফ্রন্টিয়ার—পিপল অ্যান্ড ফরেস্টস ইন মিজোরাম, নিউ দিল্লি, টাটা এনার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

১১. দেব, দেবল (২০০৯): বিয়ন্ড ডেভেলপমেন্টালিটি— কনস্ট্রাক্টিং ইনক্লুসিভ ফ্রিডম অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি, আর্থস্ক্যান, লন্ডন, পৃ. ৩০৬–৩০৭।

১২. মজুমদার, পরেশচন্দ্র (১৯৮৭): আধুনিক ভারতীয় ভাষাপ্রসঙ্গে, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা।

১৩. সচদেব, রাজেশ (১৯৯৮): টুয়ার্ডস অ্যান এক্সপ্লিসিট ল্যাংগুয়েজ পলিসি ইন এডুকেশন ফর নাগাল্যান্ড, ডিপার্টমেন্ট অফ লিংগুয়িস্টিকস্, নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, শিলং।

(এই লেখাটি ‘যোজনা’ পত্রিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষ সংখ্যার জন্য লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে প্রথমে লেখা হয়েছিল। ‘যোজনা’ পত্রিকা প্রথমে লেখাটি প্রকাশের জন্য উৎসাহ দেখালেও পরে সেই পত্রিকার দিল্লি-স্থিত সরকারি পরিচালকমণ্ডলী লেখাটি প্রকাশে আপত্তি জানানোর ফলে জানায় যে লেখাটি তারা প্রকাশ করতে পারছে না। সেই লেখাটিই এখানে প্রকাশিত হল।)

কুড়ুখ্ ভাষা ও তোলোং সিকি লিপি

নিমাই কুমার সরদার

ভূমিকা

ওরাওঁ আদিবাসীদের মাতৃভাষার নাম কুড়ুখ। আদিম যুগ থেকে ওরাওঁদের বিশ্বাস, সংস্কার, সামাজিক অনুষ্ঠান, পার্বণ ও জীবনাচার-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কুড়ুখ ভাষা আদল পেয়েছে। আজ ওরাওঁ লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুখ ভাষাও বিপন্ন। হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, সাদরি প্রভৃতি অঞ্চলিক ভাষার চাপে কুড়ুখ্ ভাষা ক্রমাগত সামাজিক ব্যবহারে ক্ষেত্র ও বাচক হারিয়ে চলেছে। ওরাওঁ শিশুদের মধ্যে, অর্থাৎ নবপ্রজন্মের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কুড়ুখ্ ভাষা প্রবাহিত হচ্ছে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। জলপাইগুড়ি জেলার ওরাওঁ শিশুরা হিন্দি ও সাদরি ভাষায়, দক্ষিণ দিনাজপুর ও নদীয়া জেলার ওরাওঁ শিশুরা সাদরি ও বাংলা ভাষায়, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া জেলার ওরাওঁ শিশুরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। বীরভূম জেলার ওরাওঁ শিশুদের কিছু অংশ কুড়ুখ ভাষায় কথা বললেও বেশির ভাগই বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকে। কেবল মালদা জেলার ওরাওঁ শিশুরাই এখনও কুড়ুখ ভাষায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলে। মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে ওরাওঁ সমাজের মধ্য থেকে সংকটমোচনের কিছু প্রচেষ্টা, বীজাকারে হলেও, দেখা যাচ্ছে। এমনই একটি প্রচেষ্টা হল ‘সারা ভারত ওরাওঁ কল্যাণ সমিতি’-র প্রতিষ্ঠা। ২০১০ সালের ২২ ডিসেম্বর বীরভূম জেলার

বোলপুরে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বিভিন্ন জেলার ওরাওঁ প্রতিনিধিদের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। এই সংগঠন কুড়ুখ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় ছোট ছোট সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নিয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে নারায়ণ ওরাওঁ উদ্ভাবিত তোলোং সিকি লিপিতে কুড়ুখ ভাষায় লেখা ও বইপত্র প্রকাশের উদ্যোগও দানা বাঁধছে। কুড়ুখ ও বাংলা ভাষার পত্রিকা 'কুড়ুখ কাত্‌থা'-ও বীরভূম জেলার বোলপুর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ৯ বছর ধরে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কুড়ুখ ভাষা ও কুড়ুখ লিপি তোলোং সিকি নিয়ে দুটি লেখা ও একটি কুড়ুখ শব্দভাণ্ডার আমরা পাঠকদের কাছে হাজির করছি। লেখা দুটি লিখেছেন নিমাই কুমার সরদার, যিনি 'সারা ভারত ওরাওঁ কল্যাণ সমিতি'-র সভাপতি এবং 'কুড়ুখ কাত্‌থা' পত্রিকার ১৪২১ বঙ্গাব্দ পৌষ সংখ্যায় এবং 'কুড়ুখ লিপি-তোলোং সিকি' লেখাটি 'কুড়ুখ কাত্‌থা পত্রিকার ২০১৭ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কুড়ুখ শব্দভাণ্ডারটি 'কুড়ুখ কাত্‌খা'-র ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর সংখ্যায় মালতী সরদার রচিত 'কুড়ুখ শব্দ ও ব্যাকরণ পরিচিতি' লেখা সংকলিত হয়েছিল। পুন:প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমরা নিমাই কুমার সরদার ও মালতী সরদারের কাছে কৃতজ্ঞ।

—সম্পাদকমণ্ডলী

ওরাওঁ জনজাতির প্রাণবন্ত মাতৃভাষা—'কুড়ুখ্'

প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর জল-স্থল-গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হলেও উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীকোষের বিভাজন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানান আকৃতিতে রপান্তরিত হওয়ার পর মানবজাতির উদ্ভব। নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষনায় আজ বিবর্তনবাদের সূত্রই যথাযথ বলে প্রমাণিত। সৃষ্টির আদিকালে মানুষ তাদের জীবন নির্বাহের তাগিদে উদ্ভিদজাত ফল মূল শাক পাতা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলেও শিকারের প্রবণতা ছিল প্রবল। ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের বিকাশ ও বোধশক্তির উন্মেষ ঘটে, তারই ফলস্বরূপ আগুন ও অস্ত্রের আবিষ্কার, প্রচলন বা প্রয়োগ। যেহেতু তখন জৈবিক চাহিদা ছাড়া অন্য কোনো চাহিদা বা বিলাসিতা

ছিল কল্পনাতীত, তাই খাদ্যান্বেষণের তাগিদে ফলমূল সংগ্রহ ও পশু শিকারকেই মুখ্য পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুখ নিঃসৃত ধ্বনি বা শব্দের সাথে ইঙ্গিত তথা ইশারায় কোনো জন্তুর উপস্থিতি সম্বন্ধে যেমন সকলকে অবহিত করত তেমনি তার পিছনে ধাওয়া করা এবং বধ করার পর উল্লাস সবই সংকেত ও ধ্বনির মাধ্যমেই প্রকাশ করত। কর্মের গতি প্রকৃতি অনুযায়ী এবং কর্মসম্পাদন হেতু একই ধ্বনি বা কণ্ঠস্বর বারংবার প্রকাশ করার ফলে উচ্চারিত নির্দিষ্ট শব্দই স্থায়ী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। মানুষ নিজের প্রয়োজনে এবং আত্মরক্ষার তাগিদে দলবদ্ধভাবে বসবাস করত। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দলে বা গোষ্ঠীতে বসবাসের দরুণ স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মনের ভাব প্রকাশে পৃথক ধরনের ইঙ্গিত ও ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। এভাবেই সংকেত থেকে বাণী এবং বাণী থেকে লিপির উদ্ভাবনে একটি ভাষা পূর্ণতা লাভ করেছে। পৃথক পৃথক অঞ্চলে বসবাস করার ফলে ইঙ্গিত, ধ্বনি বা কণ্ঠস্বর আলাদা হওয়ার কারণে এত ভাষার সৃষ্টি ও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সেখানকার জলবায়ু, ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে মানুষের শারীরিক গঠনে যেমন রঙ (বর্ণ), চুল, নাক, উচ্চতা ও দৈহিক ক্ষমতায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এখনও পর্যন্ত সারা বিশ্বে সাত সহস্রাধিক ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ওরাওঁরা দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের সদস্য। অপরাপর আদিম জনগোষ্ঠীদের মতোই ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশসাধনে এদের বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। এরা মূলত মধ্য ও দক্ষিণ ভারত থেকে এসে রোতাসগড়, সিংভূম, রাঁচী, লোহারডাগা প্রভৃতি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই আঞ্চলিক প্রভাবে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত নেমে আসে। এরা এতটাই অজ্ঞ ছিল যে নানা কারণে নিজেদের জাতিগত পরিচয়ও সঠিক ভাবে দিতে পারত না। ফলে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আরোপিত ধাঙ্গড়, কোঁড়া, মুদী, সর্দার প্রভৃতি আজ তাদের গোত্রনাম বা জাতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ওরাওঁরা বেশিরভাগই নিজেদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেয় কারণ তাদের ধর্মের নাম যে 'সারণা' সেটা তারা জানেই না। খুবই পরিতাপের ও

আশ্চর্যের বিষয় যে, এরা নিজেদের ভাষার নামও জানে না, জানলেও নিজেদের 'কুড়ুখ্' ভাষায় কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। আবার কেউ কেউ বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া, সাদরী প্রভৃতি ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে সেগুলোই তাদের মাতৃভাষা হিসেবে দাবি করে। ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চার্চ-মিশন ইত্যাদি স্থাপন করে ভারতীয় আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা শুরু করেন। কিন্তু যথাযথ পরিচয় (Proper Identity) না থাকায় ওরাওঁ ভাষা ও সাহিত্যের সঠিকভাবে বিকাশ ঘটেনি। কারণ অন্যান্য আদিবাসীদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করলেও খ্রিস্টান মিশনারীরা ওরাওঁ ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। যদিও রোমান এবং দেবনাগরী হরফে খ্রিস্টের জীবনী ও ধর্ম সংক্রান্ত দু-একটি 'কুড়ুখ্' ভাষার পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তা কিন্তু একটি ভাষার সমৃদ্ধি ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ওরাওঁরা যে ভাষায় কথা বলে তার নাম কুড়ুখ্ ভাষা। তাই এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে 'কুড়খ্যার' বলে পরিচয় জ্ঞাপন করে থাকে। কুড়ুখ্ শব্দের বহুবচনে কুড়খার শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুড়ুখ্ ও ওরাওঁ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে এফ্.হান, ই. টি. ডাল্টন, ফ্রান্সিস বুকানন, দিবাকর মিন্জ, অশোক পটিল, মিখাইল কুজুর, ডোমন সাহু, রামনারায়ণ উপাধ্যায়, কারমা ফাদার নীলুস কুজুর, জগদীশ ত্রিগুনায়ত, জীতু ওরাওঁ, শান্তি খালকো, প্রকাশ চন্দ্র ওরাওঁ, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, শরৎ চন্দ্র রায়, বি.পি. কেশরী প্রমুখ নৃ-বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, ভাষাবিদ ও গবেষকরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, এছাড়াও এবিষয়ে নানান লৌকিক কাহিনী ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেমন:

১. ই.টি. ডাল্টন সাহেবের মতে ওরাওঁদের আদি নিবাস ছিল কোঙ্কন। কোঙ্কন শব্দের অপভ্রংশ থেকে 'কুড়ুখ্' হতে পারে। বারংবার স্থান পরিবর্তনের কারণে হিন্দুরা এদের 'উড়ন' বা 'উড়ান' বলে অভিহিত করে, তার থেকেও 'ওরাওঁ' শব্দের উৎপত্তি হতে পারে।
২. এফ্ হান বলেছেন 'কুড়ুখ্' জাতির গোত্রনাম ওরাওঁ।
৩. প্রকাশ চন্দ্র ওরাওঁ মনে করেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ওরাওঁ জনজাতিরা দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছিল। 'কুড়ুখ্' শব্দের উৎপত্তি কোরকুই, কুরুক্ষেত্র বা কুরুষ থেকেও হতে পারে।

৪. রামনারায়ণ উপাধ্যায় এবং অশোক পাটিলের মতে কোরকু অর্থাৎ কোর+কু, 'কোর' শব্দের অর্থ মানুষ এবং 'কু' শব্দটি বহুবচন, সুতরাং কোরকু বা মনুষ্যসূমহ থেকে 'কুড়ুখ্' হওয়ার সম্ভাবনা ইঙ্গিত করে।

৫. শরৎ চন্দ্র রায় মনে করেন যে সংস্কৃত শব্দ 'কর্ষণ' বা 'কর্ষ' তথা 'করস' থেকে 'করখ্' এসেছে। 'স' কে 'খ' রূপে উচ্চারণের ফলে করস> করখ্> কুড়ুখ্ হতে পারে। কর্ষণ বা কর্ষ শব্দের অর্থ কৃষি বা চাষ আবাদ, ওরাওঁরা তাদের মুখ্য পেশা কৃষিকাজের সাথে যুক্ত ছিল, তাই তাদের কুড়ুখ্ বলা হয়েছে।

৬. ফ্রান্সিস বুকাননের ধারণা যে, কাড়খ্ নামে এক দৈত্য রাজার দেশের নাম ছিল 'কাড়ুস দেশ'। সেই দেশের অধিবাসীদের কাড়ুখ বা কুড়ুখ বলা হতো।

৭. ওরাওঁ লোককথা এবং বিশ্বাস অনুযায়ী কুড়ুখ্ শব্দের উৎপত্তি 'কুড়ু-আ আখ্না' থেকে এসেছে, যার অর্থ আহার বানাতে জানা বা রান্না করতে জানা। ওরাওঁ ভাষায়—গরম হচ্ছে= 'কুড়া লাগি', সেঁকা বা পোড়ানো মাংস= 'কুড়কা আহড়া', পোড়া মাছ= 'কুটুকা ইনজো' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। আদিম যুগে যখন অস্ত্রের আবিষ্কার হয়নি, আগুনের ব্যবহার বা ফসল উৎপাদন জানত না, তখন শুধু কাঁচা শাকপাতা, ফলমূল বা কাঁচা মাংস-মাছ খেয়েই মানুষেরা জীবিকা নির্বাহ করত। প্রবল বায়ু প্রবাহের ফলে জঙ্গলের শুকনো ডালের ঘর্ষণজনিত কারণে আগুনের সৃষ্টি তারা প্রত্যক্ষ করল এবং ঘর্ষণের ক্যাঁচ-ক্যাঁচ বা চিঁ-চিঁ আওয়াজ অনুসারে আগুনকে ওরাওঁরা 'চিচ্চি' বলে অভিহিত করল। দাবানলের ফলে জঙ্গলের লতা-গুল্ম থেকে বৃক্ষরাজি যেমন পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি পশুপাখি ও জীবজন্তুও বাদ যায়নি। অগ্নি নির্বাপণের পরে ভস্মাধার থেকে যে পোড়া, ঝলসানো ও আধপোড়া মাংসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, সেই থেকেই মানুষ প্রথম পোড়া মাংসের স্বাদ পায় বা গ্রহণ করে। দলে দলে মানুষ যখন 'কুটুকা' বা 'কুড়কা' আহড়া (পোড়া বা দগ্ধ মাংস) কুড়োতে ব্যস্ত তখন ওরাওঁরা তাদের স্বজাতিদের 'কুড়খার' বলে অভিহিত করে। সেই থেকেই কুড়না বা কুটকা বা কুড়কা থেকে 'কুড়ুখ্' শব্দের প্রয়োগ বলে মনে করা হয়।

> ‘চিচ্চি’ তথা আগুনের সৃষ্টি এবং ‘কুড়খা’ তথা পোড়া বা ঝলসানো থেকে ‘কুড়ুখ্’ শব্দের উৎপত্তি যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য কারণ এর সাথে ওরাওঁ ভাষা ও জীবনধারার অটুট সম্পর্ক প্রতীয়মান হয়।

কুড়ুখ্ শব্দের বিশ্লেষণে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদর্শিত হয়েছে তেমনি জাতির ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা (কোঁড়া, ধাঙ্গড়, মুদি) লক্ষ্য করা গেছে, যা এদের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায়, সঠিক জনসংখ্যা নির্ণয়ে এবং ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিকাশে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। ওরাওঁ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত রয়েছেঃ

১. দিবাকর মিন্‌জ তাঁর ‘মুণ্ডা ওরাওঁ ধর্মের ইতিহাস’ পুস্তকে লিখেছেন যে ‘মুনির বক্ষস্থান তথা উরু বা উরস থেকে ‘ওরাওঁ’ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শরৎ চন্দ্র রায় মহাশয়ও একই অভিমত ব্যক্ত করেন।
২. প্রকাশ চন্দ্র ওরাওঁ বলেছেন- ‘রাম রাবণের যুদ্ধে ওরাওঁরা রামের পক্ষ নিয়েছিল (এদের বানরসেনাও বলা হয়েছে), যুদ্ধ চলাকালীন বা যুদ্ধ জয়ের পর রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী ‘ও-রাম’ বলে উল্লাস বা জয়ধ্বনি প্রকাশ করেছিল। এভাবেই ও-রা>ওরাম> ওরাওঁ হয়েছে। উড়িষ্যার কেউ কেউ এখনও ‘ওরাম’ পদবী ব্যবহার করে থাকেন।
৩. জগদীশ ত্রিগুনায়ত এ প্রসঙ্গে মুণ্ডা লোককাহিনীর উল্লেখ করেছেন। ওরাওঁরা যখন ছোটনাগপুর অঞ্চলে আসে তখন সেখানে মুণ্ডা রাজার রাজত্ব চলছিল। মুণ্ডারা তাদের রাজ্যে ওরাওঁদের বসবাস করার অনুমতি দেয় এবং একসাথে মিলেমিশে থাকতে শুরু করে। মুণ্ডারা তাদেরকে যে জমি দেয় তা ছিল ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত, অসমতল, উঁচু-নীচু ও চাষ আবাদের অযোগ্য। ওরাওঁরা প্রচুর কায়িক প্ররিশ্রম দ্বারা সেই জমি চাষযোগ্য ও বসবাসযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলে। সারারাত কাজ করতে করতে ভোর বা সকাল হয়ে যেত। সকাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখে অবাক হয়ে মুণ্ডাদের মুখ থেকে ‘উরঙ্গে’ শব্দ নির্গত হয়। মুণ্ডারী ভাষায় ‘উর’ শব্দের অর্থ খোঁড়া বা খনন করা এবং ‘অঙ্গের’ অর্থ সকাল হওয়া, সুতরাং উরঙ্গে> উরঙ্গ> ওরাওঁ শব্দ মুণ্ডাদের দ্বারা প্রদত্ত বলে মনে করা হয়।

কৃষি কাজ করার জন্য 'কিষাণ', মাটি খোঁড়া বা খনন কাজ করার জন্য 'কোঁড়া', মাটি কেটে গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কাদা (Mud) তৈরি করার জন্য 'মুদি' (Mudi) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলো পেশাভিত্তিক (Occupational) নামকরণ। আবার যখন অবিবাহিত ওরাওঁ যুবক অন্যের বাড়িতে মজুর খাটতে যায় তখন তাকে ধাঙড়া বা ধাঙ্গড় বলে ডাকা হয়। শরৎ চন্দ্র রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ''অবিবাহিত ওরাওঁ যুবকদের স্থানীয় হিন্দী ভাষায় ধাঙ্গড় এবং ওরাওঁ ভাষায় 'জোঁক্হা' বলা হয়''। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ওরাওঁ যুবক ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুবকরা অন্যের বাড়িতে মজুর খাটা ও নানান পেশাগত কর্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের ক্ষেত্রে 'নির্দিষ্ট জাতি'-র নাম বদলে যায়নি বা বদলায় না। শুধু অবিবাহিত ওরাওঁ মজুর যুবকরাই ধাঙড়া বা ধাঙ্গড় হয় কেন? আবার মাটি খোঁড়া ও কৃষিকাজ করার জন্য এরা কোঁড়া, মুদি বা কিষাণ হয়ে যায় কেন? বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা এই বন্যজাতি (Castes of forest), আদিবাসী (First settlers), জনজাতি (Folk people), আদিম জাতি (Primitive people) তথা মূলবাসীদের (Original inhabitants) উপহাস ও অবজ্ঞাসূচক গোত্রনাম আরোপের মধ্য দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করে এদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। ভূমির অধিকার, অরণ্যের অধিকার এবং মূলবাসীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে এদের জনজাতি, বনজাতি, আদিবাসী, আদিমজাতি থেকে অনুসূচিত জনজাতি তথা তপশিলি উপজাতি (Sch.Tribe) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

বিদেশী ও দেশীয় নৃতত্ত্ববিদ, গবেষক, ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদরা কোনো অঞ্চলের নামানুসারে কাল্পনিক ও পৌরাণিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে কেবল মাত্র শব্দের (যথা-কোঙ্কন, কুরুষ, কোরকু, কুরুক্ষেত্র, কর্ষ, কাড়ুস-দেশ) সাদৃশ্য থেকে একটা জাতির ভাষার নামকরণ বা উৎপত্তি সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা কখনই সন্দেহাতীত হতে পারে না যতক্ষণ না সেটি সেই জাতির কৃষ্টি ও জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ থাকতে পারে, তবে সেটা প্রতিষ্ঠিত বা গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে দৃষ্টান্তমূলক ও যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য বা পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিক প্রভাব, জাতিগত ও

সামাজিক বৈশিষ্ট্য সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। কেউ কেউ আবার রামায়ণের বানর, দুর্যোধনের সহযোগী, দৈত্যরাজ কাড়খের বংশধর, কোঙ্কনের অধিবাসী ইত্যাদি কল্পনাপ্রসূত নামকরণ প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন, এগুলোও সংশয়াতীত নয় কারণ রামায়ণের যুগে যখন মানব জাতির অস্তিত্ব রয়েছে তখন ওরাওঁদের বানর হিসেবে উল্লেখ করা এক ধরনের তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।

জাতিগত পরিচয় প্রদানে ওরাওঁরা নিজেদের 'কুড়খার' বলে অভিহিত করলেও ভাষার ক্ষেত্রে তাদের ভাষাকে কখনই 'ওরাওঁ ভাষা' বলে না, বরং 'কুড়ুখ কাত্থা' বা 'কুড়ুখ্ ভাষা' বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কুড়ুখ ভাষার ব্যাকরণে পুরুষ, বচন, কাল অনুযায়ী স্ত্রী লিঙ্গে ক্রিয়ার প্রকারভেদ বা পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক বচনে স্ত্রী লিঙ্গের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার পরিবর্তন

পুং লিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
আমি যাচ্ছি=এন কাদ্আন	এন কাল্এন (কালেন)
তুমি যাচ্ছ=নিন্ কাদ্আয়	নিন্ কাদ্য়ি
সে যাচ্ছে=আস্ কাদ্আস	আদ্ কাল্য়ি

আমি (স্ত্রী-পুং উভয়েই)-এন, তুমি (স্ত্রী-পুং উভয়েই)-নিন্ হয় কিন্তু সে (পুং)-আস্ এবং সে (স্ত্রী)-আদ্ (ইংরেজির he এবং she)-এর ন্যায় হয়ে থাকে।

প্রথম পুরুষ (third person)-এ মানুষ ছাড়া জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, যানবাহন তথা প্রকৃতির বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই ওরাওঁ ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন- মেয়েটি আসছে= কুকোয় বারয়ি, গরুটি আসছে= আড্ডো বারয়ি, যুবতিটি হাসছে= পেল্ল আল্খি, মহিলাটি কাঁদছে= মুক্কা চিক্হি, বিড়ালটি খাচ্ছে= বেরখা মুখ্হি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে পুংলিঙ্গের বেলায়—ছেলেটি আসছে= কুক্কোস বারদাস, যুবকটি হাসছে= জোঁখাস আলাখ্দাস, লোকটি কাঁদছে= মেতাস চিক্দাস। প্রথম পুরুষের একবচনে (third person singular

number) শুধু মানব তথা মনুষ্যদের ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গে (যেমন-বাবা, দাদা, ভাই, কাকা, মামা, দাদু, ঠাকুরদা, জেঠা, সে, রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতিকে) উল্লেখ করার সময় person-এর সাথে 'স' যোগ করতে হয় এবং ক্রিয়ার সঙ্গে 'দাস' বা 'স' যোগ করা একান্ত আবশ্যক। যেমন-বাবা= এম্বাস (বাবাস), ভাই= এংড়িস, দাদু= নানাস, রা= রামেস, যদু= যদুস, মধু= মধুস ইত্যাদি। ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও— বাবা আসছেন এম্বাস বারদাস, ভাই শুনছে= এংড়িস মেন্‌দাস, দাদু হাঁটছেন= নানাস একদাস, মধু ঘুমাচ্ছে= মধুস খান্দারদাস ইত্যাদি।

কুড়ুখ্ ভাষায় মানুষ (পুং) ছাড়া সবই স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় ক্রিয়ার ব্যবহারও তদরূপ হয়ে থাকে। প্রথম পুরুষের একবচনে যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'স' এবং 'দাস' যোগ করতে হয়। যেমনঃ

পুং লিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**
সে দাঁড়িয়ে আছে= আস্ ইজ্জিকাস রাঃদাস	সে দাঁড়িয়ে আছে= আদ্ ইজ্জাকি রাঃয়ি
রাম শুয়ে আছে= রামেস বেডেরকাস রাঃদাস	সীতা শুয়ে আছে= সীতা বিডিরকি রাঃয়ি
হরি বসে দেখছে= হরিস উক্কিয়াস কি এরদাস	মিতা বসে দেখছে= মিতা উক্কিয়া কি ইরি

পুরুষ (Person)

১. First person (উত্তম পুরুষ): I/We = এন/এম
২. Second person (মধ্যম পুরুষ): You = নিন/নিম
৩. Third person (প্রথম পুরুষ): He/She/Rat/Cat/Ram/It = আস্/আদ্ অসগা/বেরখা/রামেস/সীতা/ইদ

বর্তমান কাল

বর্তমান কাল-এর এক বচনে পুরুষ বা পক্ষ (যথাক্রমে-উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ) অনুযায়ী পুংলিঙ্গের ক্রিয়ার সঙ্গে 'দান', 'দায়' 'দাস' এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্রিয়ার সঙ্গে 'য়েন', 'দি', 'ই' বা 'ি' যোগ হয়।

ক্রিয়া= করা (নান্‌না)

বাংলা	কুড়ুখ (পুং)	কুড়ুখ্ (স্ত্রী)
আমি করছি	এন্ নান্‌দান	এন্ নানেন
তুমি করছ	নিন্ নান্‌দায়	নিন্ নান্‌দি
সে করছে	আস্ নান্‌দাস	আদ্ নানি

বহুবচনে পক্ষ অনুযায়ী পুংলিঙ্গে দাম, দার, নার এবং স্ত্রীলিঙ্গে এম, দার, নার যোগ হয়।

বাংলা	কুড়ুখ (পুং)	কুড়ুখ্ (স্ত্রী)
আমরা করছি	এম নান্‌দাম	এম নানেম
তোমরা করছো	নিম নান্‌দাব	নিম নান্‌দার
তাহারা করছে	আর নান্‌নার	আর নান্‌নার

ভবিষ্যৎ কাল

ভবিষ্যৎ কাল-এর এক বচনে পুং লিঙ্গে ক্রিয়ার সঙ্গে ‘ওন’, ‘ওয়’, ‘ওস’ এবং স্ত্রীলিঙ্গের ক্রিয়ার সঙ্গে ‘ওন’, ‘ওয়’, ‘ও’ যোগ হয়।

ক্রিয়া= করব (নানোন)

বাংলা	কুড়ুখ (পুং)	কুড়ুখ্ (স্ত্রী)
আমি করব	এন্ নানোন	এন্ নানোন
তুমি করবে	নিন্ নানোয়	নিন্ নানোয়
সে করবে	আস্ নানোস	আদ্ নানো

ভবিষ্যৎ কাল-এর বহুবচনে পুং-স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই ‘ওম’, ‘ওর’ যোগ হয়।

বাংলা	কুড়ুখ (পুং)	কুড়ুখ্ (স্ত্রী)
আমরা করব	এম নানোম	এম নানোম
তোমরা করবে	নিম নানোর	নিম নানোর
তাহারা করবে	আর নানোর	আর নানোর

অতীত কাল

অতীত কাল-এর এক বচনে

ক্রিয়া= করেছিলাম (নান্‌জেকান রাঃচকান)

বাংলা	কুড়ুখ (পুং)	কুড়ুখ্ (স্ত্রী)
আমি করেছিলাম	এন্ নান্‌জেকাম রাঃচকান	এন নান্‌জান রাঃচান
তুমি করেছিলে	নিন্ নান্‌জেকায় রাঃচকায়	নিন্ নান্‌জিকি রাঃচকি
সে করেছিল	আস্ নান্‌জেকাস রাঃচাস	আদ নান্‌জিকি রাঃচা

অতীত কাল-এর বহুবচনে

বাংলা	কুড়ুখ (পুং)	কুড়ুখ্ (স্ত্রী)
আমি করেছিলাম	এম নান্‌জেকাম রাঃচকাম	এম নান্‌জেকাম রাঃচকাম
তোমরা করেছিলে	নিম নান্‌জেকার রাঃচকার	নিম নান্‌জেকার রাঃচকার
তাহারা করেছিল	আর নান্‌জেকার রাঃচার	আর নান্‌জেকার রাঃচার

একটা জাতির বা ব্যক্তির পরিচয় নির্ণায়ক হতে পারে কেবল মাত্র তাদের বা তার ভাষা। পশ্চিমবঙ্গে ওরাওঁরা নিজেদের মাতৃভাষা ছেড়ে বাংলা, হিন্দি, সাদরি ইত্যাদি ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে এখানে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে। আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে এদের মাতৃভাষা ‘কুড়ুখ্ কাত্‌থা’ আজ জর্জরিত-বিধ্বস্ত। এই ভায়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে নিস্তার পেতে তথা কুড়ুখ্ ভাষাকে বাঁচাতে হরি ওরাওঁ, নারায়ণ ভগত, অশোক বাখ্‌লা প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। রাঁচীর ডাঃ নারায়ণ ওরাওঁ মহাশয় কুড়ুখ্ ভাষায় লিপি ‘তোলং সিকি’-র উদ্ভাবন করেছেন

১৯৯৩ সালে। ঝাড়খন্ড সরকার ২০০৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তোলং সিকি লিপির স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তখন থেকেই ঝাড়খণ্ডের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়ুখ ভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। এশিয়ার বৃহত্তম আদিম জনজাতি ওরাওঁরা পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও এখানে সর্বক্ষেত্রে এরা বঞ্চিত। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশিলিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কুড়ুখ্ ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করে ৩৫০ এ ধারা অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে ওরাওঁ শিশুদের অবিলম্বে কুড়ুখ্ ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা উচিত।

কুড়ুখ্ লিপি—তোলোং সিকি

ধরাধামে জন্মগ্রহণ করে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেও যায়। তারই মাঝে মুষ্টিমেয় কিছু লোক তাঁদের কর্মকাণ্ডে এমন কিছু অবদান রেখে যান যে তাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে। এমনই এক ব্যক্তিত্ব ডাঃ নারায়ণ ওরাওঁ। ১৯৬২ খিস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলার সিসাই থানার অন্তর্গত সাইন্দা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভুনেশ্বর ওরাওঁ ও মাতা ফুলমনি ওরাওঁ কৃষিকাজ করে সংসার নির্বাহ করতেন। কিন্তু তাঁদের সন্তানকে বিদ্যাভ্যাসের জন্য শিক্ষাঙ্গনে পাঠাতে ভুল করেননি। নারায়ণ ওরাওঁ গুমলা জেলার সন্ত তুলসীদাস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাঁচী কলেজে আই.এসসি.-তে ভর্তি হন। ১৯৮১ সালে তিনি আই.এস.সি পাশ করেন। দারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড হসপিটাল থেকে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি লাভ করার পর ওই হাসপাতালে আবাসিক চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার সময় ১৯৮৯ সালে লক্ষ্য করেন যে, একশ টাকার নোটে এবং গর্ভনিরোধক বড়ি ‘মালা-ডি’-তে বিভিন্ন ভাষার হরফে নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিভিন্ন ভাষার মুদ্রিত পৃথক পৃথক বর্ণলিপি দেখে তিনি বিস্মিত ও ভাবিত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে চিন্তা করতে থাকেন ‘কুড়ুখ’ ভাষার কোনো অক্ষরও যদি ওই তালিকায় স্থান পেত তাহলে কেমন হতো? বিষয়টি তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং গভীরভাবে তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। ওরাওঁ আদিবাসীদের সঠিক পরিচয় কী? এদের উৎপত্তি কোথায়? এদের

সামাজিক আচার-রীতি, ভাষা, ধর্ম ও কৃষ্টির রূপ কী? ইত্যাদি নানা প্রশ্নবাণে তিনি জর্জরিত হতে থাকেন। ঐ বছরেই তিনি 'সারণা সমাজ ও তার অস্তিত্ব' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ওরাওঁ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পাঠকগণের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে ওরাওঁ আদিবাসীদের দৈনন্দিন কাজকর্মের পদ্ধতি, প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ, সমাজের সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর ভিত্তি করে 'কুড়ুখ্' লিপি উদ্ভাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

'জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের আদিবাসী বিষয়ক সম্মেলনে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তথা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতা ড. রামদয়াল মুণ্ডা অংশ গ্রহণ করে ভারতের আদিবাসীদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। অবিলম্বে ভারতের আদিবাসীদের সার্বিক বিকাশ সাধনে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে ঝাঁজালো বক্তব্য পেশ করেন। তার জবাবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রসংঘে জানানো হয় যে, ভারতে আদিবাসী বলে কেউ নেই।' ১৯৯১ সালের ১৩ই আগস্ট হিন্দি দৈনিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় প্রকাশিত উপরিল্লিখিত সংবাদ পড়ে ডাঃ নারায়ণ ওরাওঁ বিমর্ষ ও বিচলিত হয়ে পড়েন। আদি বাসিন্দা তথা মূলবাসীদের জীবন-জীবিকা ও অবস্থানগত কারণে এদেশে এদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যথা— বন্যজাতি (Castes of forest), বনবাসী (Inhabitants of forest), পাহাড়ী (Hill dwellers), জনজাতি (Folk people), আদিবাসী (First settlers), আদিমজাতি (Primitive people) ইত্যাদি। কিন্তু নামগুলো সরকারের পছন্দ হয়নি কারণ তাদের প্রাচীন অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বার বার বিভিন্ন নামে উল্লেখ করলেও এরা যাতে কোনো ভাবেই আদি বাসিন্দা রূপে পরিচিতি না পায় তার জন্য 'আদিবাসী' নাম পরিবর্তন করে তপশিলি উপজাতি তথা অনুসূচিত জনজাতি (Scheduled Tribe) হিসেবে এদের সরকারি খতিয়ানে নথিভুক্ত করা হয়েছে। সত্যিই তো, এদেশে আদি বাসিন্দাদের অবস্থান কবুল করে নিলে নিজেদের গায়ে উদ্বাস্তুর তকমা লেগে যাবে। বনবাসী বা বন্যজাতি হিসেবে চিহ্নিত করলে তাদের জঙ্গলের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। নির্বিবাদে প্রকৃতিকে ধবংস করা যাবে না। অবাধে বৃক্ষছেদন ও নিধনের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করার সুযোগ নষ্ট হবে। অপরদিকে পাহাড়ী জাতি হিসেবে

মেনে নিলেও ভবিষ্যতে পাহাড়ের অধিকার তারা দাবি করবে। আবার জনজাতি বা আদিম জাতি হিসেবে মান্যতা দিতে গেলেও সেই আদিবাসীর প্রসঙ্গই এসে যায়। সুতরাং এদের তপশিলি উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করাই নিরাপদ, তাতে উত্তরপুরুষরা অনুপ্রবেশকারীর বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাবে।

রাষ্ট্রসংঘে আদিবাসী বিষয়ক জেনেভা সম্মেলনের খবর নারায়ণ ওরাওঁ-এর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি ভাবতে শুরু করেন যে, ভারত সরকারের নজরে আমরা যদি আদিবাসী না হয়ে থাকি তাহলে আমাদের সঠিক পরিচয় কী?

১. আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি আর্য ছিলেন?—না।
২. কুড়ুখ্ ভাষা কি আর্যদের ভাষা?—না।
৩. আমরা কি হিন্দু ধর্মালম্বী?—না।
৪. আদিবাসীরা কি শূদ্র?—না।
৫. আমাদের কুড়ুখ্ ভাষা কোন ভাষাগোষ্ঠীর?—দ্রাবিড়।
৬. ভারতীয় সংবিধানে আদিবাসীদের পরিচয় কী?—অনুসূচিত জনজাতি।
৭. বিশ্বে আমাদের পরিচিতি কী?—স্বদেশজাত (Indigenous) উপজাতি (Tribe)।

Indigenous ও Tribe শব্দ দু'টির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। কারণ স্বদেশজাত (Indigenous) শব্দটির মধ্যেই আদি বাসিন্দার কথা নিহিত রয়েছে। তবুও তাদের অস্বীকার করা হচ্ছে। এর প্রতিকার বিধানের পন্থা ভাবতে ভাবতে নারায়ণবাবু তাঁর অন্তরাত্মা থেকেই উত্তরে খুঁজে পান যে, নিজের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হ'ন এবং কুড়ুখ্ বর্ণমালা রচনায় মনোনিবেশ করেন।

কুড়ুখ্ বর্ণমালার নামকরণ

সাধারণত দেখা যায় যে, আদিবাসীরা বিশেষ এক কৌশলে পোষাক পরিধান করে থাকে। ধুতি বা শাড়ি পরিধান করার পর পিছনের দিকে পুচ্ছাকারে কাপড়ের প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখে। সেই ঝুলিয়ে রাখা কাপড়ের প্রান্তকে (কাছাকে)

কুড়ুখ্ ভাষায় বলা হয় 'তোলোং' এবং চিহ্নকে বলা হয় সিকা বা 'সিকি'। এই সূত্র ধরেই কুড়ুখ্ লিপির নামকরণ হয়েছে 'তোলোং সিকি'।

কুড়ুখ্ বর্ণমালার সজ্জিতকরণ

পৃথিবীতে আমাদের জন্মগ্রহণে মা-বাবার ভূমিকা অপরিসীম। তাঁরাই আমাদের শ্রেষ্ঠ আরাধ্য। তাঁদের স্থান সবার উপরে—এই ধারণা মাথায় রেখে মায়ের স্থান প্রথমে রাখা হয়েছে। আমার মা কুড়ুখ্ ভাষায়—'ইঙ্গিও'। ইঙ্গিওর প্রথম অক্ষর 'ই' কে স্বরবর্ণের প্রথমে রাখা হয়েছে এবং আমার বাবা, কুড়ুখ্ ভাষায় 'এম্বাস'। এম্বাসের প্রথম অক্ষর 'এ' কে দ্বিতীয় স্থানে রেখে স্বরবর্ণ (সরহ তোড়) সাজানো হয়েছে। যথা—ই এ উ ও অ আ।

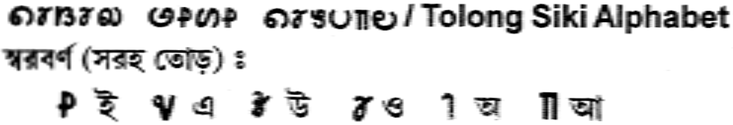

ব্যাঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রেও আমাদের কন্ঠ নিঃসৃত ধ্বনিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শব্দের উচ্চারণতত্ব (Phonetics) থেকে 'P' অর্থাৎ 'প বর্ণকে আগে রেখে ব্যাঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা প, ত, ট, চ, ক ইত্যাদি সাজান হয়েছে।

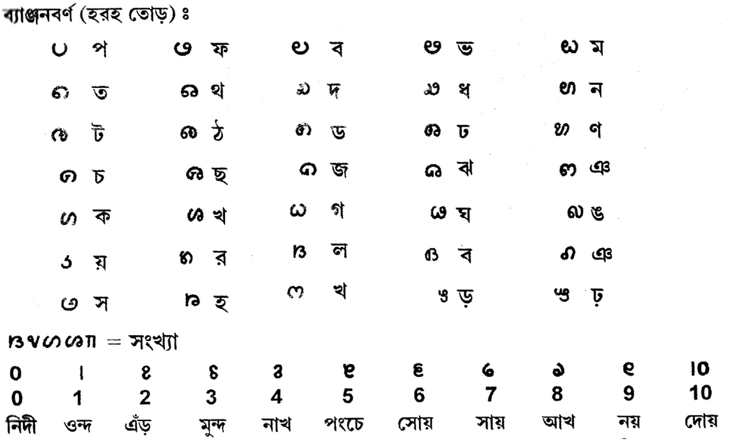

দেবনাগরী বা বাংলা অক্ষরের ন্যায় তোলোং সিকি বর্ণে কোনো প্রকার ‘মাত্রা’ বা ‘হসন্ত’ চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। ব্যাঞ্জনবর্ণের অক্ষরের সাথে স্বরবর্ণের চিহ্ন যথা—অ=া, ই=ি, = , উ= , = , = , এ= ে, = ৈ, = ো, = ৌ প্রভৃতি ব্যবহার না করে ইংরেজির মতো ব্যাঞ্জনবর্ণের ডান পাশে লেখা হয়। যেমন—বক=B+A+K) ইত্যাদি

এখানে লক্ষ্যনীয় যে তোলোং সিকি হরফে লেখার সময় ‘অ’ স্বরবর্ণটি ব্যাঞ্জনবর্ণের ডান পাশে লেখা আবশ্যক কারণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া ব্যাঞ্জনবর্ণ একাকী স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে আ, ই, উ, ও, এ ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে ব্যাঞ্জনবর্ণের ডানদিকে লিখতে হয়। স্বরবর্ণে ছয়টি এবং ব্যাঞ্জনবর্ণে পঁয়ত্রিশটি মোট একচল্লিশটি অক্ষর নিয়ে কুড়ুখ্ বর্ণমালা তোলোং সিকি-র সৃষ্টি হয়েছে।

তোলোং সিকি বর্ণমালার লিখিত রূপ

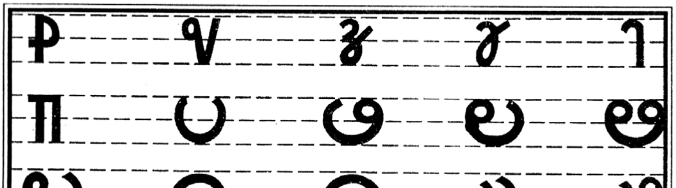

কুড়ুখ্ ভাষায় উচ্চারণের সময় বিভিন্ন সংকেত ব্যবহৃত হয়ে থাকে যথা—

লম্বা ধ্বনি=: (কুড়ুখ্ ভাষায় 'সেলা' বলা হয়)

অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি= . (কুড়ুখ্ ভাষায় 'মিতলা' বলা হয়)

বাধাপ্রাপ্ত বা খণ্ডিত শব্দ=' (কুড়ুখ্ ভাষায় 'ঘেতলা' বলা হয়)

অর্ধস্বর =। (কুড়ুখ্ ভাষায় 'হেচকা' বলা হয়)

তোলোং সিকি লিপি উদ্ভাবনে নারায়ণবাবু দীর্ঘ অনুশীলন ও তত্ত্বানুসন্ধান শুরু করেন ১৯৮৯ সাল থেকেই। দৈনন্দিন কাজ কর্মে যেমন—জাঁতা ঘুরিয়ে শস্যাদি গুঁড়ো করার রীতি, জমি চাষ করার সময় লাঙ্গল ঘোরানোর পদ্ধতি, গোলা রুটি বানানোর প্রণালী, বস্ত্র পরিধানের রীতি, সামাজিক রীতি নীতি যেমন—নৃত্য করার সময় বা মৃত সৎকারের সময় প্রদক্ষিণ,প্রাকৃতিক গতিবিধি যথা—পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা, লতার বেষ্টন পদ্ধতি, হাওয়ার ঘূর্ণাবর্ত, সমুদ্রের জলের ঘূর্ণীয়মান জলোচ্ছ্বাস এই সমস্ত কিছু ঘটে থাকে ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে তার বিপরীতে অর্থাৎ Anti clockwise।

এই সকল পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পদ্ধতি, রীতি ও প্রণালী অনুসরণ করেই তোলোং সিকি লিপি রচিত হয়েছে এবং অধিকাংশ বর্ণ Anti clockwise লেখা হয়ে থাকে।

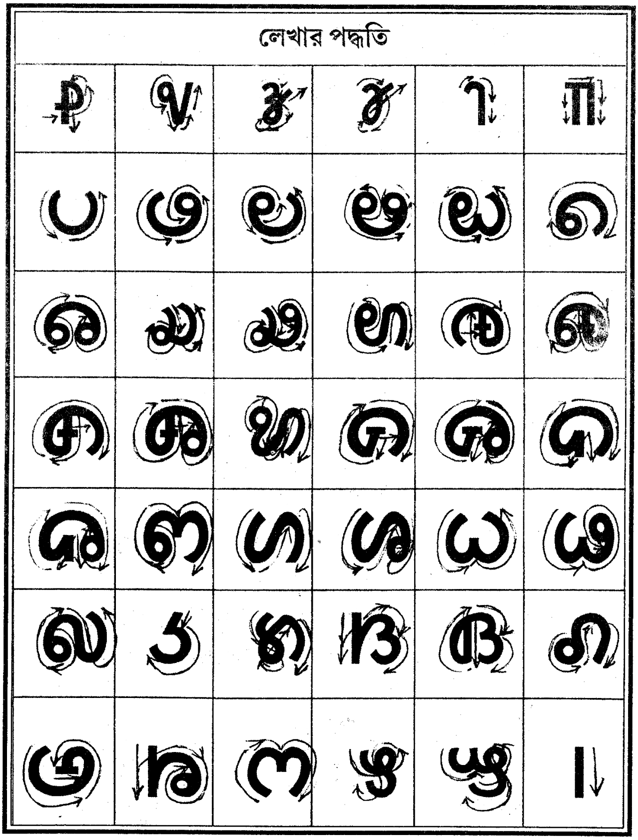

কুড়ুখ্ লিপির গ্রহণযোগ্যতা বিচার ও বিবেচনার জন্য নারায়ণ বাবু ওরাওঁ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে তোলোং সিকি লিপি উপস্থাপন করেন। অধ্যাপক বার্ণাড মিঞ্জ-এর সভাপতিত্বে ১৭-১৮ অক্টোবর, ১৯৯২ 'অখিল ভারতীয় কুড়ুখ্ কাত্থা যাতরা' নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে গুমলায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নিম্নলিখিত লিপিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১) সামুয়েল রেঙ্কার কুড়ুখ্ লিপি (১৯৩৭) (২) ফাদার বেঞ্জামিন কুজুরের কুড়ুখ্ লিপি (৩) ডঃ অনন্তী জেবা সিংহের বারতী লিপি (১৯৯১)

অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিনোদ কুমার ভগত, প্রভাকর তির্কী, প্রবীণ ওরাওঁ, ডঃ দেবশরণ ভগত ও আরো অনেকে কুড়ুখ্ ভাষার নতুন লিপি আবিষ্কার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ডাঃ নারায়ণ ওরাওঁ-এর কর্মকাণ্ডকেই সমর্থন করেন। ওই সভায় ডঃ হরি ওরাওঁ, ডঃ বিশপ নির্মল মিঞ্জ, মহাদেব টপ্পো ও উপেন্দ্র নারায়ণ ওরাওঁ কুড়ুখ্ ভাষা উন্নয়নে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। 'তোলোং সিকি' নামক নতুন লিপির পরিকল্পনাকে মূর্ত রূপ দিতে ১৯৯৩ সালে Tribal Research Analysis Communication & Education (TRACE) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সংস্থার সভাপতি হিসেবে এ.এম. খালকো এবং নির্দেশক হিসেবে ডাঃ নারায়ণ ওরাওঁ মনোনীত হন।

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩, রাঁচী কলেজের সভাগৃহে সারণা নবযুবক সংঘের আয়োজিত সভায় এই লিপির গুণাগুণ, উৎকর্ষতা, গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, সমালোচনা, যুক্তি, তর্ক-বিতর্ক হয়। ডঃ রামদয়াল মুণ্ডা, ডঃ বহুড়া এক্কা, ডঃ বাসুদেব বেসরা ছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশিষ্টজনেরা এই লিপির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। ৭ই অক্টোবর, ১৯৯৩ হিন্দি দৈনিক 'আজ' পত্রিকায় তোলোং সিকি লিপি বিষয়ে প্রথম সংবাদ প্রকাশিত হয়। ডঃ নারায়ণ ওরাওঁ কুড়ুখ্ সংস্কৃতির 'ডাণ্ডা-কাট্টানা' চিহ্নকে নিয়ে 22 Segment Display System (Tolong Siki Display System) তৈরি করেন। ১৯৯৮ সালের ২২-২৪ জানুয়ারি রাঁচীর মহারাজা হোটেলে ডঃরামদয়াল মুণ্ডা, ডঃ নির্মল মিঞ্জ, ডঃ ফ্রান্সিস এক্কা, ডঃ নারায়ণ ভগত, মনোরঞ্জন লাকড়া,বিবেকানন্দ ভগত, মঙ্গরা ওরাওঁ, ফাদার প্রভাত টপ্পো প্রভৃতি বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে এক আলোচনা সভা হয়, সেখানে তোলোং সিকি লিপির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুণাগুণ বিশ্লেষণ করার পর তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

১২ মে, ১৯৯৮ ডাঃ নারায়ণ ওরাওঁ কুড়ুখ্ বর্ণপরিচয় তথা 'কাইলগা' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৯৯৯ সালের ১৫ মে ডঃ রামদয়াল মুণ্ডা এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, ওরাওঁ মাতৃভাষার লিপি তোলোং সিকি-কে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হল। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের

উদ্যোগে রাঁচীর রাতুতে প্রথম তোলোং সিকি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং শিক্ষিকা হিসেবে শ্রমতী জ্যোতি টপ্পো নিযুক্ত হন। ২০০১ সালে মনোরঞ্জন লাকড়া সম্পূর্ণ তোলোং সিকি অক্ষরে 'দি মাইল স্টোন' নামে হস্তলিখিত একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। ২০০২ সালের ২০শে নভেম্বর তোলোং সিকির কম্পিউটার ফন্ট তৈরি হয় (Website-w.w.w.tolongsiki.com)।

২০০৩ সালের১৮ই সেপ্টেম্বর ঝাড়খণ্ড সরকার কুড়ুখ্ ভাষার লিপি 'তোলোং সিকি'-কে মান্যতা দিয়ে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশিলিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রক দপ্তরে পত্র প্রেরণ করে (পত্র নং-১২৯)। ২০০৩ সালে ঝাড়খণ্ড সরকার তোলোং সিকি লিপিকে স্বীকার করে নিলেও বাস্তবে স্বীকৃতি প্রদান করে ২০০৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি।

বাংলা	**কুড়ুখ্**	**বাংলা**	**কুড়ুখ্**
অঙ্গ	মেদ	আখ	কসারী
অক্ষি	ক্ষান্নে	আগুন	চিচ্চি
অঙ্গন	চাল্য়ি	আঘাত	পাস্না
অথবা	ভেল	আঁচল	আচ্রা
অধিক	বাগ্নে	আছি	রাঃদান
অনবরত	ঘাড়িঘাড়ি	আজ	ইন্না
অনুজ	সান্নিস	আট	আখ
অনুজা	সান্নি	আঠা	লাস্যা
অন্ন	মাণ্ডি	আড্ডা	আখড়া
অন্য	নান্না	আতপ	আব্দা
অশুচি	সতবড়োয়া	আত্মীয়	পাইহার
অশ্রু	ক্ষানজালখো	আদা	আদ্ক্ষি
অসুখ	নাড়ী	আঁধাব	উক্হা
অস্থি	ক্ষচল	আনা	অন্দরনা
অহি	নের্যে	আপনি	নিন্
আইন	নেগ	আবাদ	উষণা

বাংলা	**কুড়ুখ্**	**বাংলা**	**কুড়ুখ্**
আম	টাট্ক্ষা	কণ্ঠ	মেলখা, নারটি
আমি	এন	কত	এবাণ্ণু
আশা	কাখ্না	কথা	কাত্থা
আসা	বারণাগু	কাটা	খাণ্ডানা
ইচ্ছা	তুক্কি	কন্যা	কুকোয়
ইট	ইট্টা	কম	তানিকুনা
ইঁদুর	ওসগা	কলা	কেঁড়া
ইহা	ইদ্	কাকা	ক্ষাকা
ঈগল	মাধ্রী	কাজ	নালাখ্
উই	ইম্আ	কাঠ	কাঙ্কে
উঁচু	মেচ্ছা	কাঠবেড়ালী	চিডরা
উকুন	প্যান	কাপড়	কিচরি
উনিশ	দোয় নয়	কারণ	কাড্ডে
উনুন	চুল্হা	কাস্তে	তাঁতার
উহা	আদ্	কিন্তু	পাহে
ঋষি	লুর আখ্উস	কীট	পচ্গো
এক	ওংদো	কুকুর	আল্লা
একটু	তানিকুনা	কুটির	কুম্বা
একা	ওত্খা	কুড়াল	টঙ্গে
এখন	আক্কুন	কুড়ি	এন্দী
এঁচড়	ক্ষেনা-গাঠরা	কুমারী	ডিণ্ডা
এদিক	ইন্নু,ইজ্গু	কুমড়ো	কহড়া
এবং	দারা	কুয়ো	কুবি
ওখানে	আসান	কুলো	কেঁতের
ওঝা	দেওড়াস্	কে	নে
ওঠা	আরাগ্না	কেঁচো	লেন্ডা
ঔষধ	মান্দার	কেন	এন্দেরগে
কখন	একাবারি	কেবল	খালি

বাংলা	**কুড়ুখ্**	**বাংলা**	**কুড়ুখ্**
কোদাল	কুড়িড	চিল	চেন্‌ক্ষো
ক্ষত	খাদ্‌য়ি	চোখ	ক্ষান্নে
ক্ষুধা	কিড়আ	চার	নাখ্
খনন	আরখ্‌না	চব্বিশ	এন্দীনাখ্
খরগোশ	মুন্‌য়া	চাঁদ	চান্দো
খাওয়া	অন্না	চামড়া	চাপ্ড়া
খুকি	মাইয়ি	চাষ	উষণা
খোকা	বাবুস	চাল	তিক্‌হিল
খড়	বুশউ	চিংড়ি	চপ্পি
খেজুর	কিন্‌দা	চোর	ক্ষালবাস
খেলা	বেচ্‌না	ছয়	সোয়
খোঁজা	বেদ্দেনা	ছাই	চিন্দি
গগন	মেরখা	ছাগল	এড়া
গরম	কুড়না	ছাতা	কুল্লা
গরু	আড্ডো	ছানা	খাদ্দে
গল্প	খিরি	ছায়া	এ্যাখ্
গাছ	মান্নে	ছারপোকা	নাড়গা
গান	ডাণ্ডি	ছেলে	খাদ্দেস
গিরগিটি	টেটেঙ্গা	ছোকরা	জোখ্‌হাস
গুগলি	ঘুজ্ঘহি	ছোট	সান্নি
গুড়	গুল্লে	জন্য	খাত্‌রি
গোবর	গোবারি	জল	আম্মে
গ্রাম	পাদ্দা	জানা	আখ্‌না
ঘর	এড়পা	জাল	জাল্লি
ঘাড়	ক্ষেসের	ঝাঁটা	চাল্‌কি
ঘাম	এরচেরনা	ঝিনুক	জিনাই
ঘাস	ঘাসি	টক	তিস্যা
ঘুঘু	পাড়কি	ঠাকুর	নাদ্

বাংলা	কুড়ুখ্	বাংলা	কুড়ুখ্
ঠেঙ্গা	টেম্পা	ধোয়া	নোড়না
ডাকা	মেখ্না	নখ	অরখ্
ডাগর	কহা	নজর	এরনা
ডানা	ডেনা	নড়া	নুকুরনা
ডিম	বি	নতুন	পুনা
ডোবা	কুড়া	নদী	ক্ষার
ঢাকা	ডাবনা	ননদ	এংএরখো
ঢেঁকি	ঢিঙ্কি	নমস্কার	গড় লাগদান
তখন	আবিরি	নয়	নোয়
তবু	আন্নুহু	না	মালা
তল	কিইয়া	নাই	মাল্লা
তারা	বিন্কো	নাক	মুহি
তিরিশ	নুবদী	নাচ	নালনা
তুমি	নিন	নামা	এত্তেনা
তুঁস	কুণ্ডো	নিখোঁজ	এবসেরনা
থাকা	রাঃআনা	নির্দেশ	পেশ্না
দড়ি	পাঘা	নিদ্রা	খান্দারনা
দরজা	বালি	নিবাস	কুড়িয়া
দশ	দোয়	নেওয়া	হওনা
দাঁত	পাল্লে	নেবা	তেভেরনা
দিদি	দাই	পচা	কিত্তিকা
দিন	উল্লা	পচাই	ঝারা
দুই	এর	পাঁচ	পংচে
দেখা	এরনা	পতি	তাংআলাস
দেবর	এংএরখোস	পত্নী	তাংক্ষাইয়ি
ধনুক	গুড়থা	পথ	ডা'হেরে
ধান	খেস্যে	পা	খেড্ডে
ধামা	উড্ডু	পাকা	পাঞ্জেকা

বাংলা	**কুড়ুখ্**	**বাংলা**	**কুড়ুখ্**
পাখি	ওড়’আ	বসা	অক্কোনা
পাঁক	দহলা	বাইশ	এন্দীএর
পাগড়ি	পাঘা	বাঘ	লাক্ড়া
পাতা	আতক্ষা	বাঁচা	উজ্জুনা
পাঁচড়া	খাস্ড়া	বাটি	খরা
পালক	পেন্ছো	বাড়ি	এড়পা
পাথর	পাখ্না	বানর	বান্দরা
পাহাড়	পারতা	বাতাস	তাক্আ
পিছন	খোঁক্হা	বিছা	গজার
পিঠা	আস্মা	বিবাহ	বেঞ্জা
পিঁড়ি	কাণ্ড	বেগুন	ভেট্ঙ্গ
পিসি	তাআচী	বৈকাল	পিসাবারি
পুকুর	পোখারি	বোলতা	দুম্বা
পুরুষ	মেতাস	ভগবান	ধার্মেস
পেঁচা	ধুন্ধু	ভয়	এলেচ্না
পোঁতা	মাড়না	ভরা	নিদ্দিকা
প্রজাপতি	পাপ্লা	ভাই	এংড়িস
ফড়িং	বক্কো	ভাঙ্গা	খোট্টোনা
ফুল	পুঁপ	ভাজা	ইড়না
ফেরা	কির্রিনা	ভিক্ষুক	তিম্বুস
বাঁশি	তিরিয়ো	ভিজা	চেঁইকা
বড়	কহা	ভূমি	ক্ষাল্লে
বুড়ি	পাচ্চো	ভেড়া	মেরহো
বধূ	ক্ষায়ি	ভ্রমণ	কুদ্দুনা
বন	টরাং	মদ	বোথা, ঝারা,
বমি	পুতুরনা		বড়হে
বছর	চান	মধু	তিনিরাশি
বলা	বাঃআনা	মনিব	উরবাস

বাংলা	কুড়ুখ্	বাংলা	কুড়ুখ্
মশা	ভুস্ড়ি	যোগী	ভাগতাস
মহিলা	মুক্কা	রক্ত	খেস্
মহিষ	মান্খা	রথ	রান্থে
মা	আয়ো, আয়াং	রাখা	উইনা
মাংস	আহ্ড়া	রসুন	নাস্ড়ী
মাকড়সা	তান্দাল,	রাখাল	আড্ডো ক্ষাপুস
	মাকড়া	রাগ	খিসারনা
মাছ	ইন্জো	রাত	মাখ্হা
মাছি	তিংলী	রুটি	আস্মা
মাটি	ক্ষাজ্জে	রোদ	বিড়না
মাঠ	নাল	রোদন	চিখ্না
মাড়	আম্ড়ি	রোপা	ইদ্না
মাথা	কুক্কু	লক্ষ	লুডিম
মাদল	ক্ষেল	লক্ষ্য	এরনা
মাদুর	পিট্রি	লঙ্কা	মারচা
মুকুল	মাঞ্জের	লবণ	ব্যাক
মুখ	বাই	লতা	লারাং
মুত্রত্যাগ	উম্বুলনা	লম্বা	দিঘ্হা
মুরগী	ক্ষের	লাউ	তুম্বো
মোরগ	কক্রো	লাঙ্গল	গহ্লা
মৃত	কেচ্চেকা	লাঠি	টেস্পা
মেঘ	বাদালী	লাল	খেসো
মেয়ে	মাইয়ি	লিপি	সিকি
যখন	একাবারি	লেখা	টুড়না
যাওয়া	কাল্না	লেখক	টুডুস
যুগ	পারয়া	লেজ	ক্ষলা
যুবক	জোঁখ্হাস	লোক	আলার
যুবতী	পেল্ল	লোহা	পান্না

বাংলা	কুড়ুখ্	বাংলা	কুড়ুখ্
শক্ত	বেড়হা	সকাল	পাইরী
শকুন	গিধ্নী	সদস্য	দাস্যার
শক্তি	সাওআং	সন্ধ্যা	পুত্বারি
শন	সান্নে	সবুজ	হারিয়ার
শত	সুডিম	সভা	বাইসকী
শব্দ	খারখ্না	সমবেত	জুমুরনা
শয়ন	বেডেরনা	সম্পর্ক	নাতা
শরীর	মেদ	সর্দার	মুধ্ধাস
শর	কান্না	সাঁতার	অগ্না
শাখা	ডারা	সাত	সয়
শালা	সাড়াস	সাতানব্বই	নয়দীসয়
শালী	সাড়ী	সাপ	নের্যে
শিকল	শিক্রি	সারাদিন	গোট্টাউল্লা
শিকড়	পাআদা	সারারাত	সাগার মাক্হা
শিম	শিম্বী	সুতো	মের
শিমুল	শিম্বালী	সূচনা	ওরেওর্ত্তী
শীষ	বাইল	সূর্য	বিইড়ি
শীত	পাঁইয়া	সে (পুং)	আস্
শুকনো	ক্ষাইকা	সে (স্ত্রী)	আদ্
শোনা	মেন্না	সেখানে	আসান
শুভ	দাও	সেরূপ	আন্নে
শূকর	কিস্সী	সোজা	উজ্গো
শূন্য	নিদী	স্ত্রী	ক্ষাই
শৃগাল	চিগ্লা	স্থল	পিণ্ডি
শেষ	মুন্জুরনা	স্নেহ	চোন্হা, লোলা
ষাট	সোয়দী	স্পর্শ	এম্সেরনা
ষোল	দোয়সোয়	স্বপ্ন	তুংলী
সকল	হুরমী	স্রষ্টা	কাম্উস

বাংলা	কুড়ুখ্	বাংলা	কুড়ুখ্
হওয়া	মান্না	৮	আখ্
হঠাৎ	হাডারকে	৯	নয়
হনু	হাঁড়তু	১০	দোয়
হয়	মানি	পূর্বদিক	আরগিনি
হরণ	ক্ষাড়না		কোঁড়আ
হাতি রাড়এ, মান্খা	বেলাসঘি	পশ্চিমদিক	উটুরনি কোঁড়আ
হাওয়া	তাক্আ	উত্তরদিক	খেড্ডচপ্পো কোঁড়আ
হাঁস	গেড়ে		
হাড়	ক্ষচল	দক্ষিণদিক	কুক্কুচপ্পো কোঁড়আ
হাত	হেক্কা		
হাসি	আল্খানা	গ্রীষ্মকাল	জেট্ঠেগালী
হিংসা	পাখ্য়ারাত	বর্ষাকাল	এ্যখাগালী
হৃদয়	জিয়া	শরৎকাল	চিরদীগালী
হেথায়	ইসান	হেমন্তকাল	ঝুর্রাগালী
হোঁচট	মুরধারনা	শীতকাল	পাঁইয়াগালী
০	নিদী	বসন্তকাল	পাঝরাগালী
১	ওংদো	আজ	ইন্না
২	এর	গতকাল	চেরো
৩	নুব	গতপরশু	হরবোরে
৪	নাখ	আগামীকাল	নেলা
৫	পংচে	আগামীপরশু	নেলবেঞ্জা
৬	সোয়	সুপ্রভাত	দাও পাইরী
৭	সয়	শুভরাত্রি	দাও মাক্হা

এক ডাক্তার ও যাজকের কথা যাঁরা আদিবাসী লিপিতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন

নলিনা মিঞ্জ

১৯৯৩ সালের এক সন্ধ্যা। রাঁচির এক ছাত্রাবাসে বন্ধু বিনোদ কুমার ভগতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তরুণ আদিবাসী ডাক্তার নারায়ণ ওরাওঁ।

সময়টা উত্তাল। বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ডের দাবিতে ক্রমশ তীব্র হচ্ছে আন্দোলন। ওই অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা দীর্ঘদিনের ধরে নিজবাসভূমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের মুখোমুখি হয়ে এসেছে। তাই তাঁরা চাইছেন একটা পৃথক রাজ্য যেখানে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। নারায়ণ ওরাওঁ-এর সদ্য অভিজ্ঞতা হয়েছে এই বৈষম্যের। বিহারের দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকার সময় তাঁকে 'জংলি' বলে ডাকা হত।

আদিবাসী সমাজের শিক্ষিত অগ্রণী অংশ ছাত্ররাই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতা হিসেবে সামনের সারিতে ছিল। নারায়ণের বন্ধু ভগতও ছিল তাদের একজন। সেই সন্ধ্যায় আন্দোলনের অন্যতম অগ্নিগর্ভ নেতা ভগত বন্ধু নারায়ণের কাছে তার আবেগের দরজা খুলে দিল। সে খোলাখুলি স্বীকার করল যে মাঝে মাঝে, কী জন্য তারা লড়াই করছে, তা নিয়ে তার মনে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। কারণ নতুন রাজ্য গঠিত হওয়ার পরও তো সমাজের বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান একই রকম থেকে যাবে। স্কুল, কলেজ, থানা, আদালত তো বদলাবে না। ব্যবস্থাটা যদি বিহারের মতোই থেকে যায়, তবে আর আমরা

কী জন্য লড়ছি? এই লড়াই থেকে সাধারণ মানুষের কী লাভ হবে? ভগত এ প্রশ্ন তুলল বটে, তবে আলোচনা চলতে চলতে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল, 'আমরা যদি আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারি তাহলেই আমাদের আন্দোলন সফল হবে।'

এই কথাগুলো নারায়ণের কাছে এক শক্তিশালী অন্তর্দৃষ্টির ঝলক নিয়ে এল। ১৯৮৯ সাল থেকে সে নিজের ভাষা কুরুখ বা ওরাওঁ-র জন্য একটা লিপি তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। ভগতের কথাগুলো সে বিষয়ে তার সংকল্পকে আরও মজবুত করল।

একটা আকস্মিক পর্যবেক্ষণ থেকে এই কাজের উদ্যোগটা এসেছিল। দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল কলেজে ইন্টার্ন হিসেবে তার নজরে এল টাকার ওপরেই হোক বা গর্ভনিরোধক বড়ির প্যাকেটে, নানা রকম লিপিতে লেখা থাকে। তার মনে হল যদি আদিবাসী ভাষাগুলোর নিজস্ব আলাদা আলাদা লিপি থাকত এবং সেইসব লিপি যদি ব্যাপকভাবে পরিচিত হত, তাহলে সেগুলোও ওখানে স্থান পেত। নারায়ণ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে আদিবাসী ভাষাগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধ জ্ঞান আছে। সুতরাং অন্যান্য প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত ভাষার মতো আদিবাসী ভাষারও স্বীকৃতি প্রাপ্য।

ভগতের সঙ্গে তার বৈঠকের ফলে নারায়ণের দৃঢ় বিশ্বাস এল যে কুরুখ ভাষার একটা লিপি যদি সে তৈরি করতে পারে সেটাই হবে ঝাড়খন্ড সংগ্রামে তার অবদান।

ভাষাবিজ্ঞানে নারায়ণের কোনো প্রথাগত প্রশিক্ষণ না থাকলেও সে অভীষ্ট কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের জনগোষ্ঠীর লোকজনদের সঙ্গে আলোচনার পর সে লিপিটার একটা নাম ঠিক করল। তোলং সিকি।

'তোলং' শব্দটিতে ওই অঞ্চলের আদিবাসী পুরুষদের পরম্পরাগত পোশাক বোঝায়। নারায়ণ বুঝিয়ে দিলেন তিনি ওই পোশাক জড়ানোর কায়দা থেকে লিপিটির বর্ণগুলির নকশা তৈরি করার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। কুরুখ শব্দ 'সিকা' একটা আদিবাসী অনুষ্ঠান যাতে পুরুষদের সহ্যশক্তি পরীক্ষা করার জন্য গনগনে কাঠ দিয়ে কব্জির উলটোদিকে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। 'সিকা' থেকেই 'সিকি' শব্দটি তৈরি হয়েছে।

দিনের বেলায় নারায়ণ সরকারি মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করতেন। রাতের পর রাত তিনি লিপি উদ্ভাবনে ব্যয় করতেন। এক দশক পরে লিপিটা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হল। ২০০৩ সালে ঝাড়খন্ড সরকার এই লিপিকে কুরুখ ভাষার অনুমোদিত লিপি হিসেবে মান্যতা দিল।

এক চিকিৎসক এমন একটা কৃতিত্ব দেখালেন যা ভাষাবিজ্ঞানীদের পক্ষেও বিরল। এই অবদানের জন্য নারায়ণ ওরাওঁ কুরুখ ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। আরও কিছু ব্যক্তি নিজের নিজের ভাষাগোষ্ঠীর লিপি নির্মাণ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন, যেমন পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু। ১৯৩৪ সালে সাঁওতালি ভাষার জন্য 'অলচিকি' লিপি তৈরি করেন। রোহিদাস সিং নাগ ১৯৮০ সালের শেষ দিকে মুণ্ডারি ভাষার জন্য 'মুণ্ডারি বাণী' উদ্ভাবন করেন। এই বিরল প্রতিভাদের সারিতে নারায়ণ ওরাওঁ-এর নাম যুক্ত হল।

নারায়ণ ওরাওঁ একটি বই লিখেছেন, The Origin and Development of Tolong Siki. এই বই-এর পরিশিষ্টে প্রয়াত বিশপ নির্মল মিনজ (কুরুখ নেতা ও রাঁচির গ্রসনার কলেজের প্রতিষ্ঠাতা) লিখেছেন, 'অধিকাংশ আদিবাসী তাদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় থেকে দু-ভাবে বঞ্চিত হয়। প্রথমত, তাদের মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়ত, তাদের ভাষার কোনো লিপি নেই।'

মিনজ আরও বলেন, 'কোনো আদিবাসী ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে স্বাধীন ও মুক্ত হতে হলে তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য নিজস্ব ভাষা ও লিপি অবশ্যই দরকার।'

নারায়ণ ওরাওঁ যখন তাঁর লিপি বিশ্বের সামনে প্রকাশ করেন, প্রায় একই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে গুমলা জেলার অনেক ভেতরে বাঘিটোলি গ্রামে। কুরুখ যাজক ফাদার জেফিরিনাস বাখলা কুরুখদের জন্য ওই গ্রামে একটা স্কুল খোলেন। মাটির একটি ঘর। ১৫ জন ছাত্র ও একজন শিক্ষক। এটুকুই সম্বল।

ওরাওঁ ও বাখলার পথ দুটো মিলবে। ফলাফল বিদ্যুৎসঞ্চারের মতো। ঝাড়খণ্ডের সীমানা ছাড়িয়ে যায় এই যোগাযোগ। সে কথা বলার আগে আসুন একটু ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক।

আলাদা রাজ্যের দাবি সফল হওয়ার অনেক আগে থেকেই ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের আদিবাসীরা বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে শুরু করেছিল।

স্বাধীনতার ঠিক এক বছর পরে আদিবাসী নেতা জয়পাল সিং মুণ্ডা একটা প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সম্বন্ধে প্রচলিত মনোভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'লোকে সাধারণভাবে আদিবাসীদের সম্বন্ধে এত অজ্ঞ যে আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, এমনকি ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করতে তাদের আটকায় না।'

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর আধিপত্যকারী ভাষাগুলো চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনি সতর্কও করে দেন। 'বলা হয়, আদিবাসী ভাষাগুলো উন্নয়নের যোগ্যই নয়। সুতরাং সে-অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় ভাষা।'

সংবিধানসভার বিতর্কেও জয়পাল সিং মুণ্ডা সংবিধানের অষ্টম তফসিলের ভাষাগুলোর মধ্যে মুণ্ডারি, ওরাওঁ ও গোণ্ডি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন। তিনি বলেন, 'আমি এই সভার কাছে ওই তিনটি ভাষা অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাচ্ছি। এর প্রধান কারণ আমি বুঝতে পারছি এই ভাষাগুলোর অন্তর্ভুক্তি প্রাচীন ইতিহাসের গভীর চর্চাকে উৎসাহিত করবে।' কিন্তু দাবিটা উপেক্ষার সঙ্গে খারিজ করা হয়।

ঝাড়খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে এক আতঙ্কের স্রোত বইছে। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির মৃত্যুভয়ের কথা বলছি। এব্যাপারে ড. অভয় মিনজের কথা শুনুন। ড. মিনজ রাঁচির শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এনডেঞ্জারড ইন্ডিজেনাস ল্যাঙ্গোয়েজেস অ্যান্ড কালচারের ডিরেক্টর। তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের ভাষাতেই পরের প্রজন্মকে গল্প শোনাই। একটা ভাষার মৃত্যু হলে তার সঙ্গে গল্পগুলোরও মৃত্যু হয়।'

লিপির অভাব। এর দ্বারা বোঝা যায় মৌখিক ভাষাগুলোই ওই জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় ও ইতিহাস বোঝার চাবিকাঠি, তাছাড়া মনোভাব প্রকাশের একটা সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। মিনজ বলেন, 'ভাষা একটা প্রকাশ মাধ্যম। তোমার পরিবেশ ও সংস্কৃতি নিয়ে ভাবনা ভাষার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। মৌখিক ভাষাগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের সম্পদ বয়ে নিয়ে যায়। এতে পাওয়া যায় পুরোপুরি একটা বিশ্বদৃষ্টি, জ্ঞান ও ধারণাতন্ত্র। তুমি যদি জঙ্গলে থাক, উট তোমার ধারণায় আসবে না। তুমি ভাববে জল, জঙ্গল, জমিনের কথা।'

অন্ততপক্ষে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে আদিবাসীদের ভাষাগুলো লেখা, ছাপা এবং পড়ানো হচ্ছে দেবনাগরি বা আঞ্চলিক কোনো লিপিতে। কিন্তু বহু আদিবাসী মনে করেন তাদের ভাষার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজভাষার

আলাদা লিপি দরকার। নারায়ণ ওরাওঁ বলেন, ‘প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য ভাষার লিপির সাহায্যে আদিবাসী ভাষাটির ধ্বনিগুলোর বিশিষ্টতা প্রকাশ করা কঠিন।’

নারায়ণ আরও বললেন, কুরুখ একটা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা, সেজন্য দেবনাগরির মতো ইন্দো-আর্য লিপিতে কুরুখ ভাষা লেখা উচিত নয়। দ্রাবিড় ও ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীর ভাষার ঘাতপ্রতিঘাতে আদিবাসী ভাষাগুলোর ওপর অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছে। ‘আমাদের বুঝতে বাধ্য করা হয়েছে যে হিন্দি আর ইংরেজি ছাড়া আমাদের উন্নতির কোনো উপায় নেই। নারায়ণ বললেন, ‘এসব ভাষার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। জীবিকার জন্য এগুলোর গুরুত্ব তো আছেই। কিন্তু আমরা যদি আমাদের আদিবাসিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে চাই, নিজেদের ভাষা শিখতেই হবে।’

নারায়ণ ওরাওঁ-এর সঙ্গে আমার দেখা হয় গত নভেম্বরে। সবে ষাট পেরোনো এই মানুষটি তখন জামশেদপুরের গান্ধি স্মারক মেডিকেল কলেজে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। আমরা তাঁর অফিসে বসে কথা বলছিলাম। অনর্গল রোগীপরিজনরা কাগজ সই করাতে আসছিলেন। তিনিও কাজ করতে করতেই আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কখনো কখনো অবশ্য আলাপচারি বন্ধ রেখেই সই-সাবুদের কাজটা সেরে নিচ্ছিলেন।

আমার একটা প্রশ্ন ছিল, তিনি কীভাবে লিপিটা তৈরি করলেন। তিনি বললেন, ‘ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য রেখে তাদের বুঝতে হবে। আমি সেভাবেই লিপিটা বানিয়েছি। আমি যদি যে-কোনো রকমে একটা লিপি বানিয়ে ফেলতাম কেউ সেটা গ্রহণ করত না।’

নারায়ণ ওরাওঁ কুরুখ ভাষাভাষী গ্রামের মানুষ ও বিশিষ্ট আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সমর্থন ও পথনির্দেশ পেয়েছেন। এই বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন পেশাদার ভাষাবিজ্ঞানী ড. ফ্রান্সিস এক্কা এবং ড. রামদয়াল মুণ্ডা। এই ভাষাবিজ্ঞানীরা, তিনি কীভাবে এগোবেন এবিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তা ছাড়া এই সুপরামর্শও তাঁরা দিয়েছেন যে কুরুখ ভাষার নির্দিষ্ট ধ্বনিতত্ত্বের ওপর তাঁকে লিপির ভিত তৈরি করতে হবে। যে ধ্বনিতাত্ত্বিক নীতি অনুসারে ‘তোলং সিকি’ লিপি গড়ে উঠেছে তা নারায়ণের ভাষায় ‘যেইসে বোলিয়ে, ওইসে লিখিয়ে।’ যেভাবে কথা বলেন সে-ভাবে লিখুন।

গ্রামের যেসব দক্ষ কুরুখভাষী পাওয়া গিয়েছিল তাদের প্রতিক্রিয়াও নারায়ণকে খুব সাহায্য করেছে। একটা ঘটনা তিনি শোনালেন। প্রথমে তিনি তাঁর লিপিতে 'ন্যা' ধ্বনিটা আনেননি। গ্রামবাসীদের তিনি যখন লিপির ধ্বনিগুলো শোনালেন, তাদের কানে এই অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ল। তারা পরম্পরাগত কয়েকটা গান শোনাল যাতে ওই ধ্বনি আছে। তখন তিনি লিপির মধ্যে ওই ধ্বনিটার প্রতীক অন্তর্ভুক্ত করলেন।

জনজাতির যেসব মানুষ কুরুখ ভাষা বলতেন না তাদের কারো কারো কাছ থেকেও নারায়ণ দরকারি পরামর্শ পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সুপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় যাজক ফাদার বেনি এক্কার কথা বললেন। এক্কা অভিযোগ করলেন, 'দেবনাগরি লিপির হ্রস্ব-স্বর আর দীর্ঘ-স্বর প্রচণ্ড গুলিয়ে যায়। আপনি আমাদের জাতিকে এই দুর্ভোগ থেকে বাঁচান।'

ভাষাবিজ্ঞানীরাও নারায়ণ ওরাওঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, দেখবেন লিপিটা যেন কুরুখ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। নারায়ণ ছোটো সাইন্ডা গ্রামে বড়ো হয়েছেন। যে-সব প্রতীক ও নকশা কুরুখ সমাজে তিনি লক্ষ্য করেছেন সেগুলো তাকে অনুপ্রাণিত করল। তাঁর ভাষায়, এই লিপি তৈরির জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন। আদিবাসীদের প্রথাগত আচার অনুষ্ঠানে যেসব প্রতীক ব্যবহার করা হয় সেগুলো লক্ষ্য করলেন। দেওয়ালে যেসব মূর্তি আঁকা হয় তা দেখলেন। শস্যগোলা ও খেতখামারের নকশায় নজর দিলেন। কৃষকরা কৃষিতে যেসব পরম্পরাগত পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং পশুপাখিদের চেহারাও তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন।

এই লিপির গড়ে ওঠার পেছনে আদিবাসীদের বিশ্বাসের জগতেরও প্রভাব আছে। যেমন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত চলনকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। 'আমাদের প্রথাগত আচার অনুষ্ঠান এই চলনেই করা হয়। প্রকৃতি থেকেই আমরা এর অনুপ্রেরণা পেয়েছি। যেমন, সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তন, বেশির ভাগ আঙুরলতার মোচড় এভাবেই হয়।'

একথা মাথায় রেখে তিনি বেশির ভাগ বর্ণকে এমনভাবে এঁকেছেন যাতে সেগুলোকে বিপরীত আবর্তনেই সহজে লেখা যায়। তিনি কাগজকলমে যেমন বর্ণগুলো লিখেছেন তেমন ঘাস কালিতে ডুবিয়েও লিপির খসড়া করেছেন।

বেশির ভাগ মানুষ নারায়ণ ওরাওঁ-এর এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু কুরুখ সমাজের ভেতরে ও বাইরে থেকে বিরোধিতাও এসেছে। বিরোধীদের

যুক্তি ছিল, কুরুখের জন্য নতুন কোনো লিপির দরকার নেই। প্রচলিত দেবনাগরি, রোমান অথবা আঞ্চলিক লিপিই কুরুখের জন্য যথেষ্ট কার্যকরী।

কিন্তু নারায়ণ সরাসরি এই যুক্তি বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর কথায় 'আলাদা ভাষার জন্য আলাদা লিপি দরকার। আমরা যদি দেবনাগরি লিপি গ্রহণ করি তাহলে আমাদের আদিবাসিত্ব মুছে যাবে।'

কয়েকটা কর্মশালা ও জনপরামর্শ সভার পর ১৯৯৯ সালের ১৫ মে তারিখে রাঁচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তোলংসিকি লিপি গণব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে দু-জন প্রাক্তন উপাচার্য ড. রামদয়াল মুণ্ডা এবং ড. ইন্দুধান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে সমর্থন করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণ জানান দিনটা তাঁর পক্ষে মোটেই প্রবল উত্তেজনার দিন ছিল না। ছিল এক শান্ত উপলব্ধির দিন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর কাজ পৃথিবীর আলো দেখলেও আরও অনেক পথ তাঁকে পেরোতে হবে। কারণ লোকে যদি এই লিপি ব্যবহার করে একমাত্র তাহলেই কাজটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। 'আমি খুব উত্তেজিত হইনি, খুশিতেও ভেসে যাইনি।' তাঁর মনে পড়েছিল তিনি যাদের কাছে পরামর্শের জন্য গিয়েছিলেন তাঁরা বলেছিলেন, 'একটা পূর্ণাঙ্গ লিপি বিকশিত হতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যায়।'

তোলংসিকি লিপি প্রকাশ করার কয়েক মাস পরেই নারায়ণের অজ্ঞাতসারেই এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুরুখ যাজক এই ভাষাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করার ভিত গড়েন। যাজকের নাম জেফিরিনাস বাখলা। তিনি ২০০০ সালে বাঘিটোলি গ্রামে লুরডিপ্পা কুরুখ স্কুল শুরু করেন। এই স্কুল সম্বন্ধে বাখলার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সবার থেকে আলাদা। ইসরায়েল সহ বিদেশের কয়েকটি অঞ্চলে ভ্রমণ তাকে অনুপ্রেরণা জোগায়। বিশেষ করে ইসরায়েলের সমবায় বা কিব্বুৎস তাকে নতুনভাবে ভাবায়। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্কুলে হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয়। বাখলা ঠিক করলেন, তাঁর স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে কুরুখ। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি। হিন্দি একটা বিষয় হিসেবে শেখানো হবে। স্বাধীনতার আগে কুরুখ অঞ্চলে 'ধুমকুড়িয়া' নামে আবাসিক বিদ্যালয়ের চল ছিল। বাখলার স্কুলটি হল ঝাড়খণ্ডের প্রথম আধুনিক আবাসিক কুরুখ স্কুল।

'আমি আমার জনগোষ্ঠীকে বাঁচানোর জন্য লুরডিপ্পা স্কুল চালু করি। 'জুবান চলা গ্যয়া তো জান চলা যায়েগা', ভাষা যদি মরে যায় তবে ওই সম্প্রদায়েরও মরণ আসে।' ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে এক সন্ধ্যায় লুরডিপ্পা স্কুলের ছাদে বসে যাজক বাখলা আমাকে ওপরের কথাগুলো বলেন।

তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা আনাবিড়ি গ্রামে। বাঘিটলি যে ব্লকে আনাবিড়িও সেই একই ব্লকে। তিনি বোঝালেন লুরডিপ্পা কুরুখ সমাজের পরিচালনায় চলে। স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে তিনি আশপাশের ২২টা গ্রামের গাঁওবুড়োদের সঙ্গে বসে কীভাবে স্কুলটা চালানো যায় তা আলোচনা করেন। 'এই সময়ে অনেক বাবা-মা বাচ্চাদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলা চালু করেছিলেন। আমরা সেটা বদলাতে চাইলাম। বোঝালাম মাতৃভাষাই শিক্ষার সেরা মাধ্যম।'

যে শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ পায় তারা অনেক সহজে শিখতে পারে, শিক্ষার পথে আরও ভালোভাবে এগোতে পারে। 'অন্য ভাষার চেয়ে মাতৃভাষায় বিষয়বস্তু সহজেই আয়ত্ত হয়।'

২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ও এর আগের নীতিগুলোতেও অন্তত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার আবশ্যকতার কথা বলা হয়। সম্ভব হলে উচ্চতর শিক্ষাও মাতৃভাষায় গ্রহণ করা উচিত। ২০২০-র শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, 'শিশুরা গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো নিজেদের ঘরের ভাষায় বা মাতৃভাষায় বেশি তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পারে, এটা সহজেই বোঝা যায়।'

ইউনেস্কোও মাতৃভাষার মাধ্যম ও বহুভাষিক শিক্ষার পরামর্শ দেয়। এই সংগঠনের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, 'সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও গুণমান সম্পন্ন শিক্ষার একটি প্রধান উপাদান মাতৃভাষায় শিক্ষা। এর ফলে শিখনের ফলাফল ও লেখাপড়ায় পারদর্শিতা বাড়ে। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এভাবেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে খামতি এড়ানো এবং শিখন ও বোধের গতিবৃদ্ধি সম্ভব। মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা সব শিক্ষার্থীকে সমাজে পুরোপুরিভাবে অংশ নিতে সক্ষম করে তোলে। এটাই সবচেয়ে মূল্যবান অবদান।'

নিজেদের আত্মপরিচিতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে গর্ববোধ জাগানোও বাখলার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তাদের সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত

জ্ঞানের সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচিত করানো হত। গান, নাচ, মৌখিক ইতিহাস, উৎসব অনুষ্ঠান ও কৃষিকাজের মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হত। বাখলা প্রশ্নের সুরে বললেন, আজকাল স্কুলগুলোতে কী ঘটে? মাতৃভাষাকে পেছনে ফেলে বাচ্চাদের শুনতে হয়, বলতে হয়, লিখতে হয় হিন্দি। তাদের পরিবারের জগৎ থেকে আলাদা একটা জগতে তাদের প্রবেশ করতে হয়। অপরিচিত জগতে। আমার বাবা-মা বাড়িতে আমাকে যা শিখিয়েছে সব ফালতু। ওইসব ছেড়ে দিয়ে আমাকে এখানে নতুন করে শুরু করতে হবে। তবেই আসবে সাফল্য।'

অনেকেই বাখলার প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করেছে। তাঁদের মধ্যে কুরুখ সম্প্রদায়ের মানুষও আছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল বাখলা শিশুদের আদিবাসী ভাষায় শিখিয়ে এগোনোর বদলে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাখলা কিন্তু তাঁর উদ্যোগে অনড় রইলেন।

স্কুলটা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে চালাতে আকস্মিকভাবে নারায়ণ ওরাওঁ-এর উদ্যোগের সঙ্গে সেটা জড়িয়ে গেল। স্কুলটা সবে শুরু হয়েছে, সেই সময় বাখলা একদিন রাঁচির একটা বইয়ের দোকানে একটা পুস্তিকা দেখতে পেলেন। এটা তোলংসিকির বর্ণপরিচয়। তিনি নারায়ণ ওরাওঁকে চিনতেন না, তবুও তিনি তাঁর স্কুলের প্রাথমিক স্তরে তোলংসিকি লিপিতেই কুরুখ ভাষায় শিক্ষা দেবেন বলে স্থির করলেন।

বাখলা বুঝতে পারলেন কুরুখ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নারায়ণ ওরাওঁ-এর লিপি সাহায্য করবে। কুরুখ সমাজের মধ্যে দুটি প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে—পরম্পরাগত সারনা ধর্মবিশ্বাসী এবং ঔপনিবেশিককালে যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছে সেই খ্রিস্টানরা। 'আমার বাসনা ছিল দুটো ধর্মগোষ্ঠীকে মিলিয়ে কুরুখসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। আজ এই স্কুলের মাঠে লাল-সাদা ডোরা কাটা সারনা পতাকা ওড়ে। বেশির ভাগ ছাত্রই সারনা। বড়োদিন বা প্রজাতন্ত্র দিবস যেমন উৎসাহে এখানে উদযাপিত হয় তেমন উদ্দীপনার সঙ্গে আদিবাসী পরবগুলোও পালন করা হয়। বসন্ত উৎসব সারহুল শালগাছ বন্দনা আর ফসলের পরব করমের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়।

নারায়ণ ওরাওঁ বন্ধুদের কাছ থেকে স্কুলটার কথা শুনেছিলেন। ২০০০ সালের মাঝামাঝি একদিন তিনি লুরডিপ্পা স্কুলে এসে বাখলার সঙ্গে দেখা করলেন। নারায়ণের ভাষায় বাখলার প্রয়াস 'বীরোচিত' বললেই যথাযথ হয়।

স্কুল দশ বছর ধরে মসৃণভাবে চলল। বাখলার ভাই অগাস্টিন বাখলা ছিলেন ওই স্কুলের ডিরেক্টর। তিনি শোনালেন, পড়ুয়ারা কোনো অসুবিধা ছাড়াই ওই নতুন লিপি শিখে নিল। অল্পদিনের মধ্যেই তারা ওই লিপিতে কুরুখ ভাষায় স্বচ্ছন্দে নোট নেওয়া ও বাড়ির কাজ লিখতে লাগল।

প্রথম ব্যাচের পড়ুয়ারা উঁচু ক্লাসে উঠতেই একটা প্রশ্ন দেখা দিল, বোর্ডের পরীক্ষায় কি তাদের এই লিপিতে লিখতে দেওয়া হবে?

ইতিমধ্যে কিশলয় নামে এক সাংবাদিক তোলংসিকি লিপির একটা কম্পিউটার ফন্ট তৈরি করে ফেলেছিলেন। নাম দেন ‘কেলিতোলং’। ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে এটার উদ্বোধন হয়। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঝাড়খণ্ড সরকার তোলংসিকি লিপিকে কুরুখ ভাষার অনুমোদিত লিপি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

ঝাড়খণ্ড অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ছিল স্কুলে ও পরীক্ষায় নতুন ভাষা ও লিপির অনুমোদন দেওয়ার কর্তা। স্কুলকে তাঁরা জানালেন, ওই লিপিতে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমোদন পেতে গেলে দুটো জিনিস তাদের পেশ করতে হবে। প্রথম, তোলংসিকি লিপিতে ছাপা পাঠ্যপুস্তক, দ্বিতীয়, ওই পাঠ্যপুস্তকগুলো রাজ্যের সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত হতে হবে। এগুলি কাউন্সিলে জমা দিয়ে অনুমোদন পাওয়ার আগে দেবনাগরি হরফে লিখিত পাঠ্যপুস্তকই কেবল কুরুখ ভাষার জন্য পাওয়া যেত। লুরডিপ্পায় পড়ুয়ারা এই পাঠ্যপুস্তকগুলো ব্যবহার করত, কিন্তু তোলং সিকিতে কীভাবে লিখতে পড়তে হয় সেটা শিখত।

অগাস্টিন বাখলা ও বিনোদ ভগত চললেন নারায়ণ ওরাওঁ-এর কাছে। গয়াতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ জানালেন কাউন্সিলে লিপি অনুমোদনের জন্য তাদের সাহায্য করতে।

নারায়ণ ও অগাস্টিন বাখলার সঙ্গে কাজে হাত লাগালেন যাজক অগাস্টিন কেরকেট্টা ও বিনোদ ভগত। পরের কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রমে নবম ও দশম শ্রেণির কুরুখ পাঠ্যপুস্তক তৈরি হল। দেবনাগরি হরফের পাঠ্য বইগুলো তাঁরা তোলং সিকিতে লিপ্যন্তর করলেন।

এরপর ছাপার কাজ। এক স্থানীয় ছাপাখানার কাছে অক্ষরবিন্যাসের জন্য সহায়তা চাইলেন। মালিককে বললেন, ‘ওরাওঁ জাতিকে বাঁচানোর জন্য’ এ সুযোগ হারালে চলবে না।

প্রথমে পাঠ্যপুস্তক তোলং সিকিতে টাইপ করা হল। এরপর নারায়ণ ও কেরকেট্টা সম্পাদনা করে এর চূড়ান্ত রূপ দিলেন। নারায়ণ বললেন, 'আমি জুগাড় থেকে একটা ল্যাপটপ ধার করলাম। আমার প্রতিদিনের কাজ শেষ হলে রাতে ল্যাপটপটা নিয়ে বসতাম। গভীর রাত পর্যন্ত বইয়ের কাজ করতাম।'

তখন ঝাড়খণ্ডে রাজ্যপালের শাসন চলছে। ফলে লুরডিপ্পা স্কুলের পড়ুয়ারা এই লিপি ব্যবহার করতে পারবে কিনা তার চূড়ান্ত অনুমোদন রাজ্যপালের অফিস থেকেই পাওয়ার কথা। অগাস্টিন বাখলা ও নারায়ণ ওরাওঁ-এর মনে পড়ল তাঁদের ছোটাছুটির কথা। বিষয়টা যাতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেজন্য কুরুখ সমাজের কয়েকজন মানুষ তদ্বির তদারকের জন্য মিলিত হলেন। ঝাড়খণ্ড অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর এবং রাজ্যপালের অফিসে নিজেদের পরিচিত যেসব আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে এঁরা যোগাযোগ করতে শুরু করলেন। বোঝালেন কী তাঁরা চাইছেন এবং তার উদ্দেশ্যই বা কী।

অবশেষে ২০০৯-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ড অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি বেরোল। তাতে জানানো হল যে লুরডিপ্পা স্কুলের ৩৯ জন পড়ুয়া তোলং সিকি লিপিতে কুরুখ ভাষার পরীক্ষা দিতে পারবে।

কিন্তু সমস্যা তখনও শেষ হয়নি। এদের খাতা পরীক্ষা কে করবে? কাউন্সিলের প্রত্যাশা, পরীক্ষকও খুঁজে বের করবেন নারায়ণ ও অন্যান্যরা।

প্রচুর পরিশ্রমে নারায়ণ ওরাওঁ একজন শিক্ষককে পেলেন। তিনি সে বছর এবং পরের কয়েক বছর খাতা দেখতে রাজি হলেন। ২০১৩ সালের মধ্যে আরও কিছু স্কুল তোলং সিকি লিপিতে কুরুখ ভাষার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করল। এবার তাদের আবেদন কাউন্সিল খারিজ করল। কর্তারা বললেন, তাঁদের হাতে অত পরীক্ষক নেই।

ঝাড়খণ্ড অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নারায়ণকে বলেছিলেন, পরীক্ষায় ব্যবহার করার অনুমতি চাওয়ার আগে আপনার উচিত ছিল নতুন লিপিটা প্রচার করা। 'এখানেই আপনি ভুল করেছেন। আপনার উচিত ছিল প্রথমে ওপরের ক্লাসে লিপিটা শেখানো, নীচের ক্লাসে প্রথমে নয়, এইসব খাতা দেখবার মতো শিক্ষক আমাদের নেই।'

নারায়ণ দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন যে লিপিটা প্রকাশ করার পর কুরুখ সমাজের খুব সামান্য কয়েকজন ছাড়া কেউই বা শিক্ষকরা এই লিপি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেননি। ‘একসময় তো আমরা পাঁচজন প্রশিক্ষিত সরকারি শিক্ষকও খুঁজে পাইনি যাদের নিয়ে তোলং সিকিতে লেখা খাতা পরীক্ষা করা যায়।’

অবশেষে ২০১৬ সালে সব স্কুলের পড়ুয়াদের তোলিং সিকি লিপিতে কুরুখ ভাষার পরীক্ষা দেওয়ার সরকারি অনুমোদন মিলল।

মাঝখানের সময়টায় সরকার কুরুখ জানা ৯০ জন শিক্ষক জোগাড় করলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু শিক্ষক তোলং সিকি শিখেছিলেন।

২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কুরুখভাষা ও তোলং সিকি লিপিকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এখনও এই ভাষা অষ্টম তফসিলভুক্ত হয়নি। ২০০৩ সালে ঝাড়খণ্ড সরকার কুরুখভাষাকে অষ্টম তফসিলভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানায়। তবুও কিছু হয়নি। সাঁওতালি ভাষাই অষ্টম তফসিলভুক্ত একমাত্র আদিবাসী ভাষা। (অসম ও মেঘালয়ের বোরো ভাষা অষ্টম তফসিলে জায়গা পেলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এসব ভাষার বাচকদের যথার্থ আদিবাসী বলা যায় না।)

নারায়ণ বোঝেন যে কুরুখ ভাষা ও লিপি এখনও সমগ্র জাতিটি গ্রহণ করেনি। তবু তাঁর চেষ্টায় কুরুখ ঝাড়খণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় নিজের স্থান করে নিয়েছে।

ইতিমধ্যে লুরডিপ্পা স্কুলের মর্যাদা বেড়ে গেছে। এই স্কুলের কথা শুনে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এখানে পাঠাতে শুরু করেছেন। এমনকি বিহার ও ছত্তিশগড় থেকে পড়ুয়ারা আসছে। বর্তমানে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩৫০। বাখলা বললেন, ‘কত লোক যে স্কুলটা দেখতে আসে, কত তাঁদের প্রশ্ন।’

অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিছু অগ্রগতি ঘটেছে। ২০১৬ সালে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরির পরীক্ষায় ভাষা বিষয়ের মধ্যে কুরুখ, মুণ্ডারি ও সাঁওতালি ঐচ্ছিক পত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এইসব ভাষার আরও ব্যাপক সরকারি মান্যতা ও বেশি প্রয়োগ অর্জনের জন্য এখনও অনেকদূর যেতে হবে। শিক্ষাবিভাগের এক পদাধিকারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি জানান, যদিও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আদিবাসী ভাষাগুলিতে ব্যাপকভাবে কথা বলার চল আছে, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ এদের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। যেসব স্কুলে আদিবাসী ভাষা

শেখানো হয় তাদের বেশির ভাগই বেসরকারি স্কুল। এই ভাষাগুলো এখনও রাজ্যের শিক্ষাকাঠামোর অঙ্গীভূত হয়নি। অথচ তেমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল। সরকারি হোক বা বেসরকারি, বেশির ভাগ স্কুলেই শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি বা ইংরেজি। মাদ্রাসার মাধ্যম উর্দু।

খুব বিরল ক্ষেত্রেই ঐচ্ছিক ভাষা বিষয় হিসেবে আদিবাসী কোনো ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা আছে। আধিকারিক মশাই বললেন, 'আমাদের বলা হয় শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারকে উৎসাহিত করুন। কিন্তু খোলাখুলি বলছি, বাস্তবে শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো কাঠামোই আমাদের নেই। ভাষা সম্প্রদায়ের ইচ্ছার ওপরই এটা নির্ভর করছে। কিছু কিছু বেসরকারি স্কুলে কোনো কোনো আদিবাসী ভাষা শেখানো হয়। সেই স্কুলগুলোর নিয়মকানুন সরকারি স্কুলের থেকে আলাদা।'

যেসব পড়ুয়া আদিবাসী ভাষায় বড়ো হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে সে ভাষার কোনো স্থান দেখতে না পেয়ে তাদের লড়ে যেতে হচ্ছিল।

বাখলা বললেন, 'আমাদের শিশুরা ঘরে মাতৃভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত, সে ভাষাটিকে স্কুলে আসার সময় বিদায় জানাতে হয়। কারণ বেশির ভাগ স্কুলেই শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি বা ইংরেজি। যখন এই পড়ুয়ারা ভাষার বাঁধা ডিঙিয়ে প্রভাবশালী ভাষায় উচ্চশিক্ষা, চাকরি, শহরবাসী জীবনের সামাজিক অগ্রগতির শরিক হয় তারা মাতৃভাষাকে পরিত্যাগ করে।'

জনজাতিদের জন্য এক দশকব্যাপী সুরক্ষার কাজকর্ম চালানোর জন্য ইউনেসকো একটা বৈশ্বিক কর্মীবাহিনী তৈরি করে। তাতে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন ড. অ্যানাবেল বারা। তাঁর ভাষায়, 'ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়িত পৃথিবীতে আমরা আমাদের আদিবাসিত্ব ভুলে যাচ্ছি। আমাদের ঐতিহ্য ও ভাষা পেছনে ফেলে দিচ্ছি।'

যে কয়েকটা ভাষা এই উভয় সংকটের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে তাদের একটা কুরুখ। বারা বললেন, 'ঝাড়খণ্ডে ৩২টা জনজাতি আছে। এদের মধ্যে হো, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ এবং খেরিয়াদের নিজস্ব লিপি আছে, কিন্তু সবগুলোই আছে বিকাশের স্তরে। তরুণ প্রজন্মের ৮০ শতাংশ মানুষ নিজেদের মাতৃভাষা জানে না।'

এইসব প্রভাবশালী জনজাতিদের ভাষা মারাত্মকভাবে বিপন্ন নয়। কিন্তু সংকটগ্রস্ত জনজাতিদের ভাষা বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে

আছে ৭ হাজার বাচক বিশিষ্ট অসুর ভাষা ও ২ হাজার বাচকের বীরহড় ভাষা। ইউনেস্কো ২০১১ সালে প্রথমটাকে 'সুনিশ্চিতভাবে বিপন্ন' এবং দ্বিতীয়টাকে 'মারাত্মকভাবে বিপন্ন' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

কুরুখ ভাষা প্রভাবশালী কুরুখ জনজাতির মধ্যে কথ্য ভাষা হিসেবে এখনও প্রচলিত। দ্বিতীয়ত নারায়ণ ওরাওঁ-এর মতো মানুষদের চেষ্টার ফলে এই ভাষাকে সবচেয়ে বেশি হামলার মুখে পড়া ভাষা বলা যায় না। ইউনেস্কোর শ্রেণিবিভাগে একে 'ভঙ্গুর' বলা যায়। বিলুপ্তি থেকে তা অনেকটা দূরে।

ড. অভয় মিনজের মতে এই ভাষাগুলো বাঁচানোর জন্য সরকারের আরও তৎপর হওয়া দরকার। 'সরকারি সহায়তা ছাড়া কোনো ভাষার পক্ষে টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ বা মহারাষ্ট্রের মতো কিছু রাজ্যে সাইন বোর্ড সহ সব কিছু রাজ্যের ভাষায় লেখা হয়।'

তিনি স্বীকার করলেন ঝাড়খণ্ডের ব্যাপারটা আরও কঠিন। এখানে হিন্দি সরকারি ভাষা। তাছাড়া অনেকগুলো দ্বিতীয় ভাষা আছে। এদের মধ্যে আছে কুরুখ, সাঁওতালি ও মুণ্ডারি। তা সত্ত্বেও এসব ভাষাকে রক্ষা করার জন্য সরকারের অর্থসাহায্য করার দায়িত্ব আছে। 'খালি পেটে আপনি ভাষা ও সংস্কৃতি বাঁচাতে পারবেন না। সুতরাং এই ভাষাগুলোকে রক্ষা করার জন্য একেবারে গোড়া থেকেই অর্থ সাহায্য ও উৎসাহ জুগিয়ে যাওয়া সরকারের ওপর বর্তায়।'

কুরুখ জনজাতির কিছু মানুষ অবশ্য তাঁদের ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী। বাখলা ও বারা দু-জনেই মনে করেন, কুরুখ ভাষা পুনরুজ্জীবন ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর্বের মধ্য দিয়ে চলছে। বারা বললেন, 'তরুণ সম্প্রদায় ভাষা শেখানোর কাজে এগিয়ে আসছে। তারা গান লিখছে, ভিডিও বানাচ্ছে। এগুলোর মধ্যেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। এর ফলে অন্য তরুণদের মধ্যে নিজেদের ভাষা শেখার উৎসাহ জাগবে। তারা আর এই ভাষার জন্য লজ্জা বোধ করবে না। আমাদের আরও অনেক কিছু করার আছে। কিন্তু পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে। আমার আশা তা থেমে যাবে না।'

অনুবাদ: সজল রায়চৌধুরী

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ভূমিজ পুনরুত্থান কথা

বিপ্লব নায়ক

[মাতৃভাষা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই লেখার সমগ্রটা বই আকারে 'ভূমিজ পুনরুত্থান' (২০২৩, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা) নামে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার একটি নির্বাচিত অংশ হাজির করা হল—সম্পাদক।]

ঠাকুরানপাহাড়ির মাছকাঁদনা, বালিচুয়া, তালপুকুরিয়া ও লাবণি গ্রামে কাটানো দিনগুলো ভূমিজ জনজাতি ও তাঁদের সংস্কৃতি-ভাষা-ঐতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহল ও আকর্ষণ তৈরি করে দিয়েছিল। হারিয়ে ফেলা নিজের ভাষাকে পুনরুদ্ধারের যে প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা সেখানে দেখেছিলাম, তা মনে দাগ কেটেছিল। গত তিন-চার দশক জুড়ে বিশ্বের নানা জায়গায় বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের উদ্যোগে লুপ্তপ্রায় ভাষার পুনরুজ্জীবনের জন্য কিছু প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভূমিজদের ক্ষেত্রে এই ভাষিক জনগোষ্ঠীর ভিতর থেকে নিজেদের স্বকীয় উদ্যোগ যেভাবে অঙ্কুরিত হয়ে ডালপালা মেলতে শুরু করেছে, তেমন নজির খুব সহজলভ্য নয়।

নিজেদের ভাষা পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি, সেই ভাষার জন্য পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লড়াইও ভূমিজদের লড়তে হচ্ছে কারণ দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিজ ভাষাকে একটি উপভাষা অথবা অন্য ভাষার অপভ্রংশ হিসেবে অবমূল্যায়িত করে আসা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৃতাত্ত্বিক রিজলি সাহেবের ১৮৯১ সালে প্রকাশিত 'দি ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল' বইটি এখনও বিদ্বজনমহলে একটি আকরগ্রন্থের মর্যাদা পায়। সেই বইয়ে তিনি লিখেছিলেন:

> এ নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে মুণ্ডাদের সঙ্গে ভূমিজরা যদি অভিন্ন নাও হয়, তবে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; কিন্তু এমন খুব কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না যা থেকে বলা যায় যে ভূমিজদের নিজস্ব আলাদা ভাষা আছে। ১৮৫০ সালে হজসন একটি সংক্ষিপ্ত শব্দভাণ্ডার প্রকাশিত করেছিলেন (*বেঙ্গল জার্নাল*, ভল্যুম xviii, পার্ট II, পৃষ্ঠা ৯৬৭; *এসেজ*, ভলুম ii, পৃষ্ঠা ৯৭)। সেই শব্দভাণ্ডার তৈরি করেছিলেন ক্যাপটেন হাউটন, যিনি সেই সময় সিংভূমের রাজনৈতিক দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু সেই শব্দভাণ্ডারের বেশির ভাগ শব্দই হো ভাষার বলে মনে হয়। সবচেয়ে সম্প্রতি 'গসনারস মিশন'-এর হের নটরট তাঁর পর্যবেক্ষণে (*গ্রামাটিক ডের কোল-স্প্যাচে*, পৃষ্ঠা-৪) বলেছেন কথায় ও আচরণে ভূমিজদের সঙ্গে মুণ্ডাদের অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। তিনি অবশ্য ভূমিজদের ভাষার কোনো নমুনা হাজির করেননি এবং একটি পৃথক উপভাষা হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো মুণ্ডারির থেকে যথেষ্ট পার্থক্য তার আছে কি না সে নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি।[১]

এভাবেই সংক্ষিপ্ত কিছু শব্দভাণ্ডার, ইংরেজ ও জার্মান অনুসন্ধিৎসুদের হালকা কিছু ধারণা—তার উপর ভিত্তি করেই প্রশাসক ও পণ্ডিতদের মহলে ভূমিজ ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার না করার যুক্তি গড়ে উঠেছিল। ভূমিজ ভাষাকে মুণ্ডারি ভাষার অংশ, মুণ্ডারি ভাষার উপভাষা বা মুণ্ডারি ভাষার অপভ্রংশ হিসেবে দেখার প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। এর পিছনে অবশ্য একটা কারণ ছিল বলে মনে হয়। ১৮৫০ সালের পর থেকে মূলত জার্মান মিশন চার্চের খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরকরণ করার প্রক্রিয়ার দ্রুত ব্যাপ্তির ফলে বিপুল সংখ্যায় মুণ্ডা ও ওরাওঁ জনজাতির মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান চার্চের অধীনে আসে। এই প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে চার্চ মুণ্ডাদের ভাষা মুণ্ডারি ও ওরাওঁদের ভাষা কুরুখকে ধর্মপ্রচারে হাতিয়ার করে নেয়—বাইবেলের অনুবাদ হয় এই ভাষায়, ভাষার ব্যাকরণ রচনা করে ভাষাকে একটি মান রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াও দানা বাঁধে। রেভারেণ্ড আর্থার ভান এমেলেন ও অন্যান্য জেসুইট মিশনারিদের সহযোগে জন হফম্যান প্রকাশিত করেন বহখণ্ডবিশিষ্ট *এনসাইক্লোপেডিয়া মুণ্ডারিকা*। এর ফলে ইউরোপিয় প্রশাসকদের কাছে মুণ্ডা ভাষার মান ছিল বেশি। মুণ্ডারি ভাষাকেই

প্রধান ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে ভূমিজ ভাষার মতো অন্যান্য ভাষাগুলোকে তার উপভাষা অথবা অপভ্রংশ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল।

১৯২৭ সালে জি এ গ্রিয়ার্সন সাহেব তার বহুখণ্ড *লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া* প্রকাশ করেন। ভারতীয় ভাষাসমূহের সমীক্ষার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে তা আজও আকর গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। সেই বইয়ের চতুর্থ খণ্ডে মুণ্ডা ও দ্রাভিদিয় ভাষাসমূহ আলোচনাকালে তিনি বললেন যে তাঁর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভূমিজ মানুষরা যে এলাকায় থাকেন সেই এলাকার মুণ্ডাপরিবারভুক্ত ভাষাতেই কথা বলেন, তাই তাদের কোনো আলাদা উপভাষার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ মেলেনি। গ্রিয়ার্সনের মতে:

> স্পষ্টত এর কারণ এটাই যে ভূমিজ একটি উপজাতির নাম, তা কোনো উপভাষার নাম নয়।[২]

ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরও দীর্ঘদিন ভূমিজ ভাষার স্বীকৃতিহীনতার পরিস্থিতির খুব পরিবর্তন হয়নি। একদিকে যেমন ভূমিজ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান অংশের ভাষাসরণ ঘটেছে—বাংলার ভূমিজরা বাংলাভাষী হয়ে উঠেছে, ওড়িশার ভূমিজদের অংশ ওড়িয়াভাষী হয়ে উঠেছে, বিহার (পরবর্তী কালে ঝাড়খণ্ড)-এর ভূমিজরা অনেকে হিন্দিভাষী হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই ভূমিজ ভাষা তার অস্তিত্বের স্বতন্ত্র স্বীকৃতিটুকুও পায়নি। ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন ও রাজ্য পুনর্গঠন হয়েছে, কিন্তু জাতীয় বা আঞ্চলিক গুরুত্ব নিয়ে উঠে আসা সেইসব প্রধান ভাষার সিংহদরবারের অনেক দূরে স্বীকৃতিহীনতার উপেক্ষিত বঞ্চিত অন্ধকারে আরো অনেক আদিবাসীদের ভাষার সঙ্গে ভূমিজ ভাষাও কালাতিপাত করেছে।

১৯৫৯ সালে দুজন ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ আর সি নিগম ও ডি দাশগুপ্ত প্রথম ভূমিজদের কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করে একটি সমাজভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান। তাদের অনুসন্ধানের ফল ১৯৬৪ সালে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের মুখপত্রে ছাপা হয়েছিল (আর সি নিগম ও ডি দাশগুপ্ত, মুণ্ডারি অ্যান্ড দি স্পিচ অফ দি ভূমিজ—এ স্টাডি ইন বাইলিঙ্গুয়ালিজম, *বুলেটিন অফ দি অ্যানথ্রোপোলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া*, ৮, নং. ৩-৪, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৬৪, পৃ. ১৬৪-১৯৮)। এইখানে তারা ভূমিজদের কথ্যভাষার ভাষিক স্বাস্থ্য (অর্থাৎ, আন্তর্প্রজন্ম

ভাষাপ্রবাহ সবল নাকি ক্ষয়িষ্ণু, ভাষার ব্যবহারক্ষেত্র সঙ্কোচমান কি না, আঞ্চলিক প্রভাবশালী ভাষার বাচকতা কতটা ও তার প্রভাব কী, ইত্যাদি) বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। দুই মাস জুড়ে রাঁচি জেলার বুণ্ডু, পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ও সিংভূম জেলার ইছাগড়ে করা ক্ষেত্রসমীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী অন্য ভাষাসংস্কৃতির চাপে ভূমিজ জনজাতির ভাষা ও সংস্কৃতি উভয়ই এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে ক্রমশ ক্ষয়গ্রস্ত হতে হতে চলেছে; বিশেষ করে বাংলা ভাষায় সরণ বিপুলভাবে ঘটে চলেছে। রাঁচি জেলার বুণ্ডুতে তাঁরা সবচেয়ে অবিকৃত অবস্থায় ভূমিজদের কথ্যভাষাকে পেয়েছিলেন, সেখানে সেই ভাষা 'ভূমিজ থর' নামে পরিচিত, তার সামাজিক ব্যবহারও সবচেয়ে বিস্তৃত। উল্টোদিকে পুরুলিয়া জেলার বলরামপুরে ভূমিজদের প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষায় ভাষা-সরণ ঘটে গেছে, ভূমিজ ভাষা ভুলে গেছেন তারা, ভূমিজ সংস্কৃতিও লুপ্তপ্রায়। এই দুইয়ের মাঝখানে সিংভূমের ইছাগড়। এখানে ঘরের মধ্যে বা নিজ জনজাতির মানুষদের মধ্যে ভূমিজরা ভূমিজ ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে তারা 'মানভূমি বাংলা' বলে পরিচিত বাংলা ভাষার একটি রূপকে ব্যবহার করেন। ঘরের বাইরে বা নিজ জনজাতির লোকজনের বাইরে ভূমিজ থরে কথা বলতে হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয়ে তাঁরা কুণ্ঠিত বা লজ্জিত বোধ করেন। ভূমিজ বাচ্চারা স্কুলেও শিক্ষক ও অন্য ছাত্রদের বিদ্রূপের শিকার হওয়ার ভয়ে নিজেদের ভাষায় কথা বলে না। এখানকার 'ভূমিজ থর'-ও অন্য ভাষার (বিশেষত বাংলা ও ওড়িয়ার) সঙ্গে মিশ্রণে ক্রমশ সঙ্কর রূপ ধারণ করছে। ফলে নিগম ও দাশগুপ্তের অনুসন্ধান ভূমিজ ভাষার সংকটগ্রস্ত অবস্থার নিদর্শন তুলে ধরেছিল।

১৯৯০-এর দশকে এসে প্রথম ভূমিজ ভাষা নিয়ে কোনো বিশদ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা প্রকাশিত হয়। ভারতের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজেস (সিআইআইএল)-এর 'গ্রামার সিরিজ'-এর অন্তর্গত ১৮তম পুস্তিকা হিসেবে ১৯৯২ সালে একটি প্রায় ২০০ পাতার 'ভূমিজ গ্রামার' প্রকাশ পায়। বইটির লেখক এন রামস্বামী। বইটি রচনার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ তিনি করেছেন ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে। বইটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় লিখেছেন:

> ভারতে আদিবাসী জনজাতির মানুষরা দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে বাস করেছে, আর এই বিচ্ছিন্নতার ব্যতিক্রম ঘটলেই তারা শোষণের বলি হয়েছে। দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশে তারা নিজেদের মঙ্গলার্থে অংশ নিতে পারেনি। এই বিচ্ছিন্নতা ভেঙে বেরিয়ে আসতে তাদের চারপাশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের ভাষা তাদের শেখা প্রয়োজন, তাদের মধ্যে অনেকে তা শিখেছেও। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে পারস্পরিক জ্ঞাপনের ফাঁকের উপর কেবল এক দিক থেকেই সেতুবন্ধনের প্রচেষ্টা হচ্ছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ জনজাতির ঘাড়েই সেতুবন্ধনের সমস্ত ভার গিয়ে পড়ছে। অথচ দরকারি হল পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সুসম্পর্ক তৈরি করা এবং আদিবাসী জনজাতির মানুষদের সঙ্গে এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের উভমুখী জ্ঞাপন বাড়ানো। সেই জন্য এই জনজাতিদের ভাষা শিখতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠজনেদের, বিশেষত তাদের যারা জনপ্রশাসন, আইন-নিরাপত্তা, সমাজসেবা, বেচাকেনা ইত্যাদির প্রয়োজনে সেই জনজাতির সংস্পর্শে আসে। ধ্বনিগত পাঠ, দ্বি-বা ত্রি-ভাষিক অভিধান এবং শিক্ষাদানসূত্র সম্বলিত এই ব্যাকরণ তৈরি করা হয়েছে তেমন সংখ্যাগরিষ্ঠজনেদের এই আদিবাসী জনজাতির ভাষা শেখায় সাহায্য করার জন্য।[৩]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে রামস্বামী ভারতের সমাজকে দুটো বর্গে ভাগ করে দেখছেন—একটি বর্গ হল আদিবাসী জনজাতিভুক্ত মানুষজন ও অপর বর্গ হল তাদের ঘিরে থাকা 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' অন্যান্য মানুষ। এখানে এই দ্বিতীয় বর্গকে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ'-দের বর্গ বলা কি সমীচীন হচ্ছে? আদিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যায় তারাই বেশি, যেমন ঝাড়খণ্ড, আসাম, অরুণাচলপ্রদেশের কথা ধরা যেতে পারে, কিন্তু তাতে দেশের সমাজ-অর্থনৈতিক বিকাশের মূলধারা থেকে যে বিচ্ছিন্নতা নতুবা শোষণমূলক সংযুক্তির কথা রামস্বামী বলেছেন তার ব্যত্যয় ঘটে না। দ্বিতীয় বর্গ আসলে দেশের সমাজ-অর্থনৈতিক বিকাশের মূলধারা বা আধিপত্য বিস্তারকারী ধারার সঙ্গে ঘনসম্পৃক্ত, বা বলা চলে তাদের সক্রিয়তার উপর ভর করে এই মূলধারা প্রবাহিত হচ্ছে—যে কারণে রামস্বামী তাদের সম্ভাব্য সক্রিয়তার ক্ষেত্র হিসেবে 'জনপ্রশাসন, আইন-নিরাপত্তা, সমাজসেবা, বেচাকেনা ইত্যাদি'-কে চিহ্নিত করেছেন।

ফলে এই দ্বিতীয় বর্গকে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠের’ বর্গ না বলে ‘ক্ষমতাগরিষ্ঠের’ বর্গ বলাই সমীচীন। প্রথম বর্গ অর্থাৎ আদিবাসী জনজাতিদের যে ‘বিচ্ছিন্নতা’-র কথা রামস্বামী বলেছেন, তা এই ক্ষমতাগরিষ্ঠের বিকাশপ্রক্রিয়ার মূলধারার সঙ্গে বিরোধ বা অন্যধারাগামী হওয়ারই ফল। আদিবাসী জনজাতিদের পাহাড়-জঙ্গল-নদী-গ্রাম কেন্দ্রিক জীবনাচরণ ও জীবনভাবনাকে ‘অসভ্য’ ‘পশ্চাৎপদ’ বলে অবমূল্যায়িত করে ও অতঃপর ধ্বংস করে শহর-বাজার-খনি-বাঁধ-কারখানার ‘মূলধারা বিকাশ’ দিয়ে প্রতিস্থাপনা করাই ক্ষমতাগরিষ্ঠদের অভীষ্ট। প্রথম বর্গ অর্থাৎ আদিবাসী জনজাতির ‘বিচ্ছিন্নতা’ ঘুচলে তাই তাদের মঙ্গল হয় না, বরং ভাষা-সংস্কৃতি হারিয়ে বাসভূমির উপর অধিকার হারিয়ে দুঃস্থতর জীবনে অধঃপতিত হতে হয়। এই ক্ষমতাপার্থক্যের প্রভাব একে অপরের ভাষা শেখার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। প্রথম বর্গ দ্বিতীয় বর্গের ভাষা আয়ত্ত করে উন্নতির পাথেয় হিসেবে, ক্রমশ সেই ভাষারই বাচক হয়ে ওঠে, নিজের ভাষা ত্যাগ করে। আর দ্বিতীয় বর্গ যদি বা কখনো প্রথম বর্গের ভাষা কিছুটা শেখে, তা শেখে সাময়িকভাবে প্রশাসন চালানো বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু সুবিধের জন্য। রামস্বামীও তাই দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে যারা ‘জনপ্রশাসন, আইন-নিরাপত্তা, সমাজসেবা, বেচাকেনা ইত্যাদির প্রয়োজনে সেই জনজাতির সংস্পর্শে আসে’ তাদেরকেই তার ভূমিজ ভাষা শেখার বইয়ের ব্যবহারকারী রূপে ভেবেছেন। এই ব্যবহারকারীরা কেউ ভূমিজ ভাষা শেখার মধ্য দিয়ে ভূমিজ সংস্কৃতি, লোকজ্ঞান, আত্মিক ও প্রাকৃতিক চিন্তাকে জানতে আগ্রহী হবেন না, তারা কেবল তাদের ‘উন্নত’ অবস্থান থেকে শাসন চালাতে, বেচাকেনা চালাতে বা ‘অনুন্নত’-দের উন্নতির মূলধারায় তুলে আনতে সাময়িক হাতিয়ার হিসেবে ওই ভাষাকে ব্যবহার করবেন। তাই মনে হয় রামস্বামী ভূমিজ ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন ভাষাটির বা ভাষার বাচকদের কোনো প্রয়োজন মেটানোর জায়গা থেকে নয়, ক্ষমতাগরিষ্ঠ প্রশাসকদের প্রয়োজন মেটানোর জায়গা থেকে।

রামস্বামী ভূমিজ ভাষা সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় গিয়ে তিনজন ভূমিজ বাচকের সঙ্গে কথা বলে। এই তিনজন ভূমিজ বাচক হলেন কার্তিক সিং, সাহেব রাম সিং ও হরিশচন্দ্র সিং। এঁরা তাঁদের মাতৃভাষা ভূমিজ ছাড়াও ওড়িয়া

ও ইংরেজি ভাষা জানতেন। কার্তিক সিং সংস্কৃত ভাষাও জানতেন।তাদের সঙ্গে কথা বলে রামস্বামী সিদ্ধান্ত টেনেছেন। দেখা যাক ভূমিজ ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, অর্থাৎ, ভূমিজ কি একটি স্বতন্ত্র ভাষা না কি তা মুণ্ডারি ভাষারই একটি উপভাষা তা নিয়ে তিনি কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভূমিজ ভাষার সঙ্গে মুণ্ডারি ভাষার যে পার্থক্যগুলো রামস্বামী চিহ্নিত করেছেন, সেগুলো এইরকমঃ

১। ভূমিজ ও মুণ্ডারির ধ্বনিগত কাঠামো আলাদা, যেমন : ক) মুণ্ডারিতে কণ্ঠনালীয় স্বরধ্বনি আছে, ভূমিজে তা নেই; খ) ভূমিজে নিম্ন পশ্চাৎ বর্তুল স্বরধ্বনি আছে, মুণ্ডারিতে তা নেই; গ) ভূমিজে আনুনাসিক স্বরধ্বনি স্বনিম আছে, যা মুণ্ডারিতে নেই; ঘ) ভূমিজে মহাপ্রাণিত স্পর্শধ্বনি এবং ঘৃষ্টধ্বনি আছে, যা মুণ্ডারিতে নেই; ঙ) আবার মুণ্ডারিতে কণ্ঠনালীয় উষ্মধ্বনি আছে যা ভূমিজে নেই।

২। ভূমিজে বিশেষ্যপদে বচন / সংখ্যা-চিহ্নক বাধ্যতামূলক, কিন্তু মুণ্ডারিতে তা নয়।

৩। ভূমিজ ও মুণ্ডারিতে সংখ্যাশব্দ ১ থেকে ৬ অবধি এক, তারপর সম্পূর্ণ আলাদা।

৪। মুণ্ডারিতে 'ইরি' এবং 'রিকো' দুটি প্রযোজক প্রত্যয় হিসেবে কাজ করে, কিন্তু ভূমিজে তেমন কোনো প্রযোজক প্রত্যয় নেই।

৫। সকর্মক ক্রিয়ায় অতীত কালচিহ্ন হিসেবে ভূমিজে 'ল্' ও 'ক্' ব্যবহৃত হয়, যা মুণ্ডারিতে হয় না।

৬। ভূমিজে ভবিষ্যৎ কালচিহ্ন হিসেবে 'গা' এবং 'ই' ব্যবহৃত হয়, যা মুণ্ডারিতে নেই।

৭। ভূমিজে এমন বেশ কিছু প্রকার বিভক্তি ব্যবহৃত হয় যা মুণ্ডারিতে নেই।

৮। শব্দভাণ্ডারগতভাবেও ভূমিজ ও মুণ্ডারির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে।

ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও শব্দভাণ্ডারের দিক থেকে এতসব পার্থক্য চিহ্নিত করার পর ভূমিজ ও মুণ্ডারি আলাদা ভাষা কি না তা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত হতে পারে? রামস্বামীর সিদ্ধান্ত হলঃ

> . . . এবংবিধ ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য সত্ত্বেও ভূমিজ যেহেতু মুণ্ডারির একটি উপভাষা হিসেবেই সামাজিকভাবে গণ্য হয়ে থাকে, তাই ভূমিজকে একটি উপভাষা হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে।[৪]

সুতরাং, ভূমিজ ভাষার গঠনগত স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিলেও ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত সমাজে চালু মতের দোহাই দিয়ে ভূমিজ ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিলেন না। ভাষা যেভাবে জনগোষ্ঠীর সাপেক্ষে ও ভৌগোলিক অঞ্চলের সাপেক্ষে বদলাতে বদলাতে যায়, তার মধ্যে কোন ভাষারূপটিকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে গণ্য করা হবে, তার অবশ্য কোনো পণ্ডিতি মাপ হতে পারে না, তা নির্ভর করে সেই ভাষারূপের বাচকরা তাদের ভাষার স্বতন্ত্র পরিচয় দাবি করছেন কি না তার উপর। এই স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবি সামাজিক-রাজনৈতিক নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি বাচকগোষ্ঠীর তার ভাষার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি চাওয়ার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠীগত জনজীবনে নানা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটানোর আকাঙ্ক্ষাও জড়িয়ে থাকে। বিচারটা তাই কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিচার নয়, বরং একটি সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক বিচার। রামস্বামী সেই বিচার করেননি। রামস্বামীর আলোচনা থেকে ভূমিজভাষীদের নিজ ভাষা সম্পর্কে মনোভাব এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হল না। ভূমিজকে মুণ্ডারির উপভাষা হিসেবে গণ্য করার যে কথা তিনি বলেছেন, তা করে কারা? ভূমিজভাষীরা নিজেরাই, না কি ক্ষমতাগরিষ্ঠ অ-ভূমিজরা?

অবশ্য ভাষা স্বতন্ত্র কিনা তা কোনো গবেষণাপত্রে ঠিক হয় না, তা ঠিক হয় সেই ভাষার বাচক জনজাতির বাস্তব জীবন ও সংগ্রামের মধ্য থেকে। সেই বাস্তব জীবন ও সংগ্রামের হদিস যদি কোনো পণ্ডিতি গবেষণাপত্র না নেয়, তাতে জীবন ও সংগ্রামের খুব কিছু ক্ষতি নেই, গবেষণাপত্রটিই জীবনবিচ্ছিন্ন মহাফেজখানার ধূসর অন্ধকারে আত্মনির্বাসন বেছে নেয়।

অতঃপর ১৯৯৬ সালে ঝাড়খণ্ড (তৎকালীন বিহারের অংশ), ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমিজ জনজাতির মানুষদের উপর একটি সমাজভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংগঠিত হয়। এর পৃষ্ঠপোষণা করেছিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন' (আইএলসিসিসি) নামক একটি বেসরকারি সংস্থা এবং নিরীক্ষাটির প্রতিবেদন ২০১৫ সালে 'সামার ইনস্টিটিউট অফ

লিঙ্গুয়িস্টিকস ইন্টারন্যাশনাল' (এসআইএল) কর্তৃক পুস্তকাকারে (*এ সোশিয়োলিজুয়িস্টিক সার্ভে অফ দি ভূমিজ পিপল অফ ইন্ডিয়া*) প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির ভূমিকায় লেখা হয়েছে যে ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্যের বিকাশ ঘটানো এবং সাক্ষরতার বৃদ্ধি ঘটানোই হল আইএলসিসিসি-র প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ভূমিজ ভাষায় এই ধরনের কাজ করা সম্ভবপর কি না তা নির্ধারণ করার জন্যই এই সমীক্ষাটির আয়োজন। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর অবধি সময়কালে মূলত সিংভূম জেলা ও ময়ূরভঞ্জ জেলায় এই নিরীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলে। ভূমিজ জনজাতির মধ্যে ভূমিজ ভাষা ব্যবহারের কী চিত্র তাদের সমীক্ষায় উঠে এসেছিল দেখা যাক।

ঝাড়খণ্ড (তদানীন্তন বিহার)-এর সিংভূম জেলায় ওড়িশা সীমান্তের কাছে যে তিনটি গ্রামে তারা উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন, সেই তিনটি গ্রামেই ভূমিজদের ঘরে পরিবারের মধ্যে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, গ্রামে সভাসমিতির আলোচনায়, নাচের গানে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একমাত্র ভূমিজ ভাষাই ব্যবহৃত হয়, শিশুরাও ভূমিজকেই তাদের প্রথম ভাষা হিসেবে শিখে বড় হচ্ছে। বিশেষ করে হেসেলদিপা গ্রামের ভূমিজরা নিজেদের ভাষা নিয়ে অতি যত্নবান। হেসেলদিপার মোড়ল সমীক্ষকদের বলেছিলেন : 'আমরা আমাদের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। সেজন্য আমরা এই কাছেই একটি সাংস্কৃতিক দপ্তর তৈরি করেছি এবং সেই জন্যই আমরা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীদের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করি না।' কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের কাছে নিমডিহ গ্রামে (যা নিগম ও দাশগুপ্তের ১৯৫৯ সালের উপাত্ত-সংগ্রহস্থল ইছাগড়ের কাছে) পরিস্থিতি পুরো আলাদা। বাংলাই এখানে ভূমিজদেরও মুখের ভাষা। শিশুরা বাংলাই শিখছে মাতৃভাষা হিসেবে, স্কুলে বাংলা মাধ্যমে পড়ছে।

ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার দক্ষিণপূর্বদিকে দিঘিনুয়াসাহি গ্রামে ভূমিজ ভাষার উপস্থিতি খুব জোরালো : গ্রামে ঘরেবাইরে কথাবার্তায়, সভাসমিতিতে, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভূমিজ ভাষাই ব্যবহৃত হয়, শিশুরা ভূমিজ শেখে মাতৃভাষা হিসেবে। কিন্তু এই জেলারই উত্তরদিকে রায়রঙপুরের কাছে একটি গ্রামের এক ভূমিজ সমীক্ষকদের বলেছেন যে তিনি বাড়িতে পরিবারের মধ্যে

ওড়িয়া ভাষাতে কথা বলেন এবং গ্রামেও সর্বত্র অন্য ভূমিজরাও ওড়িয়া ভাষাই ব্যবহার করে—যদিও এই ওড়িয়া শুদ্ধ ওড়িয়া নয়, তা ওড়িয়ার একটি আঞ্চলিক অশুদ্ধ রূপ। এমনকি ওই গ্রামে অনেক ভূমিজ নিজেদের ভূমিজ পদবি বিসর্জন দিয়ে ওড়িয়া জাত-পদবি 'নায়ক' গ্রহণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিজদের নিজ ভাষা ভুলে বাংলা ভাষায় সরণ প্রায় সর্বাত্মক। কিন্তু মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ীতে সমীক্ষকরা একজন ভূমিজ স্কুলশিক্ষকের সাক্ষাৎ পান, যিনি তাদের এক বিপরীত-পথ-যাত্রার কথা বলেছিলেন। এই স্কুলশিক্ষক যখন মেদিনীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন, তখন আরও নয়জন ভূমিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের সঙ্গে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে সাঁওতালিরা যেমন নিজেদের ভাষাকে রক্ষা করছে, তারাও তেমনই নিজেদের ভূমিজ ভাষাকে রক্ষা করবেন। তাই তারা ১৯৮৯ সালে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ২,৫০০ টাকা খরচ করে বাংলা হরফে ভূমিজ ভাষার একটি পুস্তিকা ছাপেন। সেই পুস্তিকা নিয়ে ভূমিজদের নানা গ্রামে তারা সভা করেন ভূমিজ ভাষা ব্যবহার ও ভূমিজে সাক্ষরতা উৎসাহিত করার জন্য। তাদের সেই উদ্যোগ অবশ্য সফল হয়নি কারণ সবাই বলেছিল যে ওই বই তারা ঠিক পড়তে পারছে না। ওই শিক্ষক আরো বলেছিলেন যে তিনি নিজে ঘরে ভূমিজে কথা বলেন, কিন্তু তার বউ যেহেতু ভালো ভূমিজ বলতে পারে না, তাদের সন্তান ঘরে বাংলা শিখে-বলেই বড় হচ্ছে।

ভাষা সরণ ও ভাষাব্যবহার-সংকোচনের পরিস্থিতিতে একটি ভাষার টিকে থাকা বা জীবনীশক্তি নির্ভর করে যে সমস্ত বিষয়ের উপর, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সেই ভাষার বাচকদের নিজেদের ভাষার প্রতি মনোভাব। এই মনোভাবকে সদর্থক বলা যায় যদি বাচকরা ভাষাটির সঙ্গে আবেগের বন্ধন অনুভব করে, নিজের ভাষা নিয়ে গর্বিত হয়, ভাষিক পরিচয়কে নিজেদের পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে এবং তাই সমস্ত প্রতিকূলতার মুখেও নিজেদের ভাষা ব্যবহারে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে নিজ ভাষার প্রতি মনোভাবকে নঙর্থক বলা যায় যখন বাচকরা সেই ভাষাকে হীন, ইতর বা মানহীন মনে করে সেই ভাষা সর্বসমক্ষে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় বা ব্যবহার করা এড়িয়ে যায় এবং অন্য কোনো ভাষা রপ্ত করতে চায়। আইএলসিসিসি-র সমীক্ষার সমীক্ষকরা ভূমিজদের মধ্যে নিজ ভাষার প্রতি কী মনোভাব চিহ্নিত করেছিলেন

দেখা যাক। এস আই এল দ্বারা প্রকাশিত সমীক্ষা-প্রতিবেদনে লেখকদ্বয় ট্রয় বেইলি ও লোরেন ম্যাগার্ড লিখেছেন:

> ভাষার জীবনীশক্তির বাকি সব সূচক অনুকূল বলে না মনে হলেও (যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বড় অঞ্চলে সর্বাত্মকভাবে ও ওড়িশায় অংশত ভাষা-সরণ ঘটে যাওয়া ও এখনও ঘটতে থাকা), ভূমিজদের যখন তাদের মাতৃভাষার মূল্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, তখন সাধারণভাবে তারা সদর্থক উত্তর দিয়েছেন। (মাতৃভাষার সংরক্ষণকে তারা কতটা মূল্য দেন তার প্রকৃত বিচার অবশ্য তাদের ভাষা-ব্যবহার থেকেই হতে পারে।) এই সদর্থক মনোভাব দেখা গেছে যখন তারা সমীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রে থাকা সেইসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে প্রশ্নগুলোতে ভাষার শুদ্ধতা বা ঘরে পরিবারের মধ্যে ভূমিজ ভাষা ব্যবহারের বাঞ্ছনীয়তা বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমাদের সমীক্ষকদল যে যে ভূমিজভাষী অঞ্চলে সমীক্ষা করেছে, তার কোনোখানেই মাতৃভাষার প্রতি নঙর্থক মনোভাব খুঁজে পায়নি। মাতৃভাষার জীবনীশক্তির সদর্থক সূচক হিসেবে আরো তিনটি মনোভঙ্গীগত বিষয়কে দেখা যেতে পারে: ১) যে সাতটি জায়গায় সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, সর্বত্রই সবাই বলেছেন যে অন্য ভাষা যাদের মাতৃভাষা এমন কারো সঙ্গে তাঁরা নিজেদের সন্তানদের বিবাহ দেবেন না, ২) সমস্ত ভূমিজভাষী মানুষজনই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে হিন্দি বা ওড়িয়ার চেয়ে ভূমিজ অনেক ভালো ভাষা, আর, ৩) বেশিরভাগজনই বলেছেন যে ভূমিজভাষীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলাকালীন কোনো ওড়িয়াভাষী (বা হিন্দিভাষী বা বাংলাভাষী) এসে যোগ দিলে তাঁরা তাঁদের কথাবার্তাকে সেই নবাগতের ভাষায় সরিয়ে আনবেন না।[৫]

ভাষার প্রতি এই সদর্থক মনোভাব কতটা দৃঢ়? লিখনপ্রক্রিয়ার বিকাশ ও লিখিত নথি-বইপত্র প্রকাশ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা কি তাদের ভাষার ব্যবহারক্ষেত্র প্রসারে উৎসাহী, নাকি সেই ক্ষেত্রে অন্য ভাষার প্রচল মেনে নিয়েই তারা চলতে চান? সমীক্ষা-প্রতিবেদনের লেখকরা লিখেছেন:

> ভাষা-বিকাশের বাস্তব সম্ভাবনা সম্পর্কে ভূমিজ মানুষদের মতামত জানা ছিল এই অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেমন ধরা যাক, আমাদের জানার ছিল যে ভূমিজদের মাতৃভাষায় লিখিত পাঠবস্তু ভালোভাবে গৃহীত

> হবে, না কি অন্য কোনো ভাষারূপে এইসব পাঠবস্তু করলে তা আরো উপযোগী হবে। এমন পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে কোনো জনগোষ্ঠী মনে করতে পারে যে লেখাজোখার জন্য তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়, বিশেষত যদি ধর্মীয় কোনো নির্ধারণ থাকে যে কোনো বিশেষ ভাষাই লিখনের জন্য অন্য সমস্ত ভাষার চেয়ে বেশি উপযোগী। ভাষা বিকাশের কোনো প্রকল্প শুরু করার আগে এই বিষয়ে মনোভঙ্গী জেনে নেওয়া খুব জরুরী। আমাদের সমীক্ষকদল যে ভূমিজ মানুষদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়েছে, কোথাওই লিখনে ভূমিজ ভাষা ব্যবহার নিয়ে তেমন কোনো নঙর্থক মনোভঙ্গী খুঁজে পায়নি। বেশির ভাগ মানুষই ভূমিজ ভাষায় সাক্ষরতা কর্মসূচীতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মুণ্ডারি ভাষায় পাঠবস্তু সম্পর্কে প্রশ্নে অনেকে বলেছেন যে হাতে পেলে পড়বেন কিন্তু তা নিয়ে খুব আগ্রহ থাকবে না, কেউ কেউ বলেছেন যে তা তারা খুব ভালোভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন না।[৬]

সুতরাং, ১৯৯৬ সালে করা এই সমীক্ষা থেকে সামগ্রিক যে ছবিটা উঠে আসে, তাতে আমরা দেখতে পাই যে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার কিছু গ্রামে ভূমিজ ভাষা ভূমিজ জনজাতির কথ্যভাষা হিসেবে সবল অস্তিত্ব ধারণ করছে, কিন্তু বাকি অঞ্চলে ভাষা-সরণ ও ভাষা-ব্যবহার-সংকোচনের মধ্য দিয়ে ভূমিজ ভাষা ভূমিজ মানুষদের মুখ থেকে সরে যাচ্ছে। আবার আমরা এটাও দেখি যে ভূমিজভাষীরা সাধারণভাবে তাদের মাতৃভাষার প্রতি সদর্থক মনোভঙ্গী পোষণ করেন এবং নিজেদের ভাষায় লিখনপ্রক্রিয়া, সাক্ষরতা কর্মসূচী ও পাঠবস্তু তৈরিতে আগ্রহী। সুতরাং ভাষাবাচকদের সদর্থক মনোভাবের জোরে সংকটের মুখে থাকা একটি ভাষার জীবনীশক্তিকে সঞ্জীবিত করার জন্য ভূমিজ ভাষায় লিখন ও সাক্ষরতা বিকাশের উদ্যোগ তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বাস্তবোচিত হওয়া উচিত। অথচ অবাক কাণ্ড যে সমীক্ষা থেকে ঠিক এর উল্টো সিদ্ধান্তই টানা হয়েছে। সমীক্ষাপ্রতিবেদনে সেই সিদ্ধান্ত লেখা হয়েছে এইভাবে:

> এই সমাজভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে লেখকরা যে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে তা এই যে ভূমিজের জন্য নতুন পৃথক ভাষা বিকাশ প্রকল্পের কোনো প্রয়োজন নেই।... সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে

> বর্তমান গবেষকদের মনে হয়েছে যে একটি পৃথক ভাষা বিকাশ প্রকল্প—যদি তা অভিযোজনও হয়—তা তাৎপর্যহীন ভাষিক পার্থক্যকে সংহত করে তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে। তাছাড়া তা দুটো জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবাঞ্ছিত পার্থক্যবোধের জন্ম দিতে পারে। ভূমিজ ও মুণ্ডারিদের মধ্যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটা পরিমাণ পার্থক্য মেনে নিয়েও বর্তমান গবেষকরা মনে করে যে মুণ্ডারি ও ভূমিজ কথ্যভাষার মধ্যে তেমন কিছু স্পষ্ট পার্থক্য নেই। হতে পারে যে ভূমিজ কথ্যভাষার কোনো পৃথক মান্য রূপ নেই, এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিজদের কথ্যভাষার বিভিন্ন রূপগুলি আসলে মুণ্ডারি ভাষারই বিভিন্ন চেহারা। তাছাড়া, ভূমিজদের মধ্যে মুণ্ডারি মানুষজন বা মুণ্ডারি ভাষা সম্পর্কে এমন কোনো নঙর্থক মনোভঙ্গী খুঁজে পাওয়া যায়নি যা মুণ্ডারি ভাষায় তৈরি পাঠবস্তু গ্রহণ করার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে।[৭]

ওজনদার বিদ্যায়তনিক পরিভাষা ব্যবহার করে এমন যুক্তি ও সিদ্ধান্ত এখানে গবেষকরা হাজির করলেন যা তাঁদের গবেষণালব্ধ উপাত্তের সঙ্গেই বেমানান। ভূমিজদের সঙ্গে মুণ্ডারিদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়গত পার্থক্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েও তাঁরা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের দোহাই টেনে হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন পার্থক্য তাৎপর্যময় হয়ে ওঠা নাকি খারাপ বা অবাঞ্ছিত! আর নিজেদের এই অধ্যাত্মীয় মূল্যবোধকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভূমিজভাষীদের নিজ ভাষায় লিখনপ্রক্রিয়া বিকাশের চাহিদাকে নস্যাৎ করে দিয়ে লিখনপ্রক্রিয়ায় মুণ্ডারিকেই তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার রায় দিলেন! ভূমিজ ভাষার সঙ্গে মুণ্ডারি ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত পার্থক্যগুলো হঠাৎই বিস্মরিত হয়ে ভূমিজ কথ্যভাষার বিভিন্ন রূপকে মুণ্ডারি ভাষারই বিভিন্ন চেহারা বলে দিলেন! ভূমিজভাষীরাও যে অধিকাংশ তাদের ভাষাকে মুণ্ডারির থেকে পৃথক বলে মনে করেন, তাও তাদের কাছে কোনো গুরুত্ব পেল না! ভাষা বিকাশ সংক্রান্ত গবেষণা করার নামে ভূমিজ ভাষা বিকাশকে অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করার এ কেমন প্রহসন? এহেন জ্ঞানচর্চা ভাষাবৈচিত্র্যকেই আপদ রূপে দাঁড় করিয়ে অসংখ্য ভাষাকে মুছে ফেলে গুটিকয় মান্য ভাষার আধিপত্যের অধীনে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত সমরূপতা তৈরি করতে চায়!

ফলে আধিপত্যবাদী ধারা বা মূলধারার গবেষক-জ্ঞানচর্চক-নীতিনির্ধারকদের তরফ থেকে ভূমিজ ভাষা বিকাশের উদ্যোগে উৎসাহ-সহায়তা কখনও খুব মেলেনি। ভূমিজভাষীদের নিজেদের স্বকীয় উদ্যোগের উপরেই ভূমিজ ভাষার পুনরুজ্জীবন-সম্ভাবনা নির্ভর করেছে। সেই স্বকীয় উদ্যোগ যেভাবে গত তিরিশ বছরে ডালপালা মেলেছে, তার ফলই আমরা ঠাকুরানপাহাড়িতে দেখেছি। ভূমিজভাষীদের এই স্বতস্ফূর্ত উদ্যোগস্ফুরণের উপর এবার তাহলে মনোনিবেশ করা যাক।

প্রথমে দেখা যাক ভূমিজ জনজাতির ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং ভূমিজ জনজাতির মধ্যে ভূমিজ ভাষার অস্তিত্বের বিস্তৃতি।

ভূমিজ জনজাতির মানুষরা ঘনসংবদ্ধভাবে ছড়িয়ে আছেন ভারতের তিনটি রাজ্যে—ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও অসমে ও ভারতের বাইরে বাংলাদেশে কিছু ভূমিজ থাকেন, যদিও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকার মধ্য দিয়ে তারা ভূমিজ ভাষা ও সংস্কৃতি খুইয়ে বসেছেন। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে ভূমিজ জনসংখ্যার বিন্যাস এইরকম:

রাজ্য	**রাজ্যের** কোন কোন জেলায়	**ভূমিজ জনসংখ্যা** ১৯৮১ জনগণনা অনুযায়ী	২০১৭ জনগণনা অনুযায়ী
ঝাড়খণ্ড	রাঁচি, পশ্চিম সিংভূম, পূর্ব সিংভূম	১,৩৬,১০৯	২,০৯,৪৪৮
ওড়িশা	ময়ূরভঞ্জ, বালাসোর, কেওনঝড়, সুন্দরগড়	১,৫৭,৬১৪	২,৮৩,৯০৯
পশ্চিমবঙ্গ	ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২,৩৩,৯০৬	৩,৭৬,২৯৬

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিজ জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, কিন্তু এখানে ভাষা-সরণও সবচেয়ে বেশি, বেশিরভাগ ভূমিজই কয়েক প্রজন্ম ধরে ভূমিজ ভাষা ভুলে বাংলাভাষী হয়ে উঠেছে। ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে তুলনায় কম হলেও ভাষা সরণ ঘটে চলেছে—ওড়িশায় ওড়িয়া ভাষায় এবং ঝাড়খণ্ডে হিন্দি ভাষায়। কত ভূমিজ মানুষ তাহলে

উৎস : ট্রয় বেইলি ও লোরেন ম্যাগার্ড, এ সোশিয়োলিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ দি ভূমিজ পিপল অফ ইন্ডিয়া, এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫।

এখনও নিজের ভাষায় কথা বলছে? ১৯৯৬ সালে আইএলসিসিসি-র পৃষ্ঠপোষণায় যে সমীক্ষার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি, তার প্রতিবেদনে সমীক্ষকরা ভূমিজ জনসংখ্যার কত শতাংশ ভূমিজ ভাষায় এখন কথা বলে তার একটা আনুমানিক হিসাব দিয়েছিলেন।[৮] হিসাবটা এইরকম:

রাজ্য	ভূমিজ জনজাতির কত শতাংশ ভূমিজ ভাষা প্রাথমিক জ্ঞাপনমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন
ঝাড়খণ্ড	৮০-৯০ শতাংশ
ওড়িশা	৭৫-৮০ শতাংশ
পশ্চিমবঙ্গ	১৫- ২৫ শতাংশ

কাজ চালানোর জন্য আপাতত উপরোক্ত অনুমানকে যদি আমরা ধরে নিই, তাহলে ২০১৭ সালের জনগণনা হিসাব অনুযায়ী চার থেকে পাঁচ লাখ ভূমিজ বাচক ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে এখনও আছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এই ভূমিজ বাচকরা নিজেদের মাতৃভাষার ব্যবহার বিস্তারের জন্য কী উদ্যোগ নিচ্ছেন, তার উপরই নির্ভর করছে ভাষা-সরণের মধ্য দিয়ে ভূমিজ বাচকসংখ্যার ক্ষয় কতটা আটকানো যাবে এবং ভূমিজ ভাষা ভুলে বসা ভূমিজ মানুষদের আবার ভূমিজ ভাষাবাচকতায় কতটা ফিরিয়ে আনা যাবে।

ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার যে ভূমিজ গ্রামগুলোয় ভূমিজ ভাষার ব্যবহারক্ষেত্র ঘরে-বাইরে বিস্তৃত এবং সবল, ভাষাব্যবহার বিস্তারের উদ্যোগ সেখান থেকেই অঙ্কুরিত হয়েছে। ময়ূরভঞ্জ জেলার মহাদেবডিহি গ্রামের মহেন্দ্রনাথ সরদার ও তাঁর স্ত্রী ললিতা সরদার ১৯৯৫ সালে ভূমিজ ভাষায় লেখার জন্য একটি স্বতন্ত্র লিপি তৈরি করেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬র মধ্যে ময়ূরভঞ্জের জামবনি গ্রামের কার্তিক সিং-য়ের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পূর্বোল্লিখিত ‘ভূমিজ গ্রামার’ বইয়ে রামস্বামী লিখেছিলেন যে ভূমিজ ভাষায় ৬১টি ধ্বনি আছে, যার মধ্যে ২০টি স্বরধ্বনি আর ৪১টি ব্যঞ্জনধ্বনি। মহেন্দ্রনাথ সরদার ও ললিতা সরদার তাঁদের রচিত বর্ণমালা সাজিয়েছেন ৩০টি বর্ণ দিয়ে। এই ৩০টি বর্ণ ৩০টি ধ্বনির

প্রতিনিধিত্ব করছে। তাছাড়া আরো কিছু ধ্বনির লেখ্য রূপ পাশাপাশি দুটি বর্ণকে বসিয়ে করার পরিকল্পনা হয়েছে, যেমন:

বর্ণ	ধ্বনি
	ইত
	এহ
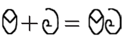	থ

এই লিপির নাম তাঁরা দিয়েছেন 'অল ওনোল', যার আক্ষরিক অর্থ হল 'ভাষা আলপনা'। বর্ণমালার নামে আলপনা শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ প্রতিটি বর্ণ তৈরি হয়েছে পরম্পরাগতভাবে ভূমিজদের ঘরে-দেওয়ালে-উঠোনে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে আঁকা হয়ে আসা আলপনার অংশ থেকে। তাই এই বর্ণমালা যেমন একটি নতুন উদ্ভাবন, তেমনই তা অতি পরিচিত পরম্পরার অনুগামী।

অল ওনোল লিপিকে পরিচিত করা ও তা ব্যবহার করে ভূমিজ ভাষায় লেখা অভ্যাস করা ও করানোর জন্য ভূমিজদের কিছু সংগঠন উদ্যোগ নিতে শুরু করে এরপর। এমন একটি সংগঠন হল 'আদিম সিন্ধুবাসী ভূমিজ নয় মহল', যা ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার রুয়াংসি-তে কেন্দ্রীভূত। চিদকুবাড়ি গ্রামের কৃষক গুলাপ সিং এই সংগঠনের হাঁসতা (অর্থাৎ, সম্পাদক)। এছাড়াও এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে ওড়িশার মহাদেবডিহি, ভীমখান্দা, জামবনি, ডুমুরকুদার, কুকুদিমুন্দি, কলারাবনি, কুলেইশিলা লোতোশাহি এবং ঝাড়খণ্ডের চুদকুঘুটু গ্রামের মানুষজন আছেন। ভূমিজ জনজাতির এই সংগঠনের নিজ নাম নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তার স্বইতিহাস-নির্মাণের প্রয়াস ধরা পড়ে। তারা মনে করেন যে ভূমিজরা আদিম সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের বংশধারা থেকে উদ্ভূত। সিন্ধু নদীর তীরে তারা নয় মহলে ভাগ হয়েছিল। সেই ইতিহাসের দাবি থেকেই তারা নিজেদের সংগঠনের নাম 'আদিম সিন্ধুবাসী ভূমিজ নয় মহল' রেখেছেন। এই সংগঠন অল ওনোল লিপি ও সেই লিপিতে লেখা ভূমিজ শব্দভাণ্ডার ও সংখ্যা সম্বলিত খান-বারো পাতার বই ছেপে বন্টন করে তার ভিত্তিতে ভূমিজ ভাষা ব্যবহার শেখার আখড়া চালু করে।

এমন ভূমিজ মানুষদের সংগঠন ঝাড়খণ্ডেও কাজ করছিল, যেমন: 'আদিম ভূমিজ কল্যাণ সমিতি', যা ঝাড়খণ্ডের হরিণা বুন্নুডিতে কেন্দ্রীভূত। এছাড়া ভারতীয় 'আদিবাসী ভূমিজ সমাজ' নামের সংগঠনের শাখা ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ তিনটে রাজ্যেই গড়ে উঠেছিল। তিনটে রাজ্যের সমস্ত ভূমিজ সংগঠন যৌথভাবে অল ওনোল লিপিকে ভূমিজ ভাষার মান লিপি হিসেবে গ্রহণ করে ২০০৪ সালে। এই লিপি গ্রহণ উপলক্ষ্যে সব সংগঠনের প্রতিনিধিরা জমায়েত হওয়ার মধ্য দিয়ে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার রুয়াংসি-তে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। তারপর থেকে অল ওনোল লিপিতে ভূমিজ ভাষায় লেখা শেখার ও ভূমিজ ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণের (মূলত শব্দভাণ্ডার, শব্দগঠন ও বাক্যগঠন সম্বলিত) বেশ কিছু চটি বই ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিম বাংলা তিনটে রাজ্যেই প্রকাশিত হয় ভূমিজদের এই সংগঠনগুলোর নিজেদের উদ্যোগে। বিভিন্ন গ্রামীণ হাটে বা ভূমিজদের গোষ্ঠীগত উৎসব-অনুষ্ঠানে বিক্রি বা বিতরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই বইগুলো ছড়াতে থাকে। ভূমিজ ভাষা ভুলে অন্য ভাষায় সরে যাওয়া মানুষজনকে নিজ ভাষায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেও ভূমিজ-বাংলা, ভূমিজ-হিন্দি, ভূমিজ-ওড়িয়া দ্বিভাষিক বই প্রকাশিত ও বিতরিত হতে থাকে। পাশপাশি, ভূমিজ শেখার আখড়াও এই তিনটি রাজ্যের ভূমিজ গ্রামগুলোতে গোড়াপত্তন করে কাজ শুরু করে। এই উদ্যোগস্ফূর্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনটি রাজ্যের সমস্ত ভূমিজ ভাষা-পড়ুয়াদের জন্য একটি ভূমিজ ভাষা পরীক্ষার আয়োজন হয়। প্রথম ভূমিজ ভাষা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়খণ্ডের গীতিলতা উচ্চ বিদ্যালয়ে, সেখানে বিভিন্ন বয়সের ১৬৫ জন পড়ুয়া সামিল হয়েছিলেন। এই পরীক্ষায় পাশ করা পড়ুয়াদের অনেকেই নিজেদের গ্রামে বা অঞ্চলে আখড়া খুলে ভূমিজ ভাষার শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। এভাবে ভাষাব্যবহার বিস্তারের আন্দোলন তরঙ্গায়িত হয়ে ক্রমশ ভূমিজ ভাষী গ্রামগুলো থেকে সমস্ত ভূমিজ বসতি সম্পন্ন গ্রামেই ছড়িয়ে পড়ছে।

জনজাতির তৃণমূলস্তরে ভূমিজ ভাষা পুনরুজ্জীবনের এই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিজ ভাষার সরকারি স্বীকৃতির জন্য দাবি উঠতে থাকে। সেই দাবি মেনে নিয়েই ঝাড়খণ্ডের রাজ্য সরকার ২০১৮ সালের ৫ অক্টোবর ভূমিজ ভাষাকে ঝাড়খণ্ডের অন্যতম সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দেয়। ওড়িশা

সরকারও ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ভুবনেশ্বর থেকে ভূমিজ ভাষা শেখার একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছে— বইটির নাম হল 'সরলো ত্রিভাষী ভূমিজ ভাষা শিখানো পেটিকা'।

ভূমিজ ভাষা পুনরুজ্জীবনের এই জনজাতির তৃণমূলস্তর থেকে ওঠা তরঙ্গের অভিঘাতই আমরা ঠাকুরানপাহাড়ির বলিচুয়ায় নিত্যলাল সিংয়ের আখড়ায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

২০২১ সালের শেষবেলায় নিজ ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় নিরত কিছু ভূমিজ মানুষের সঙ্গে অপরিকল্পিতভাবে পরিচয় হয়ে যাওয়া দিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর দেড় বছর কেটে গেছে। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার কিছু ভূমিজ গ্রামে-জনপদে গিয়েছি, সংসর্গের মধ্য দিয়ে প্রথম-পরিচয়ের অস্পষ্ট আদলে কোথাও কোথাও গাঢ় ছোপ পড়ে কিছু অংশ স্পষ্টতর হয়েছে, আবার কোথাও কোনো স্পষ্ট-বোধ-হওয়া পরিলেখ আলেয়ার মতো মিলিয়ে গেছে। সংসর্গ বহতা থাকার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রক্রিয়াও নিরন্তর থাকবে। তাই এই কথার উপসংহারে কোনো 'শেষ কথা' বলার বাতুলতার বদলে এই দেড় বছরে মনের মধ্যে জমে ওঠা কম্পমান ভাবনাছায়াগুলোকেই হাজির করা যাক।

ভাষার মরা-বাঁচা

হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া-র মতো ভাষার আধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভূমিজ জনজাতির একটা বড়ো অংশ নিজেদের ভূমিজ ভাষা খুইয়ে ওইসব ভাষার বাচকে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের প্রত্যন্ত কিছু গ্রামেই এখনও ভূমিজ ভাষা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মুখের ভাষা হয়ে আছে। ভূমিজ ভাষা পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসীরা এই গতিটিরই মোড় ঘোরাতে চাইছেন। ভূমিজ ভাষাকে আবার তাঁরা ভাষা-সরণ ঘটিয়ে ফেলা ভূমিজদের মুখে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। এর জন্য তাঁরা মূলত দুটি উপায় অবলম্বন করেছেন:

১। ভাষাশিক্ষার আখড়া চালু করে ভাষা হারিয়ে ফেলা মানুষদের জন্য নিয়মিত ভাষা পাঠ ও অনুশীলনের বন্দোবস্ত করা।

২। ভাষা-সরণ ঘটানো মানুষদের মানসিকতায় ভূমিজ ভাষার প্রতি মনোভাবে বদল ঘটানো । ভাষা সরণ ঘটানো মানুষরা সাধারণত ফেলে আসা ভাষাকে পশ্চাৎপদ ভাষা বা অকাজের ভাষা হিসেবে ছোটো করে দেখে। এই ছোটো করে দেখার মানসিকতা মুছে ভূমিজ ভাষা নিয়ে গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই চেষ্টা হচ্ছে সুদূর মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হিসেবে জনজাতীয় কুলজি নির্মাণ করে তার সঙ্গে ভাষিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে, ভাষার লিপি উদ্ভাবন ও প্রচলনের মধ্য দিয়ে লিখনজগতে ভাষাব্যবহার প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে, ভাষার ও লিপির সরকারি স্বীকৃতি আদায়ের মধ্য দিয়ে এবং সরকারি স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ভূমিজ ভাষায় রচিত প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে।

এর মধ্যে আখড়া প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভূমিজ জনজাতির মানুষরা কয়েক প্রজন্ম ধরে হিন্দি, বাংলা বা ওড়িয়া ভাষার বাচক হয়ে উঠে ভূমিজ ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন, সেখানে ভূমিজ ভাষার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে গেলে তরুণ ও নব প্রজন্মের মধ্যে এই ভাষার বাচকতা ফিরিয়ে আনা সবচেয়ে জরুরি। ঘরের মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে কথাবার্তার ভাষা হিসেবে ভূমিজ ভাষার প্রত্যাবর্তন যদি ঘটানো যায়, নবজাতকরা যদি জন্মের পর জন্মপরিবেশে ও মায়ের মুখ থেকেই এই ভাষা প্রথম শেখে, তবেই ভূমিজ ভাষা নতুন জীবন পেল বলা যেতে পারে। সরকারি স্বীকৃতি বা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু ভূমিজ পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনকে প্রকৃত অর্থে ভাষার নতুন জীবন পাওয়া বলা যায় না। গ্রামে গ্রামে আখড়াগুলো যেমন একদিকে সাধারণ গ্রামবাসীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের উপর দাঁড়িয়েই চলতে পারে, পড়াশোনার পরিবেশ-সময়-পদ্ধতিও তেমনই গ্রামবাসীরা নিজেরা নিজেদের অভ্যাস ও রীতি অনুযায়ী ঠিক করে নিতে পারেন। তাই এই আখড়াগুলো গ্রামসমাজের মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে শক্তপোক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারলে

তার মধ্য দিয়েই ঘরের ও পরিবারের ভাষা হিসেবে ভূমিজের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাকে পুষ্ট করা যায় বলে মনে হয়।

যে আখড়াগুলো পথ চলা শুরু করেছে সেখানে শিক্ষক-সংগঠক হিসেবে প্রাথমিকভাবে তাঁরাই ভূমিকা নিচ্ছেন যাঁদের কাছে নিজ পরম্পরাগত ভাষা-সংস্কৃতি-জাতিসত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই মানুষগুলো তাই ভাষা-সংস্কৃতি-জাতিসত্তার আত্মগৌরববোধ ও আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠার নানা পথও স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধান করবেন। ফলে ভাষা ও লিপি থেকে শুরু করে সংস্কৃতি-অধিকার-ধর্মের নানা বিষয়ে সরকারি স্বীকৃতি আদায়ের নানা কর্মসূচিও এঁরা নিচ্ছেন। এই সব কর্মসূচি প্রচলিত ছক অনুযায়ী মিটিং-মিছিল-অধিবেশন-ডেপুটেশনের রূপ গ্রহণ করছে। সংসদীয় রাজনীতির বিভিন্ন দল ও স্বার্থগোষ্ঠীর সংসর্গে এসে তাদের ব্যবহার করার ভাবনায় নিজেদের ব্যবহৃত হওয়ার পথও খুলে দিচ্ছে। সরকারের দৃষ্টি-আকর্ষণ ও পৃষ্ঠপোষণা লাভের আশায় শহুরে ক্ষমতাকেন্দ্রে এসে সেখানকার ক্ষমতার আড়কাঠিদের সঙ্গে নানারকম যোগাযোগ ও সুসম্বন্ধ গড়ে তোলার দিকেও ঠেলে দিচ্ছে।

এর মধ্য দিয়ে কোনো বিরোধ তৈরি হচ্ছে না? গ্রামের সর্বজনার অংশগ্রহণ গড়ে তুলে ভাষা-আখড়ার শিকড় গ্রামের প্রতিটি ভূমিজ পরিবারের অন্দরমহলে প্রবিষ্ট করার যে নিদারুণ একটানা (হয়ত বা একঘেয়ে) কাজ খুবই জরুরি, তার তুলনায় মিটিং-মিছিল-ডেপুটেশন ও সরকারি ক্ষমতার অলিন্দের চারপাশে ঘোরাঘুরি কি আপাতদৃষ্টিতে অনেক উত্তেজক ও দৃষ্টিআকর্ষণকারী নয়? এই উত্তেজনার ও সবার নজরে আসার আকর্ষণে মিটিং-মিছিল-ডেপুটেশনে বেশি জোর পড়ায় এবং তাতেই আখড়াগুলোর মূল শিক্ষক-সংগঠকরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ায়, গ্রামের আখড়াগুলো কম গুরুত্ব পেয়ে অনিয়মিত হয়ে উঠলে তা কি ভাষা-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের মূল লক্ষ্যটিরই ক্ষতি করবে না? এই প্রশ্নগুলো আমার মনে বিমূর্ত চিন্তার মধ্য দিয়েই কেবল জন্ম নেয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে গত দেড় বছর ঘটনাবলীর যে প্রবণতা দেখেছি, তার থেকেই জন্ম নিয়েছে। বিভিন্ন অধিকার ও দাবির প্রশ্নে সরকারি স্বীকৃতি আদায়ের জন্য মিটিং-মিছিল-ডেপুটেশনে ব্যস্ততায় বেশ কিছু আখড়ার শিক্ষক তাঁর নিজের এলাকার আখড়ায় আগের মতো সময় দিতে পারছেন না এমন দেখেছি। শহুরে ক্ষমতাকেন্দ্রকে

আরেকভাবেও আকর্ষণ বিস্তার করতে দেখেছি—তা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। আমাদের রীতিবদ্ধ উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বহুদিন হল ডিগ্রি-মেরিটপয়েন্ট-গবেষণাপত্র উৎপাদনের একমুখী কারখানা হয়ে উঠেছে যার মধ্য দিয়ে এক মুষ্টিমেয় অভিজাত শিক্ষিতকুলের প্রভাব-প্রতিপত্তির পুনরুৎপাদন হয়ে চলে। এই দেড় বছরে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত-অভিজাতদের নজরের মধ্যে ভূমিজ ভাষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টার উদ্যোগগুলো এসেছে। তারা তাদের ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক ডিগ্রি-মেরিটপয়েন্ট-গবেষণাপত্র উৎপাদনকাজের নয়া কাঁচামাল হিসেবে আখড়া পরিচালক কিছু অগ্রণী মানুষকে নিয়ে এসে শহরের সম্ভ্রান্ত ডেরায় মুহুর্মুহু ওয়ার্কশপ-সেমিনার শুরু করেছেন, সরকারি-আধাসরকারি কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করানো চলছে। এর মধ্য দিয়ে আখড়া-পরিচালক এই অগ্রণী মানুষগুলো যদি অভিজাত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়ে উঠে বিদ্যা-ক্ষমতার আঙিনায় ঘুরে বেড়ানো চোস্ত বক্তৃতাবাজ হয়ে ওঠে, আর তাদের ফেলে আসা গ্রামের আখড়াগুলো শুকিয়ে মরে, তাতে অভিজাত শিক্ষিতকুলের কী বা যায় আসে, বড়জোর সেই শুকিয়ে মরা তাঁদের আরেকটি প্রশংসা-ভিক্ষু গবেষণাপত্রের বিষয় হয়ে উঠবে!

ধর্মের ইশারা

ভূমিজরা বলছেন যে তাঁদের ধর্ম সারনা। তাঁদের মুখিয়ারা বলছেন যে সারনা ধর্ম হিন্দুধর্মের থেকে আলাদা, আর কেবল আলাদাই নয়, হিন্দু ধর্মের থেকে প্রাচীন, কারণ আর্যরা এই দেশে পা রাখার আগে যে অনার্য মানুষরা মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মতো উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তাদের ধর্ম ছিল এই সারনা ধর্ম। সুতরাং ভূমিজরা প্রাকহিন্দু যুগের সুপ্রাচীন ধর্মপরম্পরার বাহক হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয় নির্মাণ করছেন। এই ধর্মের আচরিত রূপটি বর্তমানে কী তা প্রথমে দেখা যাক।

ভূমিজদের ধর্মাচরণে গাছ খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়ে আছে। পুজো বা সামাজিক অনুষ্ঠানে গাছের ভূমিকা বিরাট, যেমন:

১। ধনসম্পত্তির দেবতা হল করম ঠাকুর। করম গাছের ডালকে পুজো করাই হল করম পুজো। করম পুজো চার রকমের যা বছরের ভিন্ন

ভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে—গুরু করম, দেশুয়া করম, জাওয়া করম, ডাগুয়া করম। এই পুজোরীতি থেকে বোঝা যায় ভূমিজদের ধারণায় ধনসম্পত্তির একটি প্রধান উপাদান হল গাছ বা জঙ্গল।

২। শালগাছকে পুজো করা হল শারুল পুজো, ভূমিজ ভাষায় যাকে বলে হাদী বোঙ্গা। শালগাছে ফুল ধরার সময় এই পুজো হয়, শালের ফুল মাথায় দিয়ে মেয়েরা সেজে ওঠে, গোষ্ঠীবদ্ধ নাচগানের মধ্য দিয়ে জীবনের নবীভবনকে যেন পালন করা হয়। গাছের নবফুলধারণের সঙ্গে জীবনে নবস্ফূর্তিকে মিলিয়ে দেখা মানুষের জীবন ও গাছের জীবনকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে বেঁধে রাখে।

৩। ভূমিজ সমাজে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক আচারে গোলাচ ফুল লাগে।

৪। বিবাহ বিধিতে তিনটি গাছের ডাল লাগে—শাল (ভূমিজ ভাষায় সারজম), মহুল (ভূমিজ ভাষায় মাতকম) ও সিদা (ভূমিজ ভাষায় সেকরেজ) গাছের ডাল। বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য যে বেদি তৈরি করা হয়, তার জন্য মাটি নিয়ে আসা হয় নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্য থেকে, সেই মাটি দিয়ে তৈরি বেদির তিনদিকে এই তিনটি গাছের ডাল খাড়া করে লাগানো হয়, বেদির মাথায় এইসব গাছের পাতার ঝালর টাঙানো হয়। সব মিলিয়ে যেন একটা ছোট পরিসরে জঙ্গলের অনুকরণ গড়ে তোলা হয়। এই তিনটি গাছ বিবাহিত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবানতা, পারস্পরিক আস্থা-সহযোগিতা ও সৌভাগ্যের নিদর্শক বলে মনে করা হয়। এছাড়াও, বিবাহ অনুষ্ঠান শুরুর আগে পাত্র-পাত্রীর জোড় বাঁধার অভিপ্রায় ঘোষণা করে ঘুরে ঘুরে এলাকার গাছ-গাছালি, পাহাড়-প্রকৃতির কাছ থেকে অনুমতিভিক্ষার রেওয়াজও পালন করা হয়। ভূমিজদের পরম্পরাগত ধর্মে মানুষের জীবন ও গাছগাছালি-জঙ্গলের জীবনকে নিকট আত্মীয় ও অভিভাবকের মতো কতটা সম্পর্কযুক্ত হিসেবে দেখা হয় তা এই রীতিগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির সঙ্গে জীবননির্বাহকে সুসমঞ্জস করে তোলার আকাঙ্ক্ষা ভূমিজদের পরম্পরাবাহিত সারনা ধর্মের আরও নানা আচার থেকে প্রকাশিত হয়, যেমন:

১। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির আবাহন করে ধানচাষের শুরুতে চাষের মাঠে জান্তাড় পুজো হয়। এ পুজোতে কোনো মূর্তি বা পাথর-রূপী প্রতীক ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতির প্রতি নিবেদন উৎসর্গ করে আদানপ্রদানের সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকার প্রার্থনা করা হয়।

২। চাষের মাঠে মাটি চষা শুরু করার আগে আরেকটি পুজো হয়, যা হল রোহিণী পুজো। বলা হয় যে বছরের যেদিন রাতের আকাশে রোহিণী নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, তার পরের দিনই রোহিণী পুজো করা হয়। এই পুজোতেও কোনো মূর্তি, বিগ্রহ বা প্রতীকের পুজো হয় না। একটি মুরগিকে বলি দিয়ে তার রক্ত জমিতে ছড়িয়ে জমির উর্বরতা কামনা করা হয়। তবে এই পুজো কেবল কৃষিকাজের সঙ্গেই যুক্ত নয়। যে কোনো বিদ্যা বা দক্ষতা অর্জনের সক্ষমতা কামনায় এই পুজো করা হয়। ভূমিজদের চলতি ভাষায় একে গুরু-চেলা পুজোও বলা হয়ে থাকে। শিক্ষা থেকে শুরু করে অস্ত্রচালনা, যে কোনো আখড়ায় বিদ্যাশিক্ষার সাফল্য কামনা করে গুরু ও শিষ্যরা একত্রে এই পুজো করে। মানুষের যে কোনো কর্মপ্রচেষ্টায় প্রকৃতির আনুকূল্য যে নির্ধারকভাবে জরুরি সেই বোধই বোধহয় এই আচারের পিছনে কাজ করে।

সারনা ধর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল থান। আপাত অর্থে থান মানে উপাসনাস্থল। থান যেমন গ্রামের মধ্যে থাকে, আবার গ্রামের বাইরে ঘন জঙ্গল বা পাহাড়ের উপরও থাকে। এখানে কোনো মন্দির বা নজরকাড়া স্থাপত্য নির্মাণ করা হয় না, কোনো বিগ্রহ বা দেব-দেবীর মূর্তিকেও প্রতিষ্ঠা করা হয় না। পুরোপুরি প্রাকৃতিক পরিবেশে বহু শতাব্দী পুরানো বড় গাছের নিচে বা পাহাড়ের গুহায় থানের জায়গা নির্বাচিত হয়। সেখানেই মানুষ জড়ো হয় পুজো নিবেদন করতে। সাধারণত বলি দেওয়ার জন্য একটি হাড়িকাঠ থাকে, আর থাকে পোড়ামাটির তৈরি ঘোড়া ও হাতির ছোটো ছোটো পুতুল। ভূমিজ জনজাতির কোনো একটি নির্দিষ্ট গোত্রের মানুষদের উপর এই থানের অঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করার দায়িত্ব থাকে। সেই গোত্রের মানুষদের মধ্য থেকেই পূজারী বা লায়া নির্বাচিত হয়। বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে কাছেপিঠে থেকে তো বটেই, দূরদূরান্ত থেকেও সব গোত্রের ভূমিজরাই জড়ো হয় পুজোয় অংশ নিতে। থানের

অঞ্চলভুক্ত গাছ-জঙ্গল-পাহাড়কে মানুষের মঙ্গলদায়ক হিসেবে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। সেখানকার কোনো গাছ কাটা নিষিদ্ধ, পাহাড় থেকে পাথর কাটা নিষিদ্ধ। এভাবে এই থানগুলো প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে বহু শতক জুড়ে সংরক্ষিত করে রাখার ভূমিকাও পালন করে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে ভূমিজ বসতিপূর্ণ গ্রাম-জঙ্গল-পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা এমন বহু থানের কিছু উদাহরণ হল:

১। প্রতিটি ভূমিজ গ্রামেই একটি বহু বৃদ্ধ গাছের নিচে জাহিরা খান থাকে। সেখানে সেই গ্রামের লায়া বিভিন্ন পুজো পরিচালনা করেন।

২। ঝাড়গ্রাম জেলার তালপুকুরিয়া গ্রামের পাশের জঙ্গলে মাঞ তামলিসীনী বোঙ্গার থান। সাঁড়ি গোত্রের ক্ষুদিরাম সর্দার এখন সেখানে লায়া।

৩। যাদুগোড়ায় কাপড় গাধী রঙ্কিনী থান। এই যাদুগোড়ার পুরানো ভূমিজ নাম ছিল জাড়াগোড়া। সেখানে সামাদ গোত্রের মানুষ লায়ার দায়িত্বে আছেন।

৪। বরাভূম মুলুকের পূর্ব সিংভূম জেলার ভূলা লাউজোড়ায় হাতিখেদা বোঙ্গার থান। গুলগু গোত্রের ভূমিজরা এখানে লায়া হন।

৫। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার পাখনাপাট পাহাড়ের উপর থান। জান্তাড় পুজো এখানে খুব ঘটা করে হয়, তখন দূরদূরান্ত থেকে ভূমিজরা এখানে জড়ো হয়। হেমব্রম গোত্রের ভূমিজরা এখানে লায়ার ভূমিকা পালন করেন।

খেয়াল করা যেতে পারে যে কেবল একটি বিশেষ গোত্রের মানুষই পূজারী বা লায়া হতে পারবে এমনটা ভূমিজদের রীতি নয়। বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন থানে বিভিন্ন গোত্রের মানুষরা লায়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাই হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণরা যেমন বিশেষ অধিকার ও সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে ধাপবন্দি কাঠামোয় উচ্চধাপভুক্ত হয়ে এসেছে, ভূমিজ সমাজে কোনো গোত্রই তেমন আধিপত্যকারী অবস্থানে নেই ।

গোত্র বিশেষ ভূমিকা নেয় বিবাহের সময়—একই গোত্রের পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিবাহ হয় না। বিবাহজাত সন্তানেরা পিতার গোত্রই পায়। একে পুরুষ-প্রাধান্যের একটি চিহ্ন বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু এর পাশাপাশি সন্তানের জীবনে বিভিন্ন সামাজিক কাজে মায়ের বংশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে যায়। সন্তানজন্মের পর কর্ণছেদন, বিয়ের সময় বিবাহবেদির জন্য মাটি ও জল আনা, কামান ঘর ও অন্যান্য উপচার মা এবং মামা-মামি ছাড়া হবে না—তাই এখানে আবার মায়ের বংশ অগ্রগণ্যতা পায়।

সারনা ধর্মের এই আচরিত রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে কিছু সাধারণ ভাবনা আমার মনে জন্ম নিয়েছে—সংক্ষেপে সেগুলোর কথা কিছু বলা যাক।

হিন্দুধর্মকে বর্তমান ভারতে যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে সমাজ-রাজনৈতিক পরিসরে আধিপত্যবাদী করে তোলা হয়েছে, সেখানে আরাধ্য ঈশ্বর বিভিন্ন বিগ্রহরূপ ধারণ করেছে। এই বিগ্রহরূপ কল্পনায় মানুষ নিজের রূপকেই প্রতিবিম্বিত করেছে, অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু- মহেশ্বর-ইত্যাদি মানুষের আদলেই মুণ্ড-দেহ-লিঙ্গ-হস্তপদ-ধারী অস্তিত্ব হিসেবে কল্পিত হয়েছে, যারা সৃষ্টিকর্তা-নিয়ন্ত্রা-বিধাতা হিসেবে প্রকৃতিকে শাসন করছে। এই কল্পনার উলটোপিঠেই মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে ঈশ্বরপ্রতিম হয়ে উঠে প্রকৃতিকে শাসন করতে চেয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা বিভাজনরেখা টানা হয়েছে। ঈশ্বর যেন মানুষকে তৈরি করেছেন তাঁর নিজের আদলে, আর প্রকৃতিকে তৈরি করেছেন মানুষের প্রয়োজন মেটাতে। ইচ্ছামতো প্রকৃতিকে ব্যবহার করে, বদলে ও ধ্বংস করে মানুষের নিজ প্রয়োজন মেটানো যেন মানুষের বিতর্কাতীত অধিকার। আধুনিক শিল্পোৎপাদনভিত্তিক সমাজ উৎপাদন ও ভোগের ক্রমবৃদ্ধিকে সীমাহীন করে বেঁধেছে, সেই প্রবণতার সঙ্গে মিলে প্রকৃতিকে মানুষের জন্য প্রদত্ত ভাণ্ডার হিসেবে দেখার এই ধর্মীয় দৃষ্টি আজ কালান্তক রূপ ধারণ করেছে। একদিকে যেমন তা মানুষকে এক বিচ্ছিন্ন যান্ত্রিক একাকীত্বের কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, অন্যদিকে তেমনই তা প্রকৃতির ব্যাপক ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বাস্তুতান্ত্রিক সংকটকে ঘনীভূত করে তুলে প্রাণের অস্তিত্বকেই বিলুপ্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার এই সর্বনাশা বোধকে মানুষ-কেন্দ্রিক-ঈশ্বর-রচয়িতা যে কোনো ধর্ম গভীর থেকে ইশারা যুগিয়ে চলে।

এর বিপরীতে সারনা ধর্মের মধ্য দিয়ে আমরা ধর্মের একটি অন্য রূপকে যেন দেখতে পাই। এই ধর্মে মানুষের আদলে মানুষ-কেন্দ্রিক ঈশ্বর রচনা নেই। প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা-নিয়ন্ত্রক হিসেবে ঈশ্বরের কোনো কেন্দ্রীয় রূপ-কল্পনা নেই। আরাধ্য ঈশ্বর এখানে বিকেন্দ্রীভূত হয়ে গাছ-গাছালি, পাখি-পশু, পাথর-পাহাড়, নক্ষত্র-বায়ু সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কোনো একীভূত রূপ নেই। মানুষও তাই কোনো সর্বনিয়ন্ত্রা বিধাতাপুরুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে প্রকৃতির শাসক-খাদক-ভোগকর্তা নয়। মানুষ এখানে প্রকৃতিরই একটি অংশ, প্রকৃতির সঙ্গে

সুসমঞ্জস সম্পর্ক রক্ষাই তার মঙ্গলের পথ। জঙ্গল-পাহাড়-নদীকে তাই অতি সহজ স্বাভাবিকতায় মায়ের স্নেহসিক্ত কোল হিসেবে কল্পনা করা হয়, পবিত্র বোধ করা হয়, ধ্বংস না করে সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধর্মের ইশারা গভীর থেকেই তাই মানুষকে বিচ্ছিন্নতা-যান্ত্রিকতা-নিঃসঙ্গতার প্রাসাদচুড়োয় যন্ত্রণাকর নির্বাসনের পথ থেকে সরিয়ে রাখে।

আজ যাঁরা ভূমিজ ভাষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের জনজাতিগত আত্মপরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হিসেবে সারনা ধর্মকে চিহ্নিত করেছেন। ভূমিজ ভাষা যেমন হিন্দি-বাংলা-ওড়িয়ার মতো আধিপত্যকারী ভাষার চাপে সংকুচিত হয়েছে, সারনা ধর্মও তেমনই বিশেষত হিন্দুধর্মের আধিপত্যের মুখে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক প্রজন্ম ধরে ভূমিজ ভাষা হারিয়ে বাংলা ভাষার বাচক হয়ে ওঠা ভূমিজরা অনেকেই হিন্দু ধর্ম পালনের নানা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছেন। যেমন বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিবাহ ও শ্রাদ্ধরীতিতে ব্রাহ্মণ ডেকে হিন্দু রীতি পালন করার চল দেখা যাচ্ছে, হিন্দু দেবদেবী (বিশেষ করে শিব) পুজোরও চল দেখা যাচ্ছে। ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডেও এমন ঘটছে। বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক আঙিনায় হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে জাতীয় পরিচয় নির্ধারণের যে প্রবল প্রতিপত্তির উৎপত্তি হয়েছে, তার টানে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির মরীচিকার আকর্ষণও ক্রমশ এই হিন্দু-প্রভাববৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠছে। ভূমিজ ভাষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রতীরা এখনও এই প্রবল টানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভূমিজ ভাষা পুনরুজ্জীবনের সঙ্গেও এই সারনা ধর্মের পুনরুজ্জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। সারনা ধর্মের বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন, গান, গাথা ভূমিজ ভাষাতে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে— ভাষা হারিয়ে গেলে সেগুলোও চিরতরে হারিয়ে যাবে। সেগুলো হারিয়ে গেলে সারনা ধর্মের পরম্পরাবাহিত গহন কথা ও ইশারাগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গ্রামে গ্রামে ঘরে পরিবারে ভূমিজ ভাষায় কথাবার্তা বলা ফিরিয়ে আনার সঙ্গে পরম্পরাবাহিত এই প্রবাদ-প্রবচন-গান-গাথাগুলোকে যত্ন নিয়ে সংগ্রহ করে আবার গ্রামের পুজোয়-উৎসবে ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়েই সারনা ধর্মের প্রাণশক্তিও আবার

নবরূপে নবরসে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারে। ভাষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রতীরা বিভিন্ন গ্রামে ভূমিজ সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ না ডেকে লায়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান করার জন্য অনুরোধ/নির্দেশ জারি করছেন, তা না করলে অন্য ভূমিজদের সেই অনুষ্ঠান বয়কট করার আবেদন করছেন। এই জোর খাটানোর পদক্ষেপগুলো কখনো প্রয়োজনীয় হলেও হতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা তো জোর দিয়ে তৈরি হয় না, সারনা ধর্মের প্রতি ভালোবাসাও জোরের দাপটে ফিরিয়ে আনা যাবে না। সারনা ধর্মের প্রাণের মধ্যে প্রকৃতির অংশ হয়ে অস্তিত্বকে উপলব্ধি করার যে সুধারস আছে, সম্পত্তি-উন্নয়ন-ভোগের কড়া মদের বদলে সেই সুধারস পানের দিকে কীভাবে আমাদের মন ফিরবে, গভীরে গিয়ে সেটাও হয়ত ভাবতে হবে।

প্রাত্যহিক দৈনন্দিন

ভূমিজ ভাষা ও সারনা ধর্ম পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ ভূমিজ জনজাতির যে সব মানুষরা নিয়েছেন, একইসঙ্গে তাঁরা একটি গ্রামীণ স্বশাসন কাঠামোর আদলও গড়ে তুলতে চাইছেন। প্রতিটি গ্রামে ধর্মীয় আচার পরিচালনা করার জন্য যেমন একজন লায়া ঠিক করা হচ্ছে, তেমনই গোষ্ঠীগত সামাজিক বিষয়-আশয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্বাহের জন্য মোড়ল ও ডাকুয়া নির্ধারণ করে তাদের উদ্যোগে গ্রামের অভিজ্ঞ-বয়স্ক জনেদের সভা করার রেওয়াজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রাচীনকালে ভূমিজদের গ্রামপ্রশাসনের রীতি কী ছিল সেই স্মৃতিকেই অনুপ্রেরণা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলো মূর্ত চেহারা নিতে শুরু করেছে ভূমিজদের এমন সব গ্রামে যেখানে কৃষিকাজ মূল জীবিকা এবং ভূমিজ জাতিসত্তাগত স্বপরিচয় মানুষদের মধ্যে জোরালো গোষ্ঠীগত একতার বোধ বজায় রাখে। বৃহৎ শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রিক সমাজের তুলনায় অর্থনৈতিক বৈষম্য এখানে অনেক কম। যে পরিমাণ অর্থনৈতিক বৈষম্য আছে, তাও গ্রামীণ সমাজে বিপদে-আপদে রোগে ভোগে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর নানা রীতি রেওয়াজের সজীবতার কারণে প্রশমিত হয়ে থাকে, তীব্র বিদ্বেষ-হিংসা-ঘৃণা-প্রতিশোধস্পৃহার আগুনে গোষ্ঠীগত একতার বোধকে ভস্মীভূত করে দেয় না। গ্রামসমাজের ভিত্তিভূমির এই বৈশিষ্ট্য ভূমিজ ভাষা-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের প্রাথমিক স্ফূরণে সহায়ক

হয়েছে। কিন্তু এই প্রাথমিক ভিত্তিভূমিটি অবিন্যস্তকারী জোরালো বিপরীত টানের মুখে বিপন্ন, যা ভূমিজ ভাষা-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের বিকাশের মুখেও কঠিন কিছু প্রশ্ন খাড়া করেছে—সেইদিকটা এবার দেখা যাক।

গোটা ভারত জুড়ে বৃহৎ শিল্পোৎপাদন ভিত্তিক শহরকেন্দ্রিক বিন্যাস তৈরির সমাজ-রাজনৈতিক কার্যক্রম আজ বিপুল আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। জঙ্গল-জমি-নদী সবের উপর রাষ্ট্র অথবা বৃহৎ পুঁজির কোম্পানির দখল কায়েম করা হচ্ছে, জনজাতির বা গ্রামের সাধারণ সম্পদ বলে ক্রমশই আর কিছু থাকছে না। দখল করা এই প্রাকৃতিক সম্পদ নিঙড়ে শহরকেন্দ্রিক বা বিশ্বের অন্যান্য ধনী অঞ্চলে রফতানি কেন্দ্রিক উৎপাদন বড়ো থেকে আরও বড়ো চেহারা নিতে চাইছে। কৃষিক্ষেত্রেও বড়ো বড়ো সার-বীজ-কীটনাশক তৈরির কোম্পানি থেকে শুরু করে শস্য-ব্যবসায়ী বা খাদ্য-প্রস্তুতকারক বড় বড় কোম্পানি কৃষিকাজের উপর নিজেদের দখল-নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ করে তুলছে। এর ফলে জনজাতিদের গ্রামীণ জীবনযাপন তার প্রাকৃতিক সহায়সম্বল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কৃষিকাজেও চরম সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে পরম্পরাগত জীবনযাত্রার পদ্ধতি থেকে উৎখাত হতে হচ্ছে। শহরে গিয়ে কলে-কারখানায় বা বাবুদের মলে-আবাসনে শ্রমিক-দারোয়ান-কর্মচারী হিসেবে কিছু না কিছু রোজগারের চেষ্টায় হন্যে হতে হচ্ছে। শহুরে বৃত্তি প্রয়োজনমতো রোজগার না জোটাতে পারুক, হরেক পণ্যের বিজ্ঞাপনী মায়ায় ভোগবিলাসের আকর্ষণে মনকে বেঁধে ফেলছে। ফলে গ্রামের মানুষটিও এখন গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ আমোদ-আহ্লাদের খোলা আকাশ ছেড়ে কেনা পণ্যের জৌলুসে ঢাকা কেনা বিনোদনের একক কুঠুরিতে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে, তা লোভ-হিংসা-বিদ্বেষের লেলিহান শিখাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। গ্রামের পাশের জঙ্গল যেমন কাটা পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, পাহাড় যেমন খনির গ্রাসে পতিত হচ্ছে, চাষজমি অকর্তিত পড়ে থাকতে থাকতে একদিন শহুরে বাবুদের জন্য রিসর্টের তলায় অন্তর্হিত হচ্ছে, তেমনই গ্রামের মানুষরাও গোষ্ঠীবদ্ধ সহায়-সহযোগিতার সম্পর্ক হারিয়ে লোভ-হিংসা-অতুষ্টির পথে একক পদাতিক হয়ে পড়ছে, শহুরে বাণিজ্য-আধিপত্যের ভাষা (ইংরেজি বা হিন্দি) এবং শহুরে বাণিজ্য-আধিপত্যের সংস্কৃতি (পণ্যভক্তির সংস্কৃতি)-র কাছে আত্মসমর্পণ করছে। এই

ভাঙনের বিরুদ্ধে বাঁধ না বাঁধতে পারলে ভূমিজ ভাষা-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন জনজাতির আত্মশক্তিকে রক্ষাই বা করবে কীভাবে, আর যৌথ যাপনের বীজতলা ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশের নবরসকেই বা সৃজন করবে কীভাবে? এই ক্ষেত্রে সম্ভাবনার কী কী পথ উন্মোচিত হয় তা দেখা-বোঝার জন্য আগামীদিনের ভূমিজ-সংসর্গকালে আমরা উদগ্রীব হয়ে থাকব।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০২২
'মাতৃভাষা' পত্রিকা, যুগ্ম-সংখ্যা: নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ও দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৩

তথ্যসূত্র

১. এইচ এইচ রিসলে, *দি ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল*, ভল্যুম-১, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৯১, পৃ. ১১৭। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।
২. গ্রিয়ার্সন, *লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া*, খন্ড-৪, ১৯৬৭-র পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ৯৫। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।
৩. এন রামস্বামী, *ভূমিজ গ্রামার*, সিআইআইএল, মাইসোর, ১৯৯২, পৃ. vii। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।
৪. এন রামস্বামী, *ভূমিজ গ্রামার*, সিআইআই ল, মাইসোর, ১৯৯২, পৃ. ১০। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।
৫. ট্রয় বেইলি ও লোরেন ম্যাগার্ড, *এ সোশিয়োলিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ দি ভূমিজ পিপল অফ ইন্ডিয়া*, এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, পৃ. ২০। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।
৬. ট্রয় বেইলি ও লোরেন ম্যাগার্ড, এ সোশিয়োলিজুয়িস্টিক সার্ভে অফ দি ভূমিজ পিপল অফ ইন্ডিয়া, এস আই এল ইন্টারন্যাশনাল ২০১৫, পৃ. ২০-২১। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।
৭. ট্রয় বেইলি ও লোরেন ম্যাগার্ড, এ সোশিয়োলিজুয়িস্টিক সার্ভে অফ দি ভূমিজ পিপল অফ ইন্ডিয়া, এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, পৃ. ২১। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।
৮. এন রামস্বামী, ভূমিজ গ্রামার, সিআইআইএল, মাইসোর, ১৯৯২, পৃ. ১১।

তামিলনাড়ুর হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন

বিপ্লব নায়ক

তামিলনাড়ু নামে বর্তমান ভারতে চিহ্নিত যে রাজ্য, সেইখানে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে ও ষাটের দশকে বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছিল হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে। শুধু সেই অঞ্চলের নয়, গোটা দেশের ইতিহাসেই এই আন্দোলন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বর্তমান আলোচনায় আমরা সেই আন্দোলনের কথা ও তার তাৎপর্য বোঝার লক্ষ্যে প্রাথমিক কিছু সূত্র হাজির করব।

তিরিশের দশকের হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে উক্ত অঞ্চল তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম আঞ্চলিক সরকার গঠিত হয়েছে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির নেতৃত্বে। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে সেই সরকারের পক্ষ থেকে রাজাগোপালাচারি ঘোষণা করলেন যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সমস্ত স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দি পড়াতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এর বিরোধিতা করে ই. ভি. রামস্বামী (পেরিয়ার) এবং জাস্টিস পার্টি বিক্ষোভ আন্দোলনের ডাক দেয় সরকারি আদেশ ফিরিয়ে নেওয়ার দাবিতে। ই. ভি. রামস্বামী (যিনি 'পেরিয়ার' নামে পরিচিত ছিলেন। 'পেরিয়ার' একটি তামিল শব্দ, যার মানে 'মহান তপস্বী') তখন 'স্বাভিমান আন্দোলন'-এর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যা তামিল সহ অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয়দের উত্তর ভারতীয়দের থেকে স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয়

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছিল। পেরিয়ারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত 'কুদিয়ারাসু' পত্রিকা যা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল হিন্দি বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে প্রচারে। ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরে তামিল শৈব পণ্ডিতরা ভেলুরে তাঁদের 'শৈব সিদ্ধান্ত মহা সমাজ' সম্মেলনে হিন্দি পড়ানোর বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান ঘোষণা করেন। মারাইমাল আদিগাল, সোমসুন্দর ভারতী, কে আপ্পাদুরাই, মুদিয়ারঘন আর ইলাকভানুর-এর মতো অন্যান্য তামিল পণ্ডিতরাও হিন্দি পড়ানোর বিরোধিতায় আন্দোলনে সমর্থন জানান। ক্রমশ মিছিল, বিক্ষোভ-প্রদর্শন তুঙ্গে উঠতে থাকে। ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে 'তামিলনাড়ু মহিলা সম্মেলন' ডাকা হয় আন্দোলনের সমর্থনে। বিশাল সংখ্যায় মহিলারা সামিল হন। আন্দোলনকারীদের সাধারণ মতামত ছিল এই যে দক্ষিণ ভারতের মানুষদের পৃথক জাতি-পরিচয় ও জাতি-চরিত্রকে অস্বীকার ও অবমাননা করে তাদের উপর উত্তর ভারতের 'আর্য জাতি পরিচয়' চাপিয়ে দেওয়ার অংশ এই হিন্দি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা—এর মধ্য দিয়ে তামিল ভাষাকে মুছে দিয়ে হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষাকে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা হচ্ছে। সাধারণভাবে তামিল সমাজের ব্রাহ্মণরা দক্ষিণ ভারতীয় হয়েও উত্তর ভারতের এই প্রচেষ্টার অংশীদার—এই মনোভাব থেকে আন্দোলনের মধ্যে তীব্র ছিল ব্রাহ্মণ-বিরোধিতা। আগের দুই দশক ধরে চলা 'অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন' এই হিন্দি-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। তামিলভাষী মুসলমানরাও এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, যদিও উর্দুভাষী মুসলমানরা ছিল হিন্দির পক্ষে। ১৯৩৮-এর ১ জুলাই ও ৩ ডিসেম্বর হিন্দি-বিরোধী দিবস হিসেবে পালনের ডাকে বড়ো সাড়া মিলেছিল। আন্দোলন আরো নানা চেহারা নিতে থাকে, যেমন, অনশন, হিন্দি পড়ানো হয় এমন স্কুল ঘেরাও, সরকারি দফতর ঘেরাও ইত্যাদি। রামনাত, তিনেভেল্লি, সালেম, তাঞ্জোর ও দক্ষিণ আরকোট—এই সমস্ত জেলায় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার রাষ্ট্রশক্তির দমনক্ষমতা ব্যবহার করে আন্দোলনের মোকাবিলা করার পথ নেয়। প্রচুর গ্রেফতার করা হয়। পুলিশি হেফাজতে থালামুধু ও নটরাজন নামে দুজন আন্দোলনকারী প্রাণ হারান। ১৯৩৯-এ পুলিশি দমনপীড়ন আরো তীব্র হয়ে ওঠে—১,১৯৮ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়, যার মধ্যে ১,১৭৯

জনকেই জেল-হাজতে বন্দী করা হয়। পেরিয়ারকে আন্দোলনে উসকানি দেওয়ার জন্য ১০০০ টাকা জরিমানা ও ১ বছর সশ্রম কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য হিন্দি শিক্ষার পক্ষে কিছু সমাবেশ করার চেষ্টা করেন, যা তেমন কোনো সাফল্য পায়নি। আন্দোলনে লাগাম পরাতে কায়েম হয় সরকারি দমননীতি বা পাল্টা আন্দোলনের প্রচেষ্টা।

১৯৩৯-এর ২৯ অক্টোবর কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করে ভারতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্ত করার প্রতিবাদে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রাজ্যপালের শাসন ঘোষিত হয়। এর কয়েক মাস আগে গ্রেফতার করা আন্দোলনকারীদের জেলহাজত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ৩১ অক্টোবর পেরিয়ার বিক্ষোভ প্রদর্শন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করে রাজ্যপালের কাছে আর্জি জানান বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দি পড়ানোর সরকারি নির্দেশ প্রত্যাহার করতে। ১৯৪০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপাল এসর্কিন সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা করেন যে হিন্দি পড়ানোর নির্দেশ বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ প্রত্যাহার করে তাকে ঐচ্ছিক করা হচ্ছে।

১৯৪৭-এ ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারতীয় রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা কী হবে তা নিয়ে এই অঞ্চলে আবার হিন্দি-বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে, যা ষাটের দশকে এসে বিস্ফোরণের আকার নেয়। এবার আমরা সেই ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই।

সরকারি ভাষা সম্পর্কে নীতি ও ১৯৬৫-র হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা ছিল ইংরেজি। ভারতীয় অভিজাতবর্গ বা মধ্যবর্গের যে অংশ সরকারি পদ বা সরকারি চাকরি অর্জনের মধ্য দিয়ে সামাজিক আরোহণের পথ গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তাদের কাছেও ইংরেজি ভাষা আত্মীকরণ করাই ছিল পাথেয়। জাতীয় কংগ্রেসের সভা-সমিতিও পরিচালিত হত ইংরেজি ভাষায়। ক্রমশ বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে এসে এই ভাষা-দাসত্ব নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে সচেতনতার উন্মেষ লক্ষ করা যায়। গান্ধীজি লেখেন যে ইংরেজি ভাষা 'আমাদের জাতির শক্তিকে শুষে নিয়েছে...আমজনতার থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছে... সুতরাং শিক্ষিত

ভারত যত তাড়াতাড়ি এই বিদেশী ভাষামাধ্যমের মোহিনী মায়া ঝেড়ে ফেলে মুক্ত হতে পারবে, ততই ভালো তাদের পক্ষে এবং দেশের আমজনতার পক্ষে।'[১] এর ধারাবাহিকতায় ১৯২৫ সালে কংগ্রেস তার নিয়মাবলী সংশোধন করে তার সভা-সমিতি পরিচালনার মূল ভাষা হিসেবে হিন্দুস্তানি ভাষাকে নির্দিষ্ট করে। ১৯২৮ সালের 'নেহরু রিপোর্ট'-এ বলা হয় যে ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেলার পর স্বাধীন ভারতের সাধারণ ভাষা হবে উর্দু অক্ষরে লেখা বা দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হিন্দুস্তানি ভাষা। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন ও সেই রাষ্ট্রের উর্দু ভাষাকে নিজের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার পর পরিস্থিতি পাল্টে গেল। তার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুত্ববাদকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জাতির পরিচয় গঠনের ঝোঁক জোরদার হল এবং তার অংশ হিসেবে প্রচুর উর্দু শব্দে সমৃদ্ধ হিন্দুস্তানির বদলে সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দিকে সরকারি ভাষা করার দাবি কংগ্রেসের উচ্চমহলে প্রাধান্য লাভ করল। এর ফলে ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধানে ঘোষিত হল যে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা হিন্দি ভারতের সরকারি ভাষা হিসেবে গণ্য হবে, উৎক্রমণকালীন পর্যায় হিসেবে ১৯৬৫ অবধি সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির ব্যবহারও বহাল থাকবে, ১৯৬৫ সালে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে তার পরের অবস্থা ঠিক করা হবে। পাশাপাশি সংবিধান ভারত সরকারের উপর দায়িত্ব আরোপ করে দেশজুড়ে হিন্দি ভাষা শিক্ষা ও হিন্দি ভাষা ব্যবহারের প্রসারের জন্য।

হিন্দি ভাষাকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী একটি জাতির পরিচয় নির্মাণের তাগিদ যেহেতু বহুলাংশে কাজ করছিল, তাই হিন্দি ভাষার প্রচারক প্রবর্তকরা ভাষাটির লোক-ব্যবহার ও জনবোধ্যতার কাছাকাছি একটি রূপ প্রমিতিকরণের বদলে ভাষাটির সংস্কৃত-অভিমুখী এক অভিজাত রূপ নির্দিষ্ট করায় মনোনিবেশ করলেন। ফলে সর্বভারতীয় বেতার সম্প্রচারের হিন্দি সংবাদের ভাষা হিন্দিভাষীদের কাছেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। স্বয়ং জওহরলাল নেহরু ১৯৫৮ সালে অভিযোগ করেছিলেন যে সর্বভারতীয় বেতারে তাঁর বক্তৃতা যে হিন্দি ভাষায় প্রচারিত হচ্ছে তা তাঁর নিজের কাছেই দুর্বোধ্য লাগছে।[২]

তামিলনাড়ু সহ গোটা দক্ষিণ ভারতে এই সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা করার বিরোধিতা প্রবল ছিল। ১৯৫০-এর সংবিধানের ঘোষণার

আগেই দক্ষিণ ভারত থেকে নির্বাচিত সদস্য টি. টি. কৃষ্ণমাচারি লোকসভায় বলেছিলেন: 'আমরা অতীতে ইংরেজি ভাষাকে অপছন্দ করতাম। আমি তা অপছন্দ করতাম কারণ আমাকে আমার পছন্দের বিরুদ্ধে শেকসপিয়র ও মিল্টন পড়তে জোর করা হত। আমাদের যদি এখন হিন্দি শিখতে বাধ্য করা হয়, আমার বয়সের জন্য হয়তো আমি তা পারব না, হয়তো বা যে বাধ্য-বাধকতা আমার উপর আরোপ করা হচ্ছে তার জন্য আমি তা শিখতে ইচ্ছুকও হব না। যে অসহনশীলতা দেখানো হচ্ছে তাতে আশঙ্কা হয় যে শক্তিশালী কেন্দ্র আমাদের প্রয়োজন তা হয়ত কেন্দ্রের ভাষা যাদের মুখের ভাষা নয় তাদের দাসে পরিণত করবে। সুতরাং, মহাশয়েরা, আমি সাবধান করে দিতে চাই যে দক্ষিণ ভারতে এখনই এমন অনেকে আছেন যাঁরা পৃথক হয়ে যেতে চান..., আর সে ক্ষেত্রে আমার উত্তরপ্রদেশের বন্ধুরা 'হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ'-কে যথাসম্ভব প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়ে আরও বিপদ ডেকে আনছেন। সুতরাং সম্মানীয় উত্তরপ্রদেশের বন্ধুরাই ঠিক করুন যে তাঁরা কী চান—সমগ্র ভারতকে চান, না কি হিন্দি ভারতকে চান।'[৩]

দক্ষিণ ভারতের যে পরিস্থিতি সম্পর্কে কৃষ্ণমাচারি এখানে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সেই পরিস্থিতি সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠেছিল তামিলনাড়ুতে। পেরিয়ারের নেতৃত্বাধীন জাতপাত-বিরোধী ও ধর্ম-বিরোধী স্বাভিমান আন্দোলন থেকে ১৯৪৪ সালে জন্ম নিয়েছিল 'দ্রাবিড় কাঝাগম' ('কাঝাগম' কথার অর্থ সংঘ) বা ডি কে। ১৯৪৯ সালে এই ডি কে থেকে বেরিয়ে এসে আন্নাদুরাই গঠন করেন 'দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগম' ('মুনেত্রা' কথার অর্থ প্রগতিশীল) বা ডিএমকে। ডি কে-র তুলনায় ডিএমকে তার প্রতিষ্ঠালগ্নে স্পষ্টতরভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও দ্রাবিড়-জাতীয়তাবাদী অবস্থান নেয়। আন্নাদুরাই, এম করুণানিধি ও এম জি রামচন্দ্রন—এই তিন নেতার জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে ডিএমকে তামিলনাড়ু জুড়ে অত্যন্ত সচল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে, গ্রামীণ যুবকরা তার মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। ডিএমকে যে অবস্থানের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে তা একইসঙ্গে ব্রাহ্মণ-বিরোধী, উত্তর-ভারত-বিরোধী ও আর্য-বিরোধী। তার মূল স্লোগান হয়ে ওঠে উত্তর ভারতের দ্বারা দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসনের উচ্ছেদ, বা তার

ভাষায় 'হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ'-এর উচ্ছেদ। সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দিকে মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে তো ডিএমকে বটেই, ডিএমকে-র মূল দাবি উত্তর ভারত থেকে পৃথক স্বাধীন দক্ষিণ ভারতীয় রাষ্ট্র অর্থাৎ স্বাধীন দ্রাবিড়নাড়ু বা দ্রাবিড় স্থানের দাবি। কৃষ্ণমাচারির লোকসভায় রাখা বক্তব্যের পিছনে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা নিঃসন্দেহে কাজ করেছিল।

কিন্তু কৃষ্ণমাচারির হুঁশিয়ারি তেমন কোনো দাগ কাটেনি উত্তর ভারতের সেইসব নেতাদের মনে যাঁরা হিন্দি ও হিন্দুত্ববাদকে কেন্দ্র করে ভারতের জাতীয় পরিচয় নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। জনসংঘ ও কংগ্রেসের নেতারা হিন্দিকে সরকারি ভাষা (একাংশ আবার কেবল 'সরকারি ভাষা'-য় থেমে না থেকে 'জাতীয় ভাষা') হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দ্রুততর করতে চাইছিলেন। ১৯৫৫ সালের ৭ জুন প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রথম সরকারি ভাষা কমিশন নিয়োগ করেন। ৩১ জুলাই ১৯৫৩-তে এই কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। সেই প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয় যে সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি ইংরেজিকে প্রতিস্থাপিত করবে ধাপে ধাপে, যার মধ্য দিয়ে সরকারের বিভিন্ন কাজে হিন্দি ভাষার ব্যবহার চালু হবে এবং এই পরিবর্তন ১৯৬৫ সাল থেকে লাগু হবে। কমিশনের মধ্যেরই দুইজন অবশ্য এই ব্যাপারে অন্য মত পোষণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন তামিলনাড়ুর পি সুব্বারোয়ান ও বাংলার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই দুইজন কমিশনের বাকিদের হিন্দির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি চালু থাকার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কমিশনের প্রতিবেদন পুনর্বিচার করার জন্য একটি বিশেষ যৌথ সাংবিধানিক কমিটি (Joint Parliamentary Committee) গঠন করা হয় ১৯৫৭-র সেপ্টেম্বরে গোবিন্দ বল্লভ পন্থের সভাপতিত্বে। দুই বছর আলোচনার পর এই কমিশন তার সুপারিশ রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করে ১৯৫৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। এই সুপারিশে হিন্দিকে মূল সরকারি ভাষা ও ইংরেজিকে গৌণ করার কথা বলা হয়।

এই সময় পর্যায়েই কিন্তু সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে হিন্দি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতে বিক্ষোভ ও বিরোধিতা ক্রমশ দানা বাঁধছিল। তেলেগু একাডেমি ১৯০৬ সালে সম্মেলন করে ইংরেজিক হিন্দি দিয়ে প্রতিস্থাপনের বিরোধিতা করে। এক সময় হিন্দির সমর্থক রাজাগোপালাচারি

তাঁর অবস্থান পাল্টে ১৯৫৮-র ৮ মার্চ একটি সর্বভারতীয় ভাষা সম্মেলন আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে তামিল, মালয়ালাম, তেলেগু, অসমিয়া, ওড়িয়া, মারাঠি, কন্নড় ও বাংলা ভাষার প্রতিনিধিরা অংশ নেন এবং ইংরেজির বদলে হিন্দিকে সরকারি ভাষা করার বিরোধিতা করে বলা হয় যে 'হিন্দির পক্ষে সওয়ালকারীদের কাছে ইংরেজি যতটা বিদেশি, যারা হিন্দিভাষী নয়, তাদের কাছে হিন্দিও ততটাই বিদেশি।'

১৯৫৩ সাল থেকে তামিলনাড়ুতে ডিএমকে তার হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করে। ১৯৫৩-র জুলাইয়ে ডিএমকে বিক্ষোভ শুরু করে একটি শহরের নাম বদলের দাবিতে। শহরটির নাম ছিল ডালমিয়াপুরম, দাবি করা হয় যে নাম বদলে কল্লাকুড়ি করতে হবে কারণ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার নামে শহরের নামকরণ উত্তর ভারতের দ্বারা দক্ষিণ ভারতের শোষণকে গৌরবান্বিত করে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে ওই শহরের রেলস্টেশনে রেল অবরোধ এবং হিন্দিতে লেখা সব নামফলক কালো রঙে ঢেকে দেওয়ায় নেতৃত্ব দেন করুণানিধি। তা পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ অবধি পৌছয়। দুজন ডিএমকে কর্মী মারা যান এবং বহুজন গ্রেফতার হন। এরপর হিন্দি-বিরোধিতা ও পৃথক দ্রাবিড়নাড়ুর দাবিতে আন্দোলন লাগাতার চেহারা নেয়। ১৯৫৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ডিএমকে একটি হিন্দি-বিরোধী সভা আহ্বান করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধতায়। ১৯৫৭-র ১৩ অক্টোর 'হিন্দি বিরোধী দিন' পালিত হয় গোটা তামিলনাড়ুতে। ১৯৬০-এর ৩১ জুলাই আরও একটি হিন্দি বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয় কোদামবাক্কামে।

দক্ষিণ ভারত, বিশেষ করে তামিলনাড়ু যেভাবে ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল হিন্দি-বিরোধিতায়, তা দিল্লির নেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে। ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট লোকসভায় বিতর্কে অংশ নেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন:

> দুটো জিনিস আমি বিশ্বাস করি।...কোনো চাপিয়ে দেওয়া চলবে না... ইংরেজি একটা সহযোগী অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে আমায় রাখতে হবে, আমি রাখব, অনির্দিষ্ট সময়পর্যায়ের জন্য, কতদিনের জন্য জানি না। এটা ইংরেজি ভাষার কোন সম্পদের বা বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়, বরং এই কারণে

> যে আমি চাই না হিন্দিভাষী নয় যারা তাদের মনে এমন কোনো ভাবনার জন্ম হয় যে সরকারের সঙ্গে হিন্দি ভাষার যোগাযোগ করতে হচ্ছে বলে কোনো অগ্রগতির দরজা তাদের কাছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা ইংরেজিতে যোগাযোগ করতে পারে। তাই আমি ইংরেজিকে একটি পরিবর্ত ভাষা হিসেবে রাখতে চাই যতদিন মানুষ তা প্রয়োজন বলে মনে করছে—এবং আমার মতে এই প্রয়োজনীয়তার সিদ্ধান্ত নেবেন যাঁরা হিন্দিভাষী নন তাঁরাই, হিন্দিভাষীরা তা নেবেন না।[৫]

নেহরুর এই আশ্বাস দক্ষিণ ভারতীয়দের কিছুটা আশ্বস্ত করলেও উত্তর ভারতীয় হিন্দি-হিন্দু-জাতীয়তাবাদীদের উষ্মার কারণ হয়েছিল। হিন্দি-হিন্দু-জাতীয়তাবাদীদের উষ্মা ও হিন্দি-বিরোধী দক্ষিণের বিক্ষোভ—এই দুইকে সামলে একটা ভারসাম্য বজায়কারী অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা হিসেবে ১৯৬৩ সালের ২১ জানুয়ারি লোকসভায় পেশ করা হয় 'সরকারি ভাষা আইন' তার উপস্থাপনা করতে গিয়ে নেহরু বলেন:

> একটি নির্দিষ্ট তারিখ, অর্থাৎ ১৯৬৫-এর পর ইংরেজির ব্যবহারের উপর সংবিধান যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, কেবলমাত্র তা সরিয়ে নেওয়ার জন্যই এই আইনের প্রস্তাবনা।[৬]

প্রস্তাবিত আইনের ৩ নং উপশাখায় বলা হয় যে 'হিন্দি ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা ব্যবহার চালু থাকতে পারে।' লোকসভা বিতর্কে ডিএমকে যুক্তি দেয় যে 'চালু থাকতে পারে'-র অর্থ 'চালু থাকবে' ও 'চালু থাকবে না' দুরকমই হতে পারে, সুতরাং এই ধন্ধ কাটিয়ে স্পষ্টভাবে 'চালু থাকতে হবে' বলতে হবে। রাজ্যসভায় এই যুক্তি তুলে প্রস্তাবিত আইনের সংশোধনী দাবি করেন ডিএমকে নেতা আন্নাদুরাই। কিন্তু আইনটি ২৭ এপ্রিল পাশ করে দেওয়া হয় সংশোধনী ছাড়াই। তার প্রতিবাদে তামিলনাড়ুতে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ প্রদর্শন শুরু হয় ডিএমকে-র নেতৃত্বে। ১৯৬৩-র নভেম্বরে এক হিন্দি-বিরোধী সভায় আন্নাদুরাই সংবিধানের ১৭ নং অংশ সর্বসমক্ষে আগুনে পুড়িয়ে দেন। সংবিধান অবমাননার অভিযোগে আন্নাদুরাই ও ৫০০ ডিএমকে কর্মীকে গ্রেফতার করে তামিলনাড়ুর কংগ্রেসী সরকার। আন্নাদুরাইকে ৬ মাসের জেলহাজত শাস্তি দেওয়া হয়। এর পরপরই ১৯৬৪-র ২৫ জানুয়ারি চিন্নাস্বামী, এক ডিএমকে

কর্মী, নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন জনসমক্ষে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। 'ভাষা শহিদ' হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে গোটা তামিলনাড়ু উত্তাল হয়ে ওঠে।

এই সময়েই ১৯৬৪ সালের মে-তে নেহরু মারা যান এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হন। শাস্ত্রী যেহেতু নিজে হিন্দিকে একমাত্র সরকারি ভাষা করার জোরালো প্রবক্তা ছিলেন, তাই আশঙ্কা তৈরি হয় যে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া আরো জোরদার হবে। এর কিছুদিন আগে, ১৯৬৪-র ৭ মার্চ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. ভক্তবৎসলম রাজ্যে ইংরেজি, হিন্দি ও তামিল এই তিনটি ভাষার পাশাপাশি ব্যবহার প্রস্তাব করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে বিক্ষোভ তৈরি হচ্ছিলই, এখন সেটা ফুলে-ফেঁপে ওঠে এই আশঙ্কা থেকে যে সংবিধানের প্রস্তাবিত ১৯৬৫ সালের পর হিন্দিকেই বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে আশঙ্কা তুঙ্গে ওঠে যে উচ্চ-শিক্ষা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজির বদলে হিন্দি চালু করে তাদের সেইসমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং উত্তর ভারতীয়রা সব সুযোগ করায়ত্ত করতে তাদের উপর ছড়ি ঘোরাবে।

ডিএমকে-র অবস্থানে অবশ্য ইতিমধ্যে একটি পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯৬২ সালে সংবিধানের ১৬ নং সংশোধনী করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল যে কোনোরকম পৃথক রাষ্ট্র গড়ার আন্দোলনকে বরদাস্ত করা হবে না। চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধকে অজুহাত করে ভারতীয় শাসকরা রাষ্ট্রের সমস্ত দমনশক্তি নিয়োগ করতে থাকে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা যেখানে যা প্রকাশিত হয়েছে তা নির্মূল করার জন্য। এই চাপের মুখে ডিএমকে পৃথক দ্রাবিড়নাড়ুর দাবি থেকে সরে এসে ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের একটা দল হিসেবে সংসদীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে জায়গা করে নেওয়ায় ধ্যান দেয়। শিথিল হয়ে আসে তার ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও জাতপাত-বিরোধী মনোভাবও। এখন এই সংগঠন ব্রাহ্মণ সহ গোটা তামিল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আর্থ-সামাজিক সংস্কার-উন্নয়ন ও তামিল ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশ নিজের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। ১৯৬৫ ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ তুঙ্গে উঠতে থাকা হিন্দি-বিরোধী আন্দোলনে সামনে উঠে আসে এই পরিবর্তিত ডিএমকে।

সংবিধানে উল্লিখিত সময়সীমা ১৯৬৫-র ২৬ জানুয়ারি যত এগিয়ে আসতে থাকল, ততই তামিলনাড়ুর ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। জানুয়ারির গোড়াতেই গঠিত হল 'তামিলনাড়ুর ছাত্র-ছাত্রীদের হিন্দি-বিরোধী বিক্ষোভ পরিষদ' যা বিভিন্ন স্থানের ও প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভে সমন্বয়সাধন করবে বলে ঠিক হল। ১৭ জানুয়ারি ত্রিচি-তে আয়োজিত হয় 'মাদ্রাজ রাজ্যের হিন্দি-বিরোধী সম্মেলন', যেখানে মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, কেরালা ও মাইসোর থেকে ৭০০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। তাঁরা সংবিধানের ১৭ নং অংশকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি রাখার প্রস্তাব পাশ করেন।

এই পরিস্থিতিতে দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার সম্মুখসমরের সিদ্ধান্ত নিল। স্বরাষ্ট্র দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার দফতর সরকারি নির্দেশ জারি করল যে ২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৫ সাল থেকেই ইংরেজিকে প্রতিস্থাপিত করা হবে হিন্দি দিয়ে। এর জবাবে ডিএমকে-র আন্নাদুরাই ঘোষণা করলেন যে তাঁরা ওই দিনটিকে গোটা তামিলনাড়ু জুড়ে কালা দিবস হিসেবে পালন করবেন। তামিলনাড়ুর কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ভক্তবৎসলম হুঁশিয়ারি দিলে যে দেশের প্রজাতন্ত্র দিবসকে 'কালা দিবস' হিসেবে পালনের অপমান সহ্য করা হবে না। ডিএমকে এরপর কালা দিসব পালন একদিন এগিয়ে দেয়। ২৫ জানুয়ারি হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যুবক-যুবতী রাস্তায় নামে কালা দিবস পালনে। সরকারি পুলিশ আন্নাদুরাই সহ ৩০০০ বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠায়। ওই দিনেই মাদুরাইতে বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রী ও কংগ্রেস পার্টিকর্মীদের মধ্যে সংঘাত থেকে ক্রমশ দাঙ্গা ছড়িয়ে যায় গোটা শহরে। অচিরে ওই শহরের গণ্ডি পেরিয়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে যায় গোটা তামিলনাড়ু জুড়ে। মাদ্রাজ শহরের বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা যৌথভাবে ৫০,০০০ জন মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করতে যায়, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাদের সঙ্গে দেখা করেন না। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর দফতরে ভাঙচুর, আগুন লাগিয়ে দেওয়া, লুঠতরাজ চালাতে থাকে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা। মারমুখী জনতার হাতে দুইজন পুলিশকর্মী নিহত হন। একাধিক বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারী গায়ে আগুন লাগিয়ে অথবা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন প্রতিবাদস্বরূপ। রেলগাড়িতে ও রেলস্টেশনে হিন্দিতে লেখা সমস্ত ফলক পুড়িয়ে দেওয়া হয়, বিদ্যুৎ যোগাযোগের খুঁটি উপড়ে দেওয়া হয়, রেললাইন উপড়ে দেওয়া হয়। দুই সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ-

দাঙ্গায় সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ৭০, বেসরকারি হিসেবে তা ৫০০-র উপরে। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রেফতার করে হাজতে পোরা হয়।

দুই সপ্তাহ জুড়ে বিক্ষোভ-দাঙ্গা চলার পর তা ডিএমকে নেতৃত্ব বা ছাত্র-যুব নেতৃত্বর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও আর ছিল না। সরকারপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ কোনো একটা সমঝোতা খোঁজার চেষ্টা করার পরও, বারবার আন্নাদুরাইয়ের 'শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা'-র আবেদন সত্ত্বেও বিক্ষোভ-দাঙ্গা চলতে থাকে। ১১ ফেব্রুয়ারি শেষাবধি দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী পিছু হঠতে বাধ্য হন। তিনি তামিলনাড়ুর মানুষদের কথা দিতে বাধ্য হন যে বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রে, যেমন, কেন্দ্র-রাজ্য বক্তব্য বিনিময়ে, আন্তঃরাজ্য বক্তব্য বিনিময়ে, সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ও চাকরির পরীক্ষায়, ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অনির্দিষ্টকাল বহাল থাকবে।

শাস্ত্রীযর প্রতিশ্রুতিদানের পরের দিন তামিলনাড়ুর-ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষদ তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে ইতি ঘোষণা করে। মার্চের গোড়া অবধি তবুও বিছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে বিক্ষোভ-প্রদর্শন চলতেই থাকে। ৭ মার্চ রাজ্যের কংগ্রেসি সরকার বিক্ষোভের সময় গ্রেফতার করা সবার উপর থেকে সমস্ত রকম অভিযোগ প্রত্যাহার করে মুক্তি ঘোষণা করে।

শাস্ত্রীর পশ্চাদপসরণ হিন্দি-হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দি-প্রশ্নে বিভাজন প্রকট হয়ে ওঠে। জনসংঘ হিন্দি-হিন্দু-জাতীয়তাবাদের একরোখা প্রবক্তা হিসেবে কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে বাড়াতে ক্রমে কংগ্রেস-বিরোধী অবস্থানে পৌঁছয়।

১৯৬৫-র আগস্টে শেষাবধি শাস্ত্রীর প্রতিশ্রুতি আইন হিসেবে পাশ হওয়ার জন্য লোকসভায় পেশ হয়। তিক্ত বিতর্কের পর এই প্রস্তাবিত আইন পাশ না হয়ে সাময়িকভাবে ফিরিয়ে নেওয়া হয় পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের 'সংকটজনক পরিস্থিতির' অজুহাত দিয়ে।

তামিলনাড়ুর হিন্দি-বিরোধী অভিযানের মধ্য দিয়ে তামিলদের প্রতিনিধি হিসেবে সামনে উঠে এসেছিল ডিএমকে। তার কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়েছিল। তার ছাপ পড়ল ১৯৬৭-র রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে। ২৩৪টা আসনের মধ্যে ১৩৮টা আসন জিতে ডিএমকে সরকার গঠন করে।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরেই কেন্দ্রীয় লোকসভায় পাশ হয় ভাষা আইনের সংশোধনী যার মধ্য দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য সরকারি কাজে দ্বিভাষিকতার নীতি অর্থাৎ হিন্দি ও ইংরেজি দুটোই ব্যবহারের নীতি নেওয়া হয়। এই সংশোধনী ১৯৬৮-র ৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায়।

তামিলনাড়ুর হিন্দি-বিরোধী আন্দোলনকারীরা এই সংশোধনীর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল কারণ তা তাদের রাজ্যে পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের তিন-ভাষা-নীতি (হিন্দি-ইংরেজি-তামিল)-র ধারাবাহিকতায় হিন্দি ভাষার প্রাধান্য বজায় রাখবে বলেই তারা মনে করেছিল। কিন্তু এতদিনের হিন্দি-বিরোধী আন্দোলনের নেতা ডিএমকে এখন সরকারে থাকায় আন্দোলন করলে তার বিরুদ্ধেও করতে হয়—এই ভাবনা আন্দোলনকারীদের মধ্যে দ্বিধা তৈরি করল। 'তামিলনাড়ুর ছাত্র-ছাত্রীদের হিন্দি-বিরোধী বিক্ষোভ পরিষদ' বিভিন্ন ভাগে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নরমপন্থী অংশ আন্দোলনের পথে না গিয়ে ডিএমকে ও তার নেতা আন্নাদুরাইয়ের হাতে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব/ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চাইল। অন্যদিকে চরমপন্থী অংশ সেই মুহূর্তেই আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল। আন্দোলনের দাবি হিসেবে উঠে এল তিন-ভাষা-নীতি খারিজ করা (অর্থাৎ হিন্দি খারিজ করে কেবল দুই ভাষা ইংরেজি ও তামিল রাখা), ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস-এ হিন্দিতে আদেশদান বন্ধ করা, হিন্দি চলচ্চিত্র ও গানের প্রচার বন্ধ করা এবং হিন্দি ভাষা শিক্ষা প্রচারের জন্য সরকারি সমস্ত ব্যবস্থা বন্ধ করা। এই দ্বিতীয় অংশের উদ্যোগে ১৯৬৭-র ১৯ ডিসেম্বর থেকে আবার বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়। ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা, আগুন লাগানো, লুঠ, ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়। আন্নাদুরাই দ্রুত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বিক্ষোভকারীদের বেশিরভাগ দাবি মেনে নেন। ১৯৬৮-র ২৩ জানুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় সেই অনুযায়ী আইন প্রণয়ন হয় যে:

১. তিন-ভাষা-নীতি বাতিল হল, পাঠ্যসূচি থেকে হিন্দি বাদ হল, কেবলমাত্র ইংরেজি ও তামিল ভাষা পড়ানো হবে।
২. ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস-এ হিন্দিতে আদেশদান নিষিদ্ধ হল।
৩. সমস্ত কলেজে শিক্ষাদানের ভাষা হিসেবে ও প্রশাসনের সমস্ত স্তরে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে পাঁচ বছরের মধ্যে তামিল চালু করা হবে।

৪. কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানানো হল যে সংবিধান সংশোধনী যেন এমনভাবে আনা হয় যে হিন্দি ভাষার প্রতি পক্ষপাতমূলক অবস্থান না রেখে সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে সমগুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।

ভাষা ও আধিপত্য

'হিন্দি নেভার, ইংলিশ এভার' (হিন্দি কখনো নয়, ইংরেজি সর্বকালের জন্য)—তামিল হিন্দি-বিরোধী আন্দোলনের একটা বিখ্যাত স্লোগান। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ থেকে ষাটের দশক, যে সময় এই হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তা এমন একটা সময় যখন ভারসাম্যের বদলে স্থিতিহীনতাই প্রকট সমাজ-রাজনীতিতে। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ভেঙে পড়ছে, ফলত সমাজের বুকে জাগ্রত হচ্ছে শাসন ও আধিপত্যের বেড়ি খুলে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা, অন্যদিকে যেন পুরানো আবার নতুন হয়ে ফিরে এসে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে শাসন-আধিপত্যের নয়া বেড়ি, তাই মুক্তির সম্ভাবনা-আশা ফিকে হতে হতেও দপ করে আবার জ্বলে ওঠা নয়া বেড়ির বিরুদ্ধে। তামিলনাড়ুতে প্রথমে অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন, তারপর স্বাভিমান আন্দোলন ও তারও পরে দ্রাবিড় জাতীয় পরিষদ ও স্বাধীন দ্রাবিড়নাড়ুর দাবিতে আন্দোলনগুলো তাদের চরমপন্থী সময়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বন্ধন, ধর্মান্ধতার বন্ধন-এর মতো সমাজের বহু পুরানো কিছু বন্ধনকে ধরে টান মেরেছে। আবার তার বিরোধিতার বস্তু যে ব্রাহ্মণ্যবাদ তা যেন উপনিবেশের পতনের পর নতুন চেহারা নিয়েছে হিন্দি-হিন্দু-জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে, ফলে চরমপন্থী সময় পেরিয়ে এসে ব্রাহ্মণ বিরোধিতা দুর্বল হতে থাকলেও হিন্দি-হিন্দু-জাতীয়তাবাদ বিরোধিতা জাগরুক থেকেছে। আবার যে স্লোগানের কথা বলে এই অংশের কথা শুরু, সেই হিন্দি ও ইংরেজি দুটোই এই অঞ্চলে 'বাইরের ভাষা'। ইংরেজি ভাষা ঔপনিবেশিক শাসন-প্রশাসন-যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল শাসকদের ভাষা, আর হিন্দি হল উপনিবেশের পতনের পর যারা নতুন শাসক হয়ে উঠতে চাইছে বলে এ অঞ্চলের শঙ্কা, তাদের ভাষা। ঔপনিবেশিক শাসকদের থেকে দেশীয় অভিজাতশ্রেণির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর যখন শাসন-আধিপত্যের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোটাকে অটুট রেখেই হল, তখন অঞ্চলের অভিজাত অংশ বা অভিজাত

হওয়ার প্রত্যাশী অংশের কাছে শাসন-প্রশাসনের খিলানে উঠে আসার পথ খুলে গেল। এই খিলানে উঠে আসার পাথেয় ইংরেজি ভাষা যার সঙ্গে পরিচয় ঔপনিবেশিক শিক্ষাই করিয়েছে। কিন্তু যদি খিলানে ওঠার পাথেয় ইংরেজির বদলে 'হিন্দি' হয়ে যায় তাহলে হিন্দিভাষীদের যেমন সুবিধা, অ-হিন্দিভাষীদের তেমনই বেশি অসুবিধা। ইংরেজি থাকা অসুবিধাকে সমানভাবে ভাগ করে দেবে। এই জায়গা থেকেই কি হিন্দি-বিরোধী আন্দোলনে কেন্দ্রীয় জায়গায় চলে এল প্রশাসনিক ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজির ব্যবহারকে বজায় রাখার তাগিদ আর ক্রমশ প্রান্তে সরে গেল মাতৃভাষা তামিল ও তামিল সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক পরাধীনতা কাটিয়ে স্বাভিমান অর্জন ? এই সমস্ত প্রশ্ন তামিল ও সেইসঙ্গে ভারতীয় সমাজ-রাজনীতির ইতিহাসের আরো নিবিড় পাঠের প্রয়োজনীয়তা হাজির করে দেয়।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সূত্রনির্দেশ

১. গান্ধী রচনাবলি, খণ্ড ৩৭, পৃ. ১২।

২. ইন্ডিয়া সিনস ইন্ডিপেন্ডেন্স, বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি ও আদিত্য মুখার্জি, পৃ. ১১৮।

৩. হিন্দি শভিনিজম, রামচন্দ্র গুহ।

৪. ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড ন্যাশনাল আইডেনটিটি ইন এশিয়া, অ্যান্ড্রু সিম্পসন, পৃ. ৭১

৫. দি স্টোরি অফ ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, ললিতা কৃষ্ণমূর্তি, পৃ. ১১৩।

৬. ল্যাংগুয়েজ মুভমেন্টস এগেইনস্ট হিন্দি অ্যাজ অ্যান অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ, ই আন্নামালাই।

৭. দি পাজল অফ ইন্ডিয়াজ গভর্নেন্স : কালচার, কনটেক্সট অ্যান্ড কমপারেটিভ থিওরি, সুব্রত কুমার মিত্র, পৃ. ১১৮-১২০।

আসামের বরাক উপত্যাকার বাংলা ভাষা আন্দোলন

বিপ্লব নায়ক

১৯৬০–৬১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম রাজ্য ভাষা করার দাবি কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেইসময় অসমীয়াভাষী ও বাংলাভাষীদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে, সাম্প্রদায়িকতাকেও উশকে দেওয়া হয়। নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের অধিকার নিয়ে সেই আন্দোলন ও তার পরিণতি বোঝার প্রয়াস এই আলোচনা। আসামের এই ঘটনার পিছনে যেমন আসামের বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস। প্রথমে এই দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক-সামাজিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিটিকেই দেখা যাক, যার উপর দাঁড়িয়ে আমরা আসামের বিশেষ ক্ষেত্রটির আলোচনায় ঢুকব।

সাধারণ ভারতীয় প্রেক্ষিত

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক জুড়ে কেবলমাত্র আসামে নয়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের মতো ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও ‘মাটির পুত্র’-র অধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মূল দাবিগুলো যে ভাবনার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল, তা এই যে কোন একটি রাজ্য সেই রাজ্যের প্রধান ভাষিক গোষ্ঠীর ‘মাতৃভূমি’, যেখানে সেই ভাষিক গোষ্ঠীর মানুষজনই ‘ভূমিপুত্র’

বা স্থানীয় বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। অন্যান্য ভাষিক গোষ্ঠীর মানুষজন, যত দীর্ঘকালই তারা সেখানে বাস করুক না কেন বা কর্মসূত্রে থাকুক না কেন, ‘বহিরাগত’, ‘ভূমিপুত্র’-দের সমান হক বা অধিকার তাদের নেই।

ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি ও আদিত্য মুখার্জি এর কারণ বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে:

> ১৯৫২-পরবর্তী অর্থনৈতিক অগ্রগতির জোয়ারে দেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে শহরগুলোয়, অর্থনৈতিক সুযোগের অসম বিকাশ ঘটেছিল। এর ফলাফল হয়েছিল নব্যসৃষ্ট চাকরি ও শিক্ষার সুযোগে ‘বহিরাগতদের’ আগে ‘স্থানীয়’ বা ‘ভূমিপুত্র’-দের অগ্রাধিকারের দাবি। অর্থনৈতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক সুযোগ ভোগ করার জন্য সংগ্রামে প্রায়শই হাতিয়ার করা হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা, জাত-বিদ্বেষ ও স্বজনপোষণকে। একইভাবে, ভাষা-আনুগত্য ও আঞ্চলিকতাকেও ব্যবহার করা হয়েছিল ‘বহিরাগত’-দের শহর বা রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবন থেকে সুপরিকল্পিতভাবে বাইরে রাখার জন্য।...‘ভূমিপুত্র’ গোত্রীয় আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছে এবং তীব্রতা পেয়েছে প্রধানত যখন আধুনিক শিল্পের ও মধ্যবিত্ত-আকাঙ্ক্ষিত চাকরির জন্য বাইরে থেকে আসা মানুষজনের সঙ্গে স্থানীয়, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত যুবাদের প্রকৃত বা সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা হাজির হয়েছে। সেই সমস্ত রাজ্য বা শহরেই এই সংঘাত সবচেয়ে তীব্র রূপ ধারণ করেছে যেখানে ‘বহিরাগত’-দের তুলনায় বেশি যোগ থেকেছে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে, তুলনায় বেশি মধ্যবিত্ত-আকাঙ্ক্ষিত পদ অধিকারে থেকেছে সরকারি চাকরিতে, পেশায় বা শিল্পে এবং ক্ষুদ্রশিল্প বা পাইকারির ছোটো ব্যবসায়।[১]

ভারতজোড়া এই সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত আসামের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব বিশেষ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে এক বিস্ফোরক আকার নিয়েছিল। আসামের সেই বিশেষ প্রেক্ষিতটি এইবার দেখা যাক।

আসামের বিশেষ প্রেক্ষিত

পাহাড়, জঙ্গল ও নদী উপত্যকার বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক পরিবেশে ঋদ্ধ এই অঞ্চল বিভিন্ন উপজাতির মানুষের বাসস্থান, যাদের ভাষা, সামাজিক সংগঠন ও ইতিহাস বৈচিত্র্যে বহুস্বরময়। বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের লোকজীবন-

ভাষা-সংস্কৃতি দীর্ঘ ইতিহাসের পথ পেরিয়েও তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। অসমীয়াভাষীরা ১৯৫০-এর দশকে এই অঞ্চলের একটি বৃহৎ ভাষিক গোষ্ঠী হলেও কখনোই তা মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ হয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৫১-র সরকারি সমীক্ষা ঘিরে এমন বহু অভিযোগ আছে যে তাতে অসমীয়াভাষীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেই সমীক্ষাতেও অসমীয়াভাষীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৫% মাত্র।

আসামে যাঁরা অসমীয়া ভাষা ও জাতির পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক পরিবেশ গড়তে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে এটা ছিল এক উদ্বেগের বিষয়। 'নিজ দেশে সংখ্যালঘু' হয়ে যাওয়ার উদ্বেগ তাঁদের ছিল। ১৯৫০ দশকের পূর্বালোচিত সাধারণ ভারতীয় পরিস্থিতি এই উদ্বেগকে আরও বাড়িয়েছিল। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। অসমীয়াদের দীর্ঘকালীন তীব্র অভিযোগ ছিল যে আসামের অবিকাশের সমস্যা বা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা হল ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলাফল। কেন্দ্রীয় সরকার আসাম থেকে খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ আহরণ করে নিয়ে গিয়ে তা দেশের অন্যত্র উন্নয়নে লাগাতে ব্যস্ত, কিন্তু তার জন্য আসাম না পাচ্ছে যথাযথ মূল্য, না কেন্দ্রীয় সরকার অন্য কোনো উন্নয়ন বা বিকাশের কর্মসূচি আসামের জন্য নিচ্ছে। এর পাশাপাশি অসমীয়াদের ক্ষোভ আসামে বসবাসকারী মাড়োয়ারি ও বাঙালিদের উপরও ছিল কারণ তারা মনে করত যে মাড়োয়ারি ও বাঙালিরা আসামে ব্যবসাপত্র পেশা ও চাকুরির উপরতলাটা সব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে আয়-উপার্জন নিজেদের কুক্ষিগত করছে, তা অসমীয়দের উন্নতিতে কাজে লাগছে না।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণেই আসামে বাঙালিদের বড়ো বসতি গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের বণিজ্যিক স্বার্থে অখণ্ড বাংলা থেকে শ্রীহট্টকে কেটে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেয় সেই ১৮৭৪ সালে। এর পর বাংলার ভেঙে দু-টুকরো হওয়া, সেই দুটুকরোর পূর্বের টুকরোটিকে আবার 'পূর্ব পাকিস্তান'-এ রূপান্তরিত করা—এই দীর্ঘ পর্যায়ের নানা টানাপোড়েনের ফলে আসামের বরাক উপত্যকা, গোয়ালপাড়া-র মতো অঞ্চলে বিভিন্ন সময় আরও বহু ছিন্নমূল বাঙালি বসত গড়েছেন। বাঙালিদের

মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার হার বেশি থাকায় ঔপনিবেশিক প্রশাসন থেকে শুরু করে সদ্য 'স্বাধীন' হওয়া দেশের প্রশাসনেও এই অঞ্চলে বাঙালিদের প্রায় একাধিপত্য ছিল। শিক্ষক, উচ্চ-পেশাজীবী ও সরকারি চাকরিতেও তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। ফলে শিক্ষিত অসমীয়া যুবকরাও ১৯৫০-র দশকের পর থেকে চাকরি পাওয়া বা উচ্চ-পেশায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঙালিদের বাধা হিসেবে দেখতে থাকল। এছাড়াও উচ্চ শিক্ষিত বাঙালিরা অসমীয়াদের সম্পর্কে যে ধরনের মনোভাব পোষণ করতেন তাও অসমীয়াদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই মনোভাবের এক ঝলক পরিচয় আমরা পেতে পারি ১৯৩৮-এ আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এর সভায় মোহাম্মদ শাদুল্লার বিবৃতির এই অংশ থেকে:

> ...সেই সময় (১৮৭৪ সালে) বাংলা থেকে বিযুক্ত করে যে জেলাগুলোকে আসামের সঙ্গে জোড়া হয়েছিল, তার অধিবাসীদের ধারণা ছিল যে আসাম হল একটা জঙ্গলের রাজ্য আর তার মানুষজন এখনকার সিনেমার পর্দায় দেখা 'টারজান'-এর থেকে উৎকৃষ্ট কিছু নয়। এই ধারণা দ্বারা চালিত হয়ে তৎকালীন শিলেট-এর বাসিন্দারা গভর্নর জেনারেল-এর কাছে এই মর্মে আবেদনপত্র পেশ করেছিল যে একটা বন্য দেশের বর্বর মানুষজনদের সাথে তাদের জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে যেন বাংলায় থাকাকালীন তারা যে বিচার ও প্রশাসনের সুযোগসুবিধা ভোগ করত, তার থেকে বঞ্চিত না করা হয়।[২]

ঔপনিবেশিক শাসকদের 'সভ্যতা'-র আলোকে নিজেদের আলোকিত ভেবে গর্বিত এই উচ্চশিক্ষিত বাঙালির অসমীয়াদের 'অসভ্য' বলে দেখার 'নাক-উঁচু'-পনা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের অসমীয়াদের ক্ষোভের পাত্র করে তুলেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০-এর দশকে আসামে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অসমীয়ারা আন্দোলন শুরু করে রাজ্য সরকারি চাকরিতে অসমীয়াভাষীদের অগ্রাধিকারের দাবিতে, আসামে অসমীয়াকেই একমাত্র রাজ্যভাষা করার দাবিতে এবং স্কুল-কলেজে অসমীয়াকেই একমাত্র মাধ্যম করার দাবিতে।

বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলায় বাঙালিরাই সংখ্যাধিক, তাছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলেও তারা সংখ্যায় বেশ বড়ো। তারা পাল্টা আন্দোলন গড়ে

তোলে অসমীয়া ও বাংলা দুটোই সরকারি ভাষা — ১৮৭১ থেকে চালু হওয়া এই আইনকে অপরিবর্তিত রাখার দাবিতে। ধীরে ধীরে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় অসমীয়া ছাড়া আসামের অন্য সমস্ত ভাষার সমানাধিকারের দাবিও। বরাক উপত্যকার এই আন্দোলনের দিনপঞ্জির দিকে এবার নজর ফেরানো যাক।

বিক্ষুব্ধ দিনপঞ্জি

১৯৫৫

এই বছরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যিক পুনর্গঠন কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনে আসাম সম্পর্কে বলা হয় যে এই রাজ্যে অসমীয়াভাষী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৫%-এর বেশি নয় এবং আসামের ভাষিক চরিত্র সংমিশ্র ('composite'), সুতরাং তাকে একভাষিক ('monolingual') রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এর প্রতিক্রিয়ায় অসমীয়া ভাষা ও জাতীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে আসামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাবকদের মধ্যে একটা অংশ চরমপন্থী পথ নেয়। 'খিলঞ্জিয়া'অর্থাৎ স্থানীয় অধিবাসী নয় এই অজুহাত তুলে বার বার বাঙালি কৃষকদের মাঠের ফসল পুড়িয়ে দেওয়া, হাতির দল দিয়ে বাড়িঘর ধ্বংস করা, ভয়-ভীতি জাগিয়ে অসমীয়া বলে পরিচয় দানে বাধ্য করা—এভাবে অসমীয়াকরণের প্রয়াস শুরু হয়। স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এতে মদতও দেয়। এর ফলে বাঙালি, মিজো, খাসিয়া, গারো, নাগা, মণিপুরী ইত্যাদি বিভিন্ন অনঅসমীয়া জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে তীব্র পাল্টা-প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনের সংকল্প ঘোষণা করে।

১৯৬০

এই বছরের ২১ ও ২২ এপ্রিল আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক সভায় অসমীয়াকে আসামের একমাত্র রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বাঙালি-প্রধান কাছাড়ের সদস্যরা প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা

করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে তা গৃহীত হয় এবং তা কার্যকরী করার উদ্যোগ নিতে রাজ্য মন্ত্রীসভাকে বলা হয়।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে শুরু হয়ে যায় ‘বঙ্গাল খেদা’ (বাঙালিদের তাড়াও) আন্দোলন। ১৯৫০ সালেও একবার এই আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছিল, কিন্তু এবার তা আগের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় রেল ও বাসপথে বাঙালি চিহ্নিত করে অত্যাচার ও লুঠপাট চলে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ বাঙালি ছাত্ররা সন্ত্রাসের শিকার হয়।

এই আবহে ৭ মে শিলচরে বাংলাভাষীরা মিলিত হয়ে ‘নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলন’ সংগঠিত করার জন্য প্রস্তুতি কমিটি গড়ে তোলে। এই প্রস্তুতি কমিটির ডাকে ২১ জুন শিলচর নরসিংটোলায় বড়ো সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১-৩ জুলাই শিলচরে ‘নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাংলাভাষাকে রাজ্য ভাষা হিসেবে রেখে দেওয়ার দাবি ও শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষাকে সংকুচিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলা হয়।

পরদিন ৪ জুলাই থেকে গোটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে যায়। ৪ জুলাই গৌহাটিতে অসমীয়া ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলি চললে রঞ্জিৎ বরপুজারী নামে এক ছাত্র মারা যান। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা বরপুজারীর মৃতদেহ নিয়ে গৌহাটি থেকে ডিব্রুগড় মিছিল করে যেতে যেতে পথের দুধারে বহু বাঙালির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিদ্বেষের লেলিহান শিখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি হিসাব মতে এই দাঙ্গায় ৪০ জন প্রাণ হারান, ১০,০০০-এর উপর বাড়িঘর জ্বলেপুড়ে ধ্বংস হয়, ৫০, ০০০-এর মতো মানুষ নিরাশ্রয় বাস্তুহীন হন। বহু বাঙালি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে বাঙালি-প্রধান কাছাড়ে বা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেয়।

১৯৬১

১৯ এপ্রিল: কাছাড় জেলা গণসংগ্রামে পরিষদের সভা করে সেখানে বাঙালিদের ভাষিক ও অন্য অধিকার রক্ষার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ‘সত্যাগ্রহী’ দল গঠন করে গোটা বরাক উপত্যকা জুড়ে

সভা, শোভাযাত্রা, পদযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে 'আন্দোলনমুখী গণচেতনা' সংহত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

১৯ এপ্রিল থেকে ২ মে: 'মাতৃভাষার লাঞ্ছিত সম্মান পুনরুদ্ধারের সংকল্প নিয়ে' সত্যাগ্রহী দলের পথ পরিক্রমা কর্মসূচি নেওয়া হয়। ১৯ এপ্রিল ভোর চারটেয় করিমগঞ্জ টাউন ব্যাংক প্রাঙ্গণ থেকে ২৫ জনের সত্যাগ্রহী দলের পদযাত্রা শুরু হয়। নয়াবাড়ি, চান্দশ্রীকোণা, গিরিশগঞ্জ বাজার, সাদারাশি গ্রাম অতিক্রম করে সেইদিন দুপুরে লক্ষ্মীবাজার, তারপর সেইখান থেকে সুতারকান্দি, ফকিরের বাজার হয়ে সন্ধ্যায় লাতু। পরদিন লাতু থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে গান্ধাই পৌঁছে জনসভা। তারপর আবার যাত্রা শুরু করে নিলামবাজার হয়ে কায়স্থগ্রাম। এইভাবে প্রতিদিন গ্রাম-গঞ্জ-শহর-বাজার পরিক্রমা করতে করতে প্রচার, পথসভা, জনসভা চলতে থাকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে পথ-পরিক্রমায় সঙ্গী হিসেবে যোগ দিতে থাকেন অনেকে। ২৬ এপ্রিল রাত নটায় দত্তপুরে পৌঁছে যে জনসভা হয়, সেখানে অন্যতম সত্যাগ্রহী শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন বলেন :

> ...জওহরলালের রাজত্বে সবল আন্দোলন ছাড়া আজ আর কোনো দাবি আদায় হয় না। যখন মহারাষ্ট্র জাগল, তখনই গুজরাট-বোম্বাই ভাগাভাগি হল। মাদ্রাজেও রামালুর আত্মদানে রাজ্যভাগ হল, পাঞ্জাবে শিখদের আন্দোলনের কাছে সরকারকে মাথা নত করতে হল। নেহরু সরকারকে আমরা গণতান্ত্রিক আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে দাবির পর দাবি পেশ করে এসেছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তাই আজ গণসংগ্রামের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

২ মে এওলাবাড়ি বাগানে সকাল নটায় পৌঁছে সেখানে কৃষক ও শ্রমিকদের এক বড়ো সমাবেশে সত্যাগ্রহীরা ভাষণ দেন। তারপর অম্বরখানা, করিমগঞ্জ হয়ে শিলচরে ফিরে আসেন- পদযাত্রীর সংখ্যা তখন কয়েক হাজার। শিলচরে বড়ো জনসমাবেশ ও সভা হয়।

১০ মে থেকে ১৩ মে: হাইলাকান্দি মহকুমায় আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন সংগঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১০ মে আরও একটি পদযাত্রা সংগঠিত হয়। নানা গ্রাম গ্রামান্তর পরিক্রমা শেষে ১৩ মে হাইলাকান্দি শহরে ফিরে সেখানে বড়ো জনসভা হয়।

অন্যদিকে, আসাম রাজ্যের প্রশাসন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ও কংগ্রেসের দলীয় রাজ্যস্তরের নেতৃবৃন্দ দলীয় স্তরে নানারকম চাপ ও প্রলোভন দিয়ে 'বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত করার চেষ্টা জোরদার করে। কিন্তু তার থেকেও বহুগুণ মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় এই যে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকা আন্দোলন ছত্রখান করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি উস্কে দেওয়ার নানা কৌশল নেওয়া হয়। হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে, মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে, মণিপুরী ও অন্যান্য অবাঙালি জাতিগোষ্ঠীর একাংশ বাঙালির বিরুদ্ধে, স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে—এইভাবে নানা বিভেদমূলক উস্কানি ছড়ানো হতে থাকে।

১৮ মে: কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারি দমননীতি ও বিভাজনের কূট কৌশলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে পরের দিন অর্থাৎ ১৯ মে গণআন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ১৮ মে ছিল আসামের 'স্কুল ফাইনাল' পরীক্ষার শেষ দিন। পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়েই ছাত্রছাত্রীরা মিছিলে সামিল হয় শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের সর্বত্র। ওইদিনই রাত ১২টা থেকে পুলিশবাহিনী কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন নেতা ও সংগঠকদের গ্রেফতার করতে শুরু করে করিমগঞ্জে।

১৯ মে: ভোর থেকে করিমগঞ্জ বিক্ষোভে উত্তাল চেহারা নেয়। ভোর চারটে থেকে রেল অবরোধ শুরু হয় করিমগঞ্জ স্টেশনে। তা তুলতে পুলিশ ব্যাপক লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ক্ষুব্ধ জনতা এলংজুরি ও ভাট গ্রামের মধ্যে আধ কিলোমিটার রেললাইন উপড়ে ফেলে। জেলার সর্বত্র সর্বাত্মক বন্ধ সবকিছু থমকে দেয়। কোর্ট, কাছারি, ডাকঘর, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সব কার্যালয়ের সামনে গণসংগ্রাম পরিষদের সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্বে পিকেটিং চলতে থাকে। পুলিশের আক্রমণে দেড়শ-র উপর বিক্ষোভকারী আহত ও ১৩৪ জন গ্রেফতার হয়। লালা, পাথারকান্দি শহর ও রেলশহর বদরপুরে বিক্ষোভপ্রদর্শন জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের চেহারা নেয়। তবে সবচেয়ে বড়ো ঘটনাটা ঘটে শিলচর শহরে। কাটিগড়া থেকে চারজন সত্যাগ্রহীকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশে ঘিরে একটা পুলিশ ট্রাক এসে ঢোকে শিলচর শহরে। তারাপুর রেলস্টেশনের প্রবেশ পথে বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে রাস্তার দু'পাশে তখন হাজার হাজার বিক্ষোভকারী

জনতার ভিড়। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে থেমে যায় সেই পুলিশের ট্রাক। এরপর কারো মতে জনতার একাংশ হাতকড়া পরা সত্যাগ্রহীদের দেখে রাগে পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, আবার কারো মতে পুলিশই ষড়যন্ত্র মাফিক ট্রাকে আগুন লাগিয়ে সরে যায়। জনতারই একটা অংশ দ্রুত সেই আগুন নিভিয়ে ফেলে। কিন্তু পুলিশের ডি.আই.জি ও অন্যান্য পদস্থ কর্তারা দ্রুত সেখানে হাজির হয়ে আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানদের লেলিয়ে দেয় জনতার উপর। লাঠি ও বেয়নেট চার্জ শুরু হয়। জনতার একাংশকে স্টেশনের প্রবেশপথের দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আক্রমণ করে সেনাবাহিনী। তখন দুপুর ২-৩৫। বুলেট শরীরে নিয়ে প্রাণহীন লুটিয়ে পড়ে ৯ জন আন্দোলনকারীর দেহ—মৃত্যুবরণ করেন শচীন্দ্রমোহন পাল, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, তরণী দেবনাথ, কুমুদ দাস, সুকোমল পুরকায়স্থ, সুনীল সরকার, কানাইলাল নিয়োগী ও কুমারী ছাত্রী কমলা ভট্টাচার্য।

২০ মে: ধিক্কার ও প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে সমগ্র বরাক উপত্যকা। সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ছাত্ররা ডিগ্রি পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। স্থানীয় বণিকসভা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সব ধরনের খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। শিলচর ও করিমগঞ্জ জেলে সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে অন্যান্য কয়েদীরাও উপবাস পালন করে সন্ধ্যায় শোকসভায় মিলিত হয়। শিলচরে ১৪৪ ধারা জারি করলেও পুলিশ-প্রশাসন বাধ্য হয় জনতার চাপে তা তুলে নিয়ে শহিদদের মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রার অনুমতি দিতে। প্রায় ৫০,০০০ শোকার্ত জনতা সামিল হন সেই অন্তিমযাত্রায়। সংগোপনে আসামের মুখ্যমন্ত্রী চালিহা এসে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। এই খবর পেয়ে গণসংগ্রাম পরিষদ পরদিন ১৪৪ ধারা ভেঙে 'ঘাতক' মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বিক্ষোভপ্রদর্শনের কর্মসূচি নেয়। এর মধ্যেই খবর পৌঁছয় যে রেলস্টেশনের পুকুর থেকে আরও একজন আন্দোলনকারী সত্যেন্দ্রকুমার দেব-এর বুলেট-বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গভীর রাতে আরও জানা যায় যে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আন্দোলনকারী বীরেন্দ্র সূত্রধর মৃত্যুবরণ করেছেন।

২১ মে: কুম্ভীর গ্রামে বিমানবন্দরের পথে মুখ্যমন্ত্রী চালিহা ও কৃষিমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখান বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

শিলচর সহ কাছাড় জেলার সর্বত্র রেলকর্মচারীরা ১৯ মে-র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেন। সন্ধ্যায় শিলচর শহরে হাজার হাজার মানুষ সত্যেন্দ্রকুমার দেব ও বীরেন্দ্র সূত্রধরের মৃতদেহ নিয়ে শোকস্তব্ধ মিছিলে সামিল হয়।

২২ মে: এগারোজন শহিদের চিতাভস্ম নিয়ে আগরতলা ও কলকাতার পথে রওনা হন দুই দল সংগ্রামী নেতা। বরাক উপত্যকার সর্বত্র হরতাল অব্যাহত থাকে। কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের ঘোষণা অনুযায়ী ২১ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত সমগ্র জেলায় প্রতিবাদ হরতাল পালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চিতাভস্ম নিয়ে পথ পরিক্রমা।

২৯ মে: 'ভাষা শহিদ তর্পণ দিবস' পালিত হয়। কাছাড় জেলার সর্বত্র হরতাল, অরন্ধন, চিতাভস্ম নিয়ে মিছিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহিদ তর্পণ হয়। ত্রিপুরাতেও এই দিনটি শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়।

৩ জুন: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী রাজ্যভাষা সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসাসূত্র নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শিলচরে এসে পৌঁছন। দশ হাজার মানুষ নীরব ধিক্কার প্রদর্শন করে তাঁর সামনে। দুইদিন ধরে শাস্ত্রী কাছাড়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও কংগ্রেসের দলীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা চালান। সমাধানসূত্র অধরাই থাকে। কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬ জুন: শাস্ত্রীর 'সমাধানসূত্র' প্রকাশ করা হয়। সেই সমাধানসূত্রে আপাতত ইংরেজিকে রাজ্যিক ভাষা রেখে দেওয়া ও ক্রমে তাকে হিন্দি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা এবং তার সঙ্গে অসমীয়াকে রাখার কথা বলা হয়। এর বিরুদ্ধে কাছাড় জেলার সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। গণসংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৬ জুন থেকে আবার সত্যাগ্রহ শুরু হয়। করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শিলচর সর্বত্র অফিস আদালত বন্ধ করে দেয় সত্যাগ্রহীরা। অন্যদিকে আসাম সরকার ১৯ মে-র ঘটনাবলির বিচারবিভাগীয় তদন্ত করার জন্য মেহরোত্রা কমিশন নিয়োগ করে তাকে ৩১ আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলে।

১৩ জুন: হাইলাকান্দি শহরে বিকেলবেলা একদল কলেজ ছাত্রের কাছে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা বাঙালি জাতিকে গালাগাল করে অশ্লীল মন্তব্য করলে ছাত্ররা তার প্রতিবাদ করে। জওয়ানরা তখন ছাত্রদের মারতে মারতে পথের উপর ছুঁড়ে ফেলে লাথি চালায়।

১৪ জুন: জওয়ানদের আচরণের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে করিমগঞ্জ, শিলচর। পাথারকান্দি শহরে ভোরবেলা মহম্মদ মুদরিছ আলির নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ ফাঁড়ি দখল করে নেয়। হতচকিত পুলিশ সম্বিত ফিরে পেলে সত্যাগ্রহীদের গ্রেফতার করে। রাঙাবাড়ি থানাও অনুরূপভাবে দখল করে সত্যাগ্রহীরা কারাবণ করে।

১৫ জুন: দিল্লি থেকে প্রেরিত বার্তায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাস্ত্রী কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানান।

১৬ জুন: এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে গণসংগ্রাম পরিষদের নেতারা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরের তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং দিল্লির বৈঠকের জন্য ১২ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল নির্বাচন করে।

১৯ জুন: বাংলাভাষীদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের এই সাময়িক ভাঁটার সুযোগ নিয়ে গোটা আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করা হয় পরিকল্পিতভাবে। লালবাজার, আয়নাখাল, মনাছড়া ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সরকার ও প্রশাসনের মদতে এই বলে প্রচার চলেছিল যে ভাষা-আন্দোলন আসলে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আন্দোলন, এই হিন্দু উদ্বাস্তুরা সমগ্র কাছাড় জেলাকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঙালি হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করতে চায়, আর তা বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের দাঙ্গার বদলা নেওয়া হবে ও মুসলমানদের উৎখাত হতে হবে, আসাম সরকার ও কাছাড়ের মন্ত্রী জেলার মুসলমানদের মঙ্গল চান, যে মঙ্গল হিন্দু উদ্বাস্তুদের বিতাড়িত করেই সম্ভব। এই প্রচারের পাশাপাশি দাঙ্গাবাজদের সংগঠিত করে লেলিয়ে দেওয়া হল হাইলাকান্দি শহর ও মহকুমার বিভিন্ন জায়গায়। লুঠ, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ-এর ছররা চালাল তারা। একটা দূর অবধি তাদের তাণ্ডব চালাতে দিয়ে তারপর পুলিশ তাদের উপর গুলি চালাল, দশজন দাঙ্গাকারী মারা গেল। মৃত দাঙ্গাকারীদের 'অসমীয়া ভাষা শহিদ' বলে চালানোর অপচেষ্টা হল, আসাম সরকার প্রচার চালাল যে দাঙ্গার পরিস্থিতি ভাষা আন্দোলনই তৈরি করেছে। ভাষা আন্দোলনের গায়ে 'সন্ত্রাসবাদী' ছাপ মারারও চেষ্টা নানাভাবে চালাল সরকার প্রশাসন এবং দমননীতি আরও তীব্র করা হল।

২ ও ৩ জুলাই: দিল্লিতে শাস্ত্রীর সঙ্গে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের নেতাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হল না। কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের নেতারা শাস্ত্রী-সূত্রের এই সংশোধনী দাবি করেছিল যে কাছাড় জেলার জন্য যাবতীয় বিল, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট প্রভৃতি বাংলায় প্রচার করা হবে। কিন্তু শাস্ত্রী সোজাসুজি বলে দিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী চালিহা এ ধরনের কোনকিছু মেনে নিতে রাজি নয়।

৫ জুলাই: কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের নেতারা দিল্লি থেকে ফিরে এলে এইদিন কার্যকরী সমিতির সভা হওয়ার কথা ছিল ভবিষ্যৎ অন্দোলনের পথ নির্ধারণের জন্য। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যের অনুপস্থিতির জন্য কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া হল না। রাষ্ট্রীয় দমননীতি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদবিষের সাঁড়াশি আক্রমণে গণআন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

পরিণতি?

১৯৬০ সালেই আসামের রাজ্য বিধানসভায় বাঙালি ও অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীদের বিরোধিতাকে আমল না দিয়ে আইন পাশ করা হয় যে অসমীয়াই আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা হবে। কাছাড়ের বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলনের ফলে কেবলমাত্র কাছাড় জেলার জন্য 'অতিরিক্ত সরকারি ভাষা' হিসেবে বাংলাকে রাখা হয়।

এর ফলে কি অসমীয়া ভাষা ও জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে আসামের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সংহত করা সম্ভব হয়েছিল? ১৯৭১ সালের সরকারি জনগণনার তথ্য অনুযায়ী আসামে অসমীয়াভাষীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৯% (১৯৫১-র ৫৫%-র তুলনায় প্রায় একই রকম)। অন্যদিকে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে ক্রমশ আন্দোলন বিকশিত হল আসামের থেকে পৃথক রাজ্য গঠন করে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে। তাছাড়া, জাতিবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার যে ক্ষতগুলো তখন ইতিহাস-দেহে ছড়িয়েছে, তা থেকে এখনও অবধি রক্তক্ষরণ অব্যাহত আছে।

ফলত আসামের এই অভিজ্ঞতা ভাবায় যে জাতিগত অধিকার (ভাষিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অধিকার)-এর ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল পুনর্গঠনের উদ্যোগের সময় অপর জাতিসমূহের একই ধরনের

অধিকারকে যদি বাধা হিসেবে দেখে তার উপর আধিপত্য কায়েমের মধ্য দিয়ে নিজ অভীষ্টপূরণকে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে কি বিদ্বেষ ও বিভেদের এই ঘূর্ণাবর্তে পতন অনিবার্য নয়? অপরের উপর আধিপত্য কায়েমের পথে নয়, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পথে অপরাপর জাতির একে অপরের অধিকারের প্রতি সমগুরুত্ব আরোপ করে চলা যায় এমন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার পথই কি আমাদের খুঁজে নিতে হবে না?

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০১৫

সূত্রনির্দেশ

১. বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি ও আদিত্য মুখার্জি-র ইন্ডিয়া সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স ; পেঙ্গুইন বুকস্, ২০০৮, পৃ. ১৬০- ১৬১; মূল ইংরেজি থেকে বর্তমান লেখক কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

২. Assam Legislative Council Proceeding, April 6, 1938 থেকে সুবীর কর কর্তৃক 'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে উদ্ধৃত। মূল ইংরেজি থেকে বর্তমান লেখক কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

৩. এই দিনপঞ্জি রচনায় সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সুবীর কর-এর লেখা 'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থটি।

৪. বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি ও আদিত্য মুখার্জি-র 'ইন্ডিয়া সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স ; পেঙ্গুইন বুকস্, ২০০৮, পৃ. ৪০৪

উনিশে মে-র ভাবনা: ভাষাবিদ্বেষ নয়, মৈত্রী

সজল রায়চৌধুরী

উনিশে মে-র কথা ভাবলেই বিষাদে মন ভরে যায়। বিষাদ শুধু অসম সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের কথা মনে করেই নয়, দুটি ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিবেশীসুলভ মৈত্রী যেভাবে ভেঙে খানখান হয়ে গেছে, গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে সেকথা ভেবেই এই বিষাদ। উনিশে মে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হঠাৎ বিস্ফোরিত কোনো ঘটনা নয়। ইতিহাসের দীর্ঘ পথ বেয়ে, শাসকের রাজনীতির কুটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে এবং ভাষাগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিকারের ফলে এই ভয়াবহ রক্তপাত। আমরা এই লেখায় ভাষিক সম্পর্কের বক্র ইতিহাসের কয়েকটি মাইল ফলক শুধু তুলে ধরব। ইতিহাসে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে পাঠকরাই তার পথনির্ণয় করবেন। ভাষা মৈত্রীর আলো আমাদের পথ দেখাক।

অসমিয়াসহ প্রতিবেশী ভাষাগোষ্ঠীদের প্রতি বাঙালির মনোভাব

ভাষাবিজ্ঞানে 'ল্যাংগুয়েজ অ্যাটিচ্যুড' বা ভাষামনোভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকরা বাংলা 'মাদ্রাজ' এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বাণিজ্য ও রাজ্যপাট বিস্তারের মধ্যে দিয়ে শাসন ও শোষণের ভিত গড়ে তোলে। বিশেষ করে কলকাতা দীর্ঘদিন ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের রাজধানী। এই ঘটনার পার্শ্বফল হিসেবে বাংলায় উপনিবেশের আওতায়ই পুঁজির বিকাশ ও আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত ও নতুন

জমিদারদের ভেতর থেকে আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্বজ্জনদের একটি 'আলোকপ্রাপ্ত' গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। সাহিত্য শিল্প ও জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ছোটো বড়ো স্তম্ভ হিসেবে সারা ভারতে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন। বাংলা ভাষায় সৃজনের ঢল নামে। কিন্তু প্রতিবেশী ভাষাগুলির শ্রীবৃদ্ধি অনেক মন্থর গতিতে এগোয়ে। যদিও এজন্য সে ভাষাগুলির কোনো অক্ষমতা বা অযোগ্যতা প্রমাণ হয় না। তবুও এর ফলে বাংলার সঙ্গে ওড়িয়া, অসমিয়া, ভোজপুরি, মৈথিলি এবং আদিবাসী ভাষাগুলির বিকাশের বড়ো মাপের অসমতা দেখা দেয়। এই অসমতা বাঙালির একাংশের মধ্যে উন্নাসিক মনোভাবের জন্ম দেয়। ওড়িয়া ও অসমিয়া ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে অনেক বিদ্বান বাঙালিও মানতেই চাননি। এই সময়ে ইংরেজ শাসকরা একটি বিভাজনমূলক কৌশল গ্রহণ করে। ব্রিটিশ শাসনাধীন অসম রাজ্যে ১৮৩৮-এর নভেম্বর মাস থেকে ১৮৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। এব্যাপারে সিদ্ধান্তটা নিশ্চিতভাবেই ছিল শাসক ও আমলাগোষ্ঠীর। যেহেতু আধুনিক শিক্ষায় ও দীক্ষায় বাঙালিরই ছিল প্রাধান্য, তাই অসমের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্যই ছিল বেশি। আধুনিক শিক্ষায় অসমীয়াদের হাতেখড়ি ঘটে কলকাতায়। সেকালে ইউরোপীয় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অসমীয়াদের বিস্ময় বিমুগ্ধ কৌতূহল ও অনুরাগ ছিল। আবার রাজ্যে বাঙালি ও বাংলাভাষার আধিপত্যের জন্য অন্তরে ক্ষোভ ও ক্রোধ জমে উঠেছিল। এই দ্বৈত মানসিকতা থেকেই জন্ম নিল আধুনিক অসমীয়া জাতীয়তাবাদ।'[১]

১৮৫৩-৫৪ সালে এ জে মোয়াট মিনস 'রিপোর্ট অন দ্য প্রভিন্স অফ আসাম' এই প্রতিবেদন লিখে অসমে অসমীয়া ভাষা প্রচলনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন এবং অন্যান্য অসীময়া ভাষাপ্রেমীদের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৭৩ সালে অসমীয়া ভাষা কামরূপ, দরং, নওগাঁ, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার বিদ্যালয়ে ও আদালতে সরকারি ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে।[২]

এই ৩৪ বছরের ক্ষত বাঙালি অসমীয়া সম্পর্কের ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে। রবীন্দ্রনাথের মতো উদারচেতা মনীষীও জাগরণ-উন্মুখ অসমীয়া ভাষাসাহিত্যের ইতিহাসের ইতিবাচক প্রবাহটিকে জীবনের একটি পর্বে ভালো চোখে দেখেননি।

১৮৭৩-এর পরেও রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'সেইজন্য বলিতেছিলাম আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলা যদি লিখন পঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাংলা সাহিত্যের পক্ষে শুভজনক হইবে, তেমনই সেই দেশের পক্ষেও। কিন্তু ইংরেজের কৃত্রিম উৎসাহে বাংলার এই দুই উপকণ্ঠ বিভাগের একদল শিক্ষিত যুবক বাংলা প্রচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা তুলিয়া স্থানীয় ভাষায় জয়কীর্তন করিতেছেন।'[৩]

ভাষিক আধিপত্যের চাপ, অনেক সময় যে চাপ সৃষ্টিকারীর অগোচরেই, অসচেতন ভাবেই ক্রিয়া করে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তারই নিদর্শন। অসমীয়া নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জামাই। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত আলাপেও অসমীয়াদের স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এবিষয়টি নিয়ে আর এগোননি।

অসমীয়াদের পক্ষ থেকেও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের বাঙালিদের ভাষা ও জাতিসত্তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়। অসমীয়া সাহিত্যিক বেণুধর রাজখোয়া ১৯০৩ সালে একখানি বই লেখেন— 'নোটস অন দ্য সিলেটি ডায়ালেক্ট'। এই বইতে লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রচলিত বাংলা আসলে অসমীয়া ভাষারই উপভাষা মাত্র।[৪]

ভাষাবিদ্বেষের প্রবাহ একবার শুরু হলে, সেটা পাহাড় থেকে গড়ানো তুষার গোলকের মতো ক্রমশ বেড়েই চলে। এমন দুর্ভাগ্য ভাষাগোষ্ঠীদের সম্পর্কের মধ্যে বারবার দেখা গেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভাষিক পরিস্থিতি

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি-অসমীয়া ভাষিক সম্পর্ক ঘোরালো হতে থাকে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক, অসম প্রদেশের আইনসভার বিশিষ্ট অসমীয়া সদস্য নীলমণি ফুকন আইনসভায় অসমীয়া ও অন্যান্য ভাষার সম্পর্কের স্বরূপ আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সবকটি গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি অসমীয়া সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হবে।... আমি এবিষয়ে আমাদের জনগণের মনোভাব সম্পর্কে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি।... এই রাজ্যে অন্য কোনো ভাষার পরিপোষণ চলবে না।'[৫]

অসমে আদমসুমারির কারচুপি

বাঙালি ও অসীময়া জাতির ভাষিক নৈকট্য থাকলেও স্বতন্ত্র ইতিহাসের পথ বেয়ে উভয়ে বিকশিত হয়েছে। কোনো ভাষা বা জাতিসত্তাই অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হয়ে গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পর নতুন অসম রাজ্যে অসমিয়া, বাঙালি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমমর্যাদার ভিত্তিতে বিকাশটাই ছিল কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু অতীতের ভাষিক বঞ্চনা, দেশভাগের ফলে বাঙালি উদ্বাস্তুদের ঢল ও আদিবাসীদের ভাষিক দাবি-দাওয়া সামনে আসায় অসমিয়ারা নিজ বাসভূমে কোণঠাসা হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আতঙ্ক যাদের তাড়িত করে, তারা চারিদিকে শত্রু দেখতে পায়। অরিদমনটাই তাদের 'আত্মরক্ষার' প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে অসমিয়া রাজনৈতিক নেতারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের কর্মসূচি নেয়। ভাষার প্রশ্নটিকে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ হিসেবে দেখাটাই দাঁড়ায় দৃষ্টিভঙ্গি। যুদ্ধে তো কোনো ন্যায়নীতির প্রশ্ন থাকে না। তাই ১৯৫১-র আদমসুমারিতে কারচুপি করে এক 'অলৌকিক' বাচকবৃদ্ধি ঘটানো হয়। ১৯৩১ সালে ওই ভূখণ্ডে অসমীয়া বাচক সংখ্যা ছিল ৩১.৪ শতাংশ। যুদ্ধের জন্য ১৯৪১ সালে কোনো জনগণনা হয়নি। ১৯৫১ সালে দেখা যায় অসমিয়া বাচকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট জনসংখ্যার ৫৬.৭ শতাংশ। বাঙালি জনসংখ্যা উদ্বাস্তু আগমন সত্ত্বেও ২৬.৮ শতাংশ থেকে কমে ১৬.৫ শতাংশে দাঁড়ায়।[৬] হিন্দি ও আদিবাসী ভাষীর সংখ্যাও কমে যায়। আদমসুমারির কমিশনারের এবিষয়ে মন্তব্যটি অনুধাবন করার যোগ্য। 'সম্প্রতি অসমে যে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য চলছে এই সংখ্যাগুলি নিশ্চিতভাবে তারই প্রতিফলন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুসলমান, চা-বাগানের শ্রমিক ও অভিবাসীদের অনেকের মধ্যে তাদের আশ্রয়ভূমির ভাষা অসমিয়াকে গ্রহণের ইচ্ছা। অবশ্য এমনটা হতেই পারে যারা অসমিয়াকে মাতৃভাষা হিসেবে লিখিয়েছেন তাদের ওই ভাষাজ্ঞান তেমন নয়, কৌশলে কার্যসিদ্ধির মতলবেই (devious motives) এ কাজটি তাঁরা করেছেন।'

এই প্রসঙ্গে ধুবড়ি মহকুমায় বাংলা মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যায়লগুলোকে অসমিয়া মাধ্যম করার কথা বলা যায় — ৪ বছরে ২৫০টি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় মাত্র ৩টি বাংলা মাধ্যমে এসে ঠেকে। নীচের সারণিটা দেখা যাক:[৭]

বছর	অসমীয়া মাধ্যম	বাংলা মাধ্যম
১৯৪৭-৪৮	৩৪৮	২৫০
১৯৪৮-৪৯	৫৮২	১৩০
১৯৪৯-৫০	৭৭৩	৪৫
১৯৫০-৫১	৮৩৩	৩

এর সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামার বিষাদবৃক্ষ চারিদিক আঁধারে ঢেকে ফেলেছে। ১৯৪৮ সালে অসম বিধানসভায় গোপীনাথ বরদলুই স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'অসমকে দ্বিভাষিক রাজ্য করার কোনো ইচ্ছে সরকারের নেই।'[৮] একভাষিক আধিপত্যের ইচ্ছের বীজ অসমের রাজ্যভাষা নিয়ে দমনপীড়নে ফেটে পড়ল।

ভাষা ও জাতিসত্তার পারস্পরিক সম্পর্কের সবচেয়ে বেদনাদায়ক রূপ আমরা অসমে দেখি। সত্যিই কি অন্য ভাষাকে অধিকারচ্যুত করেই আপন ভাষার অধিকার অর্জিত হয়? জাতিবিদ্বেষই কি ভাষিক সম্পর্কের 'একমাত্র' আবেগ? ভাষাগণতন্ত্রের চর্চার মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী সবক'টি ভাষা সহযোগিতার ভিত্তিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে না? মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিকতাই কি পৃথিবীর ভাষা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারের সমৃদ্ধির একমাত্র উপায় নয়?

পৃথিবীতে আমরা ভাষাবিদ্বেষের ভয়ঙ্কর সব উদাহরণ দেখেছি। ক্ষমতাবান অটোমান তুর্কি শাসনে ভাষা ও জাতিবিদ্বেষে ১৫ লক্ষ আরমেনিয়ান নিহত হয়েছে। কুর্দরা শতাধিক বছর ধরে ইরাক, ইরান, তুরস্ক, সিরিয়ায় ভাষিক অধিকারহীন হয়ে তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। সার্বিয়ানদের হাতে বসনিয়ানরা বছরের পর বছর ধরে রক্ত ঝরিয়েছে। অসমেও রক্তপাতের শেষ হয়নি। বাইরের রক্তপাত চোখে দেখা যায়। ক্ষমতার আস্ফালন 'অপর' ভাষাকে সন্ত্রস্ত করে রাখে। প্রতি পলের গোপন কাঁটায় রক্তাক্ত হয় চেতনা। দুর্বল ভাষাগোষ্ঠীকে সবলের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে লুপ্ত হয়ে যেতে হয়। অসমে সংখ্যালঘু বাঙালিদের কাছে এভাবে বিলীন হওয়ার দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা হাতের কাছে অসমিয়া জনগোষ্ঠীকে না পেয়ে অসমিয়া জাতির বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে জাতিবিদ্বেষী আক্রমণ করে এসেছে। দাঙ্গা ও শিলচরের গুলিচালনা ও সত্যাগ্রহী হত্যা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়, কিন্তু সেজন্য

গোটা অসমিয়া জাতিকে গালিগালাজ করা বিদ্বেষের চাষ বাড়িয়ে তোলা ছাড়া কিছু নয়। ওই সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মন লেখেন— 'একটা গোটা জাতি কতদূর অকৃতজ্ঞ হতে পারে অসমিয়ারা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।... বাঙালির দয়ায় প্রাণে বাঁচিয়া অসমিয়াদের তাগদ বাড়িয়াছে। খাড়া হইয়া উঠিয়াই সর্বাগ্রে তাহারা হাত তুলিয়াছে বাঙালির অঙ্গে।'[৯]

একটা 'গোটা জাতিকে' অকৃতজ্ঞ বলে নিন্দা করার মধ্যে অবশ্যই রুচিহীন প্রভুত্বের কণ্ঠস্বরই আমরা শুনতে পাই।

তাই আজ ভাষা ও জাতিগুলোর বাঁচার জন্য ক্ষমতার রাজনীতি বর্জন করে সহযোগিতার নতুন সমাজবিজ্ঞান এগিয়ে এসেছে। সেই peace linguistics-কে অবলম্বন করেই পারস্পরিক দোষারোপের পথ ছেড়ে দিয়ে ১৯ মে-র শিক্ষাকে নতুন আলোয় গ্রহণ করতে হবে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০১৭

সূত্র নির্দেশ

১. সুবীর করঃ বরাক উপত্যকার ভাষা-সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৯৯। পৃ. ৫
২. ড. লীলা গগৈ (সম্পাদিত) আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের পরিচয়, ডিব্রুগড় ১৯৯০। (পূর্বগ্রন্থে উদ্ধৃত)
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/'ভাষা বিচ্ছেদ'/ ১৩০৫
রবীন্দ্র রচনাবলী সুলভ সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈশাখ ১৩৯৫
৪. সুবীর কর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬
৫. আসাম আইন সভার কার্যাবলী, ১৯৪৮, পৃ. ৫৮৫ (ইংরেজি থেকে অনুবাদ বর্তমান লেখক)
৬. সেনসাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৫১, খণ্ড ১৩, অংশ ১এ, পৃ. ৪১৩-৪১৪
৭. অসম বিধানসভায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ অধিবেশনে তারকাচিহ্নিত প্রশ্নোত্তরে প্রদত্ত সরকারি বিবরণ।
৮. অসম বিধানসভার কার্যবিবরণী/১৯৪৮
৯. আবার বঙ্গাল খেদা: সাপ্তাহিক যুগবাণী/ ১৮ আষাঢ়, ১৩৬৭, জুলাই ১৯৬০

ওড়িয়া ভাষার স্বাধিকারের সংগ্রাম

প্রবাল সেনগুপ্ত

আজকের ওড়িশা প্রদেশ, ঔপনিবেশিক আমলের এক বিরাট সময় জুড়ে একটি ‘ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র ছিল। প্রাথমিক পর্বে প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যা সুবার অর্ন্তভুক্ত ছিল অঞ্চলটি। পরে ইংরেজ আমলে যার নব নামকরণ হয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। ১৯১১ সাধারণাব্দে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিহার ও ওড়িশাকে একটি সংযুক্ত প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য পুরো ওড়িয়াভাষী অঞ্চল এই সংযুক্ত প্রদেশের অঙ্গ ছিল না। ওড়িয়াভাষী অঞ্চলের একটি অংশ পশ্চিমে সেন্ট্রাল প্রভিন্সের ও দক্ষিণের কতিপয় ভূভাগ ছিল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত।

স্বাভাবিকভাবেই নিজ বাসভূমে পরবাসী ছিল ওড়িশার মানুষেরা। প্রদেশের যে বড়ো অংশটি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানে ওড়িয়া ভাষা ও সংস্কৃতি লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু লাভ করেনি। ওই অংশে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ‘তখ্ত-তাজ অচল’ হয়ে বিরাজ করত। একই রকম অবস্থা ছিল সেন্ট্রাল প্রভিন্সের ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ওড়িয়াভাষী অঞ্চলে। যথাক্রমে হিন্দি ভাষা ও তেলেগু ভাষার চাপে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হতে হত ওড়িয়া ভাষাকে, ওইসব অঞ্চলে।

অথচ এমনটা হবার কথা ছিল না। প্রাচীনকাল থেকেই ওড়িয়া ভাষা, অন্যান্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় গুণে-মানে কোনোভাবেই ন্যূন ছিল

না। বাংলা ভাষার সমসাময়িক এই ভাষা 'চর্যাপদের'ও অন্যতম দাবিদার, জগন্নাথদেবের 'মাদলা পঞ্জি' ব্যাতিরেকেও চতুর্দশ শতকের সরল দাসের 'মহাভারত', জগন্নাথ দাসের 'ভাগবত পুরাণ' প্রভৃতি প্রণীত হয়েছিল ওড়িয়া ভাষায়। মধ্যযুগের ভারতে রাজভাষা ফারসির চাপে ওড়িয়া কিছুটা ম্লান হলেও, 'রামচন্দ্র পট্টনায়েকের 'হায়াবলি' ও কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের লেখাসমূহ সেযুগের ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির উজ্জ্বল উদাহরণ।

ইতিমধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তি ক্রমশ ভারতে প্রসার লাভ করছিল—ওড়িয়াভাষী অঞ্চলও তার ব্যতিক্রম ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে ইংরেজি তার থাবা বিস্তার করেছিল ক্রমশ। তবে উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, খ্রিশ্চান পাদ্রীদের বাইবেল ইত্যাদি পুস্তকের ওড়িয়া গদ্যে অনুবাদ এই পর্বে ভাষাটির উন্নয়নেরই সহায়ক হয়েছিল। এর পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রাথমিক পর্বে ওরিয়েন্টালিস্টদের চাপে কিছুটা সীমিত পরিসরে ওড়িয়া শিক্ষাকার্যের ভাষা হিসেবেও ব্যবহৃত হত। কিন্তু বেশি দিন এই অবস্থা বজায় থাকেনি।

পাশ্চাত্যের ভাষা ও সংস্কৃতির 'হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে' তখন ভারতের নবজাগরণকামী শিক্ষিত সমাজ চমকিত। এদের গুরুঠাকুর হিসেবে আবির্ভূত হল অ্যাংলিসিস্টরা। 'শ্বেত মানুষের দায়ের' ধুয়ো তুলে তাঁরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে 'পিছিয়ে পড়া' ভারতবাসীর ওপর চাপিয়ে দিতে চাইল। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতোই ওড়িয়ার ওপরও পড়ল তার নঞর্থক প্রভাব। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো সেই সময় আরেকটি বিপদ সমুপস্থিত হল। আমরা সবাই জানি যে, অবিভক্ত সাবেক বাংলায়ই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষার পবন প্রবাহিত হয়েছিল। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই সুযোগে যেমন প্রাথমিক পর্বেই ইংরেজি ভাষার পুচ্ছ ধরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উচ্চবৃক্ষে সমারূঢ় হতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি পাশ্চাত্য ভাষার কৃৎকৌশলকে কাজে লাগিয়ে, নিজেদের মাতৃভাষা বাংলাকেও নবযুগের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে বহুলাংশে সমর্থ হয়েছিল। উকিল-ডাক্তার-মাস্টার হিসেবে পরিব্রাজক বাঙালির 'উন্নত' মাতৃভাষা তাই ভারতের তথাকথিত অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে 'ইংরেজির সোদর প্রতিম বলে গণ্য করার প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল।

যদিও ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত নীতি ছিল দেশের নানা অংশে আঞ্চলিক ভাষাকে আংশিকভাবে শিক্ষার মাধ্যম ও কিছুটা হলেও, জীবিকার ভাষায় পরিণত করা। কিন্তু কিছুটা পাশ্চাত্য শিক্ষিত, অন্তত প্রাথমিক পর্বে সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী শিক্ষিত বাঙালির চাপে অসম ও বিহারের মতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ওড়িয়া প্রাধান্যযুক্ত অঞ্চলেও শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল বাংলা ভাষা। বাধ্য হয়েই ওড়িশার শিশু-শিক্ষার্থীদের মাতৃদুগ্ধস্বরূপ ওড়িয়া ভাষার বদলে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়েই জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলত। ফকির মোহন সেনাপতি এই প্রসঙ্গে তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন, 'সে সময় উৎকলের সর্বত্র সরকারি প্রত্যেক মহকুমার প্রধান কর্মচারী ছিলেন বাঙালি। ওড়িয়াভাষা তুলে দিয়ে বাংলাভাষা চালানোয় সকলের একমত। আপন আপন মহকুমায় সাধ্যানুসারে বাংলা চালানো সম্বন্ধে সকলে সচেষ্ট। সরকারি কোনো কাজ খালি হলে নিজের লোক নিযুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা।' অর্থাৎ শুধু ভাষা নয়—ওড়িয়াভাষীদের ভাতের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ জড়িয়ে পড়েছিল, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৮৬৬ সাধারণাব্দে সমগ্র ওড়িয়াভাষী অঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করতে কলকাতাকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। সেনাপতির লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি যে সেই সময় বাংলা প্রেসিডেন্সির ওড়িয়াভাষী অঞ্চলে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ সমূহ বাঙালিদের অধিকৃত ছিল। এদের ত্রুটিপূর্ণ রিপোর্টের কারণেই যথেষ্ট পরিমাণ সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়নি বলেই আঞ্চলিক মানুষের দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল। আর্থ-সামাজিক দুর্দশার জন্য তাঁরা বাঙালি ভদ্রলোকদেরই দায়ী করেছিল। ইতিমধ্যেই নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেই সময় বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ওড়িয়া ভাষা প্রচলনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল ওই ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব। এই অভাব দূরীকরণের দিকে এবার দৃষ্টি দিলেন ওড়িয়া পণ্ডিতসমাজ।

নতুন পরিস্থিতিতে ওড়িয়ায় অভিবাসী কর্মবীর গৌরীশংকর রায় এবং অঞ্চলের ওড়িয়াভাষী কিছু দেশীয় শাসক ভাষাটির সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট হলেন। তাদের উৎসাহে 'সত্যবাদী' নামে একটি সাহিত্যপত্র এবং

বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী ফকিরমোহন সেনাপতির আত্মজীবনীর কিয়দংশ প্রকাশ করে ওড়িষার ভাষা মান্যতার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিকে ১৮৭২ সাধারণাব্দে বালেশ্বর নিবাসী জনৈক বাঙালি বিদ্যালয় শিক্ষক কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য চরম প্রাদেশিক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে 'ওড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে' শীর্ষক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই বইতে ওড়িয়াভাষাকে পৃথক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে, তাকে বাংলারই একটি উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা ওড়িয়াভাষীদের মানসে চরম বাংলা বিরোধিতার সূত্রপাত সূচিত করে।

এর পূর্বেই ১৮৬৫ সাধারণাব্দে কটকে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে খ্যাতনামা বাঙালি বুদ্ধিজীবী তথা ভারততত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ওড়িয়াভাষী মানুষদের তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। এদিকে, একই সময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিভুক্ত ওড়িয়াভাষী গঞ্জাম অঞ্চলে তেলেগু বিদ্যালয় ও সরকারি কার্যালয়ের ভাষা হিসেবে জাঁকিয়ে বসেছিল—অন্যদিকে, ১৮৯৫-এর এক আদেশ বলে সম্বলপুরকেন্দ্রিক পশ্চিম ওড়িশা, সেন্ট্রাল প্রভিন্সের অঙ্গ হিসেবে হিন্দি ভাষার আধিপতয মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এতদ্সত্ত্বেও বাংলা ভাষার আধিপত্যই ওড়িয়া ভাষাভাষীদের কাছে সবচেয়ে বিপদস্বরূপ ছিল। কেন না তেলেগু বা হিন্দির মতো তা শুধুমাত্র শিক্ষা ও কাজের ভাষা হিসেবে ওড়িয়া ভাষাকে পেছনে ফেলে দিয়েছিল, তাই নয়, এর পাশাপাশি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি উৎকল সমাজের ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দিচ্ছিল প্রতিনিয়ত।

প্রথম থেকেই উপনিবেশবাদী ওড়িশা প্রবাসী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বৃহদংশ, ওড়িয়া ভাষাকে অত্যন্ত পশ্চাৎকর একটি 'উপভাষা' হিসেবে গণ্য করতেন। ফকীরমোহন সেনাপতির 'আত্মজীবনী' থেকে আমরা জানতে পারি যে এই ভাষা আগ্রাসনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তখন ওড়িশার ভৌগোলিক সীমানায় সরকারি কর্মচারী হিসেবে কাজ করত, তারা প্রায় সবাই ছিল বাঙালি। স্বাভাবিকভাবেই প্রেসিডেন্সির ওড়িয়া সংখ্যাগুরু অংশে বাংলা শাসকের ভাষা হিসেবে পরিগণিত হলে, ক্রমপরম্পরায় বাঙালিদের চাকরিক্ষেত্রে মৌরসীপাট্টা স্থাপন করা সহজসাধ্য হয়ে উঠত। আমরা

দেখতে পাই প্রাথমিক পর্বেই ওড়িশাবাসী বাঙালি মেধাজীবীদের একাংশের এই দুরভিসন্ধি ধরে ফেলে। বিখ্যাত ওড়িয়া লেখক গঙ্গাধর মেহের এই প্রসঙ্গে ওড়িশার সঙ্গে নাড়ির টানহীন এই সমস্ত বহিরাগত পেশাজীবীদের 'বিদেশী' এবং 'স্বজন-দলনকারী' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৮৬০-৭০-এর দশকে কিছু সময় বাদ দিলে অন্তত তত্বগতভাবে ওড়িয়াভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা প্রেসিডেন্সির ওড়িশা অংশে কিছুটা হলে স্থান লাভ করেছিল। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বালেশ্বরকেন্দ্রিক বাঙালি আমলারা সরকারের কাছে আড়িশা ভাষার এই ন্যূনতম অধিকার রদ করার আহ্বান জানান। তাঁরা অপযুক্তি দেখায় যেহেতু ওড়িয়া ভাষায় বাংলা ভাষার মতো উচ্চমানের শ্রেণি পাঠের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব আছে, তাই শিক্ষার মান রক্ষার জন্য বাংলাভাষাকেই ওই অঞ্চলে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম করা উচিত। আসলে পেশাগত অন্যান্য কারণের পাশাপাশি ওড়িয়াভাষী অঞ্চলে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বহুল বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভের ইচ্ছা ও এই সময় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মনে জাগরুক হয়ে উঠেছিল। ১৮৬৭-৬৯ সাধারণাব্দের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আমাদের আলোচ্য ভূখণ্ডে যেখানে বাংলামাধ্যমের পুস্তক বিক্রয় হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ কপি, সেখানে ওড়িয়া ভাষার বইয়ের বিক্রয়যোগ্য কপি ছিল মাত্র চৌদ্দ হাজারের সামান্য বেশি।

এ প্রসঙ্গে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতো স্বনামধন্য বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মিত্রতামূলক সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে তিনি সরকার নিয়ন্ত্রিত ভার্নাকুলার লিটেরেচর সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রাকৃতিক ভূগোল', 'ব্যাকরণ প্রবেশ' সহ বহু পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। সেগুলি মূল বঙ্গ প্রদেশের পাশাপাশি ওড়িয়া শিক্ষার্থীদের অবশ্যপাঠ্য করে আর্থিক লাভের ইচ্ছা যে তাঁর ছিল না—সেই বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়। এমনকি ১৮৯৮ সাধারণাব্দে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় যেভাবে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অসমীয়ার মতো ওড়িয়া ভাষাকেও বাংলার উপজাত হিসেবে বর্ণনা করে, ওই দুই ভাষা প্রাধান্যযুক্ত অঞ্চলে বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম ঘোষণা করার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন।

অনেকে বলেন, জীবনের তরুণলগ্নে রবীন্দ্রনাথের মানসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এবং তাঁর প্রভাবেই পরবর্তীকালে, উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধী রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষণিকের ত্রুটি সম্ভব হয়েছিল।

আসলে ওড়িয়া ভাষার প্রতি গড় বাঙালির এই অনীহার কোনো আপাতদৃষ্ট কারণ থাকার কথা ছিল না। আমরা আগেই বলেছি প্রাচীন যুগ থেকেই ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। ১৮০৯ সাধারণাব্দে বাইবেলের ওড়িয়া অনুবাদের মাধ্যমে এই ভাষার গদ্য শৈলীরও জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল। ১৮৩৭-এর পর ব্রিটিশ সরকারও ওখানকার আঞ্চলিক অফিস আদালতে সীমাবদ্ধভাবে ওড়িয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিমরাজি ছিল। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে ওড়িয়াভাষী অঞ্চলের তিনদিকের তিন শক্তি, তাঁদের স্বভাষার স্টিমরোলার ওড়িয়াদের জবানের জীবন নাশে তৎপর হয়ে উঠেছিল, ঔপনিবেশিক আমলে। 'উৎকল ভ্রমণ' (১৮৯২) নামক এক প্রবন্ধ পুস্তিকায় ফকিরমোহন সেনাপতি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> The Kammas (telegu) have occupied the south. The north has become the home for Bengatees; the west has gone into the Maratha's hands...The Marwares, the Kapodias, the Bhojpuris and Modis have taken over the trade and commerce. The Oriyas till the land and cut the paddy plants, but the Gujarates enjoy the harvest. The Judges, the pleaders all are foreigners. Even the clerk in t he post office is not a native'.

সবাই মিলে ভাষা সংস্কৃতি ও তার সঙ্গে জড়িত ওড়িয়া অর্থনীতির একেবারে সাড়ে সর্বনাশ সংঘটিত করেছিল—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

যাই হোক, এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করে নিজেদের সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও আর্থ সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি সংগঠনের মানসে ওড়িশার কতিপয় মানুষ ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য সচেষ্ট হলেন। সবার মধ্যে ভাষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা প্রথমেই ওড়িয়া ভাষায় বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে দৃঢ় সখল্প গ্রহণ করলে। এ প্রসঙ্গে 'ওড়িষ্যার বিদ্যাসাগর' মধুসূদন রাও-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই ওড়িয়া ভাষার প্রথম প্রাইমার 'বর্ণবোধ' নামক পুস্তক রচনা করেন। এছাড়া ফকিরমোহন সেনাপতি সব্যসাচীর মতো

একাধারে গণিতের প্রাথমিক স্তরের পুস্তক, ‘অঙ্কমালা’ এবং ইতিহোসের কিতাব দু-খণ্ডে ‘ভারতের ইতিহাস’ রচনা করেন। গঙ্গাধর মেহের হিন্দি শিশুপাঠ্য কবিতার ওড়িয়া অনুবাদ প্রকাশ করে, ওই ভাষার অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। অভিবাসী ওড়িয়া প্রবাসীর রাধানাথ রথ, অঞ্চলটির বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক হিসেবে ওড়িয়া ভাষার উন্নয়নের জন্য প্রথমাবধিই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শ্রেণির উপযোগী ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করে, পাঠ্যমাধ্যম হিসেবে ওড়িয়ার দাবিকে জোরদার করে তোলেন। এছাড়া বিষুদ্ধচরণ পট্টনায়েক ও গৌরশঙ্কর রায়ও সমসময়ে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করে ওড়িয়াতে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক না থাকার অভিযোগকে ভুল প্রমাণিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেন।

শুধুমাত্র বিদ্যালয়-পাঠ্য বই-পুস্তক নয়, ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ অবস্থান প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে, সেই সময় উচ্চ অঙ্গের বইপত্রও লেখা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা প্যারীমোহন আছায়ার ওড়িশার ইতিহাস, গোপাল চন্দ্র আচার্যের শ্রীজগন্নাথ ও চৈতন্য, যতীন্দ্রমোহন সিং-এর ওড়িশার চিত্র ইত্যাদির কথা উল্লেখ করতে পারি। আর ফকিরমোহন সেনাপতি তো ছিলেনই। তাঁর ‘উৎকল ভ্রমণ’ ও পরবর্তীকালের আত্মজীবনীর কথা এ প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণীয়। বিশেষ করে উৎকল ভ্রমণে, স্বর্গদ্বারের অধিকারী উৎকলকে ‘সর্বঙ্গীধের সেরা’ বলে বর্ণনা করে, ফকীরমোহন ওড়িশাকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম অঞ্চল বলে চিহ্নিত করে, জন্মভূমি প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। একইভাবে রাধানাথ রায়, তাঁর মহাকাব্য প্রতিম ‘মহাযাত্রা’ পুস্তকে মহাভারতখ্যাত পাণ্ডবেরা ওড়িশার প্রান্তদেশ থেকেই স্বর্গে গমন করেছিলেন বলে যে ‘মিথ’ চালু ছিল, তাকে স্বীকৃতি দেন। তাঁর মত ছিল, ‘for other lands will be compared to leaves of a plant, Utkal will be the flower.’ রমাশঙ্কর রায়ও তাঁর ‘কাঞ্চিকাবেরী’ নাটকে মধ্যযুগীয় ওড়িশার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা তুলে ধরেন।

এতো গেল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ওড়িয়াভাষী অঞ্চলের কথা। গঞ্জাম অঞ্চলেও কিন্তু তেলেগু মধ্যশ্রেণির ভাষা আধিপত্যের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক ওড়িয়া জনতা সোচ্চার হয়ে উঠছিল। ১৯০৩ সাধরণাব্দে উক্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ফকিরমোহন সেনাপতি নিজ মনোব্যথা ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, যে ওড়িয়া

ভাষার অধিকার স্বীকৃত না হওয়ার ফলে উক্ত অঞ্চলে একশো কুড়িজন করণিকের মধ্যে মাত্র তিনজন ওড়িয়াভাষী স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওই অঞ্চলে ওড়িয়াভাষীদের দাবি উপেক্ষা করে, বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি ও তেলুগু মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। ১৮৬৯-৭০ সাধারণাব্দে বিদ্যালয় পর্যায়ে ওড়িয়া মাধ্যম চালুর পক্ষে গঞ্জাম, হুমা, ধারাকোট অঞ্চলে জনসাধারণ বিক্ষোভের আগুন জ্বালায়। এক্ষেত্রে জনমত সংগঠনের কাজে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে 'স্বদেশী' নামে একটি পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জনৈক উইলিয়ম মোহান্ত। এছাড়া গঞ্জাম হিতবাদিনী সভা এবং উৎকল হিতৈষীসভা নাট্য সংগঠনদ্বয়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক বুদ্ধিজীবীরা ওড়িয়া ভাষার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করতে প্রয়াসী হন। এই সমবেত চাপের মুখে অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ ওড়িশা অঞ্চলে ভাষাটি আংশিকভাবে কাজের ভাষার স্বীকৃতি পায়। এই সময়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় একটি 'বিষয়' হিসেবে ওড়িয়া ভাষাকে স্বীকৃতি দিলে—ওই ভাষার আন্দোলন নৈতিকভাবে বহুলাংশে জয়যুক্ত হয়েছিল।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ওড়িয়াভাষীরা সংখ্যাগুরু হলেও, সম্বলপুর অঞ্চলে হিন্দি ভাষাকেই শিক্ষা ও সরকারি কাজের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হত। ১৮৯৬ থেকে ১৯০১ সাধারণাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উক্ত অঞ্চলে জনমত সংগঠিত হতে শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দি ভাষা পঠনের বাধ্যবাধকতার বিরোধিতা করে ওড়িয়াভাষীরা। সম্বলপুরেই প্রথম ওড়িয়া ভাষা মান্যতার আন্দোলনকে তাত্ত্বিক স্তরের গণ্ডি অতিক্রম করে, গণসংগ্রামে পরিণত করবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ভাষা সংগ্রামের স্বপক্ষে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, তহবিল নির্মাণ করা, ছাড়াও প্রচারপত্র-ইস্তাহার ইত্যাদি বিতরণের মাধ্যমে আন্দোলনকে মাঠে-ময়দানে এনে ফেলা হয়। ওই অঞ্চলের ভাষা আন্দোলনের কর্ণধারবৃন্দ যেমন, মনমোহন মিশ্র, বলভদ্র সুপকার, ধরণীধর মিশ্র, চন্দ্রশেখর বেহারা প্রমুখ এক্ষেত্রে খুবই কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমকালে, 'সম্বলপুর হিতৈষিণী' নামে একটি সংবাদাপত্রও এখানকার ভাষা সংগ্রামে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে সক্রিয় ছিল।

ভাষা আন্দোলনে ত্বরণ সৃষ্টি করতে, সম্বলপুরের কবি গঙ্গাধর মেহারার দুইটি অপূর্ব সুন্দর কবিতা প্রেষণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবিতাদ্বয়ের নাম

ছিল, 'ভারতী রোদনা' অর্থাৎ ভাষা কাঁদছে এবং 'উৎকল ভারতীনেকা নিবেদন' বা উৎকল ভাষার আবেদন। এই কবিতাদ্বয়ে ওড়িয়াভাষীদের বিমাতা হিন্দির বদলে, প্রকৃত ওড়িয়া ভাষাজননীর ক্রোড়ে ফিরিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছিল।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, সারা উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধেই ওড়িয়া ভাষার ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সারা ওড়িয়াভাষী অঞ্চলে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলেও ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণেই তা তিনটি প্রান্তে আলাদা অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, বাংলা, তেলুগু ও হিন্দি ভাষার আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলি পৃথক পৃথকভাবে পরিচালিত হত। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দিকেই এই পৃথক জনজাগরণগুলিকে একসূত্রে গেঁধে ফেলা সম্ভবপর হয়েছিল। ওড়িয়া বুদ্ধিজীবীবৃন্দ অনুধাবন করেছিলেন ওড়িষ্যার তিন প্রান্তের আন্দোলনত্রয়কে একত্রিত করতে পারলেই একমাত্র ভাষাকেন্দ্রিক সংগ্রাম সারা ওড়িশা জুড়ে একটি গণমুখী লড়াইয়ে পরিণত হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৩-এ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, 'উৎকল সম্মিলনী' বা উৎকল ইউনিয়ন কনফারেন্স নামে ভাষা সংগ্রামীদের একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক মঞ্চ। এই সম্মেলন সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে ওড়িষ্যার একীকরণের মূর্ত প্রতীক মধুসূদন দাস এবং পরবর্তীকালের ওড়িশার নেতা উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আদর্শ ওড়িয়া মাধ্যমের বিদ্যালয় গঠনকে মাথায় রখে গোপবন্ধু দাস ইউনিভার্সাল এডুকেশন লীগ নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলেন।

বাংলা-তেলুগু-হিন্দির ত্রিশূলে বিদ্ধ ওড়িয়া ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই একটি সংহত রূপ ধারণ করে। মধ্য ওড়িশার বাংলা, দক্ষিণ ওড়িশার তেলেগু এবং পশ্চিম ওড়িশার হিন্দি ভাষার আধিপত্যকামী মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই আর স্থানীয় ইস্যু হয়ে রইল না—এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষের ভাষা মান্যতার আন্দোলনে সংগ্রামী সহযোগীতে পরিণত হল। উৎকল সম্মিলনীর ছত্রছায়ায়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ওড়িশাবাসীরা প্রতিবেশী ভাষা সমূহের আধিপত্যকামী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করলেও, তাঁরা অন্য ভাষাভাষীদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। বরঞ্চ জাতীয় কংগ্রেসের

রাজ্যওয়ারি ভাষানীতির অনুসরণেই তাঁরা নিজেদের ভাষার স্বাধিকারের স্বপক্ষে সোচ্চার পর্ব থেকেই 'বাঙালি পেশাজীবী পরিবৃত' সংগঠনটিতে ওড়িশার বুদ্ধিজীবীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ব্রিটিশ সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা দেশের অন্যান্য অংশের স্বদেশসেবকদের সঙ্গে একযোগে সোচ্চার হয়েছিলেন বারংবার। গোপবন্ধু দাসের মতো নেতারা একদিকে যেমন সমগ্র দেশের স্বতন্ত্রতার সংগ্রামে অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ওড়িশার নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি, শিক্ষার উত্তরণের জন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা গোপবন্ধুর পাশাপাশি হরিহর দাস, কৃপাসিন্ধু মিশ্র, পণ্ডিত নীলকান্ত প্রমুখের নাম করতে পারি—যাঁরা একাধারে রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, শিক্ষাপ্রসারক এবং ভাষা আন্দোলনের সৈনিক ছিলেন। ওড়িশার স্বার্থ ও দেশের স্বার্থের মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা ছিল না বলেই তাঁরা বিশ্বাস করতেন।

এই দিকটি নিয়ে আলোচনার সূত্রে ফকিরমোহন সেনাপতি তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, সমগ্র ভারতীয় মহাজাতি একটি তানপুরার মতো, যাতে অনেক ভাষাগোষ্ঠী এক একটি তন্ত্রীর মতো অবস্থান করে। এই তন্ত্রীগুলি যদি পারস্পরিক সম্মান ও সাযুজ্য রক্ষা করে বাদিত হয়, তবেই বন্দেমাতরমের প্রকৃত সুর এই মহাদেশে উত্থিত হবে, নচেৎ যা হবে তা হল অপসুরের প্রলাপ ধ্বনি।

ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে বিদেশি শাসকদের মনোভাবও এই সংগ্রামের দিকনির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের চিফ কমিশনার মিষ্টার উডবার্নের মতো কতিপয় বিদেশি শাসক প্রথমাবধিই ওড়িয়া ভাষার বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও, ঔপনিবেশিক যুগের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই অনেক ইংরেজ সিভিলিয়ন কিন্তু তাঁদের ওড়িয়া ভাষাপ্রেমের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। বালেশ্বরের জেলাশাসক জন বিমস, ওড়িশার ডিভিশনাল কমিশনার টি ই র‍্যাভেনস প্রমুখেরা ছিলেন ভাষা প্রশ্নে উদার ও সত্যিকারের ওড়িয়া ভাষার মিত্র, যেভাবে র‍্যাভেনস ওড়িয়া প্রাধান্যযুক্ত অঞ্চলে, ওই ভাষাকে বিদ্যালয় ও সরকারের কাজের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিকরণের জন্য নিজের সরকারের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছিলেন, তা স্মরণে রেখেই তাঁর শাসনকালকে 'The golden age of Orissan history' বলে চিহ্নিত করা হয়। ওড়িশার মানুষ তাঁকে আজও 'মহাত্মা' আখ্যায় ভূষিত করে। ওড়িয়াদরদী চিফ

কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার সম্বলপুরে ১৯০১ সাধারণাব্দ থেকে ওই অঞ্চলে ওড়িয়াকে আংশিকভাবে 'কাজের ভাষা' হিসেবে স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

যাই হোক, ওড়িয়াভাষী মানুষের আন্তরিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ ও ঔপনিবেশিক সরকারের কিছু 'বড় ইংরেজ'-এর সহায়তায় উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা প্রেসিডেন্সির ওড়িয়া সংখ্যাগুরু অংশে বাংলার পাশাপাশি ওড়িয়াও ক্রমশ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বাংলা এমনকী উচ্চ ও মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে 'ঐচ্ছিক' বিষয় হিসেবে গণ্য হয়েছিল। ১৯০৩ থেকে সম্বলপুরেও ওড়িয়া ভাষা তার প্রাপ্য মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ওড়িয়াভাষী অঞ্চলে খুব সহজে ভাষাটির রাহুমুক্তি ঘটেনি। বাংলা ও হিন্দির প্রাধান্যমুক্ত হওয়ার বেশ কিছু বছর পরেও দক্ষিণী এলিটদের অনমনীয় মনোভাবের ফলে ওড়িয়া ভাষা ওই অঞ্চলে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারেনি।

ইতিমধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিল। এরই প্রেষণাতে ওড়িশাতেও পৃথক প্রদেশের দাবি হয়েছিল তীব্রতর। পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছিল দ্রুত। দেশের অন্যান্য অংশের জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিবর্গ এই লাগাতার লড়াইয়ে ওড়িশাবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৬ সাধারণাব্দের ১লা এপ্রিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ ও সেন্ট্রাল প্রভিন্সের ওড়িয়াভাষী অঞ্চলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল আধুনিক ও ঐক্যবদ্ধ ওড়িশা প্রদেশ। যার ফলস্বরূপ অন্যান্য ভাষার নাগপাশ মুক্ত হয়ে ওড়িয়া ভাষাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐক্যবদ্ধ ওড়িশার কাজের ও ভাবের ভাষা। বলা বাহুল্য, এখনও ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো এখানেও ঔপনিবেশিক ইংরেজি ভাষা তার পূর্ব আধিপত্য বজায় রেখেছিল—তা সেই অভিশাপ থেকে আজও আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারিনি, সে আলাদা প্রসঙ্গ।

১৯৪৭ সাধারণাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, ওড়িয়া ভাষা তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে সবিশেষ সক্ষম হয়েছে। 'সবুজদল'-এর নেতৃত্বে কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠ পট্টনায়ক এমনকী অন্নদাশংকর রায়ের লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে ভাষাটির সাহিত্যিক বৈতরণী। সাম্প্রতিককালেও সেই ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়নি।

সমাজতন্ত্রী ভাবধারার অনন্তচরণ পট্টনায়ক, কিংবা জাতীয়তাবাদী হরেকৃষ্ণ মহ্‌তাব ও নন্দিনী শতপথীর অক্লান্ত কর্মে ও কলমে ভাষাটি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সাম্প্রতিক সময়ে এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে 'ধ্রুপদী ভাষা'-র মর্যাদাও ছিনিয়ে নিয়েছে ওড়িয়াভাষীরা। এই সামগ্রিক ভাষা আন্দোলনকে শেষ বিচারে আমরা ওড়িয়া জনতার মহান সাংস্কৃতিক সংগ্রাম হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করতে পারি।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মে ২০২৪

ঋণ:

১. ভারতের ভাষা: গোপাল হালদার।
২. আত্মচরিত : ফকীরমোহন সেনাপতি।
৩. Fakirmohan Senapati : Mayadhar Mansinha.
৪. Utkalmanio Gopabandhu Das—Durgacharan Kuanr.
৫. Padmacharan Pattanayak—Jagnnath Das.
৬. Kalindi Charan Panigrahi—Madhusudan Pati.
৭. Selected Works of Vaysa Kavi Fakirmohan Senpati, (ed) Monica Das.
৮. প্রবন্ধ: British Language Policy in (19th India and the Oriya language Movt, Panchanan Mohanti.
৯. The Linguistic Movt in the 19th Century Orissa—Pritish Acharya.
১০. Linguistic Movt of Odisa : A brief survey of Historiography—Sringdha Acharya.